শ্রীঅরবিন্দ

উপনিষদাবলী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ

উপনিষদাবলী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

'THE UPANISHADS' গ্রন্থের অনুবাদ

মূল অনুবাদক: শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ: ১৯৭২
পুনর্মুদ্রিত: ১৯৮৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রক — শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

সূচীপত্র

উপনিষদ্‌সমূহের দার্শনিক তত্ত্ব

এক

কেবল ব্রহ্মের আবিষ্কার

উপনিষদ্‌সমূহের মূল ভাবনা হ'ল, প্রাতিভাসিক জীবনের সকল পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের পশ্চাতে সর্বাতিরিক্ত ঐক্য, একত্ব ও স্থিরতার ভাবনাঃ ইহাই সকল ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার কেন্দ্রস্থল, আমাদের অধ্যাত্ম অনুভূতির পরাকাষ্ঠা ও লক্ষ্য। আমাদের চারিদিককার প্রাতিভাসিক জগতের কাছে স্থিরতা ও একত্বকে প্রথমে মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়; এমন কিছু নেই যা চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল নয়, এমন কিছু নেই যার প্রতিরূপ নেই, বিপরীত নেই, সুসমঞ্জস ও বিরোধপূর্ণ অংশ নেই; আর সকল কিছুই তাদের আপেক্ষিক স্থান ও বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করছে। তবু যদি একটি বিষয় নিশ্চিত হয় তাহ'লে তা এই যে এই সকল পরিবর্তন ও গতির সমষ্টি একান্তই স্থির, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল, আর এই সব বিভিন্ন জাতীয় সজীব ও নির্জীব বিষয়-সমূহ মূলতঃ একজাতীয় ও এক। তা না হ'লে কিছুই স্থায়ী হ'ত না, তাছাড়া অস্তিত্বের মধ্যে কোন নিশ্চয়তা থাকত না। আর এই যে ঐক্য, স্থিরতা, অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্টতা যুক্তি দাবী করে ও সাধারণ অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে তা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধানের দ্বারা। ক্রমশঃই এই ধারণা দৃঢ় হ'চ্ছে, আর আমাদেরও তা থেকে নিস্তার নেই, যে যতই অংশগুলির পরিবর্তন ও স্থানান্তর হ'ক না কেন এবং যতই না মনে হ'ক যে তারা ধ্বংস হ'চ্ছে তবু সমষ্টি ও সমগ্র অপরিবর্তিত, অন্যূন ও অক্ষয় থাকে; বিভিন্ন রূপ ও মিশ্রিত পদার্থ যতই বহুল, পরিবর্তনশীল ও পরস্পরবিরুদ্ধ হ'ক না কেন, তবু মহান আশ্রয় এক, সরল ও স্থায়ী; স্বয়ং মৃত্যুই সদ্‌বস্তু নয়, বরং এক অবভাস, কারণ যা মনে হয় ধ্বংস তা শুধু রূপান্তর ও পুনর্জন্মের জন্য প্রস্তুতি। বিজ্ঞান তার নিজের আবিষ্কারের পূর্ণ তাৎপর্য না উপলব্ধি করে থাকতে পারে; যে সব ন্যায়ানুগ ফলের দিকে তারা নিয়ে যায় সে সবকে অবিচলিতভাবে স্বীকার করতে সে হয়ত সঙ্কুচিত হয়; আর যে সব মহান বিপরীত সত্য বর্তমানে তাদের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন

রয়েছে—যেমন এই বিস্ময়কর তথ্য যে শুধু মৃত্যুই অবভাস নয়, বরং জীবনও অবভাস এবং জীবন ও মৃত্যুর অতীত এমন এক অবস্থা আছে যা উভয় অপেক্ষা আরো সত্য এবং সেজন্য আরো স্থায়ী—সে যে সেই সব সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে দূরে তা নিশ্চিত। কিন্তু যদিও বিজ্ঞান এখনো তার লক্ষ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবে না, তবু সে সেই পথেই পা দিয়েছে যেখান থেকে আর ফিরে আসা হয় না—এই সে পথ যা ধরে বেদান্ত আগেই চলেছে, তবে এক ভিন্ন স্তরের উপর।

তাহ'লে এখানে এক মহান মৌলিক তথ্য পাওয়া গেল যার জন্য দর্শনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়—সকল ভেদ পরিণত হয় ঐক্যে; আর বিষয়সমূহের পরিবর্তনের ভিতরে এবং ইহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন এক অনির্বচনীয়, অপরিবর্তনীয় কিছু আছে যা যুগপৎ সকল কিছুর আশ্রয় ও সমষ্টি, যাকে কাল স্পর্শ করতে পারে না, গতি বিচলিত করতে অক্ষম আর কোন ভেদেই যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না আর এই আশ্রয় ও সমষ্টি শাশ্বত কাল ধরে আছে এবং শাশ্বত কাল ব্যেপে থাকবে। ইহা এক মৌলিক তথ্য যার দিকে সকল ভাবনা যায়, অথচ সংকীর্ণভাবে বিবেচনা করলে ইহা কি অতীব বিরুদ্ধভাবাপন্ন নয়? কেন না অনন্ত পরিবর্তনের সমষ্টি কেমন করে চিরকাল ধরে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ হ'তে পারে যা কখনও বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়নি এবং কখনো বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে না? যে সমগ্রের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশ নিরন্তর পরিবর্তিত ও ধ্বংস হ'চ্ছে, সে সমগ্র কেমন করে নির্দিষ্ট ও চিরস্থায়ী হ'তে পারে? যদি গতির এক বিভ্রান্তিকর ঘূর্ণন থাকে, তাহ'লে তার ফল কেমন করে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, শুধু এখন নয় বা পরিণতি হিসাবে নয়—সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হ'তে পারে? ইহা অসম্ভব, যদি না এমন কোন চালিকাশক্তি থাকে যার জন্য, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কার্যকারণসম্বন্ধের চিরন্তন শৃঙ্খলার মধ্যে কোন স্থান নেই অথবা যদি না ঐ সমষ্টি ও আশ্রয়ই একমাত্র সদ্‌বস্তু হয় যা অক্ষয় এই কারণে যে ইহা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা অবিভাজ্য, কারণ ইহা দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা অপরিবর্তনীয় কারণ ইহা কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়—এক কথায় যা অনপেক্ষ ও বিশ্বাতীত এবং সেই কারণে চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় ও অক্ষীয়মাণ। তাহ'লে গতি ও পরিবর্তন, মৃত্যু ও বিভাগ হবে পরম এক ও পরমার্থসৎ-এর শুধু বিভিন্ন অস্থায়ী ঘটনা, চিহ্ন ও অবভাস—যে পরমার্থসৎ এখনো পর্যন্ত অনিরূপিত এবং হয়ত

অনুপাখ্য 'ইদম্' আর একমাত্র যা "আছে"।

ভারতীয় কল্পনা তার সচেতন প্রয়াসের আদিপর্বেই এরূপ এক সিদ্ধান্তের দিকে ফিরেছিল,---অবশ্য প্রথমে অনিশ্চিতভাবে এবং বহু অন্ধ অন্বেষণ ও ভ্রম সহ। দৃশ্যমান জগতের বহুল চাঞ্চল্যে শৃঙ্খলা ও স্থিরতা আনে এমন কোন একত্বের অস্তিত্বের কথার চিন্তাতেই আর্য মনস্বীরা শুরু থেকে প্রবণ ছিলেন আর তাঁরা কষ্ট করেই চেষ্টা করেছিলেন ঐ একত্বের জ্ঞান পেতে ইহার প্রকৃতিতে অথবা ইহার স্বরূপে। বিশ্বের যেসব জীবন্ত শক্তিকে তাঁরা বহুদিন পূজা করেছিলেন, অথচ তাদের বহুত্বের মধ্যে সর্বদাই এক ঐক্যের ভাসমান কিন্তু স্থায়ী বোধের বোধ নিয়ে, সেসব শক্তি আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলে পরিণত হ'য়েছিল একটি মাত্র প্রত্যয়ে, একটি মাত্র শক্তিতে বা উপস্থিতিতে যা এক ও বিশ্বব্যাপী। তার পর প্রশ্ন হ'ল, ঐ শক্তি বা উপস্থিতি কি বুদ্ধিযুক্ত না অ-বুদ্ধিযুক্ত? ভগবান না প্রকৃতি? সংশয়ের সহিত ঋগ্বেদ বলেছিল,"একমাত্র তিনিই জানেন, অথবা হয়ত তিনি জানেন না।" অথবা ইহা কি সম্ভব নয় যে, যে একত্ব বিভিন্ন ঘটনাকে একত্র বেঁধে রাখে ও শাসন করে এবং জগৎসমূহের বিবর্তন উদ্‌ঘাটিত করে তা প্রকৃতই সেই বিষয় যাকে আমরা কাল বলি, কারণ প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের তিনটি আদি অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ কাল, দেশ ও কার্যকারণসম্বন্ধের মধ্যে, কাল হ'ল কার্যকারণ-সম্বন্ধের ভাবনার প্রয়োজনীয় অংশ আর দেশের ভাবনা থেকেও ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা একরূপ সম্ভব নয়, তাছাড়া কার্যকারণসম্বন্ধকে কালের ভাবনার পক্ষে প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় না? অথবা ইহা যদি কাল না হয় তাহ'লে ইহা কি স্বভাব নয়, অর্থাৎ বিষয়সমূহের স্বরূপগত প্রকৃতি নয় যা বিবিধ অবস্থা ও রূপ গ্রহণ করে? অথবা বোধ হয় ইহা 'যদৃচ্ছা', কোন অন্ধতত্ত্ব অনন্ত পরীক্ষণের দ্বারা বিষয়সমূহের মধ্যে ঐক্য ও বিধান গড়ে তুলছে---তা-ও হ'তে পারে। অথবা যেহেতু চিরন্তন অনিশ্চয়তা থেকে চিরন্তন নিশ্চয়তা আসা সম্ভব নয়, ইহা কি 'নিয়তি' হতে পারে না, অর্থাৎ বিষয়সমূহের মধ্যে এমন এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বিধান যার অধীন হ'য়ে এই জগৎ নিজেকে বিকশিত করে ঘটনাসমূহের এক পূর্ব-নির্দিষ্ট যাত্রাতে যা থেকে তার অন্যদিকে যাত্রা সম্ভব নয়? অথবা হয়ত বিষয়সমূহের আদি আণবিক উৎসের মধ্যে কতকগুলি ভূত আবিষ্কার করা সম্ভব যারা নিরন্তর ও অনন্ত যোগ বা বিনিময়ের দ্বারা বিশ্বকে

তার বিভিন্ন ক্রিয়াতে নিবিষ্ট রাখে? কিন্তু তা যদি হয়, তাহ'লে এই ভূতগুলির উৎপত্তি এমন কিছু থেকে হ'তে হবে যা তাদের উপর তাদের সত্তার বিধান আরোপ করে এবং উহা যোনি ছাড়া কি হ'তে পারে,— যে যোনি হ'ল আদি ও অবিনশ্বর জড়ের গর্ভাশয়, সেই জৈবনিক যা বিশ্বকে গঠন করে ও যা থেকে ইহা গঠিত হয়? আবার তবু বিষয়সমূহ সম্বন্ধে মন শেষ পর্যন্ত যে পরিকল্পনাই স্থির করুক না কেন, তাতে সজীব প্রাণীর এই সব সচেতন, চিন্তাশীল ও জ্ঞাতা অহং-এর (পুরুষের) জন্য কিছু স্থান করা চাই, কারণ এই সব পুরুষের বেলায় জ্ঞান ও মননই মনে হয় স্বরূপগত আত্মা আর তাদের বিহনে বোধ করা যায় ও জানা যায় এমন সব বিষয়ের এই জগৎকে বোধ করা ও জানা সম্ভব হ'ত না— আর যদি তাদের বোধ করা ও জানা না হয় তাহ'লে ইহা কি সম্ভব নয় যে তাদের ব্যতিরেকে তারা এমন কি থাকতেও পারত না?

এই সব সেই অন্তহীন কল্পনার সব আবর্ত, যাদের মধ্যে প্রাচীন আর্য মনস্বীরা আন্দোলিত ও বিভ্রান্ত হ'য়ে দাঁড়াবার এমন কোন দৃঢ় ভূমি, কোন নির্দিষ্ট সূত্রের সন্ধান করেছিলেন যাতে তাঁরা অন্ধের দ্বারা চালিত হোঁচট খাওয়া অন্ধের মত আঘাত পাওয়া থেকে পরিত্রাণ পান। অবভাসসমূহের উৎপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রথম প্রয়াস হ'য়েছিল সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা প্রাচীন প্রাগ্-ঐতিহাসিক মনীষীশ্রেষ্ঠ কপিল মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন; ইহাকেই বলা হয় সাংখ্যের পদ্ধতি অর্থাৎ পরিসংখ্যানের বিধান। কপিলের পদ্ধতিতে ছিল শুদ্ধ বিচারশীল যুক্তিশক্তির দ্বারা নির্দেশ আর ইহার যে নামকরণ হ'য়েছিল তা তার অন্যতম প্রধান বিধি থেকে অর্থাৎ পরিসংখ্যান ও সাধারণ ধর্ম নির্ধারণের বিধান থেকে। স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান বিষয়সমূহ থেকে যে অব্যবহিত বিষয়ান্তর্গত সত্যগুলি তাঁরা প্রভেদ করতে অথবা অনুমান করতে পেরেছিলেন প্রথমে সেইগুলি তাঁরা গণনা করেছিলেন এবং সে সব থেকে তাদের সাধারণ ধর্ম নির্ধারণের দ্বারা তাঁরা এমন আরো অল্পসংখ্যক দূরবর্তী বিষয়ান্তর্গত সত্য লাভ করেছিলেন যাদের শুধু বিভিন্ন অবস্থা হ'ল অব্যবহিত সত্যগুলি। ইহার পর এইসব দূরবর্তী বিষয়ান্তর্গত সত্যগুলি গণনা ক'রে তাঁরা সামান্য ধর্ম নির্ধারণের দ্বারা সমর্থ হ'য়েছিলেন সেগুলিকে অতি অল্পসংখ্যক অন্তিম বিষয়ান্তর্গত সত্যে হ্রাস করতে; ইহারাই উন্নত সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব (আক্ষরিক অর্থে

তৎ-ত্ব)। আর কিছু নিশ্চয়তার সহিত এই তত্ত্বগুলিকে একবার গণনা করা হ'লে আরো এক ধাপ এগিয়ে সাধারণ ধর্ম নির্ধারণ করা কি সম্ভব ছিল না? সাংখ্য এইভাবেই সাধারণ ধর্ম নির্ধারণ ক'রে এই পরম ও অন্তিম নির্ধারণের দ্বারা এমন এক সর্বশেষ ধাপে উপনীত হ'য়েছিল যার উপর ইহা অপরের সহায় বিনা নিজের শক্তিতেই নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সক্ষম হ'য়েছিল। ইহাই হ'ল প্রকৃতি নামক পরম তত্ত্ব, ইহাই জড়ের একমাত্র নিত্য অবিনশ্বর তত্ত্ব ও উৎস যা নিরন্তর পরিণামের দ্বারা যুগ যুগ ধরে বাহিরে প্রকাশ করে বিষয়সমূহের অন্তহীন দৃশ্য[১]। এবং তা কার লাভের জন্য? নিশ্চয়ই সেই সব সচেতন জ্ঞাতা ও অনুভবকারী অহং-এর, অগণিত সাক্ষীর জন্য যারা স্থূল জড়ের পরিবেষ্টনকারী মাধ্যম দ্বারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রত্যেকে নিজস্ব যুক্তিশীল ও অনুভবশীল মনোদেশের ভিতর চিরকাল আসীন থাকে বিশ্ব নাট্যাগারে দ্রষ্টারূপে! সাংখ্যের চিন্তায় তা হবে চিরকাল ধরে, কারণ যদিও পুরুষদের প্রাচীর অনবরতই ভেঙে যাচ্ছে ও নতুন তৈরী হ'চ্ছে এবং তাদের অধিকৃত দেশ কখনো বরাবর এক থাকে না, তবু তারা মনে করে যে তারা প্রকৃতি অপেক্ষা কম নিত্য ও অবিনশ্বর নয়।

তাহ'লে ইহাই হ'ল নিরূপিত দার্শনিক জ্ঞানের বিস্তীর্ণ নির্দিষ্ট সরোবর যার মধ্যে সাংখ্যের পদ্ধতি অর্থাৎ বিভিন্ন নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী শুদ্ধ বুদ্ধিগত যুক্তিধারা প্রাচীন ভারতের মনকে নিয়ে গেছল। অবশ্য এই জলাধার থেকে শাখা প্রশাখা, কৃত্রিম খালের অভাব ছিল না। কেহ কেহ সেই অগণিত সাক্ষীদের একটিমাত্র সাক্ষীতে পরিণত ক'রে উপনীত হ'য়েছিল ভগবান ও নিসর্গের (Nature), পুরুষ ও প্রকৃতির, চিৎ-পুরুষ ও জড়ের, অহং ও অনহং-এর দ্বৈত ভাবনায়। অন্য যারা আরো মৌলিক তারা প্রকৃতিকে দেখেছিল পুরুষেরই সৃষ্টি, ছায়া বা অবস্থা হিসাবে যার ফলে শুধু ভগবানই রইলেন আধ্যাত্মিক বা আদর্শ বিষয় আর জড়ীয় বা বাস্তব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বাদ পড়ে গেল। বিপরীত দিকেও সমাধানের চেষ্টা হ'য়েছিল; কারণ কেহ কেহ সচেতন পুরুষকেই বাদ দিল শুধু অবভাস বলে; অনেকে আবার মনে হয় ভেবেছিল যে প্রতি

[১] ইহা লক্ষণীয় যে এখানে জড়ের অর্থ শুধু সেই স্থূল জড় নয় যার সহিত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সংস্রব, ইহার অর্থ সূক্ষ্ম জড়ও, সেই উপাদান যাতে মনন ও অনুভবের ক্রিয়া এবং সেই কারণ জড়ও যাতে জিজীবিষার বিভিন্ন মৌলিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

পুরুষ হ'ল চেতনার পরপর অভিঘাতের এক শ্রেণী মাত্র আর তাদাত্ম্যের যে দৃঢ় বোধ তা ভ্রান্তির অতিরিক্ত কিছু নয় আর ইহার কারণ হ'ল অভিঘাতগুলির অবিচ্ছিন্ন অনুবর্তন। যদি চেতনার এই অভিঘাতগুলি বিবর্তনের বহুল চাঞ্চল্যের মাঝে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন থেকে মস্তিষ্কের উপর বহন করা হয় তাহ'লে চেতনা হল প্রকৃতিরই বহু সংস্কার মধ্যে অন্যতম যার ফলে শুধু প্রকৃতিই একমাত্র সদ্-বস্তু, জড়ীয় বা প্রকৃত বিষয় আর আধ্যাত্মিক বা আদর্শ বিষয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে বাদ পড়ে যায়। কিন্তু অনেকের মতো যদি আমরা বলি যে প্রকৃতি যে পুরুষদের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অন্তিম সদ্‌বস্তু তা নয় আর তবু ইন্দ্রিয়-সংবিতের পরপর তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট তাদাত্ম্যের মিথ্যা ধারণার মত প্রয়োগ করি তাহ'লে আমরা উপনীত হই প্রাচীন ভারতীয় শূন্যবাদীদের অসম্ভব ও সত্যাভাসময় মতে যার যুক্তি অদ্ভুত আত্মনাশের দ্বারা উপনীত হ'ল এই মতে যে শূন্যতাই সকল অস্তিত্বের আদি ও অন্ত, এমনকি ইহাই তার উপাদান ও সত্যতা। আর একটি তৃতীয় দিক ছিল যাতে চিন্তাধারা বেদান্তের অনুকূল হওয়ায় বেদান্তের দ্বারে উপনীত হ'য়েছিল; কারণ ইহাও এক সম্ভবপর কল্পনা যে প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই সম্পূর্ণ সত্য অথচ অন্তিমে ইহারা পরস্পরের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা নয়, এবং সেজন্য শেষ পর্যন্ত তারা হ'ল তাদের অপেক্ষা পরতর এক একত্বের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা। কিন্তু এই সব কল্পনা প্রথমদৃষ্টিতে গ্রহণীয় বা অপূর্ণ হ'ক, ন্যায়ানুগ অথবা সত্যাভাসময় হ'ক, ইহারা কিন্তু শুধু কল্পনাই; কোন দৃষ্ট তথ্যে অথবা বিশ্বাসযোগ্য অনুভূতিতে ইহাদের ভিত্তি ছিল না। মনে হয় দুটি নিশ্চিত বিষয় পাওয়া গেছল, প্রকৃতি প্রমাণিত হ'ল দৃশ্যমান অস্তিত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা; ইহাই ছিল দৃশ্যমান জগতের ভিত্তি কারণ আদি জড়ের এক আশ্রয় ব্যতীত এই জগতের কোন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়নি আর এই আশ্রয়ে মৌলিক একত্ব ও অবিনশ্বরতা না থাকলে, জগৎ তা হ'তে পারত না যা তাকে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যেমন ইহা বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিধানের অধীন এবং স্পষ্টতঃই তার যোগফল ও সারে অপরিবর্তনীয়। অপর পক্ষে পুরুষসমূহ প্রমাণিত হল জীবনের মধ্যে অথবা মৃত্যুর[১] পর ব্যষ্টিত্ব ও তাদাত্ম্যের বোধের চিরন্তন দৃঢ়তার দ্বারা এবং

১ ভারতবর্ষে মৃত্যুর পর মানবীয় ব্যক্তিত্বের স্থায়িত্ব সর্বদাই এক বিবাদাতীত ও প্রমাণিত তথ্য; ইহার সম্বন্ধে চার্বাকের অস্বীকৃতিকে অযৌক্তিক ও ইচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতা

প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর জন্য এক অনুভবকারী কারণের আবশ্যকতার দ্বারা; তারা হ'ল গ্রহিষ্ণু ও চিন্তাশীল অহং যাদের চেতনার আয়তনের মধ্যে প্রকৃতি তাদের সান্নিধ্যের দ্বারা সৃজনশীল ক্রিয়ায় প্রণোদিত হ'য়ে তার দৃশ্যমান বিবর্তনের দীর্ঘ নাটক অভিনয় করেছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও শরীর জয়ের পরীক্ষণে ও প্রয়াসে এমন এক আবিষ্কারকে সুষ্ঠু করেছিলেন যা মানব জ্ঞানের ভবিষ্যতের নিকট তার গুরুত্বে নিউটন ও গালিলিও-এর সব ভবিষ্যৎবাণীকে খর্ব করে; এমনকি বিজ্ঞানে আরোহ ও পরীক্ষণ-মূলক পদ্ধতির আবিষ্কারও ইহা অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়নি; কারণ তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যোগপদ্ধতি তার সর্বশেষ সব প্রণালী পর্যন্ত এবং যোগপদ্ধতির দ্বারা তাঁরা উঠেছিলেন তিনটি চরম উপলব্ধিতে। প্রথম তাঁরা তথ্য হিসাবে বিষয়সমূহের পরিবর্তনধারা ও বহুলত্বের নীচে এমন এক পরম ঐক্য ও অপরিবর্তনীয় স্থিরতায় অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যা এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে শুধু এক আবশ্যকীয় মত, এক অনিবার্য সামান্য করণ হিসাবে। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে ইহাই একমাত্র সদ্‌বস্তু আর সকল দৃশ্যমান বিষয় শুধু তার অবভাস ও প্রতিভাস; তাঁরা আরো জেনেছিলেন যে ইহাই সকল বিষয়ের প্রকৃত আত্মা এবং দৃশ্যমান বিষয়গুলি শুধু ইহার বিভিন্ন পোষাক ও ভূষণ। তাঁরা এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন যে ইহাই অনপেক্ষ ও বিশ্বোত্তীর্ণ এবং যেহেতু ইহা অনপেক্ষ ও বিশ্বোত্তীর্ণ, সেহেতু ইহা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, তারতম্যের অতীত ও অবিভাজ্য। আর কল্পনার অতীত প্রগতির দিকে পিছনে তাকিয়ে তাঁরা দেখেছিলেন যে শুদ্ধ বুদ্ধিগত যুক্তিধারা বলে তাঁরা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতেন, ইহাও সেই লক্ষ্য। কারণ যা কালের অন্তর্গত তার জন্ম ও নাশ ধ্রুব; কিন্তু বিষয়সমূহের ঐক্য ও স্থিরতা নিত্য এবং সেজন্য ইহা কালের অতীত হবেই। যা দেশের অন্তর্গত তার বৃদ্ধি ও হ্রাস, অংশ ও সম্বন্ধ থাকবেই কিন্তু বিষয়সমূহের ঐক্য ও স্থিরতা তারতম্যের অতীত এবং সেজন্য ইহার বৃদ্ধি সম্ভব নয়, ইহা তার বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন-শীলতার অনধীন, ও তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধের তারতম্যের স্পর্শমুক্ত এবং সেজন্য দেশাতীত হবেই; আর ইহা যদি দেশাতীত হয়, তাহ'লে বস্তুতঃ

ব'লে অবজ্ঞা করা হ'ত। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় মানসে মৃত্যুর পর স্থায়িত্ব বলতে যে অমরত্ব বোঝাবেই তা নয়; ইহা শুধু তার অনুকূলে এক দৃঢ় সম্ভাবনা আনে।

ইহার কোন অংশ থাকা সম্ভব নয় কারণ দেশ হ'ল জড়ীয় বিভাজ্যতার অবস্থা; সুতরাং মৃত্যুর মত বিভাজ্যতাও অবভাস হ'তে বাধ্য, ইহা কোন সদ্‌বস্তু নয়। সর্বশেষ, যা কার্যকারণ সম্বন্ধের অধীন তা নিশ্চয়ই পরিবর্তনশীল হবে; কিন্তু বিষয়সমূহের ঐক্য ও স্থিরতা অপরিবর্তনীয়, বহু যুগ পূর্বেও ইহা যেমন ছিল তেমনই ইহা এখনো আছে এবং ইহার পর যুগ যুগ ধরে তেমনই থাকবে এবং সেজন্য ইহাকে কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত হ'তে হবেই।

তাহ'লে যোগের মাধ্যমে ইহাই হ'ল প্রথম উপলব্ধি, "নিত্যোঽনিত্যানাম্', বহু অনিত্যের মধ্যে এক নিত্য।

সেই সঙ্গে তাঁরা আর একটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন--এক আশ্চর্যজনক সত্য; তাঁরা দেখেছিলেন যে বিষয়সমূহের বিশ্বাতীত অনপেক্ষ আত্মাই আবার সকল প্রাণীর আত্মা, জড়ীয় স্তরে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠ প্রাণী যে মানুষ, তারও আত্মা। দেখা গেল যে বিষয়সমূহের আপাত অচেতন উৎস, প্রকৃতিও যা, পুরুষ অর্থাৎ মানবের মাঝে যে সচেতন অহং সাংখ্যকে বিমূঢ় ও বিফল করেছিল তা-ও ঠিক তাই; অন্য সব কিছুর মতো প্রকৃতির অচেতনতা এক অবভাস বলে প্রমাণিত হ'ল, ইহা কোন সদ্‌বস্তু নয়, কারণ যোগীর দৃষ্টিতে অচেতন রূপের পশ্চাতে যে সচেতন প্রজ্ঞা কর্মরত তা জ্বলন্তভাবে স্বয়ং-প্রকাশিত।

তাহ'লে ইহাই হ'ল যোগের মাধ্যমে দ্বিতীয় উপলব্ধি, "চেতনশ্চেতনানাম্" বহু চেতনার মধ্যে এক চেতনা।

সর্বশেষ, এই দুটি উপলব্ধির মূলে একটি তৃতীয় উপলব্ধি ছিল যা আমাদের জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ--এই উপলব্ধি যে ব্যষ্টি মানবের মাঝে বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মা বিশ্বের মধ্যস্থ বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মার মতোই সম্পূর্ণ কারণ এই দুই অভিন্নভাবে এক; কেননা বিশ্বোত্তীর্ণ অবিভাজ্য আর পৃথক ব্যষ্টিত্বের বোধ সেই সব মৌলিক অবভাসের অন্যতমমাত্র যাদের উপর দৃশ্যমান অস্তিত্বের অভিব্যক্তি চিরন্তন নির্ভরশীল। এই প্রকারে যে পরমার্থসৎ অন্যথায় জ্ঞানের অতীত তা জানার যোগ্য হ'য়ে ওঠে; আর যে ব্যক্তি তার সমগ্র আত্মাকে জানে সে সমগ্র বিশ্বকে জানে। এই বিশাল সত্য আমাদের জন্য সযত্নে রক্ষিত আছে বেদান্তের দুটি বিখ্যাত সূত্রে--'সোঽহম্', 'তিনিই আমি' এবং 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম, সনাতন।

বিশাল স্তম্ভের মতো--'নিত্যোঽনিত্যানাম্', 'চেতনশ্চেতনানাম্', 'সোঽহম্',

'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'—এই চারিটি মহান্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উপ-নিষদের সমুন্নত দর্শন তার শীর্ষ উত্তোলন করেছিল দূরবর্তী সব তারকার মাঝে।

দুই

অনপেক্ষ ব্রহ্মের স্বরূপ

এই চারটি মহান্ জ্যোতিস্তম্ভের আলোকে দেখা হ'লে উপনিষদগুলির বিভিন্ন উক্তি একটি সুষ্ঠু সুসঙ্গতির মধ্যে সজ্জিত হ'য়ে পড়ে। ম্যাক্স-মুলারের মতো ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই সব শ্রুতির মধ্যে দেখেছিলেন রাশি রাশি বিরুদ্ধ ভাবনা যেখানে মহান বিষয়ের সংঘর্ষ হ'চ্ছে শিশুসুলভ বিষয়ের সহিত, গম্ভীর বিষয় বন্ধুর মতো বিচরণ করে হাস্যকর বিষয়ের সহিত, অতীব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বিষয় অবস্থান করে সর্বাপেক্ষা বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বোধির সহিত এবং সেজন্য তাঁরা বলেছেন যে ইহারা হ'ল শিশু মানবজাতির প্রলাপ; পাশ্চাত্য মতে আরণ্যকের মহান্ ঋষিরা ছিলেন অনুপ্রাণিত শিশু, প্রতিভাসম্পন্ন নির্বোধ। কিন্তু এই মতের যা প্রকৃতি তাতেই ইহা সন্দেহজনক। যে ব্যক্তিরা অন্তিম ও সর্বাপেক্ষা দুরূহ বুদ্ধিগত সমস্যাগুলি এরূপ দক্ষতা, যথার্থতা ও অন্ত-র্দৃষ্টির সহিত আলোচনা করেছেন তাঁরা যে এমন সব বিষয়ে শুধু নির্বোধ প্রলাপ বলবেন যাতে আরো নিম্ন শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন তা সম্ভব নয়। এই আরো কম উন্নত ক্ষেত্রে তাঁদের উক্তি সত্য হ'তে পারে অথবা প্রমাদপূর্ণ হ'তে পারে কিন্তু ইহা সঙ্গত ভাবেই স্বীকার করা যায় যে সেসব উক্তি তাঁরা করেছিলেন তাদের সম্বন্ধ ও অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাবনা নিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলি যে সব পদ্ধতি দিয়ে পাওয়া গিয়েছে সে সব পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত বুদ্ধির কাছে এই সব সিদ্ধান্ত এত উদ্ভট ও শিশুসুলভ মনে হবে যে তা কথায় প্রকাশ করা যায় না—এই সবকে শিশু মানবজাতির প্রলাপ মনে না হ'লেও মনে হবে যে ইহারা অন্ততঃ মানবজাতির বার্ধক্যজনিত মানসিক অবসন্নতা-প্রসূত প্রলাপ; অথচ এই সব উদ্ভট তুচ্ছ বিষয় যে সুনিরূপিত ও অকাট্য সত্য তা দেখাবার জন্য প্রয়োজন শুধু সামান্য সঠিক জ্ঞানের।

আসল সত্য এই যে উপনিষদগুলিতে যে কল্পনাত্মক ভাষা ও মাঝে মাঝে যে প্রতীকের প্রয়োগ আছে তা সত্ত্বেও, সেগুলি তাদের সকল অংশে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত ও সুসম্বন্ধ। অবশ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের নানাবিধ

অবস্থা উপেক্ষা করে এবং সকল বিষয়কে একটিমাত্র সংজ্ঞায় পরিণত করে সুসঙ্গতির একটি কৃত্রিম ধারণা সৃষ্টি করা ইহাদের কাজ ছিল না; কারণ ইহারা এমন কোন দার্শনিক গ্রন্থ নয় যার উদ্দেশ্য গাণিতিক আচ্ছিন্নতা অথবা জ্যামিতিক যথার্থতা ও সুসঙ্গতি। ইহারা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির এবং এইসব পর্যবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও সামান্য ধর্ম নিরূপণের বিশাল ভাণ্ডার আর এইসব যখন বলা হ'য়েছিল তখন বিতর্কের জন্য কোন সাবধানতার দিকে মন দেওয়া হয়নি এবং ন্যায়ানুগ বিরুদ্ধতা এড়াবার জন্য কোন উদ্বেগ ছিল না। অথচ তাদের মধ্যে ছিল সকল যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও অকৃত্রিম অনুভূতির সুসঙ্গতি। স্বভাবতঃই এবং কোন স্থির উদ্দেশ্য বিনাই ইহারা এমন এক মহান্ বিশ্বজনীন সত্যের মধ্যে সুবিন্যস্ত হয়েছিল যা প্রসারিত হ'য়েছিল কিছু সংখ্যক ব্যাপক সাধারণ বিধানে আর এই সব বিধানের সাধারণ ঐকমত্যের ভিতরে আবার অনন্ত বিশেষ তারতম্যের ও এমন কি অনিয়মেরও স্থান আছে। অন্য কথায় বলা যায় যে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ সুসঙ্গতি অপেক্ষা বরং বৈজ্ঞানিক সুসঙ্গতিই বর্তমান।

অবশ্য বাচনিক যুক্তিধারার সংকীর্ণ কারাগারে আবদ্ধ কঠোর নৈয়ায়িকের কাছে মনে হবে যে উপনিষদগুলি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এক আদি ও মৌলিক অসঙ্গতির উপর। এই সব শ্রুতিতে কতকগুলি অংশ আছে যাতে অত্যধিক জোরের সহিত অনপেক্ষ ব্রহ্মের অজ্ঞেয়তার কথা বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে মন বা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কিছুই ব্রহ্মে উপনীত হ'তে অক্ষম আর বাক্য বিফল হ'য়ে ফিরে আসে ইহাকে বর্ণনা করার প্রয়াস থেকে; আরো বলা হয়েছে যে আমরা পরমার্থসৎ ও বিশ্বোত্তীর্ণকে তার সত্যতায় জানি না, তাছাড়া অপরের কাছে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সঠিক পন্থা, হয়ত কোন পন্থাই আমরা বিচার করে বাহির করতে অক্ষম; এমন কি ইহাও বলা হয় যে ইহার যথার্থ উপলক্ষণ সম্ভব একমাত্র নেতিবাচক ভাষায় আর নির্দেশের জন্য প্রতি আহ্বানেই একমাত্র সত্যকার উত্তর হ'ল, 'নেতি নেতি', ইহা তা নয়, ইহা তা নয়। ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না বুদ্ধিগতভাবে জানাও যায় না। তবু এই সব অংশ সত্ত্বেও উপনিষদগুলি সর্বদাই ঘোষণা করে যে ব্রহ্মই জ্ঞানের একমাত্র সত্যকার বিষয় আর বাস্তবিকই সমগ্র শ্রুতিতে হয়ত নির্দেশ করার কোন প্রয়াস নেই তবে তাতে অন্ততঃ কিছু

প্রকারে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ভাবনা, এমন কি বিস্তারিত ভাবনাও উপলক্ষিত ও উপস্থাপিত করার প্রয়াস করা হ'য়েছে।

যে অসঙ্গতি আছে তা তত যথার্থ নয় যত আপাতপ্রতীয়মান। তার অন্তিম সত্যতায় ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ, অনপেক্ষ ও অনন্ত; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি ও যে ধীশক্তিকে ইন্দ্রিয়গুলি উপকরণ জোগায় তা সান্ত; বাক্যও ধী-শক্তির ন্যূনতার দ্বারা সীমিত; সুতরাং ব্রহ্ম তার স্বরূপে ধীশক্তির নিকট অজ্ঞেয় হবেই আর বর্ণনা করার জন্য বাক্যের শক্তির অতীতও হবে,—অথচ তা শুধু ইহার অনন্ত সত্যতায়, তার বিভিন্ন পাদে বা অভিব্যক্তিতে নয়। অজ্ঞেয়বাদী বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করে যে মানুষের অজ্ঞাত এবং সম্ভবতঃ অজ্ঞেয় এমন কোন মহান অন্তিম সদ্‌বস্তু অবশ্যই আছে যা থেকে এই বিশ্ব উদ্ভূত এবং যার উপর সকল দৃশ্যমান বিষয় নির্ভরশীল, কিন্তু অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে তার এই স্বীকৃতি শুধু এই পরম সত্ত্বের (Ens) অন্তিম স্বরূপে সীমিত, বিশ্বের মধ্যে ইহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তিতে নয়। জড়ীয় বিশ্লেষণ অপেক্ষা আরো এক গভীর পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে উপনিষদ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী অপেক্ষা তার জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করে অথচ পরিশেষে ইহারও মনোভাব প্রায় একই; তার পার্থক্য শুধু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে ইহা বলে যে পরব্রহ্ম সান্ত জ্ঞানের ভাষায় প্রকাশের যোগ্য না হ'লেও ইহাকেও উপলব্ধি ও লাভ করা সম্ভব।

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ হ'ল তিনি দৃশ্যমান বিশ্বে যে ভাবে অভিব্যক্ত হ'য়েছেন সেইভাবে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করা; কারণ যদি ব্রহ্ম ছাড়া কোন সদ্‌বস্তু না থাকে, তাহ'লে যে দৃশ্যমান বিশ্ব স্পষ্টতঃই স্থায়ী ও নিত্য কিছুর অভিব্যক্তি তা অবশ্যই ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি হবে, অন্য কিছুর নয়, আর যদি আমরা ইহাকে সম্পূর্ণ-ভাবে জানি, তাহ'লে আমরা তাকে কিছু পরিমাণে ও কিছু প্রকারে জানি, অবশ্য অনপেক্ষ সন্মাত্র হিসাবে নয় তবে দৃশ্যমান অভিব্যক্তির অবস্থায়। কিন্তু যখন ইউরোপীয় বিজ্ঞান চেষ্টা করে শুধু স্থূল জড়ের ঘটনাবলী জানতে, তখন যোগী যায় আরো বেশী দূরে। সে বলে যে সে এমন এক সূক্ষ্ম জড়ের বিশ্ব আবিষ্কার করেছে যা স্থূলকে ভেদ ক'রে ও বেষ্টন করে অবস্থিত; এই বিশ্ব যার মধ্যে চিৎ-পুরুষ নিদ্রার মধ্যে আংশিক-ভাবে ও অল্প সময়ের জন্য যায় এবং মৃত্যুদ্বারের মধ্য দিয়ে আরো সম্পূর্ণ-ভাবে ও আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য যায়,—এই উৎস থেকেই সকল চিত্ত-

বৃত্তির উদ্ভব হয়; আর যে সূত্র এই বিশ্বকে স্থূল জড়ীয় জগতের সহিত সংযুক্ত করে তা পাওয়া যাবে প্রাণ ও মনের বিষয়ের মধ্যে। তার এই উক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মক আর উপনিষদ ইহারই উপর ভিত্তি করে চলে যেন ইহা এক নির্ধারিত ও নির্বিবাদ তথ্য যা শুধু আন্দাজ বা অনুমান বা কল্পনার সীমার সম্পূর্ণ অতীত। কিন্তু তবু সে আরো দূরে যায় এবং বলে যে কারণজড়ের আরো একটি তৃতীয় বিশ্ব আছে যা সূক্ষ্ম ও জড়, এই উভয় বিশ্বকেই ভেদ ক'রে ও বেষ্টন ক'রে আছে আর এই বিশ্ব যার মধ্যে চিৎপুরুষ নিদ্রা ও সমাধির সর্বাপেক্ষা গভীর ও অতলস্পর্শী অবস্থার মধ্যে যায় এবং আবার মৃত্যুর পর মানুষের অবস্থার উজানে আরো এক দূরবর্তী অবস্থায় যায়—এই উৎস থেকেই সকল বিষয়ের উৎপত্তি হয়। যদি আমরা উপনিষদ বুঝতে চাই তাহ'লে অন্ততঃ সাময়িক-ভাবেও আমাদের এই সব উক্তি স্বীকার করা দরকার যদিও এগুলি আমাদের কাছে বিস্ময়কর; কারণ ইহাদেরই উপর বেদান্তর সমগ্র সৌধ নির্মিত। এই সব বিশ্বের প্রতিটির মধ্যেই ব্রহ্ম নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, কারণজড়ের বিশ্বের মধ্যে কারণ, আত্মা ও চিদাবেশকারী রূপে, যাকে কবির ভাষায় বলা হয় প্রাজ্ঞ রূপে; সূক্ষ্ম জড়ের বিশ্বের মধ্যে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করেন স্রষ্টা, আত্মা ও আধার রূপে যাকে অভিহিত করা হয় হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ ও রূপের হিরন্ময় গর্ভ, আর স্থূল জড়ের বিশ্বের মধ্যে শাস্তা, অধ্যক্ষ, আত্মা ও সহায়করূপে যাকে অভিহিত করা হয় বিরাট যিনি ভাস্বর ও পরাক্রান্ত। আর এই সব অভিব্যক্তির প্রতিটির মধ্যেই তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করা যায় মানবের চিৎ-পুরুষ দ্বারা।

যদি এই সব অসাধারণ উক্তিগুলির সত্যতা স্বীকার করা হয় তাহ'লে পরমাত্মা ও মানুষের মধ্যে কি সম্বন্ধ? একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা হ'য়েছে যে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মা যা, মানুষের মাঝে বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মাও ঠিক তাই এবং এই তাদাত্ম্যই অনপেক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের একটি বড় চাবিকাঠি। তাহ'লে যেমন ব্রহ্মের ত্রিধা অভিব্যক্তির মধ্যে কিছু প্রভেদ সূচিত হয়, পরমার্থসৎ, ও মানুষী আত্মার মধ্যে কি এরূপ প্রভেদের কথা অবান্তর হ'য়ে পড়ে না? একদিকে পরমাত্মা ও মানবাত্মার সম্পূর্ণ তাদাত্ম্যের কথা বলা হ'চ্ছে একটি নিরূপিত ও অনুভূত তথ্য হিসাবে, অন্যদিকে বৃহত্তম প্রভেদের কথা বলা হয়েছে এক সমানই সুনিরূপিত

ও অনুভূত তথ্য হিসাবে; এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কোন মিল সম্ভব নয়। অথচ এই দুটিই তথ্য——ইহাই বেদান্তর উত্তর; তাদাত্ম্য হ'ল বিষয়সমূহের সত্যতার মধ্যে এক তথ্য আর প্রভেদ হ'ল বিষয়সমূহের অবভাসের মধ্যে, দৃশ্যমান ঘটনার জগতের মধ্যে এক তথ্য; কারণ দৃশ্য-মান বিষয়সমূহ স্বরূপে অবভাস ছাড়া কিছু নয় আর ব্যষ্টি আত্মা ও বিশ্বজনীন আত্মার মধ্যে পার্থক্যই সেই মৌলিক অবভাস যার জন্য বাকী সব সম্ভব হয়। ব্রহ্মের অভিব্যক্তি যতই এগিয়ে চলে, ততই এই প্রভেদ বৃদ্ধি পায়। স্থূল জড়ের জগতে, ইহা সম্পূর্ণ; এই প্রভেদ এত তীক্ষ্ণ যে জড়গত ইন্দ্রিয়পর সত্তার পক্ষে একথা ধারণা করা অসম্ভব যে তার নিজের অন্তঃপুরুষের সহিত পরম পুরুষের কোন প্রকার সংযোগ আছে আর শুধু বিবর্তনের এক দীর্ঘ প্রণালীর দ্বারাই সে সেই জ্ঞান লাভ করে যাতে তার কাছে কোন প্রকারের তাদাত্ম্য ধারণার যোগ্য হ'য়ে ওঠে। স্থূল জড়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনের মৌলিক ধারণা দ্বৈতভাবাত্মক; এখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে ভিন্ন হবেই আর তার সমগ্র বুদ্ধিবিষয়ক উন্নতির অর্থ জ্ঞানের আরো নতুন মাধ্যম ও পদ্ধতি আবিষ্কার, উন্নতি ও সুষ্ঠু ব্যবহার। ইহা নিঃসন্দেহ যে, সে যে চরম জ্ঞান লাভ করে তাতে সে নিজের সহিত পরমাত্মার তাদাত্ম্যের মৌলিক সত্য জানতে পায়, কিন্তু স্থূল দৃশ্য-মান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই তাদাত্ম্য কখনই বুদ্ধিগত ধারণার অতিরিক্ত হ'তে পারে না, ব্যক্তিগত উপলব্ধির দ্বারা ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করা কখনো সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে মানবজাতি ও অন্য সকল মানব-ভাইদের প্রতি প্রেমের মাধ্যমে অথবা সরাসরি ভগবানের প্রতি প্রেমের মাধ্যমে, প্রেম ও বিশ্বাসের পরম সমবেদনার দ্বারা ইহাকে অনুভব করা সম্ভব। প্রধানতঃ যেসব ধর্ম প্রধানতঃ প্রেম ও বিশ্বাসের কোমল ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে তাদাত্ম্যের এই অনুভব অতিশয় প্রবল। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ও পিতা এক"; বৌদ্ধধর্ম বলে, আমি ও আমার ভাই মানুষ ও আমার ভাই পশু——সব এক; সাধু ফ্রান্সিস বায়ুকে বলেছিলেন তাঁর ভাই এবং জলকে তাঁর ভগিনী; আর হিন্দু ভক্ত একটি বলদকে চাবুকের দ্বারা প্রহৃত হ'তে দেখে নিজেই যন্ত্রণায় পড়ে যায় আর তার দেহে ফুটে ওঠে চাবুকের দাগ। কিন্তু একত্বের অনুভব শুধু অনুভব থেকে যাওয়ায়, ইহা জ্ঞানে প্রসারিত হয় না এবং সেজন্য এই সব ধর্ম ভাবাবেগের দিক থেকে তাদাত্ম্যের

বোধে পরিব্যাপ্ত হ'লেও বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইহা এক সংগ্রামোন্মুখ, দ্বৈতভাবের অথবা সর্বদাই অন্য কোন অদ্বৈতবিরুদ্ধ মতের দিকে ঝোঁকে। সুতরাং দ্বৈতভাব শুধু ভ্রান্তি নয়; ইহা এক সত্য, তবে ইহা এক প্রাতিভাসিক সত্য, ইহা বিষয়সমূহের চরম সত্যতা নয়।

জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার ও সুষ্ঠু করার কাজে অগ্রসর হওয়ার সময় ব্যষ্টি আত্মা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করে। এখানে যে প্রভেদ ইহাকে পরমাত্মা থেকে পৃথক করে তা কম উগ্র; কারণ জড়ের সব বন্ধন লঘু হ'য়ে যায় এবং বিভাজন ও বৈষম্যের যে বৃহৎ সহায়ক কাল ও দেশ তাদের চাপের প্রবলতা হ্রাস পায়। এখানে ব্যষ্টি বৃহৎ সমগ্রের সহিত কিছু ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে; বিশ্বজনীন আত্মার অংশ হিসাবে সে প্রসারিত হয় ও বৃদ্ধি পায় কিন্তু তাদাত্ম্যের বোধ সম্পূর্ণ হয় না আর তা হ'তেও পারে না। এই সূক্ষ্ম বিশ্বের মধ্যে মনের মূল ধারণা দ্বৈত-অদ্বৈত; জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়; সে তারই সদৃশ এবং একই ধাতুর তবে নিম্নতর, ক্ষুদ্রতর ও অধীন; তার একত্বের বোধ সাদৃশ্য ও এক-ধাতবীয়ত্ব হ'তে পারে কিন্তু ইহা সমানুপাত ও পরিপূর্ণ তাদাত্ম্য নয়।

সূক্ষ্ম বিশ্ব থেকে ব্যষ্টি আত্মা তার বিবর্তনে আরো ঊর্ধ্বে ওঠে যতক্ষণ না সে সক্ষম হয় কারণ জড়ের বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করতে আর এখানে সে উৎস-মুখের সন্নিকটে দাঁড়ায়। এই বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম ও পদ্ধতিসমূহ লোপ পেতে শুরু করে, মন তার উৎসের সহিত প্রায় সরাসরি সম্বন্ধে আসে আর ব্যষ্টি আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত হ্রাস পায়। তবু, এখানেও প্রভেদের একটি প্রাচীর আছে যদিও শেষ পর্যন্ত ইহা ক্ষীণ হ'য়ে আসে সবচেয়ে পাতলা কাগজের মতো। জ্ঞাতা জানে যে সে পরমাত্মার সহিত সমকালীন ও সহবর্তী, সর্বত্র উপস্থিতির বোধও তার থাকে; কারণ যেখানেই পরমাত্মা, সেখানেই সে-ও থাকে; তাছাড়া সে থাকে দৃশ্যমান বিষয়সমূহের অন্য দিকে এবং বিশ্বকে ইচ্ছামতো দেখতে পারে তার বাহিরে বা তার ভিতার; কিন্তু তখনো সে অবশ্যম্ভাবীরূপে পরমকে সম্পূর্ণ নিজ ব'লে উপলব্ধি করেনি, যদিও এই পূর্ণ উপলব্ধি এখন প্রথম বারের মতো তার আয়ত্তাধীন। এই বিশ্বে মনের মূল বোধ হল ভেদসমেত অদ্বৈতভাব, কিন্তু অদ্বৈতভাবের চরম শ্রেষ্ঠ বোধ এখানে সম্ভব হয়।

কিন্তু যখন ইহা শুধু যে সম্ভব তা নয়, বরং আয়ত্ত করা হয়েছে? তখন ব্যষ্টি আত্মা পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে ও যে কোন অর্থেই সে আর ব্যষ্টি আত্মা থাকে না, বরং সে নিত্য ও অনপেক্ষ ব্রহ্মের মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে আবার হ'য়ে ওঠে নিত্য ও অনপেক্ষ ব্রহ্ম যার অংশ নেই, আদি নেই, যা অক্ষীয়মাণ ও অপরিবর্তনশীল। কার্যকারণ সম্বন্ধ ও প্রতিভাসসমূহের উজানে সে চলে গেছে এবং আর সে সেই বস্তুর দাসত্বের অধীন থাকে না যা থাকে শুধু অবভাসরূপে। ইহাই হিন্দুধর্মের লয় বা নিঃশেষ সমাপত্তি, উপনিষদগুলির ও বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ নির্বাণ অথবা বিষয়সমূহ থেকে বিনাশ। স্পষ্টতঃই ইহা এমন এক অবস্থা যাকে বাক্য প্রকাশ করতে অক্ষম, কারণ বাক্যের সৃষ্টি হ'য়েছে বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রকাশ করার জন্য এবং সম্বন্ধ প্রকাশ করার সময় ছাড়া তার কোন অর্থ থাকে না এবং সেজন্য ইহা সেই অবস্থার সহিত সফলভাবে কারবার করতে পারে না যা সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ, অনপেক্ষ ও অসম্বন্ধ; ইহা আবার সে অবস্থাও নয় যাকে এই স্তরের উপর মানুষের সীমাবদ্ধ ও সান্ত মন এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করতে পারে। পরম অবস্থা বোধগম্য না হওয়া আমাদের বর্তমান দিনের মানবজাতির অসংযত কল্পনার পক্ষে এক প্রকাণ্ড বাধা কারণ ইহা ইন্দ্রিয়পর, ভাবাবেগাত্মক, ও বুদ্ধিগত হওয়ায় ইহা সেই আনন্দ থেকে অনিবার্যভাবে পশ্চাদপসরণ করে যার মধ্যে কি ইন্দ্রিয়, কি ভাবাবেগ, কি ধীশক্তি, কারুরই কোন স্থান নেই। আপত্তি করা হয় যে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও সুখের এই সকল উৎস ও পদ্ধতির বিনাশ বা প্রশমের অর্থ নিশ্চয়ই পরম আনন্দ নয়, বরং ইহা সম্পূর্ণ শূন্যতা, একান্ত বিনাশ। বেদান্ত বলে, "ইহা ভুল, এক করুণ নিকৃষ্ট প্রমাদ। এই পরম অবস্থায় সব ইন্দ্রিয়ের যে অবসান হয় তার কারণ কি? তার কারণ এই যে ইন্দ্রিয়গুলি বিকশিত হ'য়েছিল বাহ্য সত্তা বোধ করার জন্য আর যেখানে বাহ্য অবস্থার অবসান হয় সেখানে কোন কাজ না থাকায় ইন্দ্রিয়গুলিরও অবসান হয়। ভাবাবেগগুলিও চালিত হয় বাহিরের দিকে এবং তাদের আনন্দের জন্য অন্য একজনের প্রয়োজন হয়, তারা স্থায়ী হয় শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ আমরা অসম্পূর্ণ থাকি। সেই রকম ধীশক্তিও থাকে ও কাজ করে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তার বাহিরে কিছু থাকে ও আয়ত্ত না হয়ে। কিন্তু সর্বোচ্চের নিকট কোন কিছু অনায়ত্ত নেই, সর্বোচ্চ তাঁর আনন্দের জন্য কাহারো উপর নির্ভরশীল নন। সুতরাং তাঁর ভাবাবেগও নেই, ধীশক্তিও

নেই, আর যে ব্যক্তি সর্বোচ্চের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ও সর্বোচ্চ হ'য়ে ওঠে সে-ও ঐ শ্রেষ্ঠ পূর্ণতার পর এক মুহূর্তের জন্যও ঐ সবের অধিকারী থাকে না। তাঁর অসীমত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলির লোপ কিছু ক্ষতি বা বিনাশ নয়, বরং ইহা নিশ্চয়ই সেই পরম সত্তার মধ্যে পরি-পূর্ণতা বা বিকাশ হবে যা নিজের আপন আনন্ত্যে আনন্দিত হন। তাঁর সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের খণ্ডিত ও নশ্বর ভাবাবেগগুলির তিরোভাব আমাদিগকে শীতল শূন্যতার মধ্যে নিয়ে যায় না বরং নিয়ে যায় সীমাহীন আনন্দের মধ্যে। আমাদের বিভক্ত ও প্রমাদপূর্ণ বুদ্ধিশক্তিকে অতিক্রম করে জ্ঞানের পরিণতি যে সম্পূর্ণ অন্ধকার ও শূন্য রিক্ততা হবে তা নয়, তা নিশ্চয়ই হবে এক অনন্ত চেতনার জ্যোতির্ময় উল্লাস। আমাদের নির্বাণ সত্তার বিনাশ নয়, আমাদের নির্বাণ সত্তার একান্ত পূর্ণতা।" আর এই উল্লাসভরা উক্তি যখন যুক্তির কষ্টি পাথরে আনা হয় তখন ইহা স্বীকার করতেই হবে যে ইহা ন্যায়সঙ্গত ও ইহার কোন প্রত্যুত্তর নেই। কারণ বুদ্ধিশক্তির চরম মুক্তি এমন একটি স্থানেই হওয়া সম্ভব যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক হ'য়ে ওঠে, কারণ সেখানে জ্ঞান অনন্ত, প্রত্যক্ষ ও মাধ্যমশূন্য। আর যেখানে এই অনন্ত ও ত্রুটিহীন জ্ঞান বর্তমান সেখানে, মনে হয়, অনন্ত ও ত্রুটিহীন অস্তিত্ব ও আনন্দ থাকতে বাধ্য। কিন্তু এই পর্যায়ের অবস্থাগুলি এমনই যে আমরা শুধু ইহার সম্বন্ধে বলতে পারি যে ইহা আছে, বাক্য দিয়ে আমরা ইহার সঠিক নির্দেশ দিতে অক্ষম, আর তা শুধু এই কারণে যে আমরা ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে অক্ষম। আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় শুধু আত্মার সাহায্যে; উপলব্ধির আর কোন করণ নেই।

বলা হ'তে পারে যে না হয় স্বীকারই করা হ'ল যে এরূপ এক অবস্থা ধারণা করা সম্ভব---আর তোমার স্বীকৃত তথ্য থেকে ইহাই যে একমাত্র ও অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত তা নিশ্চয়---কিন্তু ইহা যে সদ্‌বস্তু হিসাবে বিদ্যমান তার প্রমাণ কি আছে? তোমাদের যোগই বা কি প্রমাণ আনতে পারে যে ইহা বিদ্যমান? কারণ যখন ব্যষ্টি আত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হ'য়ে যায়, ইহার বিবর্তন শেষ হয় এবং ইহা তার সব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে প্রতিভাসের মধ্যে ফিরে আসে না। এই প্রশ্নটি আলোচনা করা দুরূহ; এক কারণ এই যে যদি ভাষায় ইহার আদৌ সঠিকভাবে আলোচনা করার প্রয়াস হয় তাহ'লে এই ভাষা এত নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম হবে যে তাতে

ইহা বোধগম্য হবে না; আর এক কারণ এই যে যেসব অনুভূতি ইহার সহিত জড়িত সেসব আমাদের বর্তমান সাধারণ বিকাশ থেকে এত দূরে এবং এত অল্পই তা পাওয়া যায় যে তাদের সম্বন্ধে দৃঢ় মত অথবা এমন কি কোন নির্দিষ্ট বিবরণ মনে হয় প্রায় ক্ষমার অযোগ্য। তবু, রূপক ভাষায় অথবা যেমন সাধু পল বলেছেন নির্বোধের মতো বলা গেলে, আমরা ইহার সম্বন্ধে আদৌ যা বলার আছে তার একটি স্থূল চিত্র দিতে প্রয়াস করতে পারি। তাহ'লে মনে হয় সত্য এই যে আত্মার এই সর্বশেষ অথবা চতুর্থ পাদেও বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম বিদ্যমান যাদের সংখ্যা অনুযায়ী অনুভূতির তারতম্য হয়; কিন্তু কাজের উদ্দেশ্যে আমরা তিনটির কথা বলতে পারি, প্রথম যখন আমরা নাটমন্দিরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাই; দ্বিতীয় যখন আমরা নাটমন্দিরের ভিতরের সীমায় দাঁড়াই এবং বস্তুতঃ সনাতনের মুখোমুখি হই: তৃতীয় যখন আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। মনে রাখতে হবে যে, যে ভাষা আমি ব্যবহার করছি তা রূপকের ভাষা, রূঢ় আক্ষরিক ভাবে যেন ইহার অর্থ না করা হয়। আচ্ছা, তাহ'লে প্রথম পর্যায়টির অনুভূতিলাভ মানুষের পক্ষে বেশ সম্ভবপর এবং সেখান থেকে মানুষ ফিরে এসে জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ সে জীবিত থেকেও তার আন্তর আত্মায় প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের দাসত্ব থেকে মুক্ত; দ্বিতীয় পর্যায়ে কেহ একবার পৌছলে সে সাধারণতঃ আর ফিরে আসে না, যদি না সে কোন পরম বুদ্ধ হয়---অথবা হয়ত ফিরে আসে জগদ্-অবতার হিসাবে; তৃতীয় পর্যায় থেকে কেহই ফিরে আসে না, তাছাড়া এই শরীরে ইহা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মকে জীবন্মুক্ত পুরুষ যেভাবে উপলব্ধি করেন, নাটমন্দিরের প্রবেশমুখ থেকে দেখে, সেই ব্রহ্মকে আমরা সাধারণতঃ বলি পরব্রহ্ম, পরম সনাতন, আর ইহাই বেদান্তের সর্বোত্তম বিবরণের বিষয়। সুতরাং ব্রহ্মের পাঁচটি অবস্থা আছে। বিরাট ব্রহ্ম, জাগ্রত বিশ্বের স্বামী; হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, স্বপ্ন বিশ্বের স্বামী; প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম অথবা অব্যক্ত যিনি অনভিব্যক্তির সমাধি বিশ্বের স্বামী; পরব্রহ্ম যিনি পরতম ; এবং তা-ই যা পরতম অপেক্ষা পরতর, অজ্ঞেয়। অজ্ঞেয় সম্বন্ধে কিছু বলে লাভ নেই, কিন্তু পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ মানুষী বুদ্ধির নিকট বোধগম্য করা যায় কারণ---যদি অবশ্য শিথিল রূপকের ব্যাপক প্রয়োগ নিষিদ্ধ না করা হয়---ইহাকে আংশিকভাবে বাক্যের রাজ্যের মধ্যে আনা সম্ভব।

তিন

পরব্রহ্ম

এ পর্যন্ত পরম বিশ্বোত্তীর্ণ সদ্‌বস্তুকে দেখা হ'য়েছে মানুষী চিৎ-পুরুষের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ইহা বিবর্তনের ঊর্ধ্বগামী বক্র-রেখায় চলে যাতে তার পরিণতি হয় পরমে। এখন পরমার্থসৎকে অভিব্যক্তি-চক্রের সেই অন্য প্রান্ত থেকে দেখা আরো সুবিধাজনক হবে যেখানে, এক অর্থে, বিবর্তন শুরু হয় আর দৃশ্যমান বিষয়সমূহের মহান কারণ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি যে বিশ্ব শীঘ্র সৃষ্টি করবেন তার দিকে মুখ ফিরিয়ে। অবশ্য প্রথমে আছেন পরমার্থসৎ যিনি নিরুপাধিক, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, যাঁর সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা ছাড়া কোন কিছুই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিব্যক্তির পথে প্রথম ধাপ হিসাবে পরমার্থসৎ নিজের মধ্যে—উৎপাদন করেন, তাই কি আমরা বলব? আরো ভাল কোন কথার অভাবে এই কথাটিই ব্যবহার করা হক!—উৎপাদন করেন তার অনন্ত অবোধ্য সত্তার এক জ্যোতির্ময় ছায়া—এই রূপকটি তুচ্ছ ও অনুপযুক্ত, কিন্তু কোন পর্যাপ্ত রূপক পাওয়া সম্ভব নয়; ইহাই পরব্রহ্ম অথবা যদি আমরা তাঁকে বলতে পছন্দ করি—ভগবান, সনাতন, পরম চিৎ-পুরুষ, ঋষি, সাক্ষী, প্রজ্ঞা, প্রভব, স্রষ্টা, পুরাণ। তাঁর সম্বন্ধে বেদান্ত নিজেই বলতে পারে শুধু দুই মহান ত্রিখণ্ডবিশিষ্ট পদে—প্রত্যক্‌বৃত্ত ও পরাক্‌বৃত্ত, 'সচ্চিদানন্দম্' সৎ, চিৎ আনন্দ; "সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্", সত্য, জ্ঞান ও আনন্ত্য।

'সচ্চিদানন্দম্"। পরম হ'লেন শুদ্ধ সত্তা, অনপেক্ষ অস্তিত্ব, 'সৎ'। তিনি 'সৎ' কেননা একমাত্র তিনিই 'অস্তি', তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তির অনধীন কোন অন্তিম সদ্‌বস্তু বা কোন সত্তা অন্য কিছুর নেই। আর তিনি অনপেক্ষ অস্তিত্ব কারণ যেহেতু একমাত্র তিনিই আছেন আর অন্য কিছু সত্যতঃ নেই, সেহেতু স্বীকার করতেই হবে যে তিনিই আছেন নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যে ও নিজের কাছে। তাঁর অস্তিত্বের কোন কারণ থাকতে পারে না, তাঁর অস্তিত্বের কোন বিষয়ও থাকতে পারে না; তাছাড়া তাঁর মধ্যে কোন বৃদ্ধি বা হ্রাসও সম্ভব নয় কারণ বৃদ্ধি হ'তে পারে শুধু বাহিরের কিছু থেকে

যোগের দ্বারা এবং হ্রাস হ'তে পারে বাহিরের কিছুতে যায় এমন কোন ক্ষয়ের দ্বারা, আর ব্রহ্মের বাহিরে কিছু নেই। কোন প্রকারেই তাঁর পরিবর্তন সম্ভব নয়, কারণ তাহ'লে তিনি কাল ও কার্যকারণসম্বন্ধের অধীন হবেন; তাঁর কোন অংশও থাকতে পারে না কারণ তাহ'লে তিনি দেশের বিধানের অধীন হবেন। তিনি দেশ, কাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণার অতীত কারণ তিনি প্রাতিভাসিকভাবে এইসব সৃষ্টি করেন অভিব্যক্তির উপাধি হিসাবে কিন্তু ইহারা তাদের প্রভবকে সীমিত করতে অক্ষম। তাহ'লে পরব্রহ্ম হ'লেন অনপেক্ষ সৎ।

পরতম আবার শুদ্ধ সংবিৎ, একান্ত চেতনা, 'চিৎ'। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকা চাই যে আমরা যেন ব্রহ্মের অন্তিম চেতনাকে আমাদের নিজেদের মনন ও জ্ঞানের প্রকারের সহিত ভুল না করি অথবা স্পষ্ট রূপকভাষায় ছাড়া যেন আমরা তাঁকে বিশ্বজনীন সর্বজ্ঞ মন অথবা এরূপ অন্য কোন সংজ্ঞায় অভিহিত না করি; মন, মনন, জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা, আংশিক জ্ঞান, নির্জ্ঞান—এই সব শুধু বিভিন্ন প্রকার যাতে পরম চেতনা নিজেকে প্রকাশ করে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ও বিভিন্ন আধারে। কিন্তু ব্রহ্মের শুদ্ধ চেতনা এমন একটি ধারণা যা আমাদের চিন্তার সব প্রকারের অতীত। চেতনা যে তার সারে কেবলমাত্র প্রত্যক্‌বৃত্ত তা দেখিয়ে দিয়ে দর্শন ভালই করেছে। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; আমরা শুধু সচেতন আমাদের মস্তিষ্কের কতকগুলি বোধ ও ছাপ সম্বন্ধে যেগুলিকে আমরা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পৃথক অথবা সহঘটমান ক্রিয়ার দ্বারা নাম ও রূপে বাহ্যভাবাপন্ন করতে সমর্থ হই; আর বিষয়সমূহের যা প্রকৃতি তাতে আমরা কালের শেষ পর্যন্তও এই সব ছাপ ও বোধ ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে সচেতন হ'তে সমর্থ হই না। এই তথ্য সংশয়াতীত যদিও জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদ ইহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ব্যাখ্যা করে। শেষ পর্যন্ত আমরা জানব যে এই অবস্থা অত্যাবশ্যক শুধু এই কারণে যে চেতনাই মৌলিক বিষয় যা থেকে সকল প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের উৎপত্তি হয় আর সেজন্য সকল প্রতিভাসকেই এক স্পষ্ট উপমার প্রয়োগে বলা হয় অনপেক্ষ চেতনার বিভিন্ন 'বিকার'। কিন্তু অদ্বৈতবাদী দার্শনিকরা বলেন যে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিকার নয়, বরং 'অধ্যারোপ'—প্রথমতঃ অনাত্ম ভাবনার অধ্যারোপ আত্মার মধ্যে এবং বাহ্যিকতার অধ্যারোপ আন্তরের মধ্যে এবং তারপর বিবর্তনের পদ্ধতির দ্বারা নতুন ও ক্রমাগত আরো

জটিল রূপের অধ্যারোপের দ্বারা। এই সব দার্শনিক ব্যাখ্যাকে আয়ত্ত করা যে প্রয়োজনীয় তা ঠিক, কিন্তু ইহাদের সব সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পার্থক্য আয়ত্ত করে অনন্ত ভাবনাসমূহের সীমানায় এসে পৌছুলেও, অন্ততঃ সেখানেও আমাদের নিরস্ত হতে হবে; আমরা বাঁধা আছি মস্তিষ্কের সহিত আর এই দেহের মধ্যে আমরা রজ্জু ছিন্ন করতে অক্ষম অসীম মহাসমুদ্রের উপর পাল তোলবার উদ্দেশ্যে। সকল চৈতন্যই যে শেষ পর্যন্ত আত্ম-চৈতন্য---এই তথ্যের কোন অস্পষ্ট উপলব্ধি যদি আমরা পাই তা-ই যথেষ্ট।

উপনিষদগুলি আমাদের বলে যে ব্রহ্ম কোন অন্ধ বিশ্বব্যাপী শক্তি নয় যা তার স্বভাববশে যন্ত্রের মত কাজ করে, এমন কি ইহা শক্তির কোন অচেতন কারণও নয়; তিনি চেতন, বরং তিনি নিজেই চেতনা, 'চিৎ' আবার 'সৎ'-ও। তা থেকেই বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে 'সৎ' ও 'চিৎ' একই; অস্তিত্বই চেতনা এবং ইহাকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। প্রাতিভাসিকভাবে আমরা ইচ্ছা করলে মনে করতে পারি যে অস্তিত্ব চৈতন্য থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে অথবা তাতে পরিণত হয়েছে অথবা ইহার মধ্যে ও ইহার দ্বারাই তার সত্তা; কিন্তু পরিণতি হল এক প্রচ্ছন্ন উৎসে প্রত্যাবর্তন মাত্র, যে ফুল বীজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তারই বিকাশ। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকেই চৈতন্যই শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের সর্ত; তারা শুধু সেই মানসিক আবশ্যকতার তিনটি বিভিন্ন দিক যা আমাদের কল্পনা করতে দেয় না যে মহৎ 'অস্তি' মূলতঃ অজ্ঞ যে তিনি 'অস্তি'। অবশ্য ইচ্ছা করলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে সত্য অবস্থা ঠিক অন্যরূপ, অস্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় অ-চৈতন্য থেকে এবং চৈতন্যের মধ্য দিয়ে তা আবার ফিরে যায় অ-চৈতন্যে; তাহ'লে চৈতন্য হ'ল অচৈতন্যের এক রূপ মাত্র শাশ্বত ও অচৈতন্যময়ের এক ভ্রান্তি অথবা সাময়িক বিকার। এই ক্ষেত্রে, চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, মনন ও জ্ঞান---এ সবই মায়া আর হয় অচৈতন্যময় জড়, নয় শূন্যতাই একমাত্র নিত্য সদ্‌বস্তু। কিন্তু শূন্যবাদী যে অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তা শুধু সকল মনন ও যুক্তির বিরুদ্ধ, এক দার্শনিক 'হারাকারি' (আত্মহত্যা) যার দ্বারা দর্শন তার নিজের উদর ছিন্ন করে নিজেরই অস্ত্র দিয়ে। জড়বাদী যে শাশ্বত অচৈতন্যময় জড়ের সিদ্ধান্ত করে তার ভিত্তি মনে হয় আরো দৃঢ়; কারণ আমরা এই দৃষ্টতথ্য পাই যে বিবর্তন মনে হয় শুরু হয়েছে অচৈতন্যময় জড় থেকে

এবং জড়ের মধ্যে চেতনার এমন একটি বিষয়রূপে উপস্থিত হয় যা অল্প সময়ের জন্য আবির্ভূত হ'য়ে আবার তিরোহিত হয়, এক প্রতিভাস বা সাময়িক অবভাস। এই যুক্তি'র বিরুদ্ধেও বেদান্ত বহু সংখ্যক উত্তরের ব্যূহ সাজাতে পারে। কোন স্থায়ী চৈতন্যময় সদ্‌বস্তু ('পুরুষ') নেই, আছে শুধু শাশ্বত অচৈতন্যময় জড় ('প্রকৃতি')--এই কথাটিই--শুরুতে বলা যায়--এমন একটি অসত্যাভাস যা অদ্বৈতবাদীদের মায়ার অসত্যাভাস থেকেও বিস্ময়কর এবং এমন একটি সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে যায় যা মনে ধারণা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া জড়বাদীর সিদ্ধান্ত দৃষ্ট তথ্য দ্বারাও অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয় না; বরং মনে হয় তথ্যসমূহ থেকে সম্পূর্ণ অন্য সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় কারণ এমন এক প্রকৃতই অ-চৈতন্যময় দ্রব্য আছে যার পশ্চাতে কোন প্রচ্ছন্ন চৈতন্য নেই--এই কথা শুধু এক অভ্যুপগম মাত্র (কেন না আমরা নিশ্চিতভাবে বলতেও পারি না যে নিষ্প্রাণ বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ), আর যে একটি মাত্র তথ্য আমরা নিশ্চিতভাবে ও অবিসংবাদিতভাবে জানি তা আমাদের চৈতন্য ও সজীবতা। নিষ্প্রাণ জড়ের বিভিন্ন কর্মধারায় আমরা সর্বত্র দেখি বুদ্ধি ক্রিয়ারত এক লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে আর সেই উপায়গুলিকেও প্রয়োজনানুযায়ী উপযোগী করা হয় লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে; এক অচেতন সত্তার দ্বারা বিভিন্ন উপায়ের বুদ্ধিমান ব্যবহার স্ববিরুদ্ধ এবং ইহার সমর্থনে এক বিন্দুও প্রমাণ নেই; আর বাস্তবিকই যোগের দ্বারা বিশ্ব সম্বন্ধে যে আরো ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা যায় তা প্রকৃতই প্রকাশ করে এরূপ এক সর্বত্র কর্মরত বিশ্বব্যাপী বুদ্ধি।

তাহ'লে ব্রহ্ম চেতনা আর একবার ইহা স্বীকার করা হ'লে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে তিনি তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ সত্যতায় অনপেক্ষ চেতনা হবেনই। তাঁর অস্তিত্বের মতো, তাঁর চেতনাও নিজের ও নিজ থেকে, কারণ তিনি ব্যতীত ও তাঁর থেকে পৃথক কিছু নেই; শুধু তাই নয়, তিনি যে তাঁর এক অংশ দিয়ে অন্য এক অংশ জানেন অথবা তাঁর সমগ্র দিয়ে তাঁর বিভিন্ন অংশ জানেন তা-ও নয়, কারণ তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ অস্তিত্ব এক ও অমিশ্রিত, ইহার কোন অংশ নেই। সুতরাং আমাদের চেতনা যেসব বিধানের অধীনে চলে, তাঁর চেতনা সেসব বিধানের অধীন হ'য়ে চলে না, বিষয়ীকে বিষয় থেকে, জ্ঞাতাকে জ্ঞাত থেকে প্রভেদ করেও ইহার কাজ হয় না, ইহা শুধু আছে, নিজেরই শুদ্ধ ও অবিশেষিত অস্তিত্বের

অধিকার বলে, শাশ্বতভাবে ও সীমাহীনভাবে, এমন প্রকারে যা অশুদ্ধ ও বিশেষিত সব অস্তিত্ব ধারণা করতে অক্ষম।

সর্বশেষ, পরতম হলেন শুদ্ধ উল্লাস, অনপেক্ষ আনন্দ, 'আনন্দ'। 'সৎ' ও 'চিৎ' যেমন একই, 'সৎ' ও 'চিৎ' ঠিক তেমনই 'আনন্দ' থেকে ভিন্ন নয়; ঠিক যেমন অস্তিত্বই চেতনা এবং ইহাকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, সচেতন অস্তিত্বও তেমন আনন্দ এবং ইহাকে আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি যে এমন কি এই জড়ীয় লোকেরই উপর সান্ত অস্তিত্বেরও আবদ্ধ চেতনার মধ্যেও আমরা তা অনুভব করি। অন্ততঃ সচেতন অস্তিত্ব সুখ বিনা স্থায়ী হ'তে পারে না; এমন কি সর্বাপেক্ষা দুঃস্থ চৈতন্যময় প্রাণীর মধ্যেও অস্তিত্বে আনন্দ থাকবেই, যদিও তা মনে হয় সর্ষপ বীজের মতো অতি সামান্য; শূন্য একান্ত দুঃখ তার অবশ্যম্ভাবী ও অব্যবহিত ফলস্বরূপ নিয়ে আসে আত্ম-হত্যা ও বিনাশ। বেঁচে থাকার ইচ্ছা---সচেতন অস্তিত্বের কামনা ও আত্ম-সংরক্ষণের সহজ প্রবৃত্তি যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকৃতির শুধু এক লক্ষ্যাভিসারী ব্যবস্থা তা নয়, ইহা মৌলিক ও কোন উদ্দেশ্য বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়; অস্তিত্বের যে সুখ স্বরূপগত ও নিত্য তার শুধু এক দেহ ও রূপ ইহা; কোন কিছুরই কাছে ইহাকে জোর করে নত করা যায় না, নত করা যায় শুধু আরো পূর্ণ ও ব্যাপকভাবে বাঁচবার সেই ইচ্ছার কাছে যা একদিকে সকল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভীপ্সার উৎস আবার অপরদিকে সকল প্রেম, আত্ম-ত্যাগ ও আত্ম-জয়ের উৎস। এমন কি আত্মহত্যাও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে শুধু এক উন্মত্ত বিদ্রোহ---জ্ঞানহীন ব'লে যে এই বিদ্রোহ কম তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়। অস্তিত্বের সুখ রাজী হ'তে পারে শুধু এক বিশাল অস্তিত্বের মহত্তর সুখের মধ্যে নিমজ্জিত হ'তে, আর ধর্ম, ভগবানের দিকে অভীপ্সা হ'ল এই চিরন্তন ভৌতিক শক্তির সার্থকতা মাত্র অনন্ত অস্তিত্বের নিছক আনন্দের মাঝে তার বিভক্ত ও সীমিত সুখ নিমজ্জিত করার কামনা। ব্যষ্টিভাবে বাঁচবার ইচ্ছার মধ্যে ফুটে ওঠে সেই ব্যষ্টি অস্তিত্বের সুখ যা সকল জীবের বাহ্য প্রাতিভাসিক আত্মা; কিন্তু অনন্তভাবে বাঁচবার ইচ্ছা শুধু আসতে পারে একমাত্র আমাদের মধ্যস্থ বিশ্বোত্তীর্ণ অন্তিম চিৎ-পুরুষ থেকে আর ইহাই আমাদের প্রকৃত আত্মা; আর ইহাই আস্পৃহা করে অমরত্বের দিকে। তাহ'লে ব্রহ্ম সচেতন অস্তিত্বের আনন্ত্য হওয়ায় আবার

অনন্ত আনন্দও বটে এবং সেজন্য ব্রহ্মের আনন্দ তার স্বরূপে ও তার বিষয় সম্বন্ধে অনপেক্ষ হ'তে বাধ্য। দুঃখের সহিত কোন মিশ্রণ বা সহাবস্থানের অর্থ দুঃখের এমন কোন কারণ যা হয় একই হবে অথবা আনন্দের কারণ থেকে ভিন্ন হ'বে আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে বিভাজন, সংগ্রাম, বিরোধ এবং ব্রহ্মের মধ্যে এমন কিছু যা সুষমা-হীন ও আত্ম-নাশক; কিন্তু বিভাজন ও বিরোধ সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা অসম্বন্ধ পরমার্থসৎ-এর মধ্যে থাকতে পারে না। ঠিকমত বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে দুঃখ সীমাবদ্ধতার ফল। যখন বিভিন্ন কামনা ও সংবেগের তৃপ্তি সীমিত হয় অথবা যে ভৌতিক বা মানসিক পদার্থের উপর তারা কাজ করে তা তার বিজাতীয় অন্য কিছুর দ্বারা সম্বৃত ভিতরের দিকে পিষ্ট, বিভক্ত অথবা ছিন্নভিন্ন হয় তখনই শুধু দুঃখের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। যেখানে কোন সীমাবদ্ধতা নেই, সেখানে কোন দুঃখ থাকতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের আনন্দ তার স্বরূপে অন-পেক্ষ।

তার বিষয় সম্বন্ধে ইহা কম অনপেক্ষ নয়; কারণ বিষয়ী ও বিষয় একই। ইহা তাঁর নিজের অস্তিত্বে ও চেতনায় স্বগত আর তাঁর ভিতরে বা বাহিরে যে তার কোন কারণ থাকবে তা সম্ভব নয়, কারণ একমাত্র তিনিই বিদ্যমান এবং তাঁর কোন অংশ বা বিভাজন নেই। কেহ কেহ আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইবে যে স্বাধিষ্ঠিত আনন্দ অসম্ভব; আর দুঃখের মত আনন্দেরও এমন একটি বিষয় বা কারণ প্রয়োজন যা বিষয়ী থেকে ভিন্ন এবং সেজন্য ইহা সীমার অধীন। অথচ এমন কি এই জড়ীয় বা জাগ্রত জগতে যে কোন বৃহৎ ও গভীর অনুভূতিতে জানা যায় যে এমন সুখ আছে যা পারিপার্শ্বিকের অনধীন এবং যা তার জীবনধারণের জন্য কোন অস্থায়ী বা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। যে সুখ অপরের উপর নির্ভরশীল তা পঙ্কিল, অনিশ্চিত এবং তার হ্রাস বা ক্ষয় ধ্রুব; কেবল যখন কেহ নিজের মধ্যে ক্রমশঃ গভীরে নিবৃত্ত হয়, তখনই সে সেই শান্তির সন্নিকট হয় যা বুদ্ধির অতীত। অতিতৃপ্তির ক্লান্তিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য; ইহার নিয়ন্ত্রণকারী বিধান এই যে সুখের ক্ষেত্র যতই কম সীমাবদ্ধ ও বেশী প্রত্যক্‌বৃত্ত হয় ততই ইহা অতিতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার নাগাল থেকে দূরবর্তী হয়। দেহ সুখের দ্বারা দ্রুত অতিতৃপ্ত হয়; ভাবাবেগগুলি যতই কম সীমাবদ্ধ ও বেশী প্রত্যক্‌বৃত্ত হয়, ততই

বেশী পরিমাণ আনন্দ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম; মন আরো ব্যাপক ও আরো বেশী আন্তরভাবে সমর্থ হওয়ায় তার উপভোগ আরো গভীর এবং আত্তীকরণের শক্তি অক্লান্ত; বুদ্ধিশক্তি ও উচ্চতর বুদ্ধিতে আমরা এক অতি বিরল ও প্রশস্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করি এবং ইহাদের সুখ কদাচিৎ বিস্বাদ হয় আর হ'লেও তা শীঘ্র নিরাময় হয়; আর যে অনন্ত চিৎপুরুষ আমাদের প্রত্যক্‌বৃত্ততার শীর্ষ তার আধ্যাত্মিক উল্লাসে কোন বিতৃষ্ণা আসে না, তার আনন্দে আনন্ত্যের কম কিছুতে সে সন্তুষ্ট হবে না। এই ঊর্ধ্বারোহী শ্রেণীর পরিণতি হ'ল অতিস্থিত ও অনপেক্ষ পরব্রহ্ম যাঁর আনন্দ সীমাহীন, স্বাধিষ্ঠিত ও বিশুদ্ধ।

তাহ'লে ইহাই উপনিষদগুলির ত্রিত্ব—অনপেক্ষ অস্তিত্ব; যা সেজন্য অনপেক্ষ চেতনা; যা সেজন্য অনপেক্ষ আনন্দ।

আর তারপর দ্বিতীয় ত্রিত্ব, 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্'। এই ত্রিত্ব প্রথমটি থেকে ভিন্ন নয়, ইহা শুধু তার পরাক্‌বৃত্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম 'সত্যম্', সত্য অথবা সদ্‌বস্তু কারণ সত্য বা সদ্‌বস্তু হ'ল যে অস্তিত্বকে পরাক্‌বৃত্তভাবে দেখা হয় তার প্রত্যক্‌বৃত্ত ভাবনা। যা মৌলিকভাবে বিদ্যমান শুধু তা-ই প্রকৃত ও সত্য, আর ব্রহ্ম অনপেক্ষ অস্তিত্ব হওয়ায় ইহা আবার অনপেক্ষ সত্য ও সদ্‌বস্তু। অন্য সব বিষয় শুধু আপেক্ষিকভাবে প্রকৃত, অবশ্য ইহার সকল অর্থেই মিথ্যা নয়, কেননা তারা এক সদ্‌বস্তুর বিভিন্ন অবভাস, তবে ইহারা অস্থায়ী এবং সেজন্য স্বরূপে চরম সত্য নয়।

আবার ব্রহ্ম 'জ্ঞানম্', জ্ঞান; কারণ যে চেতনাকে পরাক্‌বৃত্তভাবে দেখা হয় তার শুধু প্রত্যক্‌বৃত্ত ভাবনা হ'ল জ্ঞান। দার্শনিক সংজ্ঞা হিসাবে জ্ঞান কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে; ইহা 'সংজ্ঞান' থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়, সংজ্ঞান হ'ল সংস্পর্শের দ্বারা সংবিৎ; যে 'অজ্ঞান' হল গ্রহিষ্ণু ও কেন্দ্রীয় সংকল্পের দ্বারা প্রত্যক্ষ বোধ এবং যাতে মস্তিষ্ক থেকে এক আদেশের অর্থ থাকে তা থেকেও এই জ্ঞান ভিন্ন; ইহা 'প্রজ্ঞান' থেকেও ভিন্ন, এই প্রজ্ঞান হ'ল প্রজ্ঞা, লক্ষ্যাভিসারী সংকল্প অথবা উদ্দেশ্যযুক্ত জ্ঞান; আর 'বিজ্ঞান' থেকে ইহা ভিন্ন, কারণ 'বিজ্ঞান' হ'ল বিবেচনার দ্বারা জ্ঞান; 'জ্ঞান' হল সেই জ্ঞান যা অপরোক্ষ ও স্বাধিষ্ঠিত, যার আদি, মধ্য বা অন্ত নেই এবং যাতে জ্ঞাতাই আবার জ্ঞান ও জ্ঞেয়।

সর্বশেষ, ব্রহ্ম 'অনন্তম্', সীমাহীনতা যার মধ্যে সকল প্রকারের আনন্ত্য অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তার অনপেক্ষ অস্তিত্ব ও চেতনার মধ্যেই তাঁর আনন্ত্য

নিহিত; তবে ইহা সোজা আসে তাঁর অনপেক্ষ আনন্দ থেকে, যেহেতু, আমরা যেমন দেখেছি, পরাক্‌বৃত্তভাবে আনন্দে আছে সীমার অভাব। সেজন্য, আনন্দকে পরাক্‌বৃত্তভাবে দেখা হ'লে তার শুধু প্রত্যক্‌বৃত্তভাবনা হ'ল আনন্ত্য। মুক্তি অথবা অমরত্ব, ইহাদের যে কোন একটি পদের দ্বারা ইহাকে অন্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। কাল, দেশ ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের ত্রিবিধ ভাবনার দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন বিধান ও সংকীর্ণতার দ্বারা সকল দৃশ্যমান বিষয় আবদ্ধ; শুধু ব্রহ্মতেই আছে অনপেক্ষ মুক্তি কারণ কাল বা দেশের মধ্যে তাঁর কোন আদি বা মধ্য বা অন্ত নেই, তাছাড়া তিনি অপরিবর্তনীয় হওয়ায়, কার্যকারণ সম্বন্ধের মধ্যেও তাঁর কোন আদি, মধ্য বা অন্ত নেই। কালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে ব্রহ্ম নিত্যতা অথবা অমরত্ব; দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে তিনি আনন্ত্য অথবা বিশ্বব্যাপিতা; কার্যকারণসম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে তিনি অনপেক্ষ মুক্তি। এক কথায় তিনি 'অনন্তম্', সীমা-হীনতা, সীমার অভাব।

চার

মায়া ঃ প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের তত্ত্ব

তাহ'লে মনে করা যাক যে ব্রহ্ম নিজের মধ্যে তাঁর নিজের এই জ্যোতির্ময় ছায়া পুরঃক্ষেপ করেছেন এবং এই কাজে (আমার সর্বদাই সান্ত জীবের ভাষায় বলছি আর তাতে আছে কাল, দেশ ও কার্যকারণসম্বন্ধের নিরন্তর কলঙ্ক) তিনি নিজেকে নিরূপণ করতে এবং বিভিন্ন গুণের পরি-প্রেক্ষিতে নিজের স্বরূপ ভাবগুলিকে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। যিনি অস্তিত্ব, চেতনা, আনন্দ তিনি নিজেকে ভাবছেন সত্তা, চেতন ও আনন্দময় বলে। সেই মুহূর্ত থেকে প্রাতিভাসিক অভিব্যক্তি অনিবার্য হ'য়ে ওঠে; অবিশেষিত যিনি তিনি নিজেকে দেখতে চাইছেন বিশেষিত হিসাবে। একবার এই মৌলিক অবস্থা স্বীকার করা হ'লে অন্য সব কিছু আসে বিবর্তনের কঠোর বিধানের দ্বারা। বেদান্ত এই একটিমাত্র অভ্যুপগম দাবী করে। এই অভ্যুপগম স্বীকার করা হ'লে আমরা দেখতে পাই কেমন করে পরমার্থসৎ নিজের মধ্যে পরব্রহ্ম নামক জ্যোতির্ময় ছায়া পুরঃক্ষেপ করে এই ব্যক্ত জগতের বিবর্তনের পথ তৈরী করেন এবং তা যেন অবশ্যম্ভাবী করেন——মায়া অথবা ভ্রান্তি নামক মৌলিক তত্ত্বকে সক্রিয় করে। ঐ একটি তত্ত্ব যখন নিজেকে গতিতে রূপান্তরিত করে তখন তার সক্রিয়তায় উপনিষদ কথিত মহান্ রূপান্তর সম্ভব হয়—— এক বহু হয়।

(কিন্তু এই একটি মৌলিক অভ্যুপগম সহজে ধারণা করা যায় না। যে প্রশ্নটি এখনই ইউরোপীয় মনে যুদ্ধসাজে অসুরতুল্য হ'য়ে উদিত হবে তা হ'ল লক্ষ্যাভিসারী আপত্তি, কেন? সকল ক্রিয়ারই পশ্চাতে থাকে উদ্দেশ্য; কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম নিজেকে বিশেষিত রূপে দেখতে চাইলেন? সকল বিবর্তন প্রবর্তিত হয় কামনার দ্বারা, ইহার অর্থ বিকাশ এবং তা চলে এক বোধগম্য লক্ষ্যের দিকে। যে ব্রহ্ম অনপেক্ষ হওয়ায় স্বয়ং-পর্যাপ্ত তিনি কি কামনা করলেন, কি বিকাশেই বা তাঁর প্রয়োজন ছিল অথবা কোন লক্ষ্যের দিকে তিনি চলেন? বিশ্ব সম্বন্ধে যেসব মত এক স্বরূপগত ও আদি ঐক্য থেকে আরম্ভ করতে চেষ্টা করে সে সবেতেই

লক্ষ্যাভিসারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এই কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়; একটি ব্যবধান রয়ে যায় আর তা ভরাট করা বুদ্ধিশক্তির পক্ষে দুরূহ হ'য়ে ওঠে। অবশ্য কোন কোন দর্শন এক লক্ষ্যাভিসারী ব্যাখ্যার দ্বারা তা ভরাট করার প্রয়াস করে। তাদের যুক্তি এই যে, অনপেক্ষ এক যে চক্রাকারে অভি-ব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেন তার কারণ তিনি তাঁর আদি ঐক্যে ফিরে আসেন বিভিন্ন অনুভূতি ও সংস্কারের নব ভাণ্ডারে ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে, প্রেমে জ্ঞানে ও কর্মে আরো সমৃদ্ধ হ'য়ে। ইহা এক দর্শন,---এই প্রশান্ত ভ্রান্তিতে সত্যই গর্ব অনুভব করে এমন লোক যে পাওয়া যায় তা সত্যই আশ্চর্যের কথা। ইহা অপেক্ষা কোন কিছু দর্শনের বেশী অযোগ্য, যুক্তিতে বেশী দূষিত কল্পনা করা যায় না। যখন বেদ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলে---পরমার্থসৎ সম্বন্ধে নয়---যে তিনি একলা ছিলেন এবং তাঁর নিঃসঙ্গতায় তিনি ভীত হ'লেন তখন মনে করা হয় যে ইহা এক দুঃসাহসিক কবিত্বময় কল্পনা; আর এই ব্যাখ্যাকেও কবিত্বময় কল্পনা হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হিসাবে নয়। অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক ঐক্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় যে ভাবনা যে ইহা এক শূন্য ও রিক্ত অভাব তা থেকে অযৌক্তিক পশ্চাদপসরণের অতিরিক্ত কিছু ইহা নয়। এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত এড়াবার জন্য এমন এক ঐক্য কল্পনা করা হয় যা যুগপৎ বহুবিধ, অসংখ্য স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হ'তে পারে---আর তা প্রাতিভাসিক রূপে নয়, তা তার চরম সত্যতায়। এই ভাবনার সঠিক যুক্তিধারা বোঝা দুরূহ---যখন পরম এক তাঁর ঐক্যে আবার ফিরে আসেন, তখন তিনি যে তাঁর অভিজ্ঞতা-গুলি সংরক্ষণ করেন তা কি তাদের খুঁটিনাটি সমেত, না একটি স্তূপ হিসাবে যেমন এক দলা বা সার হিসাবে? কিন্তু যাই হ'ক এই ধারণার মধ্যে বহু মৌলিক অসঙ্গতি বর্তমান। মনে করা হয় যে পরমার্থসৎ একটি অসম্পূর্ণ জিনিস, ইহা তার অসম্পূর্ণতার বোধে প্রবুদ্ধ হয় ও কাজের লোকের মত তার নিরাময়ে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ইহা কামনার অধীন এবং ইহা কালেরও অধীন এবং কালের মধ্যেই ইহা এখন আশ্রিত। যে আকর থেকে এই সব নতুন সংস্কার পাওয়া যায় আর তাতে ব্রহ্মের অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ হয় তা যে কি---সেও এক আরো বিশাল রহস্য। তা যদি তাঁর মধ্য থেকেই পাওয়া যায় তাহ'লে তা তাঁতেই সুপ্ত ছিল, তাঁর অজ্ঞাতসারে পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে তিনি নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন কারণ অন্য কোন স্থান তো নেই

যা থেকে এনে তিনি সৃষ্টি করবেন, আর এমন জিনিস সৃষ্টি করা হ'ল যা আগে ছিল না কিন্তু এখন বর্তমান; যা ছিল না তা হ'য়ে উঠল; অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি হ'ল। ইহা দর্শন নয়, ইহা ধর্মতত্ত্ব; যুক্তি নয়, বিশ্বাস। বিশ্বাস হিসাবে ইহা চলতে পারে; ভগবান সর্বশক্তিমান এবং সেজন্য তিনি শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম---ইহা এক নির্বিচার মত, তা বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু ইহা যুক্তির এলাকার বাহিরে।)

প্রথমে মনে হয় এই অভ্যুপগমের স্বীকৃতিতে এক মারাত্মক আপত্তি আছে; প্রকৃতই মনে হয় যে ইহাতে অস্তিত্বের সমস্যার মৌলিক প্রশ্নটি পরিহার করা হ'চ্ছে অথবা সমস্যাটির আরম্ভকে শুধু আরো দুধাপ পিছনে নেওয়া হ'চ্ছে। কারণ বিশ্বের বিশাল কঠিন সমস্যা যথার্থতঃ এই যে কিভাবে ও কেন এক বহু হ'লেন তা বোঝা দুষ্কর আর অবিশেষিত নিজেকে বিশেষিতরূপে দেখতে চাইলেন বলে সৃষ্টি হ'ল এই কথা ব'ল্লে সমস্যার দুরূহতা যায় না। যদি ধরা যায় যে "কি ভাবে"-র প্রশ্নটির সদুত্তর মায়াবাদে পাওয়া যায়, তাহ'লেও সমগ্র ক্রিয়াধারার 'কেন' প্রশ্নটি রয়ে যায়। বিবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারিত করা হ'য়েছে---স্বীকার করা যাক যে এই লক্ষ্য হ'ল অভিব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে অনন্তের নিজের কাছে প্রত্যাবর্তন; কিন্তু বিবর্তনের প্রারম্ভের ব্যাখ্যা নেই, ইহার উপকারিতা পরিস্ফুট করা হয়নি। পরমার্থসৎ কেন বিবর্তনের দিকে তাঁর মুখ ফেরালেন? মনে হয় এই প্রশ্নের কোন সম্ভবপর উত্তর নেই; অবিশেষিত কেন নিজেকে বিশেষিতরূপে দেখতে চাইবেন এবং এইভাবে বিবর্তন-চক্রের আবর্তন শুরু করবেন সে সম্বন্ধে কোন লক্ষ্যাভিসারী যুক্তির ইঙ্গিত দেওয়া অসম্ভব---যাই হ'ক এমন কোন যুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে না যা অনপেক্ষতার মৌলিক অর্থের সহিত একান্তই অসঙ্গত হবে না, আর যে ব্যক্তি অদার্শনিকমনা অথবা অসম্পূর্ণভাবে দার্শনিকমনা শুধু সে-ই ভাবতে পারে যে তার প্রয়াস সফল হয়েছে। কিন্তু এই অসম্ভবতায় মায়াবাদ দূষিত হয় না; কারণ বেদান্তবাদী এমন এক প্রত্যুত্তর দিয়ে 'কেন'-র প্রশ্নটি এড়িয়ে যায় যে তার আর উত্তর নেই। সে বলে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য ও অপ্রাসঙ্গিক। তিনি অনপেক্ষ হওয়ায়, তাঁর স্বরূপেই তিনি সেই কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত যার উপর প্রয়োজন, উপকারিতা, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকল ভাবনা নির্ভরশীল এবং তাঁর কোন

উদ্দেশ্য আছে তা ভাবার অর্থ তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ ও অনপেক্ষ স্বভাবে সন্দেহ করা; যা কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত তার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন নেই। পরাক্রান্ত অনন্তকে প্রশ্ন করা যে কেন ইহা তার আনন্ত্যকে মায়ার দ্বারা আবৃত করতে চেয়েছিল অথবা এই বলা যে বিশ্ব হয় উপকারী হবে না হয় মোটেই সৃষ্ট হবে না—এসব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; এতে বোঝা যায় বুদ্ধির সুষ্ঠু স্বচ্ছতার অভাব; সোজা কথা এই যে 'কেন' প্রশ্নটি উঠতেই পারে না।

কিন্তু উপকারিতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, সৃষ্টি যে কি প্রণালীতে হ'য়েছে তা বোধগম্য করা হয়নি। বলা হচ্ছে যে অবিশেষিত যে নিজেকে বিশেষিত হিসাবে দেখতে ইচ্ছুক হ'য়েছেন তা তাঁর মায়া। কিন্তু এই প্রণালীর প্রকৃতি কি, ইহা কি বুদ্ধিমূলক না সংকল্পমূলক, আর কোন বুদ্ধিমূলক বা সংকল্পমূলক প্রণালীকে কি সঙ্গতভাবে অনপেক্ষ সম্বন্ধে বলা যাবে? অন্ততঃ এই বিষয়টি সম্বন্ধে বুদ্ধির সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা আশা করা যায়। কিন্তু এরূপ আশা যে ন্যায়সঙ্গত তা বেদান্তবাদী প্রবলভাবে অস্বীকার করে। যদি "দেখবার ইচ্ছা"কে কোন নির্দেশ্য তথ্যের আক্ষরিক বিবরণ ব'লে ও ইহার সব সংজ্ঞাকে দার্শনিকভাবে সঠিক ব'লে উপস্থাপিত করা হ'ত, তাহ'লে ঐরূপ আশা সমর্থনযোগ্য হ'ত। কিন্তু সংজ্ঞাগুলি স্পষ্টতঃই কবিত্বময় এবং সেজন্য ন্যায়তঃ অপর্যাপ্ত; এগুলি ব্যবহার করা হ'য়েছে শুধু এই অভিপ্রায়ে যে মায়ার তথ্যটিকে বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করা হয়, তবে অপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত প্রকারে কারণ শুধু এইভাবেই অনন্তের বেলায় সান্ত ভাষা ও মননের পক্ষে তা করা সম্ভব। আমরা ইচ্ছা ও বুদ্ধি বলতে যা ধারণা করি সেইমত কোন বুদ্ধিমূলক বা ইচ্ছামূলক প্রণালী বাস্তবিক ঘটেনি। তাহ'লে কি হ'য়েছে? মায়া কি? কিভাবে ইহার উৎপত্তি হ'ল?

বেদান্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার স্বভাবসিদ্ধ অনমনীয় সরলতা ও মননের অচঞ্চল স্বচ্ছতা সহ;—ইহা বলে যে আমরা তা বলতে পারি না, কারণ আমরা তা জানি না ও জানতে পারি না; অন্ততঃ আমরা বোধগম্যভাবে ইহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলতে অক্ষম, আর তা শুধু এই কারণে যে মায়ার সৃষ্টি যদি আদৌ হ'য়ে থাকে তাহ'লে তা হ'য়েছিল প্রতিভাসসমূহের অপরদিকে, কাল, দেশ ও কার্যকারণ সম্বন্ধের উৎপত্তির আগে এবং সেজন্য বুদ্ধির কাছে ইহা বোধগম্য নয় কারণ বুদ্ধি ভাবতে

পারে শুধু কাল, দেশ ও কার্যকারণ সম্বন্ধের সংজ্ঞায়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এমন কি পরব্রহ্ম ব'লে অভিহিত জ্যোতির্ময় ছায়াপাতের মধ্যেই মায়ার অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জড়িত আছে। যে বিষয়টি অতদূরে কালের পূর্বে অন্ধকারময় পশ্চাদদিকে ও গভীর গর্তের মাঝে রয়েছে তাকে আমরা যাই বলি না কেন,—এক অবস্থা, শক্তি বা প্রণালী তা যখন কাজ করে অনপেক্ষর মধ্যে যিনি আছেন কিন্তু অচিন্ত্য তখন তাকে তথ্য হিসাবে বোধ করা সম্ভব, কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা বা নির্দেশ সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা বলি যে মায়া এমন বিষয় যা 'অনির্দেশ্যম্', যাকে নির্দিষ্ট করা অসম্ভব, যার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি না যে ইহা 'সৎ'—কারণ ইহা ভ্রান্তি—আবার আমরা বলতে পারি না যে ইহা 'অসৎ'—কারণ ইহাই বিশ্বের জননী; আমরা শুধু এই অনুমান করতে পারি যে ইহা এমন কিছু যা ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে স্বগত এবং সুতরাং ইহার জন্ম অসম্ভব, ইহা নিত্য হবেই, ইহা কালের মধ্যে হবে না, ইহা হবে কালের বাহিরে। আমাদের "প্রতিজ্ঞা" থেকে এতখানি জানা যায়, ইহার বেশী আমরা জানি ব'লে ভান করা অসাধুতা হবে।

তবু মায়া নিছক অঙ্গীকার নয়, অথবা ইহার অস্তিত্ব যে প্রমাণের অযোগ্য তা নয়! মায়া যে আছে তা প্রমাণ করতে বেদান্ত প্রস্তুত; পরমার্থ-ভাবে নয়, পরব্রহ্মে জড়িত ও বিশ্বের মধ্যে অভিব্যক্ত এই হিসাবে ইহা কি তা দেখাতে বেদান্ত প্রস্তুত; বেদান্ত আরো প্রস্তুত কিভাবে মায়া বিবর্ত-নের কাজ শুরু করল তা বর্ণনা করতে, বিশ্বের সমগ্র ক্রমবিন্যাস সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ সম্ভবপর ব্যাখ্যা হিসাবে মায়াকে বুদ্ধির সংজ্ঞায় উপস্থাপন করতে বেদান্ত প্রস্তুত; এমন কি ইহা একথা বলতেও প্রস্তুত যে ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা যা সত্তার প্রকৃতির সহিত এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যের স্বীকৃত বিভিন্ন ভিত্তির সহিত সম্পূর্ণ সুসঙ্গত। ইহা শুধু প্রস্তুত নয় মায়ার চরম অনন্ত প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে সান্ত মনের পক্ষে বোধ-গম্য সঠিক সংজ্ঞায় বলতে; কেননা যা দার্শনিকভাবে অসম্ভব তা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করা বুদ্ধির বিলাস আর বেদান্তবাদী স্বচ্ছ চিন্তায় এতই অনুরক্ত যে সে এই বিলাসে মত্ত হ'তে অসমর্থ।

তাহ'লে মায়া কি? বুদ্ধিগতভাবে ভাবলে ইহা এমন এক প্রত্যক্‌বৃত্ত আবশ্যকতা যা পরব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যেই জড়িত। আমরা দেখেছি যে পরব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হন তিনটি প্রত্যক্-বৃত্ত ধারণার রূপে

যাদের সহিত থাকে অনুরূপ তিনটি পরাক্-বৃত্ত ধারণা আর এগুলি তাঁর সত্তার স্বরূপ ভাব। কিন্তু পরব্রহ্ম ব্রহ্মই, যখন ব্যষ্টি আত্মা তার উৎসে ফিরে যেতে থাকে তখন সে ব্রহ্মকে যা ভাবে তা-ই পরব্রহ্ম; ব্রহ্ম নিজের সংকল্পের দ্বারা মায়ার রূপে বহির্ভাবাপন্ন হ'য়ে নিজের দিকে তাকাচ্ছেন তবে মায়ার আবরণ তখন অর্ধ-উত্তোলিত হ'য়েছে, কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ পিছনে ফেলা হয়নি। মায়ার বিভিন্ন রূপ অন্তর্হিত হ'য়েছে, কিন্তু স্বরূপভাব প্রত্যাবর্তনকারী আত্মার পশ্চাতে নাটমন্দিরের প্রবেশমুখে দণ্ডায়মান আর যখন সে নাটমন্দিরের আন্তর প্রান্তে এসে পৌঁছয় কেবল তখনই সে সম্পূর্ণ-ভাবে মায়ার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যায়। আর মায়ার স্বরূপ ভাব হ'ল, যে অস্তিত্ব, চেতনা ও আনন্দ প্রকৃতপক্ষে এক তাকে তিনে পর্যবসিত করা, ঐক্য দেখা দেয় ত্রিত্বরূপে, আর একটিমাত্র স্বরূপভাব তখনই বিকীর্ণ হয় বহুধা ধর্মে বা গুণে। আন্তর প্রবেশমুখে কেবল ব্রহ্ম হ'লেন জ্যোতির্ময় ত্রয়াত্মক পরব্রহ্ম, ইহাও অনপেক্ষ, তবে জ্ঞেয়; নাটমন্দিরের দ্বারপ্রান্তে তিনি মায়াদর্শনে রত পরব্রহ্ম, আর তারপরের পদক্ষেপেই তিনি যান মায়ার মধ্যে যেখানে দ্বৈতভাবের আরম্ভ, পুরুষ ভিন্ন হয় প্রকৃতি থেকে, চিৎ-পুরুষ জড় থেকে, সংহতশক্তি ক্রিয়া-শক্তি থেকে, অহং অনহং থেকে; আর যেমন প্রতিভাসসমূহের মধ্যে অবতরণ গভীর হ'তে থাকে তেমন এক-মাত্র পুরুষ নিজেকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করে বহুবিধ আধারের মধ্যে, একমাত্র প্রকৃতিকে অসংখ্য রূপের মধ্যে। ইহাই মায়ার বিধান।

কিন্তু, শুদ্ধবুদ্ধির কথায় বলা হ'লে, প্রথম পদক্ষেপ হ'ল, স্বরূপসত্তাকে ভাবতে হবে এই বলে যে তার তিনটি প্রত্যক্‌বৃত্ত ও তিনটি পরাক্‌বৃত্ত ধর্ম বিদ্যমান---সৎ, চিৎ, আনন্দ; সত্য, জ্ঞান, আনন্ত্য, যে মুহূর্তে তা ঘটে, ঠিক তখনই অনিবার্য আবশ্যকতাবলে ইহার বিপরীত গুণগুলি,--- শূন্যতা, অচৈতন্য, দুঃখ উপস্থিত হয় তিনটি ধাতুর অবিচ্ছেদ্য ছায়ারূপে, আর তাদের সঙ্গে আসে পরাক্‌বৃত্ত ত্রয়ী,---মিথ্যা, অজ্ঞান, সসীমতা; সসীমতার জন্য আবশ্যক বিভাজ্যতা, বিভাজ্যতার জন্য আবশ্যক কাল ও দেশ; কাল ও দেশের জন্য আবশ্যক কার্যকারণসম্বন্ধ; কার্যকারণ-সম্বন্ধই সেই উৎস যা থেকে নির্দিষ্ট দৃশ্যমান ঘটনাসমূহের উৎপত্তি হয় আর এই কার্যকারণসম্বন্ধের জন্যই আবশ্যক পরিবর্তন। দ্বৈতভাবের সকল মৌলিক বিধানগুলিরই উৎপত্তি হ'ল এবং তাদের আবশ্যক হ'ল যে মুহূর্তে সগুণ ব্রহ্মের আবির্ভাব হ'ল, অবিশেষিত অনন্ত বিশেষিত হ'ল।

বস্তুতঃ অথবা পরমার্থতঃ। তাদের অস্তিত্ব নেই কারণ তারা পরব্রহ্মের কেবল স্বরূপের সহিত অসঙ্গত, কেননা এমন কি প্রতিভাসসমূহের ক্ষেত্রেও আমরা এই সত্যে উঠতে পারি যে বিনাশ ভ্রান্তি, আর শুধু রূপই ধ্বংস হয়; শূন্যতা এক অসম্ভব জিনিস, নিত্য কখন ধ্বংস হতে পারে না; তাছাড়া, তিনি অচৈতন্যময়ও হ'তে পারেন না কারণ তাঁর সত্তার মধ্যে চৈতন্য ও অচৈতন্য এক, তিনি দুঃখ অনুভবেও অক্ষম কারণ তিনি অনন্ত ও সীমারহিত। তবু এই যেসব বিষয় আমরা জানি থাকতে পারে না অর্থাৎ অসৎ, তাদের ধারণায় আনা আবশ্যক, সুতরাং প্রাতিভাসিকরূপে তাদের অস্তিত্ব আছে এবং অস্থায়িত্বের মধ্যে সত্যতা আছে। কেননা, ইহাই মায়ার ও তার সব কাজের হেঁয়ালি যে আমরা বলতে পারি না যে তারা সৎ, কারণ সত্যতঃ তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব অথচ আমরা বলতে পারি না যে তারা অসৎ কারণ প্রত্যক্‌বৃত্তভাবে আমরা তাদের ধারণায় আনতে বাধ্য এবং এখন জ্ঞান বহির্মুখী হওয়ায় তাদের পরাক্‌বৃত্তভাবেও ভাবতে হবে।

এইভাবে আমরা গিয়ে পড়ি তত্ত্ববিদ্যার গভীর পঙ্কের মধ্যে। কিন্তু এই জট থেকে উদ্ধারের উপায় আমাদের হাতেই আছে—তা হ'ল এই কথা মনে রাখা যে পরব্রহ্ম নিজেই সেই অনির্দেশ্য পরমার্থসৎ-এর বিভাব যিনি জ্ঞান ও নির্জ্ঞানের, সৎ ও অসতের, সসীমতা ও আনন্ত্যের অতীত, আর তার ছয়টি গুণ প্রকৃতপক্ষে ছয় নয়, তারা এক, প্রকৃতপক্ষে তারা ব্রহ্মের গুণ নয়, বরং তাদের ঐক্যে তারা স্বয়ং ব্রহ্ম। যখন আমরা তাদের গুণ বলি ধারণা করি, কেবল তখনই আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে বিনাশ, অচৈতন্য ও সসীমতা এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যক্‌বৃত্ত ও পরাক্‌বৃত্ত বিষয়-গুলি সদ্‌বস্তু। কিন্তু আমরা তাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা করতে বাধ্য হই অনন্ত জিজীবিষার মধ্যে, স্বয়ং ব্রহ্মের মধ্যে চিরন্তনভাবে স্বগত কিছুর প্রভাবে। যে তত্ত্ববিদ্যা এই আনন্ত্যের ভ্রান্তিকর সীমার উপর আমাদের ঘূর্ণমান বুদ্ধিতে ধরা না দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে তার দুরূহ ভাষা কিছু-ক্ষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা উপনিষদের তীক্ষ্ণ প্রতীকপূর্ণ শৈলী ব্যবহার করি তাহ'লে বলতে পারা যায় যে পরব্রহ্ম হ'ল পরমার্থসৎ-এর জ্যোতির্ময় ছায়া যা নিজেরই দ্বারা পুরঃক্ষেপ করা হয় নিজেরই মধ্যে, আর সেইরকম মায়া হ'ল পরমার্থসৎ-এর দ্বারা পরব্রহ্মের মধ্যে পুরঃক্ষেপ-করা অন্ধকারময় ছায়া; দুইই সত্য কেননা তারা নিত্য, কিন্তু আলোক

কি অন্ধকার কোনটিই সদ্‌বস্তু নয়, সদ্‌বস্তু হ'ল 'তৎ' আর পরব্রহ্ম ও মায়া যে প্রতিভাসের মত ইহার শুধু প্রতিরূপ তা নয়, এক অবোধ্যভাবে ইহারা তা-ই। তাহ'লে পরব্রহ্মের সহিত প্রত্যক্‌বৃত্ত সম্বন্ধে মায়া ইহাই।

প্রতিভাসসমূহের মধ্যে মায়া পরাক্‌বৃত্ত হয় শত শত প্রতারক রূপে যাদের জটিল বৈচিত্র্যের মাঝে আমরা বৃথাই দীর্ঘকাল চেষ্টা করি এক পরম সন্ধানসূত্র পাবার জন্য। প্রাচীন মনস্বীরা বিবিধ প্রধান সূত্রগুলি দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু ইহাদের কোনটিতেই তাঁরা মায়ার গতির রহস্যময় আদি বিন্দুতে উপনীত হ'তে পারেননি। শ্বেতাশ্বতর বলে, "তারপর, তাঁরা ধ্যানযোগ অবলম্বন করে দেখলেন যে তার নিজের প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় রয়েছে 'দেবাত্মশক্তি'।" এই দেবাত্মশক্তিই অর্থাৎ দিব্য আত্মার, পরব্রহ্মের শক্তিই মায়া; আবার অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ইহার দুটি দিক––সম্মুখ ও বিপরীত, বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও নির্জ্ঞান। নির্জ্ঞানের চিরন্তন প্রবণতা হ'ল জ্ঞানকে আবৃত করা, জ্ঞানের চিরন্তন প্রবণতা হ'ল নির্জ্ঞানকে অপসারণ করা। অবিদ্যা বা নির্জ্ঞান হ'ল পর-ব্রহ্মের সেই শক্তি যাতে সৃষ্টি হয় ভ্রান্তি বা প্রতিরূপ, এমন সব বিষয় যা মনে হয় আছে কিন্তু তত্ত্বতঃ নেই; বিদ্যা বা জ্ঞান হ'ল তাঁর সেই শক্তি যাতে তিনি তার নিজের সব কল্পনা পরিহার ক'রে ফিরে আসেন তাঁর প্রকৃত ও নিত্য আত্মায়। এই যে দুটি শক্তি পরস্পরের উপর সক্রিয় হয় তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াই বিশ্বব্যাপী সক্রিয়তার রহস্য। অস্তিত্বের প্রতি স্তরেই নির্জ্ঞানের শক্তি স্পষ্ট; কারণ সমগ্র বিশ্বই বিভিন্ন প্রতিরূপের সারি। প্রভাতে সূর্য উদিত হয়, পরে তা আরোহণ করে নীলগগনের শীর্ষে এবং সন্ধ্যায় অবতরণ করে আর অস্ত যাবার সময় পশ্চাতে রেখে যায় গৌরবোজ্জ্বল মেঘমালা। বিপুল সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত এই অখণ্ডনীয় সত্যকে কে সন্দেহ করতে পারে? প্রতিদিন যুগ যুগ ধরে, পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ লোক এই অপূর্ব পরিক্রমণের সত্য সম্বন্ধে একসাথে অটল সাক্ষ্য দিয়েছে। এরূপ বিশ্বজনীন চাক্ষুষ সাক্ষ্য অপেক্ষা আর কোন সাক্ষ্য সিদ্ধান্তে আসার বেশী সহায়কর? অথচ এখন জানা যায় যে এসবই দৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট এক প্রতিরূপ মাত্র। বিজ্ঞান আসে এবং কারাগারে কি ফাঁসির মঞ্চে ভীত না হ'য়ে প্রচার করে যে সূর্য কখনো আকাশে ভ্রমণ করে না, বস্তুতঃ ইহা আমাদের আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে, আমরাই সূর্যের চারিদিকে ঘুরি, সূর্য আমাদের চারিদিকে ঘোরে না। এমন কি,

ঐ যে আকাশ যার সুনীল বৃত্তমণ্ডলে কবিতা ও ধর্ম অত সৌন্দর্য ও বিস্ময় দেখেছে তা-ও শুধু এক প্রতিরূপ যাতে নির্জ্ঞান দৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আমাদের বাতাবরণকে চিত্রিত করে। যে আলোর প্রবাহ আমাদের সূর্য থেকে আমাদের উপর এসে পড়ে আর মনে হয় সকল দিক পূর্ণ করে, তা-ও জানা যায় এক প্রতিরূপ বৈ কিছু নয়। বিজ্ঞানকে এখন অগণিত চমকপ্রদ হেঁয়ালি আনতে দেওয়ায় সে অবশেষে আমাদের এই বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে শুধু জড়ের গতির স্পন্দনের এক বিশেষ মাত্রা আমাদের উপর এসে মস্তিষ্কে ঐ বিশেষ ছাপ উৎপাদন করে। আর এইভাবে সে সকল বিষয়কেই পর্যবসিত করে শুধু বিশাল বিশ্বব্যাপী ইথারের (ether) বিভিন্ন প্রতিরূপে আর বলে যে একমাত্র এই ইথারই আছে। এই সব দৃশ্যমান বিষয়ের বিস্ময়কর প্রাসাদ না কি এই সব অসার দ্রব্যে নির্মিত! এমন কি, ইহাও দেখা যাবে যে কোন বিষয় যত বেশী অসার হয় তত বেশী ইহা চরম সত্যের নিকটবর্তী। বেদান্তবাদী বলে, এই যা বিজ্ঞান প্রমাণ করে তা-ই ঠিক আমরা যা মায়া বলতে বুঝি।

কিন্তু কখনো স্বপ্নেও ভেব না যে বিজ্ঞানের শেষকথা এইখানেই আর সে যা সব উদ্ঘাটন করবে তার সীমায় আমরা পৌঁছেছি। সে আরো এগিয়ে গিয়ে বলবে যে এই বিশ্বব্যাপী ইথারও এক প্রতিরূপ মাত্র এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং ইন্দ্রিয় থেকে অনুমেয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই যে বিশ্ব তা এক বহুগুণ বিশালতর রূপময় বিশ্ব থেকে আসা বিভিন্ন রূপান্তরের এক অংশ মাত্র আর এইসব বিভিন্ন রূপ নির্মিত হয়েছে এমন এক আরো সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা দেখতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। আর যখন সে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের উপযোগী যন্ত্র নিয়ে ঐ সূক্ষ্মতর জগতে প্রবেশ করবে তখন সে ইহাকেও নির্দয়ভাবে পর্যবসিত করবে শুধু আরো সূক্ষ্মতর ইথারের বিভিন্ন প্রতিরূপে আর বলবে যে এই থেকেই আগেরটির উৎপত্তি। সেই সূক্ষ্মতর বিশ্বের পশ্চাতেও আবার অস্তিত্বের এক আরো গভীর ও আরো বিশাল কিন্তু আরো সরল অবস্থা দেখা দেয় যেখানে আছে শুধু সেই বিষয়-সমূহের অনির্ধারিত সঠিকতা যা এখনো নিগূহিত রয়েছে তাদের বিভিন্ন কারণের মধ্যে। এখানেই জড়ের সহিত বিজ্ঞানের কারবার শেষ হতে বাধ্য আর তাকে দেখাতেই হবে যে বিষয়সমূহের এই নির্বিশেষ সঠিকতা শেষ পর্যন্ত আমাদের আত্মার মধ্যে কিছুর এক প্রতিরূপ মাত্র। এদিকে

সেই আত্মা নিয়েই সে নিরন্তর ও জোরের সহিত আমাদের স্বীকার করাতে ব্যস্ত যে যা কিছু আমরা নিজ বলে বিশ্বাস করি, যা সবের মধ্যে নির্জ্ঞান চায় আমরা সন্তুষ্ট হ'য়ে বাস করি সেসব শুধু প্রতিচ্ছবি ও রূপ। আমাদের মধ্যকার পশুর দাবী এই যে এই দেহই প্রকৃত আত্মা এবং ইহার সব প্রয়োজনের তৃপ্তিসাধনই আমাদের প্রথম কর্তব্য; কিন্তু বিজ্ঞান (যার সম্বন্ধে অধ্যাপক হেকেলের "বিশ্বপ্রহেলিকা" শেষ কথা নয়) আমাদের নির্দেশ দেয় যে আমাদের মনে করা উচিত যে আমাদের আত্মা শুধু কতকগুলি প্রাণিক সংবেগের পুঞ্জ ও তার সহিত বিভিন্ন আদিম পশু রূপের স্তূপ; নিশ্চয়ই ইহা সেক্সপীয়ার ও নিউটনের, বুদ্ধ ও সাধু ফ্রান্সিসের সত্যতা নয়! তাহ'লে ঐসব প্রাণিক সংবেগের মধ্যে আমরা আমাদের সত্তার ভিত্তি খুঁজি। কিন্তু এই সবকেও বিজ্ঞান পর্যবসিত করে নির্জ্ঞান-সৃষ্ট ভ্রান্তিতে অথবা প্রতিরূপে; কারণ প্রকৃতপক্ষে এই সব প্রাণিক সংবেগের নিজেদের কোন মৌলিক অস্তিত্ব নেই, ইহারা শুধু এক যোগসূত্র যার একদিকে আছে পশুরূপের জড়ীয় সমাবেশ ও অন্যদিকে আমাদের মধ্যস্থ কিছু যাকে আমরা মন বলি। মনের সম্বন্ধেও তার এই কথা হবে যে এক দিকে শরীরের জড়ীয় সমাবেশ ও অন্যদিকে জড়ীয় সংস্থানকে নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ করে এমন কিছু—এই দুয়ের মধ্যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-সংবিতের ও সে সবে উত্তরের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট এক প্রতিরূপের বেশী কিছু যে মন তা ভাবা ভুল হবে। মনের উপর তার ক্রিয়ার এই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে এমন এক সত্তা হিসাবে যা বিচার করে, নির্বাচন করে, বিন্যাস করে ও যা উদ্দেশ্যপূর্ণ; ইহাকেই বেদান্ত বলে "বুদ্ধি" যার শুধু এক অবস্থা হ'ল যুক্তিশক্তি, এক প্রতিরূপ মাত্র বুদ্ধিশক্তি। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিও হ'য়ে ওঠে শুধু এক প্রতিরূপ, কোন সত্তা নয় আর বিজ্ঞান এই শেষ কথা বলতে বাধ্য হবে যে দেহ, প্রাণ শক্তি, মন, বুদ্ধি, এই সব শুধু তার প্রতিরূপ যাকে দর্শন বলে আনন্দ, অস্তিত্বের সুখ বা জিজীবিষা; আর অবশেষে সে আমাদের কাছে এই তথ্য উদ্ঘাটন করে যে যদিও এই জিজীবিষা নিজেকে এমন সব অসংখ্য রূপে বিভক্ত করে যেগুলি বিভিন্ন ব্যষ্টি আত্মা বলে নিজেদের জাহির করে, তবু এই সব হ'ল এক বিশাল বিশ্ব জিজীবিষার বিভিন্ন প্রতিরূপ, ঠিক যেমন সব জড়ীয় রূপ হ'ল বিশ্ব জড়ের, অথবা যদি বলতে চাই কারণ ইথারের, এক বিশাল অবিশেষিত সার্বিকতার প্রতিরূপ মাত্র। ঐ জিজীবিষা পুরুষ, ঐ সার্বিকতা

প্রকৃতি ; আর উভয়ই পরব্রহ্মের প্রতিরূপমাত্র।

তাহ'লে, প্রধান তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে ও অপ্রচুরভাবে বলা হলেও, ইহাই বেদান্তর মায়াবাদ আর ইহার সমর্থনে বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞান, না জেনেই, রাশি রাশি বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটন করছে। নিশ্চিতভাবে যা কিছু এই বিজ্ঞান বলে তাতেই এই সমর্থনের সাক্ষ্য বৃদ্ধি পায়, আর যেখানে সে অসম্পূর্ণ ও সেজন্য তাকে অজ্ঞেয়বাদী হ'তে হয়, শুধু সেখানেই বেদান্ত তার বিশ্লেষণ থেকে কোন সাহায্য পায় না। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার অর্থ নির্জ্ঞানের চরম পরাজয় ও মায়ার উন্মোচন।

পাঁচ

মায়া ঃ পরমার্থসতের শক্তি

তাহ'লে মায়াই বিশ্বের মধ্যে মৌলিক তথ্য আর তার যে সমান সমান বিপরীত যুগলের দ্বৈত পদ্ধতি তা বুদ্ধিগত ধারণার রীতি; কিন্তু প্রতিভাস-সমূহের বাহিরে ব্রহ্মের মধ্যে স্বগত শক্তি হিসাবে তার যে অস্তিত্ব সম্ভব তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যতদিন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে আর যোগ অল্পসংখ্যকের মধ্যে গূঢ় শিক্ষা হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন তত্ত্ববিতের নির্বন্ধ প্রশ্নগুলি উপেক্ষা করা যায় না, আর তার পদ্ধতিও অপ্রচলিত হ'য়ে ওঠে না। পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞান দৃঢ়প্রত্যয় সহকারে ও এমন কি উদ্ধত-ভাবে যে চেষ্টা করেছিল যে ইহাই মনের রাজ্যের উপর একাধিপত্য করবে আর তাত্ত্বিক ও অন্য সকল পদ্ধতি বাতিল হবে তা বিবেচনাহীন-ভাবে অসময়ে করা হ'য়েছিল,---আর অসময়ে করা হ'য়েছিল বলেই এই আক্রমণ বিবেচনাহীন হ'য়েছিল; প্রথমে তা সফল হ'লেও, জোর ক'রে দখল করার জন্য তার বিজয়ী অগ্রগতি শ্লথ হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়েছে, এমন কি যেসব স্থান একসময়ে মনে হ'য়েছিল যে সে চিরকালের জন্য দখল করেছে সেসবও তার হাতছাড়া হ'চ্ছে। ইতিমধ্যেই তত্ত্ববিদ্যার মন্থর পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হ'য়েছে। একথা ঠিক যে কোন তত্ত্ববিদ্যাই গ্রহণ-যোগ্য হবে না যদি না ইহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মান ও সংশয়াতীত ফল গণ্য করে; কিন্তু তর্কশাস্ত্রের মাধ্যমে কল্পনার যে পদ্ধতি তত্ত্ববিদ্যা থেকে অপ-হরণ করা হয়েছে অথচ যার সহিত বিজ্ঞানের কোন সংস্রব নেই সেই পদ্ধতি বাদ দিয়ে পরীক্ষণমূলক প্রমাণের দ্বারা এবং সেই সব অনুমানের দ্বারা যেগুলি পরীক্ষণমূলক প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষিত ও নিশ্চিত করা হয়েছে পরীক্ষণমূলক বিশ্লেষণ যতদিন না বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান করে আর সকল ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করা হয় ও কোন তথ্যকেই উপেক্ষা না করা হয় ততদিন তত্ত্ববিদ্যাই সেই সব স্থানে আধিপত্য করবে যেখানে বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষণের কোন কাজ হয় নি। যদিও বেদান্তর ভিত্তি হ'ল প্রধানতঃ যোগের বিভিন্ন প্রত্যক্‌বৃত্ত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি এবং ইহাদের ফলের সহিত মিল নেই এমন কোন তাত্ত্বিক অনুমান সঠিক বলে গ্রাহ্য

করা হয় না, তবু ইহা তার নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে তাত্ত্বিক তর্কশাস্ত্রের বিধির দ্বারা পরীক্ষা করাতে সম্মত আছে। বর্তমানে কতকগুলি নৈতিক বাধার জন্য বৈদান্তিক যোগী তার গোপনীয় বিষয়কে ভিড়ের নিকট প্রকাশ করতে সঙ্কুচিত হয় বটে কিন্তু সে স্বীকার করে যে যতদিন সে প্রকাশ করতে অস্বীকার করে ততদিন তাত্ত্বিক তার্কিকের অনুসন্ধান এড়াবার কোন অধিকার তার নেই। অথর্বা ও শ্বেতাশ্বতর কথা বলার পর শঙ্কর ও রামানুজকে সুবিধা দিতে হবে তর্কযুদ্ধের জন্য।

যে তাত্ত্বিক প্রশ্নটি জড়িত তা নির্ভর করে অবিদ্যার, নির্জ্ঞানের প্রকৃতির উপর এবং যে পরব্রহ্ম শেষ পর্যন্ত অনপেক্ষ---অনপেক্ষ চেতনা ও সেজন্য অনপেক্ষ জ্ঞান---তাঁর মধ্যে ইহার অস্তিত্বের সম্ভাবনার উপর। যখন পরব্রহ্ম মায়া চিন্তা করেন তখন তিনি অবিদ্যায় সমর্থ হ'য়ে ওঠেন---একথা বলা ন্যায্য হবে না; কারণ 'মায়ার চিন্তা' কথাটির অর্থ রূপক-ভাবে বলা যে ইহা অবিদ্যাই। ধর্মতত্ত্ববিৎ অবশ্য বিধিবহির্ভূত সর্ব-শক্তিমত্তার আশ্রয় নিয়ে যুক্তি এড়িয়ে চলে, কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে তা করা চলে না। ইহাতে সন্দেহ নেই যে সনাতন স্বরূপে স্বাধীন ও সীমা-হীন কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নেই যে প্রতিভাসসমূহের সহিত তাঁর সম্বন্ধ-বিষয়ে তিনি নিজেকে ইচ্ছা করে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বের দ্বারা আবদ্ধ করেছেন; তিনি ইচ্ছা করেছেন যে কতকগুলি বিষয় হবে না এবং হ'তে পারে না আর মানুষী উপমা প্রয়োগ করে বলা যায় যে তিনি যেন এক রাজা যিনি কোন এক বিশেষ বিধান জারী করার পর দরিদ্রতম প্রজার মতোই নিজেও নিজের বিধানের দ্বারা আবদ্ধ, অথবা তিনি যেন এক কবি যার কল্পনাগুলি নিজেদের মধ্যে স্বাধীন কিন্তু যে মুহূর্তে সেগুলি আকার নেয় সে মুহূর্তে তারা বিভিন্ন বিধানের দ্বারা সীমিত হয়। কথার কথা হিসাবে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু ভগবান সর্বশক্তিমান সেহেতু তিনি শূন্য থেকে কিছু বিষয় সৃষ্টিতে সক্ষম কিন্তু যতক্ষণ না শূন্য থেকে কিছু বিষয়ের সৃষ্টি হওয়ার একটি উদাহরণও দেওয়া হয় ততক্ষণ "নামতো বিদ্যতে ভাবঃ"---এই নিয়মটি এক সার্বিক ও মৌলিক বিধান রয়ে যায় আর বিশ্বের এক মৌলিক বিধান লঙ্ঘন করে ভগবান বিশ্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন---একথা মনে করার অর্থ গৃহ থেকে যুক্তিকে বহিষ্কার করা এবং তার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করা। অনুরূপভাবে, যদি একই ক্ষেত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার সহাবস্থান ও পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ বিধান-

বিরুদ্ধ হয় তাহ'লে সে কারণে ইহা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে এবং তখন প্রমাণ হবে যে মায়াবাদ ভুল; যতই না সর্বশক্তিমত্তার দোহাই দেওয়া হ'ক, তাতে তা রক্ষা পাবে না।

অবিদ্যা সম্বন্ধে যে আপত্তি তা এই ভাবে বলা যায়ঃ অনপেক্ষ জ্ঞান এক-সাথে না জানতে অক্ষম, যা সৎ নয় তাকে সৎ বলে কল্পনা করতে অক্ষম; কারণ এরূপ কল্পনার মধ্যে কিছু আত্ম-প্রতারণা জড়িত থাকে কিন্তু পরমার্থসৎ-এর মধ্যে আত্ম-প্রতারণা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কি সত্যই চেতনার এক বিধান--আর এইখানেই বিষয়টির মূল বর্তমান--যে, কোন বিষয়ই একসাথে সৎ ও অসৎ হ'তে পারে না, কিছুতেই তোমার পক্ষে সেসব বিষয়কে সৎ ব'লে কল্পনা করা সম্ভব নয় যেগুলি তুমি সেই সাথে অসৎ বলে বেশ ভাল করে জান? দ্বৈত আপত্তিকারীরা বলতে পারে যে এই যে সম্ভব নয় তা চেতনার এক বিধান। বেদান্তবাদী তখনই বলে,-- না, তোমার কথা যে ঠিক নয় তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে; বিশ্ব-ব্যাপী অভিজ্ঞতার সহিত ইহার মিল নেই। একান্ত ও স্বীকৃত অসত্য-গুলিকেও সত্য বলে দৃঢ়ভাবে কল্পনা করা সম্ভব, সত্য বলে দেখা সম্ভব, অনুভব করা সম্ভব, ধারণা করা সম্ভব এবং তা করাও হয় অথচ সে সময় মন এক মুহূর্তের জন্যও তাদের সত্য বলে স্বীকার করে না। মরু-ভূমির মরীচিকাকে আমরা কিছুক্ষণ বাদে অসৎ বলে জানি, কিন্তু তবুও আমরা ইহাকে সত্য বলে দেখি ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করি, ঐসব বৃক্ষের শ্যামল সৌন্দর্য প্রশংসা করি, ঐ জলের শীতলতা থেকে গভীর তৃপ্তি পেতে অস্থির হই। আমরা স্বপ্ন দেখি, আর স্বপ্ন তো অসত্য, কিন্তু তবু কতকগুলি অন্ততঃ একান্তই অসত্য নয়, কারণ তারা এমন সব ঘটনার চিত্র দেয় এবং কখনো কখনো তা নিখুঁতভাবে দেয় যা সব ঘটেছিল, ঘটছে কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবে। আমরা দেখি যে যাদুকর শূন্যে একটি দড়ি ছুঁড়ে দিল, তা দিয়ে উপরে উঠল, তার পূর্বগামী ছেলেটিকে বধ করল এবং মাটিতে তার রক্তাক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল; সত্য হ'লে ঘটনাটি যেমন হ'ত তেমন এই অসত্য ঘটনার প্রতি খুঁটিনাটি ও পরিবেশ আমরা দেখি; কিন্তু যতক্ষণ ইহা দেখান হয় ততক্ষণ আমরা ইহাকে অসৎ বলে ভাবি না, তা কল্পনাও করতে পারি না; কারণ যা দেখি তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ, আমাদের মধ্যে ইহা যেসব ভাবের উদ্রেক করে তা অতীব জীবন্ত, অথচ আমরা সব সময়ই বেশ ভাল করেই

জানি যে এরূপ কোন ঘটনা ঘটছে না। এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত কম নয়, তাদের গুণে শেষ করা সহজ নয়।

কিন্তু এই সব বিষয় দূরবর্তী ও অনব্যবহিত আর কাহারও কাহারও পক্ষে তাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। কাছে প্রাত্যহিক জীবনে আসা যাক। আমরা একটি পাথর দেখি, ইহার যে গুণ , ঘনত্ব ও নিশ্চলতা তা লক্ষ্য করি আর কোন কথাই আমাদের কল্পনা করাতে পারবে না যে ইহা ঘন ও নিশ্চল ছাড়া অন্য কিছু, আর আমরা এবিষয়ে সঠিক কারণ ইহা ঘন ও নিশ্চল উভয়ই ; কিন্তু তবু আমরা জানি যে ইহার ঘনত্ব ও নিশ্চলতা সত্য নয়, আমরা জানি যে প্রকৃতপক্ষে,--আর যে দৃষ্টিতে অনুপরিমাণ বিষয়ও জানা যায় তার কাছে--ইহা সর্বাপেক্ষা সক্রিয় গতির এক জগৎ, এমন অসংখ্য অণুর এক জগৎ যার প্রতিটি অন্য হ'তে বিচ্ছিন্ন। আবার যদি কোন একটি বিষয় থাকে যা আমার কাছে সত্য তা এই যে আমি শীর্ষক ও ঠিক সোজা, তা বিপরীত দেশের লোক যাই হ'ক না কেন আর আমি পৃথিবীর উপর চারিদিকে ঘুরে বেড়াই আনুভূমিকভাবে ; অথচ, আমি জানি প্রকৃতপক্ষে, আমি শীর্ষক নই, বরং প্রায় আনুভূমিক, আর পৃথিবীর উপর আমি প্রায়ই চলি শীর্ষকভাবে উপর নীচু করে, যেমন মাছি চলে দেওয়াল বেয়ে। আমি এই কথা বেশ ভাল ভাবেই জানি অথচ যদি আমি সর্বদাই আমার এই জ্ঞানকে কল্পনায় রাখতাম তাহ'লে বাতুলালয়ের নিভৃত কথাই আমার একমাত্র স্থান হ'ত। বস্তুতঃ আমাদের চেতনার ইহাই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিধান যে ইহা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ ধারণাকে একই সময় ও সমান জোরের সহিত পোষণ করতে সমর্থ। বিজ্ঞান আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা আমরা স্বীকার করি কিন্তু নির্জ্ঞান যে সব চিত্র সৃষ্টি করে তাদেরই উপর নির্ভর করে আমরা চলি। আমি জানি যে সূর্য ওঠেও না, অস্তও যায় না, পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না, আকাশের মধ্য দিয়ে ভেসে যায় না আর যাবার সময় দিনের কাল চিহ্নিত করে না, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে আমি ঠিক এই স্বীকার করেই কাজ করি যে এই অসত্য ঘটনা সত্যই ঘটছে; প্রতি ঘন্টায় ও প্রতি মুহূর্তে আমি ইহাকে সত্য বলে ধারণা করি ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করি এবং কখন কখন আমি ধারণা অনুযায়ীই আমার সব চলাফেরা নিয়মিত করি। চিরন্তন যুদ্ধরত এই দুই--বিজ্ঞান ও নির্জ্ঞান অন্যান্য অনেক বিষয়েরই মতো এই সূর্যের গতির বিষয়েও এক কাজচলা আপোসে এসেছে। বাঁচবার

অবাধ সংকল্প হিসাবে যখন আমি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিবিষয়ক অংশের দ্বারা নিত্যতার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হই এবং দ্রষ্টারূপে সূর্যের কেন্দ্রের মধ্যে অথবা জড়ীয় বিশ্বের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইহার বাহিরে অবস্থান করি তখন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের বিষয়টিই সত্য আর এমন কি নির্জ্ঞান রাজী হয় যে আমি শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্যে স্বীকৃত তথ্য হিসাবে ইহারই উপর নির্ভর ক'রে কাজ করব; কিন্তু শৃঙ্খলিত দেহ হিসাবে যখন আমি পৃথিবী পরিত্যাগে অক্ষম হ'য়ে প্রাত্যহিক জীবনে ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় আবদ্ধ থাকি তখন আমার কাছে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের পরিভ্রমণই সত্য আর বুদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান আমি পাই তাকে আমার দৈনন্দিন কল্পনার মধ্যে আনা হ'লে তা অসহনীয়-ভাবে অসুবিধাজনক হবে; সেজন্য এমন কি বিজ্ঞানও রাজী হয় যে আমার পৃথ্বীবদ্ধ অবস্থার জড়ীয় জীবনে আমি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই স্বীকৃত তথ্য হিসাবে স্বীকার করে তার উপর নির্ভর করে কাজ করব। যে প্রকারে পরমার্থসৎ প্রাতিভাসিকরূপে সীমাবদ্ধ হ'তে সংকল্প করেন তার এক অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব আমরা দেখি দৃষ্টিকোণের এই দ্বিত্বের মধ্যে; তিনি সম্যক্ জানেন কি সৎ অথচ সেই সময়েই তিনি ইচ্ছা করেন যা অসৎ তা কল্পনা করতে; অনন্ত বিজ্ঞান তাঁর আছে অথচ তিনি আসতে দেন আত্ম-সীমাজনক নির্জ্ঞানকে। এই বিষয়টি আর বেশী ব্যাখ্যা করার, অথবা উদাহরণের জন্য সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আলোড়ন করার প্রয়োজন নেই; আধুনিক জ্ঞানের আলোতে বিদ্যা ও অবিদ্যার সহাবস্থানে কোন আপত্তি টিকতে পারে না; চেতনার দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে ইহা এক চিরন্তন তথ্য।

উত্তরে বলা যেতে পারে যে তা বটে, কিন্তু পরমার্থসৎ সম্বন্ধে ইহা যে সম্ভব শুধু তাহাই প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, তার বেশী কিছু নয়। প্রাতি-ভাসিক অস্তিত্বের পরিধির মধ্যে বিষয়সমূহের যে অবস্থা সত্য তা সেখানে কার্যকরী না হ'তে পারে যেখানে প্রতিভাসসমূহেরই অবসান হয়। কিন্তু ইহা যে সম্ভব তা একবার স্বীকার করা হ'লে বেদান্ত বলতে পারে যে এই বহুময় অস্তিত্বের যত ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে তার দেওয়া মায়াই একমাত্র সফল ব্যাখ্যা; প্রথম কারণ এই যে মায়া সমগ্র অস্তিত্বকে তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সেই সাথে ইহা এমন এক সাবিক তথ্য যা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং চেতনার

প্রতি ক্রিয়ায় মৌলিকভাবে উপস্থিত থাকে; দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ইহা প্রতি-ভাসসমূহের অতিস্থিত আবার তাদের মধ্যে অনুস্যূত সেহেতু ইহার অনপেক্ষ ও সীমিত অবস্থা উভয়ই বিদ্যমান এবং সেজন্য ইহা যে শুধু পরমার্থ-সতের মধ্যে সম্ভব তা নয়, ইহা অভিব্যক্তির মধ্যে স্বয়ং পরমার্থসৎ হবেই; তৃতীয়তঃ, যেহেতু ব্রহ্মের নিছক অতিস্থিত অনপেক্ষতার সত্য এবং প্রাতিভাসিক বিশ্বের সুস্পষ্ট, অনস্বীকার্য অস্তিত্ব—এই উভয়কেই অন্য কোন সম্ভবপর ব্যাখ্যা ন্যায়ানুগভাবে ধারণ করতে সক্ষম নয়।[১] ন্যায়সম্মত নয় এমন সব মত যাদের সহিত যুক্তির কোন সংস্রব নেই, এমন মত যেগুলি পর্যবেক্ষণ-করা সব বিধানের উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত না করে শূন্যে দাঁড়ায় অনেক পাওয়া যেতে পারে। মায়া কোন মত নয়, ইহা এক তথ্য; শুধু তর্ক বা কল্পনার ফল নয়, ইহা সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফল অথচ তর্কের দ্বারা অখণ্ডনীয় এবং কল্পনার দ্বারা অনতিক্রম্য।

মানবচেতনার মধ্যে অবিদ্যার একটি অত্যাশ্চর্য অভিব্যক্তি যার প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াপ্রণালীর বিধানসমূহে তার জনকের সহিত নিকট সাদৃশ্য আছে হ'ল কল্পনাশক্তি—সেই শক্তি যা এমন সব চিত্রের রূপ দেয় যেগুলি হয় তাদের উৎস ব্যষ্টি চেতনার মধ্যে পুনরায় তার অংশ হিসাবে তার মধ্যে সুপ্ত থাকে, নয় তার পরেও জীবিত থাকে। এই শেষোক্ত প্রকারের কল্পনার এক প্রধান দৃষ্টান্ত হ'ল কাব্যসৃষ্টি। কোন এক সময় কোন এক দেশে সেক্‌স্‌পীয়ার নামে এক ব্যক্তি তাঁর অবিদ্যার শক্তি বলে, যা নয় তা কল্পনা করার শক্তিবলে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এই জগৎকে সেক্‌স্‌পীয়ার যখন সৃষ্টি করেছিলেন, অথবা আরো সঠিক বৈদান্তিক পরিভাষায় "অসৃজত", তাঁর মধ্যস্থ কারণ জগৎ থেকে তা বাহিরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন ইহা যেমন সৎ ও অসৎ ছিল আজও ইহা তেমনই আছে। ঐ জগতের সীমার মধ্যে অথেলোর (Othello) কাছে আয়াগো (Iago) সৎ, ডেসডিমোনার (Des - demona) কাছে অথেলো সৎ, এবং সকলেই সেই চেতনার নিকট সৎ যা কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে এই জগৎ থেকে ইহার আত্ম-সৃষ্ট পরিবেশ থেকে আচ্ছিন্ন করে সেক্‌স্‌পীয়ারের জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম। আমরা তাদের কথা জানি, তাদের পর্যবেক্ষণ করি, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি,

[১] অবশ্য এই সব সীমার মধ্যে আমি শেষ যুক্তিটি বিস্তার করতে প্রস্তুত নই, কারণ ইহার জন্য প্রয়োজন সকল দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা যা সমগ্র জীবনব্যাপী কর্ম।

তাদের কাজ করতে দেখি, কথা বলতে শুনি, তাদের দুঃখ শোকে কাতর হই; আর এমন কি যখন আমরা নিজেদের জগতে ফিরে আসি তখনো তারা যে সর্বদাই আমাদের ছাড়ে তা নয়, বরং কখনো কখনো আমাদের সঙ্গে এসে আমাদের কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জীবন ও ইতিহাস গঠন বিষয়ে কাব্যসৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা এখনো পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় নি; অথচ ক্ষিপ্রচরণ পেলেয়াসপুত্র একিলিসই (Achilles) তার সৈন্যবাহিনীর অধিপতি হয়ে সারা এসিয়ায় বজ্রনাদ করে ভীতির সঞ্চার করেছিল, বাতিসকে (Batis) তার রথচক্রে বদ্ধ করে টেনেছিল এবং ঐ ইরাণবাসীকে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিল--কিন্তু এই পেলেয়াসপুত্র একিলিস কখনো কল্পনার চিত্র ছাড়া বাস্তবে জীবিত থাকে নি, এমন কি সবজান্তা পণ্ডিতরা কি বলে না, যে তার স্রষ্টাও কখনো বাস্তবে জীবিত ছিল না অথবা তার স্রষ্টা ছিল শুধু এমন কতকগুলি অখ্যাত কবি যাদের একসাথে নাম দেওয়া হ'য়েছিল, হোমার (Homer)? অথচ এই যে সব চিত্রকে আমরা সত্য বলে ভাবি এবং আমাদের কথা, চিন্তা, অনুভব এবং এমন কি কখনো কখনো কার্য দ্বারাও তাদের সত্য বলে স্বীকার করি সেসব বাস্তবে,---আর আমরাও তা ভালভাবেই জানি-- স্বপ্ন, মরীচিকা, রজ্জুর উপর যাদুকরের মতোই অসত্য। কোন অথেলো নেই, আয়াগো নেই, ডেসডিমোনা নেই, এই সব শুধু নাম ও রূপের বৈচিত্র্য, সেক্‌স্‌পীয়ারের নয়, যে নাম ও রূপের মধ্যে সেক্‌স্‌পীয়ার অন্তর্নিহিত রয়েছেন এবং যা এখনো বিদ্যমান শুধু এই কারণে যে সেক্‌স্‌পীয়ার তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত। তবু যে ব্যক্তি এই সব ভ্রান্তির সন্তানকে এই অপরূপ সুসঙ্গত মায়াকে চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সফল হয় তাকেই আমরা নির্ণয় করি শ্রেষ্ঠ কবি, স্রষ্টা বা নির্মাতা ব'লে যদিও অন্যেরা আরো মধুরভাবে কথা গাঁথতে অথবা আরো কুশলতার সহিত বিভিন্ন ঘটনা সংযুক্ত করতে সক্ষম। কল্পনার এই রচনার সহিত প্রতিভাসসমূহের সৃষ্টির সম্বন্ধ আর সেইরকম কবির সহিত কবিসৃষ্ট সব চরিত্রের সম্বন্ধ এবং সগুণ ব্রহ্মের সহিত তাঁর বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধ আশ্চর্যজনকভাবে অনুরূপ--যেমন তাদের অধিকাংশ অংশে তেমন তাদের সাধারণ প্রকৃতিতে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য কর যে এই যে সব বহুবিধ মূর্তি, পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান, জ্ঞানী ও নির্বোধ, তাদের মধ্যে যিনি এসবের স্রষ্টা, তাদের বাহিরে প্রকাশ করেছেন, তাদের আত্মা ও সেই সদ্‌বস্তু যা ব্যতিরেকে তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব তিনি তাদের

পাপ ও পুণ্যের প্রভাবের বাহিরে দায়িত্বহীন ও স্বাধীন। ঈশ্বর--তা হলে? এই উপমা কি কবির কল্পনার বেশী কিছু অথবা মোটের উপর ব্রহ্ম ও মায়ার সমগ্র ভাবনাই কি শুধু কবির কল্পনা নয়? হয়ত তাই, কিন্তু তাহ'লেও বিশ্ব ও ইহার বিভিন্ন গতি অপেক্ষা ইহা বেশী কাল্পনিক বা অসৎ নয়; কারণ এ দুটির তত্ত্ব ও ক্রিয়াপ্রণালী একই।

যখন সৃষ্টির কোন মহৎ কর্ম ঘটে, তখন যা ঘটেছে তা কি এবং আজ যখন সেক্‌স্‌পীয়ার নিজেই মৃত ও মাটিতে পর্যবসিত তখন এ কেমন কথা যে সেক্‌স্‌পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্র সব এখনো আমাদের কাছে জীবিত--এ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য যে সেক্‌স্‌পীয়ারের সব সৃষ্টি অমর হবে অথচ সেক্‌স্‌পীয়ার নিজেই শুধু এক রাশি স্বল্পায়ুঃ জৈবনিক কোষাণু! আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি যে সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি হ'ল ঐ বিস্ময়কর মনে যেসব অসংখ্য মূর্তি ভিড় করে থাকত তা থেকে কিছু নির্বাচন বা সংকলন; সেই চিত্রাগারে সহস্র সহস্র চিত্র ছিল যা কখনো জগদ্‌বাসীদের প্রশংসার জন্য বাহির করা হয় নি। ইহা এমন এক সত্য যা প্রতি স্রষ্টাই নিশ্চিতভাবে সমর্থন করবে--তা সে প্রস্তর ব্যবহার করুক, কি রঙ ব্যবহার করুক বা কথা ব্যবহার করুক তার ভাবনার প্রতীকের জন্য। সুতরাং সাহিত্যের অনুভবযোগ্য পদার্থের মধ্যে যে জগৎকে সেক্‌স্‌পীয়ার রূপায়িত করেছিলেন বলে আমার জানি তা অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম ও আরো বিশাল এক জগৎ তাঁর মনের ভিতর ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি যে এই সব কাল্পনিক চিত্রগুলি রূপ নেবার আগেই সেক্‌স্‌পীয়ারের মনের ভিতর ছিল অব্যক্ত ও অরূপায়িত অবস্থায়; কারণ একথা ঠিক যে এই সব বাহির থেকে আসে নি। তুমি বলতে পার যে সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর সব মালমসলা নিয়েছিলেন এই উপ্যাখ্যান থেকে অথবা ঐ নাটক থেকে, এই পুরাবৃত্ত থেকে অথবা ঐ ইতিহাস থেকে। সম্ভবতঃ বহিঃরেখাটি তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বিষয়-গুলি নয়; হ্যামলেট (Hamlet) কোন উপাখ্যান বা নাটক থেকে আসে নি, অথবা কেসিয়াস (Cassius) বা রাজা হেনরী (King Henry) কোন ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত থেকে আসে নি। না, সেক্‌স্‌-পীয়ার নিজের মধ্যে তাঁর সব সৃষ্ট চরিত্র ধারণ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি এই সব ছাড়িয়ে গেছলেন, তাদের অতিরিক্ত ছিলেন; তিনি তাদের চেয়ে, এমন কি তাদের সমষ্টির চেয়ে অধিক ছিলেন, তিনি সত্যই তাদের অধিক; কারণ এই সব শুধু তাঁর সীমিত অভিব্যক্তি দেশ ও কালের

অবস্থার মধ্যে, আর এমন কি যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে একটি দৃশ্যও বা একটি লাইনও না পেতাম তাহ'লেও তিনি সেই একই সেক্‌স্‌পীয়ার থাকতেন; শুধু কল্পনার জগৎটি ব্যক্ত না হ'য়ে তাঁর মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকত। একবার ব্যক্ত হ'লে তাঁর সৃষ্ট বিষয়গুলিকে অমর করে রাখা হয়---ছাপার অক্ষর দিয়ে কি হাতের লেখা দিয়ে নয়---তবে, কি বলব, কথা দিয়ে? না, তাও নয়, কারণ কথা বা শব্দ শুধু ভৌতিক ধাতু, অণু যা থেকে তাদের আকার নির্মিত হয় এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজান যায়---যেমন অনুবাদের দ্বারা, অথচ তাতে আমরা অথেলো ও ডেসডিমোনাকে হারাই না, ঠিক যেমন অন্তর্বাসী অন্তঃপুরুষ নতুন দেহ নিতে পারে অথচ এই পুনর্জন্মগ্রহণের দ্বারা যে পরিবর্তিত হবেই তা নয়। অথেলো ও ডেসডিমোনাকে মূর্ত রাখা হয় শব্দে বা কথায় কিন্তু মনন তাদের সূক্ষ্মতর ও অবিনশ্বর ধাতু। যেখান থেকে তাদের নির্বাচিত করে শব্দের মধ্যে মূর্ত করা হ'য়েছে তা হ'ল সেক্‌স্‌পীয়ারের মধ্যে মননের এক সূক্ষ্মতর জগৎ আর এই মননের জগতে তারা গোড়ায় এসেছিল প্রাণের এমন এক আধার থেকে যা মননের চেয়েও গভীরতর সত্তার এমন এক মহাসমুদ্র থেকে যার তলদেশ এখনো আমাদের বিশ্লেষণ স্পর্শ করতে পারে নি।

এখন, এই সব তথ্যগুলিকে বেদান্তর ধারণায় রূপান্তরিত করা যাক। সেক্‌স্‌পীয়ারের নাম ও রূপে আত্ম-সীমিত পরব্রহ্ম চেতনার অগোচর হ'য়ে তাঁর মধ্যে গভীরতম প্রদেশে বাস করেন মনন অপেক্ষা আরো মৌলিক (তা কি কারণ সংকল্প, মৌলিক সংকল্প হ'তে পারে না?) কিছুর অব্যক্ত জগৎরূপে যার মধ্যে সেক্‌স্‌পীয়ারের কল্পনার চিত্রগুলি এখনো অগঠিত ও অনিরূপিত হ'য়ে রয়েছে; তারপর তিনি সেক্‌স্‌পীয়ারের গোচর হ'য়ে চেতনার উপরিভাগে আসেন সূক্ষ্ম জড় বা মননের আন্তরভাবে ব্যক্ত জগৎরূপে যার মধ্যে ঐ কল্পনাগুলি সূক্ষ্ম মনন-আকার নিয়ে একসাথে জমা হয়; অবশেষে তিনি সেক্‌স্‌পীয়ার ছাড়া অন্যদের গোচর হ'য়ে চেতনার উপরিভাগে ওঠেন এমন এক বাহ্যতঃ ব্যক্ত জগৎরূপে যা শব্দে ব্যক্ত এবং যার মধ্যে কিছু নির্বাচিত কল্পনা সকলের দেখার জন্য প্রকাশিত হয়। এই বিশাল চিত্রগুলি আমাদের মনে অমর হ'য়ে জীবিত থাকে কারণ সেক্‌স্‌পীয়ারের মধ্যস্থ পরব্রহ্ম ও আমাদের মধ্যস্থ পরব্রহ্ম একই; এবং এই কারণে যে সেক্‌স্‌পীয়ারের মনন সেজন্য সেই একই আকাশীয় (etheric)

মহাসমুদ্রের জল যা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়; বস্তুতঃ মনন এক, যদিও আমাদের কাছে প্রকাশিত হবার জন্য ইহাকে রূপ দিতে হয় এবং আমরা দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত এমন সব শব্দরূপে ইহারা রূপ গ্রহণ করে। সেক্‌স্‌পীয়ারের মধ্যে মনন-সৃজনশীল রূপে ব্রহ্মন্‌-ব্রহ্মা সেসবকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধ্যে মনন-সংরক্ষণ রূপে ব্রহ্মন্‌-বিষ্ণু সেসব পালন করেন, মনন-সংহারশীল অথবা বিস্মৃতি রূপে ব্রহ্মন্‌-রুদ্র একদিন তাদের ধ্বংস করবেন; কিন্তু এই সব ক্রিয়ার মধ্যে ব্রহ্ম এক, মনন এক, যেমন সকল মহাসমুদ্র এক। সেক্‌স্‌পীয়ারের জগৎ সর্বতোভাবে আমাদেরই জগতের অনুরূপ। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে——সেক্‌স্‌পীয়ার স্থূল জড়ে অনুভবযোগ্য রূপে তাঁর চিত্রগুলিকে আকার দিতে পারেন নি, কারণ, যেমন অন্য ধর্মগুলি বিশ্বাস করে মানুষকে ঐ শক্তি দেওয়া হয়নি, অথবা যেমন বেদান্তবাদ বলে মানবজাতি এখনো সৃজনশীল শক্তি'র সেই উচ্চতায় ওঠেনি।

অবশ্য এমন এক শ্রেণীর প্রতিভাস আছে যার মধ্যে ব্যষ্টি কল্পনা ও বিশ্বজনীন অবিদ্যার মধ্যে তাদাত্ম্যের এই ত্রুটি মনে হয় পূর্ণ হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে মন এমন সব চিত্র সৃষ্টি করতে পারে যেগুলি মনের নিজের লয় বা প্রস্থানের পরেও জীবিত থাকে এবং স্থূল জড়ে অথবা অন্ততঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য জড়ে কোন প্রকারের রূপ গ্রহণ করে। ভূতপ্রেতের ঘটনার ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে এবং সে সব ক্রমশঃই বাড়ছে। গোঁড়া বিজ্ঞান এই সব তথ্যকে উপেক্ষা করতে চায়, অনুসন্ধানের যোগ্য হওয়ার প্রাথমিক যুক্তি যে আছে তা-ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে, ইহাকে রহস্যময় ব্যাপার, কাকতালীয় ব্যাপার, মতিভ্রম আখ্যা দিয়ে এবিষয়ে আরো বেশী জ্ঞানলাভের পথ বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও, অনুসন্ধান করা হ'ক বা না হ'ক ঐরূপ ঘটনা ঘটতেই থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূত আসাযাওয়ার ঘটনা; ইহার সম্বন্ধে ইওরোপে শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু নিদর্শন আছে কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে আর তার কারণ আমাদের দৈহিক গঠনের অধিকতর শক্তিশালী আন্তর শক্তি এবং অধিকতর সূক্ষ্ম আন্তর সংবেদনতা। এই সব ভূত আসার ব্যাপারে আমরা আশ্চর্য হ'য়ে দেখি কল্পনার প্রভাব কত বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মরণাপন্ন ব্যক্তিরাই অথবা যেসব ব্যক্তিদের মৃত্যু নিশ্চিত তারাই যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে এই সব মূর্তি তৈরী করে আর এগুলি তাদের স্রষ্টার মৃত্যুর পরও

টিকে থাকে; কতকগুলি দেখা যায়, কতকগুলির স্বর শোনা যায়, কতকগুলি দেখা যায় আবার তাদের স্বরও শোনা যায়, আবার কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে সেগুলিকে ছোঁয়াও যায় যদিও তা হয় এক অপাথিব ও অপর্যাপ্ত প্রকারে তবে অনিপুণভাবে নয়। কবিতাসৃষ্টির বা জগৎ-সৃষ্টির যা প্রণালী এই সব সৃষ্টির প্রণালীও সারতঃ তা-ই; ইহা তপঃ বা তপস্যা––ইংরেজ পণ্ডিতরা যে ইহার অনুবাদ করেন কৃচ্ছ্রসাধন (penance) বলে তা অদ্ভুত,––ইহা কৃচ্ছ্রসাধন নয়, ইহার অর্থ তেজ এবং সংকল্পের প্রচণ্ড একাগ্রতা যা সমগ্র সত্তাকে প্রজ্জ্বলিত করে, সকল শক্তিকে একত্র ক'রে পুঞ্জীভূত করে এবং তা সবলে নিক্ষেপ করে একটিমাত্র লক্ষ্যের উপর। তপঃ-র দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হ'য়েছিল। মুণ্ডক বলে, সৃজনক্ষম ব্রহ্মের উপচয় হয় তপোবলে, "চীয়তে"––একত্র ও তীব্র করা হয়েছে, তপোবলেই উৎপন্ন হয় চিদাবেশের বেগ। জড়স্তরে এই তপঃ উদ্দেশ্যযুক্ত অথবা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন হ'তে পারে। মৃত্যুর দ্বারে প্রচণ্ড ভীতি বা শোক, ভীষণ যন্ত্রণা অথবা দারুণ উত্তেজনা থাকলে, ইহা কোন জড়ীয় উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় অনিচ্ছাকৃত ইহা তা-ই, কিন্তু ইহা তার উৎস থেকে এমন এক অতুলনীয় প্রগাঢ়তা পায় যাতে তার জীবন্ত মূর্তির সৃষ্টি হয় আর মৃত্যুর দ্বারা উৎসটি বিলীন বা নিশ্চল হ'লেও ঐ মূর্তিগুলি অনেকদিন থাকে ও কাজ করে। কল্পনার অন্তিম শক্তি এইরূপ যদিও বর্তমানে জড়স্তরে ইহাকে অনিয়মিত, আকস্মিক ও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ছাড়া ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

তাহ'লে কর্মপ্রণালী বিষয়ে কল্পনা হ'ল অবিদ্যার এক সুচারুরূপে নিষ্পন্ন অনুকৃতি; আর অবিদ্যার সহিত তার মৌলিক তাদাত্ম্যের অন্য নিদর্শনের যদি প্রয়োজন হয়, তা-ও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উভয়ই প্রধানতঃ উদ্দেশ্যহীন। অন্ততঃ জড়স্তরে কল্পনার কর্মপ্রণালীতে প্রায়ই কোন বোধগম্য উদ্দেশ্য আদৌ থাকে না আর যদিও ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হ'তে পারে যে আমাদের চেতনার যে সুপ্ত অংশ নিম্নদেশে সক্রিয় তাতে কখন কখন এমন উদ্দেশ্য থাকে যা উপরিস্থ অংশ জানে না, তবু কল্পনার অতি সাধারণ ক্রিয়াসমূহ যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন তা সুস্পষ্ট। আর উদ্দেশ্যবিহীন না হ'লেও ইহারা যে এক প্রকাণ্ড অপচয় তা নিশ্চিত। কোন নির্দিষ্ট শিল্পবিষয়ক উদ্দেশ্যের জন্য সেক্‌স্‌পীয়ারের মন থেকে কয়-শত চিত্র নির্বাচন করা হয়েছিল কিন্তু যে বহু সহস্র চিত্রকে কখনো কথায়

পরিস্ফুট করা হয় নি--আর অনেকগুলি হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের চিত্র-গুলির মতই বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল--সেগুলি মনে হয় কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য বিনাই উৎপত্তির পর বিনষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির কার্যে সেই একই প্রকারের অপচয় দেখা যায়; কত লক্ষ লক্ষ প্রাণই না প্রকৃতি সৃষ্টি করে যাতে অল্পসংখ্যক নির্বাচিত হ'তে পারে বিবর্তনের উদ্দেশ্যের জন্য! তবু যখন সে মনে করে যে সে মিতব্যয়ী হ'য়ে ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে তখন সে কল্পনার মতো পরিশ্রম সম্বন্ধে সাবধানী কৃপণ হ'য়ে দেখাতে পারে যে লক্ষ্য অনুযায়ী উপায় সাধনে তার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা ও নিশ্চয়তা আছে। সুতরাং কি প্রকৃতি, কি কল্পনা, কোনটি সম্বন্ধেই মনে করা যেতে পারে না যে ইহারা কোন অনিয়ন্ত্রিত শক্তি হ'তে উদ্ভূত অন্ধ অনিয়মিত শক্তি এবং আকস্মিকভাবে লক্ষ্যানুসারী। তাদের ক্রিয়া-বলী স্পষ্টতঃই এমন এক পরমা বুদ্ধির দ্বারা চালিত যা ইচ্ছা করলে আজকালকার বিজ্ঞান ও শৃঙ্খলার দিনের বুদ্ধিমান ও সাবধানী কারিগরের মতোই উদ্দেশ্য স্থির করায়, কার্যক্রম উদ্ভাবনে, লক্ষ্যসাধনের জন্য উপায় প্রয়োগ করায়, মালমসলা ও পরিশ্রম ব্যাপারে মিতব্যয়ী হওয়ায় সম্পূর্ণ সমর্থ। তাহ'লে এই মহতী বিশ্বব্যাপিনী বুদ্ধি কেন সাবধানী কারিগরের মতো সর্বদাই--মাঝে মাঝে নয়--তার মালমসলা ও পরিশ্রম সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হবে না--সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ইহাই কি সত্য নয় যে প্রকৃতি সকল সময়ে ও তার সকল কার্যে লক্ষ্যানুসারী নয়, আর উদ্দেশ্য শুধু অস্তিত্বের এক ক্ষুদ্র অংশ যা অধিকাংশ অপেক্ষা অনেক বেশী একাগ্র এবং সেজন্য আরো প্রখর ও বিজয়ী আর তার বিশ্বময় ক্রিয়াবলীর অধিকাংশের মধ্যে লক্ষ্যানুসারী ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাই আমাদের খুঁজতে হবে? অথবা ইহাই কি সত্য হবে যে প্রকৃতি একই সময় লক্ষ্যানুসারী হবে আবার তার অতিরিক্ত হবে? সেক্‌স্‌পীয়ার মাইকেল এনজেলো (Michelangelo), এডিসন (Edison), বীঠোফেন (Beethoven), নেপোলিয়ন (Napoleon), সোপেনহাওয়ারের (Scho - penhauer) মতো কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, জীবন বা মননের কল্পনাশক্তিসম্পন্ন স্রষ্টাই সব হ'লে আমরা তাদের ক্ষেত্রে তাদের অব্যবহৃত কল্পনাসমূহের জন্য এই উপকারিতার কথা বলতে পারতাম যে ইহারা ভূমিকে এত সমৃদ্ধ করেছিল যে তা থেকে অতিসুন্দর পুষ্পোদ্গম হবে। এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হ'তে পারে, কবির কল্পনার বেশী কিছু অবশ্য

ইহা নয়, কিন্তু তবু অন্য কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় এই ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হ'তে পারে। কিন্তু প্রতি মানুষের মধ্যেই কম বা বেশী বিকশিত দিব্যশক্তি বর্তমান; প্রতি মনই কল্পনায় পরিপূর্ণ এক জগৎ; আর বাস্তবিকই শুধু কল্পনা হিসাবে বিচার করলে, বলা যায় যে গুলিখোরের কল্পনা সেক্স্‌পীয়ারের কল্পনা অপেক্ষা আরো বেশী জীবন্ত উর্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ। অথচ সহস্রের মধ্যে হয়ত একটি ক্ষেত্রেও এই সব কল্পনা জগতের কোন উপকারে আসে নি অথবা কাজের বাধা হওয়া অথবা বড় জোর স্বপ্ন দ্রষ্টার উদ্দেশ্যহীন আমোদপূর্ণ খেলা ছাড়া অন্য কিছু হয় নি। কল্পনা চেতনার এক মৌলিক শক্তি আর এই বিস্ময়কর অদম্য শক্তি কাজ ক'রে চলে, তাকে সদ্ব্যবহার, অপব্যবহার অথবা আদৌ কোন ব্যবহার করা হ'ল কিনা তা ইহা গ্রাহ্য করে না; ইহা থাকে শুধু তার নিজের অস্তিত্বের আনন্দের জন্য। এইখানেই মনে হয় আমরা মূল বিষয় পাই। কল্পনা উদ্দেশ্যের বাহিরে, কখন কখন ইহার ঊর্ধ্বে, কখন কখন ইহার নিম্নে, কখন কখন ইহার সহিত যুক্ত। কারণ ইহা এক স্বগত শক্তি তবে কোন মহান্ লক্ষ্যানুসারী কারিগরের নয়, ইহা আনন্দের, অস্তিত্বের আনন্দের অথবা জিজীবিষার স্বগত শক্তি; আর অস্তিত্বে এই আনন্দের বাহিরে তার থাকার কোন কারণ নেই। সেইভাবে, মায়া অর্থাৎ যে সৃজনশীলা শক্তি প্রাতিভাসিক বিশ্বকে পূর্ণ করে তা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত জিজীবিষাতে স্বগত কোন শক্তি; আর এই কারণেই তার ক্রিয়াবলীকে উপযোগী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অত অপচয়পূর্ণ মনে হয়; কারণ উপযোগিতা বা অর্থনীতি সম্বন্ধে তার কোন লক্ষ্য নেই, সে কাজ করে শুধু প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব, চেতনা ও সচেতন অস্তিত্বের আনন্দের দিকে তার মৌলিক সংবেগ অনুযায়ী। এপর্যন্ত তার যা উদ্দেশ্য আছে তা এই---আর প্রকৃতির মধ্যে সকল লক্ষ্যানুসারী পদার্থেরই শুধু এই উদ্দেশ্য---সচেতন প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের সুখের জন্য আরো সুষ্ঠু পরিবেশ অথবা আরো উৎকৃষ্ট উপায় অথবা বৃহত্তর সুবিধা অথবা মহত্তর উপভোগশক্তি ও ক্ষেত্র পাওয়া। তবু শেষ পর্যন্ত গভীরতম আনন্দ হ'ল সেই বিষয় যা সে ফেলে এসেছে এবং যাতে সে ফিরে যাবে, ইহা সান্ত জীবনের খণ্ডিত ও দুঃখবেষ্টিত আনন্দ নয়, ইহা হ'ল বিশ্বাতীত অবিভক্ত ও অসীম চেতনার পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দ। কিছু সময়ের জন্য সে ঐ পূর্ণ আনন্দ পেতে চেষ্টা করে সান্ত উপায়ের দ্বারা এবং সান্ত বিষয়সমূহে, সমাজবাদী বা নৈরাজ্যবাদীর স্বর্গে, শিল্পীর

স্বর্গে, জ্ঞানের স্বর্গে, মননের স্বর্গে অথবা অন্য কোন জগতের মধ্যে কোন স্বর্গে; কিন্তু একদিন সে ঐ মহৎ সত্য উপলব্ধি করে যে "স্বর্গের রাজ্য তোমার ভিতরে" এবং ইহাতেই সে শেষ পর্যন্ত ফিরে যায়। ইহাই মায়া।

অবিদ্যা ও বিদ্যা, অর্থাৎ মায়ার বহিঃবক্ররেখা ও অন্তঃবক্ররেখা যে পরমার্থসতে চিরন্তন ভাবে অবস্থিত কিছুর মধ্যে ফিরে যায় এবং প্রাতিভাসিক কারণের দ্বারা সৃষ্ট নয়—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হবার পূর্বে এখনো একটি তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজনীয়। যদি মায়া পরমার্থসতে স্বগত হয় তাহ'লে মায়ার পরিণাম এমন সব ধারণা হতে বাধ্য যা সব নিজেরাই অনপেক্ষ, অনন্ত ও নিরুপাধিক। বিদ্যা আনন্ত্যে পরিণত হয় এই সব ধারণার মধ্যে—সৎ অর্থাৎ শুদ্ধ অস্তিত্ব, চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনা, আনন্দ অর্থাৎ শুদ্ধ আনন্দ; অবিদ্যা শিখরে ওঠে এই সবে—অসৎ অর্থাৎ সতের অভাব, অচেতনম্ অর্থাৎ চৈতন্যশূন্যতা, নিরানন্দম্ অর্থাৎ আনন্দহীনতা বা কষ্ট। অবশ্য অসৎ ও চৈতন্যশূন্যতা অনপেক্ষ ধারণা—অনন্ত ও অসীম; কিন্তু নঞর্থক ত্রিত্বের তৃতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে তা বলা যায় না। একান্ত দুঃখ, শূন্য অনন্ত, অসীম ও অপ্রশমিত কষ্ট এমন এক ধারণা যা যুক্তি গ্রাহ্য করতে অনিচ্ছুক ও চেতনা অস্বীকার করে, ইহা যে সম্ভব তা স্বীকার করতে প্রচণ্ডভাবে আপত্তি করে। শূন্য সম্বন্ধে তাত্ত্বিক হিসাব করতে পার, কিন্তু নিজে নিজে ইহা নিছক কিছু-না, কোথাও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না, অথবা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তবু যদি অনন্ত কষ্টের অস্তিত্ব সম্ভব হয় তাহ'লে ইহার উৎপত্তিতেই ইহা অসতে বিলীন হবে, একান্ত হবার মুহূর্তেই ইহার নাম লোপ পাবে। তাহ'লে তাত্ত্বিক প্রতীতি হিসাবে আমরা একান্ত নিরানন্দকে নঞর্থক ত্রিত্বের একটি ন্যায্য তৃতীয় সংজ্ঞা বলে স্বীকার করতে পারি, তবে কোন প্রকৃত বা সম্ভবপর অবস্থা হিসাবে নয়, কারণ এই তিনটির কোনটিই প্রকৃত বা সম্ভবপর অবস্থা নয়। তৃতীয় সংজ্ঞাতেই অসৎভাবটি আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিভাত হয় যেমন সদর্থক ত্রিত্বের তৃতীয় সংজ্ঞায় সৎ-ভাবটি আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিভাত হয়, কারণ আনন্দ ও ইহার নেতিবাচক নিরানন্দ জড়স্তরে স্পষ্টভাবে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে আমাদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে; অন্যগুলি আমাদের আরো পরোক্ষভাবে চৈত্য ও কারণ স্তরে স্পর্শ করে। তবু অসতের অসৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয় এবং অচৈতন্যতার অসৎভাব আমাদের

কাছে স্পষ্ট হবে যখন চৈতন্যের প্রকৃতি আরো ভালভাবে বোঝা যাবে।

বলা হবে যে শেষ পর্যন্ত যেমন দুঃখ তেমন সুখ থেকেও মুক্তি পাওয়া বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত, উভয়েরই সাধারণ লক্ষ্য। একথা সত্য যে মুক্তি কামনা করা হয় সীমিত সুখ থেকে যার সহিত দুঃখ জড়িত থাকে আর দুঃখ থেকেও মুক্তি চাওয়া হয় কারণ ইহা সুখের সীমাবদ্ধতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই চাওয়া হয় সীমার একান্ত অভাব যা কোন নেতিবাচক অবস্থা নয় বরং সদর্থক আনন্ত্য ও ইহার অনির্বচনীয়, অবিমিশ্র আনন্দ; ব্যষ্টিত্ব থেকে তাদের মুক্তিতে শূন্যতা আসে না, আসে অনন্ত অস্তিত্ব, ইন্দ্রিয়-সংবিৎ থেকে তাদের মুক্তির উদ্দেশ্য চৈতন্যের বিনাশ নয়, বরং শুদ্ধ একান্ত চেতনাই ইহার লক্ষ্য। "অসৎ", "অচেতনম্", "নিরানন্দম্"--এসব নয়, 'সচ্চিদানন্দম্‌ই' মহান্ সদ্‌বস্তু যা অবধারণ করার জন্য জীবাত্মার উত্তরণ, সেই 'তৎ' যার কাছে সে সর্বদাই ফিরে যেতে চায় বিদ্যার শক্তিবলে।

ছয়

ত্রিবিধ ব্রহ্ম

এখন পরব্রহ্ম প্রাতিভাসিক অভিব্যক্তিতে উদ্যত; অস্তিত্বের অনপেক্ষ সেক্‌স্‌পীয়ার, অনন্ত কবি, মনস্বী ও কাব্যরচয়িতা শাশ্বত সৃজনশীলা শক্তি মায়ার শুধু অস্তিত্বের দ্বারাই তাঁর নিজের মধ্য থেকে এমন জীবন্ত সদ্‌বস্তুর এক জগতের ছায়া-রূপ দিতে উদ্যত যাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। প্রাতিভাসিকরূপে তিনি হন স্রষ্টা ও বিশ্বের আধার যদিও তিনি সর্বদাই যা ছিলেন তাই থাকেন---অনপেক্ষ ও অপরিবর্তিত। বিশ্ব যা তা ইহা কেন ও কিভাবে ঐরূপ প্রতীয়মান হয় তা বুঝতে হলে আমাদের ইচ্ছা করেই সর্বোত্তম জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করে নির্জ্ঞানের ভাষায় পরমার্থসৎকে চিত্রিত করতে হবে যে ইহা নিজেকে সীমাবদ্ধ করছে, এক বহু হ'চ্ছে শুদ্ধ অতি-আধ্যাত্মিক নিজেকে অশুদ্ধ করছে মানসিক ও জড়ীয়ভাবে। আমরা এবিষয়ে আধুনিক দৈবজ্ঞের মতো যে ভালভাবেই জানে যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে অথচ সে বলে চলে যে সূর্য চলছে, আকাশের এই অংশে বা অন্য অংশে কারণ তার কাজ হ'ল পৃথিবীর অধিবাসী মানুষদের সহিত সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের আপেক্ষিক অবস্থা নিয়ে, অন্তিম জ্যোতিষ সদ্‌বস্তু নিয়ে নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হবে বিষয় ও তার ছায়া, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাব নিয়ে; এই পুরুষ ও প্রকৃতিকে সাধারণতঃ বলা হয় চৈতন্য ও জড়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই পার্থক্য ভ্রমপূর্ণ কারণ এমন কিছু নেই যা আত্যন্তিকভাবে চৈতন্য বা আত্যন্তিকভাবে জড়, তাছাড়া বিশ্বকেও ঠিক এই দুয়ের মধ্যে বিভক্ত করা সম্ভব নয়; সদ্‌বস্তুর দিক থেকে চৈতন্য ও জড় ভিন্ন নয়, ইহারা একই। ইচ্ছা করলে আমরা বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্বই জড় আর চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই; ইচ্ছা করলে আমরা বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্ব চৈতন্য আর জড়ের অস্তিত্ব নেই। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা শুধু না ভেবে কথা বাড়াই আর সারা বিশ্ব ব্যেপে যে স্পষ্ট তথ্যটি দেখা যায় তা উপেক্ষা করি; এই তথ্য হ'ল চৈতন্য ও জড় উভয়ই বর্তমান এবং অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত; এরূপ করার

সঠিক কারণ এই যে ইহারা একই বিষয় তবে দেখা হয় দুই দিক থেকে। তাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল একটি প্রাথমিক দ্বৈতভাব এবং বিশাল অবিদ্যার প্রথম ফল। জড়ীয় উপাদান হিসাবে মায়া কাজ করে নাম ও রূপের মধ্যে; আধ্যাত্মিক বিষয় হিসাবে মায়া কাজ করে নাম ও রূপের অবধারকের মাঝে। পুরুষ হ'ল সেই মহৎ তত্ত্ব বা শক্তি যার উপস্থিতি প্রয়োজন হয় সৃজনশীল শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে জড়ের বিভিন্ন আকারের মধ্যে ও উপরে কাজ করতে পাঠানর জন্য। এই কারণেই বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাঝে সোপাধিক ব্রহ্মকে সাধারণতঃ পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু ইহা সর্বদাই মনে রাখা ভাল যে অভিব্যক্তির দিকে ফেরা আদ্য অস্তিত্বের দুটি দিক পুমান্ ও স্ত্রী, সদর্থক ও নঞর্থক। তিনি বিষয়সমূহের উৎপত্তির আদি এবং তিনিই উৎপত্তির আধার এবং তার পুংবাচক দিক সম্বন্ধেই পুরুষ কথাটি প্রধানতঃ প্রযোজ্য। এই সম্পর্কটি সম্বন্ধে যে রূপক প্রায়ই প্রয়োগ করা হয় তা হ'ল স্ত্রীর মধ্যে পুরুষের রেতঃপাত; পুরুষের কর্তব্য শুধু রেতঃ উদ্ভব করা ও স্থাপন করা কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল রেতঃকে পোষণ করা, বৃদ্ধি করা, বাহিরে আনা এবং অভিব্যক্ত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করা। উপনিষদ বলে, রেতঃ পুরুষের আত্মা, ইহা চিৎ-পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে ইহা প্রকৃতির সহিত এক হয় এবং সেজন্য তার কোন ক্ষতি করে না; চিৎ-পুরুষ জড়ের গঠনকারী মূর্তি নেয়, ইহা জড়ের সব মূর্তি চূর্ণ করে না, বরং তাদের বিধানের অধীনেই বিকশিত হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী, বিশ্বজনীন আদম ও ইভ প্রকৃতপক্ষে এক এবং প্রতিটি অন্য বিহনে অসম্পূর্ণ, অন্য বিহনে বন্ধ্যা, অন্য বিহনে নিষ্ক্রিয়। পুরুষ, পুমান্ ভগবান 'একম্'-এর সেই দিক যা প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের দিকে সংবেগ দেয়; প্রকৃতি, স্ত্রী, নিসর্গ সেই দিক যা প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের উপাদান এবং ইহার বিকাশ সাধন করে; সুতরাং ইহাদের উভয়ই অজ ও সনাতন। পুমান্ হ'ল পুরুষ যে বৃহতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে; স্ত্রী হ'ল প্রকৃতি, পুমানের কর্মপ্রণালী এবং কখন কখন ইহাকে বলা হয় রয়ি, অর্থাৎ সেই বিশ্বজনীন গতিবিধি যা শান্ত পুমান্ থেকে নিঃসৃত হয়। সেজন্য পুরুষকে চিত্রিত করা হয় ভোক্তা বলে, প্রকৃতিকে ভুক্ত ব'লে; পুরুষকে চিত্রিত করা হয় দ্রষ্টা বলে আর প্রকৃতিকে সেই সব দৃশ্যমান বিষয় বলে যা সে দেখে; পুরুষ যেন বিষয়সমূহের জনক বা পিতা, প্রকৃতি যেন তাদের ধাত্রী বা

মাতা। আবার অন্য অনেক রূপকও উপনিষদ ব্যবহার করে যেমন পুরুষ তার নিজের প্রতিরূপ পায় সূর্যে, যা জীবনের পিতা, এবং প্রকৃতি পৃথিবীতে যা জীবনের ধাত্রী। উপনিষদ যেভাবে মায়ার বিকাশ বর্ণনা করে তা আয়ত্ত করার চেষ্টায় যাতে কোন বিভ্রান্তি না আসে তার জন্য প্রথম থেকে পুরুষের সংজ্ঞা এইভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজনীয়।

প্রতিভাসসমূহের বিকাশসাধনের সময় পরব্রহ্মের তিনটি পাদ বা অবস্থা হয় যেগুলিকে উপনিষদের এক অংশে বলা হ'য়েছে তাঁর তিনটি আয়তন, আবার আরো এক ব্যঞ্জনাময় রূপকে তাঁর তিন স্বপ্নাবস্থা। প্রথম অবস্থাটি হ'ল অব্যক্ত, অভিব্যক্তির পূর্বাবস্থা যেখানে সকল বিষয় নিগূহিত থাকে, কিন্তু যার মধ্যে কিছুই প্রকাশিত বা চিত্রিত হয় না, ইহা এক আদর্শভাবের অবস্থা, অবিশেষিত, কিন্তু সকল প্রভেদ তার মধ্যে নিহিত ঠিক যেমন বীজের গর্ভে নিহিত থাকে বল্কল, রস, মজ্জা, তন্তু, পাতা, ফল ও ফুল এবং অন্যসব যা যুক্ত হ'য়ে গাছের ধারণা তৈরী করে; ঠিক যেমন জৈবনিকের গর্ভে নিহিত থাকে প্রাণিজীবনের সকল অসাধারণ বৈচিত্র্য। ইহার পরাক্‌বৃত্ত দিকে ইহা বিষয়সমূহের বীজাবস্থা। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে সমগ্র বিশ্বের এরূপ এক অবস্থার পরাক্‌বৃত্ত সম্ভাবনা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয়তা বর্তমান; কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া-বলীতে আমরা দেখি যে বিকাশের অপরিবর্তনীয় প্রণালী ইহাই। বিবর্তনের অর্থ এই নয় যে জৈবনিক এমন এক উপাদান যা থেকে বাহিরের এক শক্তির দ্বারা অত সব গঠন সৃষ্ট হ'য়েছে অথবা যাতে যোগ করা হ'য়েছে; বরং ইহার অর্থ এই যে জৈবনিক থেকেই এই সব বিকশিত হ'য়েছে; আর যদি বিকশিত হয় তাহ'লে তারা পূর্বেই সেখানে অবস্থিত ছিল এবং জৈবনিকের মধ্যেই অবস্থিত ও সক্রিয় কোন শক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হ'য়েছে। কিন্তু জৈবনিককে উন্মুক্ত করলে ইহা যে সকল অঙ্গ ও গঠন অতঃপর বিকশিত করবে তার কোন উপক্রম তুমি ইহার মধ্যে দেখবে না। সেইরূপ যদিও জৈবনিক ও অন্য সব কিছু ইথার থেকে বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে তবুও তাদের কোন চিহ্নই ইথার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ-মূলক গবেষণায় দেখা যাবে না। বিভিন্ন যন্ত্র ও গঠন জৈবনিকের মধ্যে আছে, পাতা, ফুল ও ফল বীজের মধ্যে আছে যে ইথার থেকে সকল রূপ বিকশিত হ'য়েছে তা ইথারের মধ্যে আছে, কিন্তু এসব আছে অবিশেষিত অবস্থায় এবং সেজন্য যে বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রভেদ আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ তা

ঐসবের নাগাল পায় না। ইহাকেই বলা হয় নিবর্তিত অবস্থা। সেইরকম আবার ইথার নিজেই তা স্থূল বা সূক্ষ্ম হ'ক বা যা সব ইথার থেকে বিকশিত হয় অব্যক্তের মধ্যে নিবর্তিত থাকে; তারা সেখানে উপস্থিত আছে কখনও তাদের সেখানে আবিষ্কার করা যাবে না কারণ তারা অবিশেষিত হ'য়ে রয়েছে। প্লেটোর (Plato) ভাবনার জগৎ হ'ল বিষয়সমূহের এই অবস্থায় উপনীত হবার এক ভ্রান্ত প্রয়াস; ভ্রান্ত বলা হ'ল এই কারণে যে ইহা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়কে যুক্ত করে––অব্যক্তের অবস্থা এবং হিরণ্যগর্ভের দ্বারা অধিষ্ঠিত ইহার পরবর্তী অবস্থা।

এখন প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে অব্যক্ত অবস্থায় পরব্রহ্মের প্রত্যক্‌বৃত্ত দিক কি? জৈবনিক থেকে বিভিন্ন যন্ত্র ও গঠন বিকশিত হ'য়েছে এবং ইথার থেকে বিভিন্ন রূপ বিকশিত হ'য়েছে এমন এক শক্তির দ্বারা যা তাদের মধ্যে অবস্থান করে ও কাজ করে আর ঐ শক্তি নিশ্চয়ই অব্যক্ত বুদ্ধি-সম্পন্ন চেতনা হবে; নিশ্চয়ই, এই কারণে যে স্পষ্টতঃই ইহা এমন এক শক্তি যা লক্ষ্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন করতে, বিন্যাস করতে ও উপযোগী করতে সক্ষম; নিশ্চয়ই এই কারণে যে অন্যথায় সূক্ষ্মের মধ্যে স্থূল নিবর্তিত থাকার বিধান চলে না। যদি জড়ই সব হয় তাহ'লে জড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থূল সূক্ষ্ম অপেক্ষা আরো অনুভবযোগ্য হওয়ায় সূক্ষ্মের চেয়ে আরো সৎ এবং অসৎ কখন সদ্‌বস্তু বিকশিত করতে পারে না; ইহা বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনা আর আমরা অন্য কিছুর কথা জানি না যা শুধু যে একই সময় স্থূল ও সূক্ষ্মকে ধারণ করতে সক্ষম তা নয়, বরং যা আবার অস্পষ্টতা থেকে নির্দিষ্টতা, অরূপ থেকে রূপ, ও সরল রূপ থেকে জটিল রূপ সৃষ্টি করার বা বিকশিত করার পদ্ধতি বিষয়ে সু-সঙ্গতভাবে অগ্রসর হয়। যদি বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির কোন অর্থ হয়, সেগুলি যদি বিশৃঙ্খলা, ভ্রান্তি বা মিথ্যা কল্পনা না হয় তাহ'লে তাদের শুধু এই অর্থ হ'তে পারে যে এক বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনা সকল বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান ও কর্মরত। সুতরাং পরব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থাতেও প্রত্যকবৃত্তভাবে বিদ্যমান ঠিক যেমন ইহা অন্য সব অবস্থাতেও বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনারূপে ও সেজন্য আনন্দরূপে বিদ্যমান।

বাকী সব অবস্থার জন্য আমাদের বাধ্য হ'য়ে রূপক ব্যবহার করতে হয় আর যেহেতু রূপক ব্যবহার করতেই হয় তখন একটিও যা অন্যটিও তা কারণ কোনটিই সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। তাহ'লে কল্পনা করা যাক

যে পরব্রহ্ম একটি ডিম্ব; পুরাণের স্বর্ণময় ডিম্ব যা অবিশেষিত অস্তিত্বের জলরাশিতে পূর্ণ এবং যা দুটি অর্ধে বিভক্ত––পর বা জ্যোতির্ময় অর্ধ যা প্রত্যক্‌বৃত্ত ভাবনার উচ্চ জলরাশিতে পূর্ণ এবং অপর বা তিমিরাচ্ছন্ন অর্ধ যাতে আছে পরাক্‌বৃত্ত ভাবনার নিম্ন জলরাশি। পরার্ধে পুরুষ প্রচ্ছন্ন থাকেন বিষয়সমূহের প্রয়োজন কারণরূপে; এইখানেই অবিশেষিত, সনাতন, অনন্ত, বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষের ভাবনা গঠিত হয়। অপরার্ধে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন প্রকৃতি রূপে, বিষয়সমূহের উপাদান কারণরূপে; এখানেই গঠিত হয় অবিশেষিত, সনাতন, অনন্ত, বিশ্বময় জড়ের ভাবনা এবং ইহার আনন্ত্যের মধ্যে নিগূহিত থাকে কাল, দেশ, ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ। পৌরাণিক চিত্রে ইহাকেই দেখান হয় যেন বিষ্ণু কারণ-সমুদ্রের উপর অনন্ত নাগের ফণার উপর আসীন রয়েছেন আর এই নাগের অনন্ত ভাঁজগুলি হ'ল কাল এবং সেই সঙ্গে দেশ ও কার্যকারণসম্বন্ধও কারণ এই তিনটি মূলতঃ এক––ইহারা এক ত্রিত্ব। পরার্ধে পরব্রহ্ম এখনো সম্পূর্ণ স্বরূপ অবস্থায় তবে তাঁর দুই মুখ––একটি দিকে তিনি যা সেই অনপেক্ষ সদ্‌বস্তুর চিন্তায় রত, অন্যদিকে তিনি ভাবছেন মায়ার কথা, দেখছেন ইহার সব কাজের অন্তহীন শ্রেণী তবে তখনো সদ্‌বস্তু হিসাবে নয়, বরং এক ছায়াবাজি হিসাবে। একটি দুঃসাহসিক রূপক ব্যবহার করা গেলে বলা যায় যে অপরার্ধে পরব্রহ্ম নিজেকে ভুলে যান। তিনি প্রত্যক্‌বৃত্ত ভাবে এমন সুষুপ্তি বা সমাধির অনুরূপ অবস্থায় আছেন যা থেকে মানুষ জেগে উঠলে সে শুধু উপলব্ধি করতে পারে যে সে ছিল এবং সীমাবদ্ধতার সম্পূর্ণ অভাবজনিত আনন্দের অবস্থায় ছিল; আর সেই অবস্থায় সে যে সচেতন ছিল তা বোঝা যায় তার আনন্দপূর্ণ অস্তিত্বের উপলব্ধি থেকে, কিন্তু এই চেতনা তার উপলব্ধির অংশ নয়। চেতনার এই প্রচ্ছন্নতা বিষয়সমূহের বীজাবস্থার বৈশিষ্ট্য আর যখন বলা হয় যে পরব্রহ্ম জড়ের মধ্যে প্রকৃতিরূপে প্রবিষ্ট হ'য়ে নিজেকে ভুলে যান তখন তার অর্থ ইহাই।

এরূপ এক অবস্থার কোন বিশেষ সংবাদ আমরা পেতে পারি না, চেতনার উপলব্ধিগুলি আমাদের কাছে ফিরে আসে না। যোগী এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যায় সনাতনের কাছে যাবার পথে, কিন্তু সে তার লক্ষ্যে দ্রুত চলে যায়, এখানে বিলম্ব করে না; শুধু তাই নয়, এক সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত এই পর্যায়ের মধ্যে সমাপত্তিকে বড় বেশী ভয় করা হয়;

কারণ যদি অন্তঃপুরুষ ঐ অবস্থায় চূড়ান্তভাবে দেহ পরিত্যাগ করে তাহ'লে তাকে বাধ্য হয়ে বিবর্তনের চক্র পুনর্বার শুরু থেকে আরম্ভ করতে হয়; কেননা অন্তঃপুরুষ নিজেকে বিষয়সমূহের বীজাবস্থার সহিত একাত্ম করায় তাকে অব্যক্তের সেই প্রকৃতি অনুসরণ করতে হবে যার কাজ হ'ল বিশ্বময় অভিব্যক্তির নিয়মিত ক্রমের দ্বারা বিবর্তনের গতিপথে যাত্রা করা। এই সমাপত্তিকে বলা হয় প্রকৃতিলয় অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে সমাপত্তি। যোগী এই সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান বা অবিদ্যার অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে বহু শতাব্দী ধরে সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু যদি দৈবাৎ তার দেহ সংরক্ষিত হয় আর সে তাতে ফিরে আসে তাহ'লে সে অব্যক্তের এই দিকে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছুই ফিরে আনে না।

অব্যক্ত পুরুষ অবস্থায় পরব্রহ্মকে বলা হয় 'প্রাজ্ঞ', অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা', শাশ্বত জ্ঞান বা পরিণামদর্শিতার অধিপতি, কারণ মহাকবি যেমন তার মনের মধ্যে এক চমৎকার উৎকৃষ্ট রচনার পরিকল্পনা করে তেমন তিনিও তাঁর নিজের সম্মুখে অস্তিত্বের সনাতন বিধিসমূহের ও বিভিন্ন জগতের অন্তহীন শ্রেণীর বিন্যাস ও ব্যবস্থা করেন। এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায়, প্রথমটি নিশ্চল ও শান্ত যদিও সর্বগ্রাহী, পরেরটি তখনো সক্রিয় কর্মে ব্যাপৃত নয়, 'অন্ধকার আসুক' এই আদেশের অপেক্ষায় অবস্থিত। আর তারপর আসে তমসার আবরণ, মনে হয় বিদ্যা স্তিমিত হ'য়েছে আর সাম্যাবস্থার বিক্ষোভের ফলে আসে অসমতা; তখন তমসার মধ্য থেকে শাশ্বত প্রজ্ঞা নির্ঝরিত হয় তার সৃষ্টির কার্যে আর জন্ম নেয় হিরণ্যগর্ভ, হিরন্ময় কুমার।

উপনিষদ্ অনুবাদ করা সম্বন্ধে

উপনিষদ্ অনুবাদ করা সম্বন্ধে

'ভগবদ্-গ্রন্থ'—এই শিরোনামায় এখন যে অল্পসংখ্যক অপেক্ষাকৃত সরল ও স্পষ্টার্থক উপনিষদের অনুবাদ করা হচ্ছে এবং ইহার পর শ্রুতির অন্তর্গত নয় এমন সব হিন্দুদের অন্যান্য পবিত্র ও দার্শনিক লেখার অনুবাদ করা হবে তার একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নীতি আছে। এই নীতি হ'ল ইংল্যাণ্ডের কাছে এবং ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমে ইওরোপের কাছে ভারতবর্ষের ধর্মের বাণী উপস্থিত করা, তবে তা হবে তার লিখিত ভাবনার শুধু সেই সব অংশে যাসব শোনার জন্য প্রতীচী যোগ্য; আর ইহাদের এমন এক আকারে উপস্থিত করা হবে যা পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধির কাছে আকর্ষণীয় ও ইঙ্গিতবহ। এই নীতির প্রথম অংশের জন্য যে নির্বাচন আবশ্যক হ'য়েছে তা কঠোরভাবে এক নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী করা হয়েছে; আর দ্বিতীয় অংশের জন্য অনুবাদের এমন এক শৈলী ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে যা আক্ষরিক হওয়ার পরিবর্তে বরং সাহিত্যিক।

স্বর্গত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সম্পাদনায় "প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলী" (Sacred Books of the East) নামক অনুবাদমালা সম্পন্ন হ'য়েছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও এক বিশেষ প্রকারের মনোভাব নিয়ে। অধ্যাপক ম্যাক্স-মুলার একজন প্রভূত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, সর্ব বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী উৎসাহী ও কর্মঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উদ্ভাবনক্ষম ও বল্গাহীন এবং বৈদিক অধ্যয়নের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য তিনি ভারতবর্ষে প্রভূত সম্মান লাভ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে একথা স্বীকার করা চাই যে তিনি প্রগাঢ় সংস্কৃত পণ্ডিত অপেক্ষা বরং বেশী ছিলেন বৈয়া-করণিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ। তিনি বেশ ভালভাবেই সংস্কৃতের অর্থ প্রকাশ করতে পারতেন কিন্তু তিনি ভাষার নাড়ী বুঝতে অথবা শব্দের পশ্চাতে তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেজন্য তাঁর বিচারে দুটি ভীষণ ভুল হ'য়েছিল; তিনি ভেবেছিলেন যে অক্সফোর্ডে বসে এবং নিজের দীপ্ত কল্পনাবলে নতুন অর্থ বাহির করে শঙ্করাচার্য বা অন্য কোন হিন্দু মেধাবী পণ্ডিত অপেক্ষা তিনি উপনিষদের অর্থ গ্রহণ করতে বেশী সক্ষম; আর

তিনি আরো ভেবেছিলেন যে তিনি ও অন্যান্য ইওরোপীয় পণ্ডিতরা উপ-নিষদের যে অর্থ হওয়া উচিত বিবেচনা করতেন উপনিষদ সম্বন্ধে ইও-রোপের তা-ই জানাই দরকার। কিন্তু পণ্ডিতদের নিজেদের নিকট ছাড়া অন্যদের নিকট ইহার কোন গুরুত্ব নেই। ইওরোপের পক্ষে কি জানা প্রকৃতই দরকার তা প্রথমতঃ এই যে উপনিষদগুলির প্রকৃত অর্থ কি,— অবশ্য যতদূর তাদের প্রকাশ্য শিক্ষায় জানা যায় এবং কিছু কম পরিমাণে হিন্দু দার্শনিকরা ইহাদের কি অর্থ করত। এই শেষ বিষয় জানা যায় শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য দার্শনিকদের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে যেগুলির মূলগ্রন্থ বা অনুবাদ পড়া যেতে পারে আর এই সব গ্রন্থ প্রকৃতই বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য ও উচ্চমনা উদ্যমের সহিত দ্রাবিড় অঞ্চল থেকে বাহির হ'চ্ছে যদিও এই অঞ্চলকে জড়বাদীরা অজ্ঞানবশে তমসাচ্ছন্ন বলে অভিহিত করে। প্রথম বিষয়টি বোঝাবার জন্য এই গ্রন্থে কিছু চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, শুধু এই বিশেষ কতকগুলি উপনিষদ কেন, যখন অন্য অনেক উপনিষদ আছে যেগুলির পরিকল্পনা আরো বৃহৎ ও গুরুত্ব কম নয়? উত্তরে আমি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের "প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলীর" মুখবন্ধ থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করব। তিনি বলেন, "আমি স্বীকার করি যে বহু বৎসর ধরে আমার কাছে ইহা এক সমস্যা ছিল এবং এখনও অনেক পরিমাণে সেইরূপই রয়েছে যে প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থাবলীতে কেমন করে একদিকে অত সব সতেজ, স্বাভাবিক, সরল, সুন্দর ও সত্য বিষয় থাকে আবার তার পাশে অতসব থাকে যা শুধু যে অর্থহীন, কৃত্রিম ও নির্বোধোচিত তা নয়, যা এমন কি বিকট ও জঘন্য।" আমি নিজে শুধু এক দীন স্থূলমনা প্রাচ্য এবং সেজন্য জীবন ও প্রকৃতির স্থূল ভৌতিক সব তথ্য অস্বীকার করতে ইচ্ছুক নই অথবা কেন আমি সে সবকে দৃষ্টির বহির্ভূত করে এমন এক পরিচ্ছন্ন সম্ভ্রান্ত ভাব গ্রহণ করব যাতে তাদের অস্তিত্ব গোপন রাখার ইচ্ছা সত্ত্বেও বোঝা যায় তাও আমি বুঝতে পারি না; হয়ত এই জন্যই আমি বুঝতে পারি না যে অধ্যাপক উপনিষদে এমন কি পেয়েছিলেন যা বিকট ও জঘন্য। তবু আমি প্রায় শৈশব থেকেই ইংল্যাণ্ডে লালিত হ'য়েছিলাম, ইংরাজী শিক্ষাই লাভ করেছি আর সেজন্য আমি সামান্য আলো পেয়েছি। কিন্তু অর্থহীন, কৃত্রিম ও নির্বোধোচিত অংশ বলতে তিনি কি মনে করেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। উপনিষদে যা কিছু ইওরোপীয়রা বুঝতে অক্ষম তা-ই

অর্থহীন, যা কিছু তাদের মানসিক অভিজ্ঞতার এলাকার বহির্ভূত তা-ই কৃত্রিম, যা কিছু ইওরোপীয় বিজ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না তা-ই নির্বোধোচিত। ইওরোপীয়ের পক্ষে এরূপ এক মনোভাব প্রায় অবশ্যম্ভাবী কারণ আমরা সবাই বিচার করি আমাদের আলো অনুযায়ী, আর সব জাতিরই মধ্যে এরূপ লোক খুবই কম যারা সত্যই তাদের মন খোলা রাখে, যারা উপলব্ধি করতে পারে যে এমন সব আলো আছে যা তাদের নয় অথচ তাদেরই মত সমান দীপ্তিকর এমন কি তাদের চেয়ে বেশী দীপ্তিকর। অধিকাংশ লোকই তাদের পারিপার্শ্বিকের দাস।

মনে করা যাক যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্রিয়া ও পূজা শুধুই এমন সব ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ছিল না যেগুলির অধিকাংশই না বুঝে প্রাচ্য রহস্যানুষ্ঠান থেকে নেওয়া হয়েছিল; ইহাদের এমনভাবে আয়োজন করা হ'ত যাতে তারা কতকগুলি গভীর তাত্ত্বিক সত্যের সুষ্ঠু প্রতীক হ'তে পারে এবং মন ও জড়, উভয়েরই উপর শব্দের শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও জড়ীয় ফল উৎপাদন করতে পারে; মনে করা যাক এই সব প্রতীকের সংজ্ঞায় এবং প্রায়ই প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় গভীর দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল; সর্বশেষ আরো মনে করা যাক যে এই সব গ্রন্থকে বাংলা বা হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদ করে এমন একজন শিক্ষিত পণ্ডিতের কাছে দেওয়া হল যে নদীয়া বা বারাণসীতে অধ্যয়ন করেছে; সে এই সবের কি অর্থ করবে? একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত লওয়াই ভাল। যীশুখৃষ্ট এক মহান মনস্বী ছিলেন--এমন একজন ব্যক্তি যিনি মনে হয়, যদিও এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না, নিজের শক্তিবলে অন্য কাহারও সাহায্য বিনা কিছু দিব্যজ্ঞান পেয়েছিলেন; কিন্তু যেসব লেখক তাঁর কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছিল তাদের অধিকাংশই সাধারণ লোক ছিল, তাদের সংস্কৃতি ও চিন্তার পরিধি অতীব সংকীর্ণ ছিল আর মনে হয় তারা তাঁর সর্বাপেক্ষা গূঢ় কথাগুলিকে নিতান্তই ভুল বুঝেছিল। যেমন, তিনি যে বলেছিলেন, "আমি ও আমার পিতা এক", তাতে এই গভীর সত্য প্রকাশিত হ'য়েছিল যে মানবাত্মা ও ভাগবত আত্মা অভিন্ন, কিন্তু তারা ভেবেছিল যে তিনি এই দাবী করেছিলেন যে তিনি ভগবান; আর এই জন্যই কুমারী মেরী ও তা থেকে অন্য সব বিষয়ের অলৌকিক উপাখ্যান এসেছে। আমরা সকলেই শেষ নৈশভোজের কাহিনী জানি এবং রুটী ভেঙে শিষ্যদের মধ্য

বিতরণের সময় তিনি যে অত্যাশ্চর্যজনক অর্থগর্ভ উক্তি করেছিলেন, "ইহা আমার দেহ ও ইহা আমার রক্ত", তা-ও আমরা জানি; এবং যীশুর প্রাণদানস্মারক ভোজের (Eucharist) যে প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান এবং ইহার উপর রোমান কাথলিক সম্প্রদায় যে "যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের (Transubstantiation) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল তা-ও জানি। বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান (Protestant) তারস্বরে বলে, "কদর্য! কুসংস্কার! ঈশ্বরের নিন্দাপূর্ণ প্রলাপ! ইহা শুধু এক জ্বলন্ত প্রাচ্য রূপক, তার বেশী কিছু নয়।" তা সত্য হ'লে, ইহা নিশ্চয়ই "অর্থ-হীন, কৃত্রিম ও নির্বোধোচিত" রূপক এমন কি "বিকট ও জঘন্য" রূপক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই যে যীশুর কথার সর্বদাই এক অর্থ ছিল আর সাধারণতঃই সে অর্থ সত্য ও সুন্দর। অপরপক্ষে "যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের" তত্ত্বটি ক্যাথলিকরা নিজেরাই বোঝে না, তাদের কাছে ইহা এক "রহস্য"। কিন্তু প্রাচ্য বুদ্ধির কাছে ইহার অর্থ কত সরল! জড়ের জৈবনিক, বিশ্বের অন্নকোষ যার অন্তর্গত হ'ল রুটি ও মদ্য পরিণত হয় ভগবানের রক্ত ও দেহে আর ইহাতে সেই আদি মহান্ যজ্ঞ সূচিত হয় যার দ্বারা ভগবান নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন যাতে জগৎ বাঁচতে পারে। অনন্তকে সান্ত হ'তে হবে, নিরুপাধিককে নিজেকে উপাধিযুক্ত করতে হবে, চিৎ-পুরুষকে বিকশিত করতে হবে জড়। যে রুটি ও মদ্য খৃষ্টের খাদ্যগ্রাহক খায় তার মধ্যে ভগবান সত্যই আছেন কিন্তু তিনি আমাদের চেতনায় উপস্থিত নন, আর বিশ্বাসের ঐ ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি শুধু ঐরূপ উপস্থিত হন (এখানে আমাদের চেতনার কাছে); ইহাই "যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের" তত্ত্বের সমগ্র অর্থ। কেননা, যেমন উপ-নিষদ বলে, আমাদের প্রথম ভগবানে বিশ্বাস করা চাই তবে যদি আমরা পরে তাঁকে জানতে পারি; প্রথমে তাঁকে উপলব্ধি করা চাই "তিনি আছেন" বলে, তবেই তাঁকে স্বরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আর বাস্তবিকই যদি শিশু তার শিক্ষক বা পুস্তকের কথায় না বিশ্বাস করত তাহ'লে প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি কেমন করে কিছু জানবে? কিন্তু যদি "যীশুর প্রাণদানস্মারক" অনুষ্ঠানের উপর একটি গভীর দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করা হয় আর তাতে বিভিন্ন মহান্ সত্যের ইঙ্গিত থাকে কিন্তু তাতে সর্বদাই রুটি ও মদ্যের প্রতীক ব্যবহার করা হয় আর এই প্রতীক থেকে এবং এই প্রতীকের উপর প্রতিষ্ঠিত "যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের" তত্ত্ব থেকে গ্রন্থের পরিভাষা

করা হয় তাহ'লে আমাদের হিন্দু পণ্ডিত তার কি বুঝবে? কিন্তু পণ্ডিত ও দার্শনিক হওয়ায় সে নিশ্চয়ই সেখানে এমন অনেক কিছু পাবে যা "সতেজ, স্বাভাবিক, সুন্দর ও সত্য" কিন্তু আবার অন্য অনেক কিছুও পাবে যা "অর্থহীন, কৃত্রিম ও নির্বোধোচিত" এবং তার নিরামিষাশী কল্পনার কাছে "এমন কি বিকট ও জঘন্য।" আর এই প্রতীক ব্যবহারের ফলে এই বেচারী নিরামিষাশীর হয়ত বমন শুরু হবে। বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান বলে, "কি বিকট প্রলাপ, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা ভগবানকে খাচ্ছি!" এরূপ লোক কেমন করে তাঁর সম্বন্ধে জানবে যে তিনি কোথায় অধিষ্ঠিত?

সেইরূপ, অনেক উপনিষদই বিভিন্ন প্রতীককে কেন্দ্র ক'রে লেখা হ'য়েছে আর তাতে এমন সব কথা ও উপমা ব্যবহার করা হ'য়েছে যা সবের গভীর অর্থ আছে অথবা এক সময় ছিল আর হিন্দুদের কাছে সে সবে এক পবিত্রতার পরিবেশ আছে কিন্তু যে কোন ইওরোপীয়ের কাছে সে সব অবোধ্য ও জঘন্য হ'তে বাধ্য। সুতরাং ছান্দোগ্য বা ঐতরেয় উপনিষদের মতো যেসব গ্রন্থে প্রতীকের অর্থ ভেদ করে তার অন্তর্নিহিত সত্য বোঝা অধিকাংশ হিন্দুর পক্ষেই দুরূহ অথবা অসম্ভব সেসব গ্রন্থ ইওরোপের সম্মুখে উপস্থিত করে কি লাভ? শুধু সেই কটি উপনিষদ নির্বাচন করা হ'য়েছে যাতে বিষয়ের সার দেওয়া আছে সর্বাপেক্ষা কম সাংকেতিক ও বেশী কবিত্বময় রূপে; শুধু একটি ব্যতিক্রম হ'ল প্রশ্নোপ-নিষদ্ যা সেজন্য ইওরোপীয় মনের কাছে অদ্ভুত লাগবে ও সম্পূর্ণ বোধ-গম্য হবে না। কিন্তু এই কারণে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হ'ল যে তবেই উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের প্রধান ভাবনাগুলি ও কিছু বিস্তারিত তথ্য সম্যক্‌ভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব; তাছাড়া ইহার যে সাংকেতিক অংশ তা ছান্দোগ্য ও ঐতরেয়ের অনুরূপ অংশ অপেক্ষা আরো বেশী সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

অনুবাদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'য়েছে তাতে এক আপত্তি করা যেতে পারে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার যে অনুবাদ করেছিলেন তাতে আত্মা ও প্রাণের মতো যেসব আর্য দার্শনিক সংজ্ঞার অনুরূপ কোন দার্শনিক ধারণা পাশ্চাত্যের পরিচিত নয় তাদের অর্থের সঠিক বৈশিষ্ট্য ইংরাজীতে প্রকাশ করার কোন চেষ্টা করা হয় নি; তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইহাদের অনুবাদের কাজে সংজ্ঞাগুলি যে অতীব অপরিচিত তাতেই বলদায়ক

ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়ার মতো মনের উপর কাজ হ'য়ে তাকে জাগিয়ে তুলে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে অধ্যাপক ভুল করেছিলেন; শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) মতো নির্ভীক দার্শনিক বুদ্ধিমানদের বেলায় অথবা যারা সংস্কৃত ভাষার সহিত ইতি-পূর্বেই কিছু পরিচিত তাদের বেলায় অধ্যাপকের কথা সত্য হ'তে পারে কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত ও অব্যাখ্যাত সংজ্ঞাগুলি উঁচু ও ঘন কাঁটাগাছের বেড়া তৈরী করে তাকে উপনিষদের গৌরবময় প্রাসাদ ও সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করতে নিরস্ত করবে। উপরন্তু পণ্ডিতসুলভ আক্ষরিক যাথার্থ্যের ফলে অনুবাদের শৈলী অসহনীয়ভাবে কুৎসিৎ ও এই সব মহৎ ধর্মীয় কবিতার অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। আমি বলি না যে এই অনুবাদও তাদের যোগ্য হ'য়েছে কারণ সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ মহিমা ও সৌন্দর্য সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এবং তাদের বিভিন্ন ক্রমও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কঠোপ-নিষদের যে "এতদ্ বৈ তৎ" ধুয়াটি আছে, সংস্কৃতে তার এক গভীর ও উদাত্ত ঝঙ্কার আছে কারণ 'এতদ্' ও 'তৎ' ঐরূপভাবে ব্যবহৃত হ'লে সংস্কৃতে তাদের যে গভীর ও মহিমময় দার্শনিক তাৎপর্য থাকে যা সকলে তখনই অনুভব করে; কিন্তু ইংরাজীতে ইহার যে অনুবাদ "ইহা সত্যই তাহা" তা শুধু সর্বনাম নিয়ে ধাঁধাঁ লাগান ছাড়া কিছু নয়; ইহার যে অনুবাদ "ইনিই তোমার অন্বেষণের ভগবান" তা যতই অপ্রচুর হ'ক তাতে ছন্দ ও অর্থ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

অবশ্য এ কথা ন্যায়তঃ বলা চলে যে এরূপ এক অনুবাদে অর্থের কোন সঠিক ও যথার্থ ভাবনা দেওয়া সম্ভব নয়। "প্রাণ" পদটিকে কখন 'life' বলে, কখন 'breath' বলে, কখন 'life-breath' বা 'breath of life' বলে অনুবাদ করা বিভ্রান্তিকর হবে কারণ 'breath' (শ্বাসবায়ু) ও 'life' (প্রাণ) 'প্রাণে'র গৌণ দিক মাত্র। আবার যদি 'আত্মন্'কে ইচ্ছামতো 'soul', 'spirit' ও 'self' বলে অনুবাদ করা হয় তাতেও বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য কারণ পাশ্চাত্য যাকে 'soul' বলে তা বস্তুতঃ মন ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মা, আর 'spirit' কথাটি এমন যার অর্থের তারতম্য হয় এবং প্রায়ই 'soul' কথাটির সমার্থক; এমন কি 'self' কথাটিও ঐভাবে ইংরাজীতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা চলে না। আবার, 'অমৃতত্ব' সম্বন্ধে হিন্দুভাবনা ইওরোপীয় ভাবনা থেকে ভিন্ন;

ইহার অর্থ 'মৃত্যুর পর জীবন' নয়, ইহার অর্থ জীবন ও মৃত্যু থেকে মুক্তি; কারণ যাকে আমরা জীবন বলি তা মৃত্যু ব্যতীত অসম্ভব। সেই-রূপ, 'পুরুষের' অনুবাদ 'Being' অথবা 'রয়ি'র অনুবাদ 'matter' অথবা 'তপঃ'র অনুবাদ 'askesis' এমন যাতে তাদের সমগ্র ভাবনা প্রকাশিত হয় না। কিছু পরিমাণে এই সব স্বীকার করতে হবে কিন্তু সেই সাথে একথাও আমার মনে হয় যে, যে পাঠক চিন্তা ও অনুভব করতে সক্ষম সে এই সবের দ্বারা গুরুতরভাবে বিভ্রান্ত হবে না, আর যাই হ'ক সংস্কৃত পদগুলি অপেক্ষা তাদের অসম্পূর্ণ ইংরাজী প্রতিশব্দে তাদের অর্থ সে বেশী বুঝতে পারবে কারণ সংস্কৃত পদগুলি তার বুদ্ধির কাছে অর্থহীন শূন্য মনে হবে। মানুষের মন চায়, আর এই চাওয়া ন্যায়সঙ্গত, যে নতুন ভাবনাগুলি তার কাছে এমন সব পদে উপস্থিত করা হবে যা তার কাছে সেই পরিবেশ আনে যাতে সে মনে করবে না যে সে এক অপরিচিত দেশে বিদেশী আর কেহই তার ভাষা বোঝে না আর সে-ও তাদের ভাষা বোঝে না। তার কাছে নতুন ভাবনা আনা চাই পুরানো পদের মাধ্যমে; কিছু পরিমাণে পুরানো বোতলেই নতুন মদ রাখা চাই। সংস্কৃতে 'পরব্রহ্ম' সম্বন্ধে সাধারণতঃ ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয় ব'লে--যদিও মনে রাখতে হবে যে সর্বদাই তা করা হয় না--ভগবান কথাটি ব্যবহার না করে তাঁকে সর্বদাই 'It' (ইহা) বলে উল্লেখ করায় কি লাভ? সংস্কৃতে যে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয় তা শুধু অচেতন বিষয় সম্বন্ধে নয়, যা লিঙ্গের নিম্নে শুধু তার সম্বন্ধে নয়, এমন কি যা লিঙ্গের ঊর্ধ্বে তার সম্বন্ধেও ইহা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইংরাজীতে তা নয়। সুতরাং 'ভগবান' (God) ও সর্বনাম 'তিনি' (He) কথাগুলি ব্যবহার না ক'রে শুধু 'ইহা' (It) ব্যবহার করলে মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। যখন ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold) বলেছিলেন ভগবান হ'লেন ন্যায়-ধর্মের অভিমুখে প্রবণতার ধারা তখন লোকে তাকে উপহাস করেছিল কারণ মনে হ'য়েছিল যে তিনি ভগবানকে এক অচেতন শক্তিতে পরিণত করেছেন; কিন্তু একথা ঠিক যে তা আর্নল্ডের অর্থ নয়। অপর পক্ষে যদি নতুন ভাবনা শক্তি ও বলের সহিত উপস্থিত করা হয় তাহ'লে একজন বুদ্ধিমান পাঠক শীঘ্রই বুঝবে যে 'ভগবান' (God) পদটিতে সে যেসব ভাবনা যুক্ত করে তা থেকে ভিন্ন কিছু বলা হচ্ছে। আর এদিকে আমাদেরও এই স্পষ্ট লাভ হয় যে সে গোড়াতেই এমন কিছু থেকে

আঘাত পায়নি যা তার কাছে স্বভাবতঃই মনে হবে অদ্ভুত, ঘৃণাজনক বা অশ্রদ্ধেয়।

অবশ্য একথা সত্য যে এই অনুবাদ থেকে উপনিষদগুলির অন্তর্নিহিত সব সত্য সম্বন্ধে সঠিক, সম্পূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যাবে না। এরূপ জ্ঞান আনা এই অনুবাদের উদ্দেশ্য নয়, আর উপনিষদগুলিরও সেই উদ্দেশ্য নয়। ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই মহান্ গ্রন্থগুলি শুধু পরতর জ্ঞানে প্রবেশের দ্বার; দ্বারের পিছনে অনেক কিছু বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই বলেছেন যে যেমন চারিদিকে প্রবল বন্যার জল থাকলেও কূপের জলই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট, তেমন যে পবিত্রমনা ব্যক্তি ভগবানকে জানতে সক্ষম তার পক্ষে বেদের জ্ঞানই যথেষ্ট। কিন্তু সাধারণ লোকের বেলায় তা খাটে না। জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানকে পেতে ইচ্ছুক সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল আয়াসসাধ্য শিক্ষা গ্রহণ করা। তার প্রথম কর্তব্য হ'ল একান্তই পবিত্র হওয়া, তার দেহ, হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা চাই, নতুন হৃদয় নিয়ে পুনর্জন্ম লওয়া চাই; কারণ একমাত্র দ্বিজরাই বেদ বুঝতে বা শিক্ষা দিতে সক্ষম। ইহা করা হ'লে, সাফল্যের জন্য তার আরো চারটি জিনিস দরকার,—শ্রুতি অর্থাৎ লিপিবদ্ধ দিব্যপ্রকাশ, পবিত্র আচার্য, যোগসাধনা ও ভগবদ্‌কৃপা। শ্রুতির এবং বিশেষ করে উপনিষদগুলির কাজ হ'ল মনকে ধরে তাকে একটি যাদুময় পরিবেশের মধ্যে আনা, ইহাকে ভগবানের (ব্রহ্মের প্রতি) ভাবনায় ও আস্পৃহায় অভ্যস্ত করা, কতকগুলি ভাবনায় ইহাকে অভিষিক্ত করা এবং ইহাকে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল দিয়ে বেষ্টন করা; এই উদ্দেশ্যে ইহা মনকে এমন সব অত্যাশ্চর্য শব্দের সমুদ্রের মধ্যে বারবার ডুবিয়ে আবর্তিত করে যে তার মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণীর সহচারী ভাবনা নিরন্তর আবর্তিত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তি, কর্ণ ও কল্পনার মাধ্যমে ইহা অন্তঃপুরুষে ঝঙ্কার তোলে। সুতরাং অনুবাদের দ্বারা উপনিষদের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়; বড় জোর অনুবাদ তাকে মূলগ্রন্থের জন্য প্রস্তুত করে ও সেই দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন সে মূলগ্রন্থের মধ্যেও নিমজ্জিত হ'য়ে যায় তখন সে উপনিষদ যা আভাসে বলেছে তা বুঝে থাকলেও, সে ইহার সেই নিহিতার্থ, ইহার পিছনে অবস্থিত সেই প্রভূত পরিমাণ ধর্মীয় সত্য যার শুধু এক ইঙ্গিত বা প্রতিধ্বনি হ'ল উপনিষদ তা বোঝেনি। "জাগ্রত হও, উত্তিষ্ঠ হও, জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সন্ধান

ক'রে ভগবানের সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ কর।" আজকালকার দিনে শ্রেষ্ঠ পুরুষের সন্ধান পাওয়া কষ্টকর, কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমাদের কাছে আসেন না, তাঁদের অন্বেষণ করে আমাদের দেখাতে হবে আমাদের অকপটতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়। আর আচার্যের কাছ থেকে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শোনার পরও আমরা ভগবান সম্বন্ধে জানি শুধু কথায়; কোন গুরুর কাছ থেকে আমাদের আরো শিখতে হবে ভগবান সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাঁর দর্শন ও তাঁর প্রাপ্তি; ইহাই যোগ এবং যোগের লক্ষ্য। আবার ইহাতেও সফল হওয়া সম্ভব নয় যদি না আমরা পাই ভগবানের কৃপা; কারণ যোগের পথ সমাকীর্ণ বিভিন্ন প্রলোভনের দ্বারা আর যেসব শক্তি আমরা যোগে পাই সেসব কম প্রলোভন নয়, এই সব শক্তিকেই নির্বোধরা বলে অলৌকিক। "সুতরাং যোগের জন্য সাতিশয় সতর্ক হ'তে হবে কারণ যেমন ইহার আরম্ভ আছে, তেমন ইহার শেষ আছে।" শুধু ভগবদ্‌কৃপাই আমাদের দৃঢ় রাখে এবং প্রলোভন জয় করতে সাহায্য করে। "আত্মাকে লাভ করা যায় না" ইত্যাদি—বিজয়ী আত্ম-কর্তৃত্বের আশীর্বাদ যা আসে অন্তঃপুরুষের অনুভূতির দীর্ঘ ও ধীর সঞ্চয় থেকে। উপনিষদ ঠিকই বলে, "ক্ষুরের ধারের মতো নিশিত এই পথ, এপথে চলা দুরূহ ও কষ্টকর;—এই কথাই ঋষিরা বলেন।" সৌভাগ্যক্রমে, একটিমাত্র জীবনে সমগ্র পথ পরিক্রম করার প্রয়োজন নেই, আর বস্তুতঃ তা সম্ভবও নয়; তাছাড়া বুদ্ধের মতো প্রাত্যহিক কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে আমরা পর্বতে বা অরণ্যে পলায়ন করতে পারি না, আর তা করাও উচিত নয়। আরম্ভ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশোপনিষদ

ঈশোপনিষদ

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥১

১। এই সবই ঈশ্বরের আবাসের[১] জন্য নির্দিষ্ট---বিশ্বজগতে এই যা কিছু ব্যষ্টিগতির জগৎ আছে সে সবই। সে সবের ত্যাগের দ্বারা তোমার ভোগ করা উচিত, কোনও লোকের ধন আকাঙ্ক্ষা ক'রো না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথাতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥২

২। ইহজগতে কর্ম করেই[২] শতবর্ষ জীবিত থাকতে চাওয়া উচিত। তোমার পক্ষে এই হল বিধান, এছাড়া আর কিছুই নয়; মানুষে কর্ম সংসক্ত হয় না।[৩]

(১) 'বাস্যং' শব্দের তিনটি অর্থ সম্ভব: 'পরিহিত হওয়া,' 'বস্ত্ররূপে পরিধান করা', 'আবাসস্থান হওয়া'। প্রথম অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন, শুদ্ধ ব্রহ্মের একমাত্র প্রতীতিতে এই অবাস্তব স্থূল বিশ্বের বোধ আমাদের হারিয়ে ফেলতে হবে। এ ব্যাখ্যাতে এই প্রথম শ্লোকার্ধ উপনিষদের সমগ্র ভাবধারার বিরোধী হয়; কারণ এ উপনিষদের শিক্ষা হল, স্বরূপ একত্ববোধের দ্বারা আপাতবিরুদ্ধ সব দ্বৈতের সমন্বয় করা:---ঈশ্বর ও বিশ্ব, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও আন্তর মুক্তি, এক ও বহু, সত্তা ও তার সব সম্ভূতি, ভব ও ভাব, নিষ্ক্রিয় দিব্য নির্ব্যক্তিকতা ও সক্রিয় দিব্য ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি, পৃথিবীতে এবং তার ওপারে জীবনধারণ ও পরম অমরত্ব,---সব দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য করা। এখানে জগৎকে অন্তর্যামী সর্বনিয়ন্তা অধ্যাত্ম-সত্তার বা পরমপুরুষের হয় বস্ত্র না হয় বাসস্থান বলে কল্পনা করা হয়েছে। এ উপনিষদের ভাবের সঙ্গে দ্বিতীয় অর্থেরই ভাল সঙ্গতি হয়।

(২) 'কুর্বন্নেব'---'এব' শব্দে জোর দেওয়াতে এর অর্থ হচ্ছে, 'কর্ম ক'রেই কর্ম পরিহার ক'রে নয়'।

(৩) শঙ্কর এ শ্লোকার্ধের অন্বয় করেছেন, 'এবং ত্বয়ি নরে---নান্যথাতোঽস্তি---ন কর্ম লিপ্যতে': মানুষ তোমাতে এইরূপে---আর কোনরূপেই নয়---কর্মলিপ্ত হয়

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ৷৷৩

৩। সূর্যহীন[৪] সেই সব লোক, অন্ধতামসের দ্বারা আবৃত, যারা তাদের আত্মাকে হনন করে প্রয়াণের পর তারা সেই সব লোকে যায়।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ৷৷৪

৪। এক অদ্বিতীয় নিস্পন্দ অথচ মনের চেয়ে বেগবান; দেবতারা তাঁকে প্রাপ্ত হন না কারণ সে সদ্বস্তু সর্বদা অগ্রে গমন করেন। স্থির থেকেও তিনি ধাবমান অপর সবকে অতিক্রম করে যান। প্রাণের অধ্যক্ষ, মাত-রিশ্বা,[৫] সব জলধারা[৬] তাঁতেই প্রতিষ্ঠা করেন।

না। প্রথম শ্লোকার্ধে 'কর্ম' শব্দের অর্থ করেছেন 'বৈদিক যজ্ঞ'—অশুভ কর্ম ও তার ফল থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বর্গলাভ করবার জন্য অজ্ঞানে আবদ্ধ লোকদের সে অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় 'কর্ম' নিয়েছেন ঠিক তার বিপরীত অশুভ কর্ম অর্থে। তিনি বলছেন যে, এ শ্লোকে অজ্ঞান ব্যক্তির সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে; জ্ঞানদীপ্ত জীবেরা কর্ম ও সংসার পরিত্যাগ করে' বনে যান। এ অন্বয় ও ব্যাখ্যা উভয়ই কণ্টকক্লিষ্ট এবং অস্বাভাবিক। আমি যে-ব্যাখ্যা করেছি, আমার মনে হয়, সেই-ই এ উপনিষদের সহজ ও সরল অর্থ।

(৪) এখানে পাঠভেদ আছে: 'অসূর্যাঃ', সূর্যহীন, এবং 'অসূর্যাঃ', আসুরিক বা দেববিরোধী। এ উপনিষদের ভাবের বিন্যাস থেকে দেখি যে, শেষের চারি শ্লোকের, তার বিচারের চতুর্থ প্রস্তাবের, সূত্রপাত হল এই শ্লোকে। এখানে বীজাকারে যে নির্দেশ দেওয়া হল সেখানে আবার তার বিস্তার করা হয়েছে। ভাবের দিক থেকে, সূর্যের কাছে প্রার্থনার ধ্বনি রয়েছে সূর্যহীন লোকে ও তার অন্ধতামসে; নবম ও দ্বাদশ শ্লোকেও আবার সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য উপনিষদেও জ্যোতির লোকের সঙ্গে সূর্য ও সূর্যরশ্মির নিকটসম্বন্ধ রয়েছে। আর তার স্বাভাবিক বিপরীত হল সূর্যহীন লোক, আসুরিক লোক নয়।

(৫) 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ, মনে হয়, 'মাতাতে বা আধারে যিনি নিজেকে বিস্তার করেন'—তা সে সর্বাধার আদিভূত আকাশেই হ'ক বা বেদে যাকে পৃথিবী নাম দিয়ে মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই জড়শক্তিই হ'ক। প্রাণ বা জীবনীশক্তিতে নিহিত দৈবতত্ত্বের প্রতীক, বায়ু দেবতারাই এ একটা বৈদিক আখ্যা, জড়ে পরিব্যাপ্ত

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫

৫। তিনি চলেন আবার চলেন না, তিনি দূরে আবার নিকটে; তিনি এ সবের অন্তরে আবার এ সবের বাহিরে।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।৬

৬। যিনি আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তারপর আর তিনি কোন কিছু থেকে সঙ্কুচিত হন না।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭

৭। যাঁর মধ্যে পরমাত্মাই সর্বভূত[৭] হয়েছেন--কারণ তাঁর পূর্ণজ্ঞান লাভ

হয়ে সব জড়রূপে তিনিই সঞ্জীবিত করেন। এখানে এ শব্দের তাৎপর্য হল সর্ব-প্রকার বিশ্বক্রিয়ার অধ্যক্ষ দিব্যপ্রাণশক্তি।

(৬) শুক্লযজুর্বেদে যে স্বরচিহ্ন দেওয়া হয়েছে তাতে 'অপস্' শব্দের অর্থ (বহু-বচনে) জল ছাড়া আর কিছু হয় না। সে চিহ্ন উপেক্ষা করলে 'অপস্' শব্দ এক-বচনে কর্ম অর্থে নেওয়া যায়। কিন্তু শঙ্কর অর্থ করেছেন বহুবচনে কর্মসমূহ। এ ব্যাখ্যাবিভ্রাট হবার একমাত্র কারণ হল যে, এ শব্দের প্রকৃত বৈদিক অর্থ বিস্মৃত হওয়াতে তাতে পঞ্চভূতের চতুর্থ, মূল জড় পদার্থের তরল অবস্থার অর্থ আরোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সে অর্থ একেবারেই অচল। কিন্তু বেদে 'অপস্'--জলধারা সব--হল সপ্ত বিশ্বতত্ত্বের এবং তাদের ক্রিয়ার প্রতীক; অন্যত্র তাদের সপ্তস্রোতঃ বা সপ্তধেনুও বলা হয়েছে। দেহ-প্রাণ-মন--নিম্নের এই হল তিনটি তত্ত্ব আর দিব্য সত্য, দিব্য আনন্দ, দিব্য চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি এবং দিব্যসত্তা--উর্ধ্বের এই হল চারিটি তত্ত্ব।

সপ্তলোকের প্রাচীন সংস্কার যে, সাতটি লোক আছে আর তার প্রত্যেকটিতে এর এক একটি তত্ত্ব তাদের নানাবিধ সঙ্গতি সুষমা বিস্তার করে' পৃথকভাবে কাজ করে, এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ উপনিষদেও অবশ্যই এই হল এ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

হয়েছে—কি করে তাঁর মোহ হবে? যিনি সর্বত্র একত্ব দর্শন করেন তাঁর শোক কোথা থেকে আসবে?

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

৮। তিনি নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন—সেই তৎস্বরূপ যা জ্যোতির্ময়, দেহহীন, ব্রণ বা ত্রুটিবিচ্যুতির চিহ্নরহিত, স্নায়ুশূন্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। সর্বদর্শী ও মনীষী,[৮] সর্বময় (সর্বত্র যে একসত্তার সম্ভূতি) ও স্বয়ম্ভূ তিনি অনাদি কাল থেকে, যথাযথভাবে প্রত্যেকের স্বভাবের উপযোগী করে' সব ভোগ্যবস্তুর বিধান করেছেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯

৯। অন্ধতামসে প্রবেশ করে তারা যারা অবিদ্যার উপাসনা করে আর যেন আরও বেশী অন্ধকারে প্রবেশ করে তারা যারা কেবলমাত্র জ্ঞানে রত থাকে।

(৭) 'সর্বাণি ভূতানি', এ কথার আক্ষরিক অর্থ হল 'হয়েছে যে-সব বস্তু সে-সব'; আর সে হল আত্মন্ বা স্বয়ম্ভূ অব্যয় সত্তার বিপরীত। সাধারণ অর্থ হল সর্বজীব। এখানে আক্ষরিক অর্থের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে: 'ভূতানি অভূৎ',—হওয়া সব হল, সম্ভূত সবের পরিণতি হল। ভাবার্থ হল, যে-পরচেতনার দ্বারা মানবের অন্তরস্থ এক পরমাত্মা সর্বভূতকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে' নিজেকে প্রসারিত করে' জগদ্ব্যাপারে সেই অদ্বিতীয় সত্তার বহুরূপে আত্ম-অভিব্যক্তির নিত্যক্রিয়া উপলব্ধি করেন, সেই পরম চেতনাকে মানবহৃদয়ে লাভ করা।

(৮) বেদের ভাষাতে 'কবি' বা সত্যদ্রষ্টা ও 'মনীষী' বা ভাবুকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 'কবি' শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হয় বিচারবুদ্ধির অতীত যে দিব্যজ্ঞান, সাক্ষাৎ-দর্শনে ও উদ্ভাসনে প্রকৃত সদ্বস্তুকে দেখে এবং সেই সঙ্গে দেখে সবপদার্থের তত্ত্ব ও রূপ এবং সবের প্রকৃত সম্বন্ধ। মনীষীর বিষয় হল পরিশ্রমী মনোবৃত্তি, যা বিভক্ত চেতনা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে, সবের সম্ভাব্যতা বিচার করে' ক্রমশঃ

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥১০

১০। (আচার্যেরা) কিন্তু বলেছেন যে জ্ঞানের ফল অন্যরূপ-ই[৯] হয় আর অজ্ঞানের ফলও অন্যরূপ হয়; যে-সব সুধীরা বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কাছ থেকে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চৈব যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥১১

১১। যিনি তৎস্বরূপকে একাধারে জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়রূপে জানেন তিনি অজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় এব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥১২

১২। অন্ধতামসে প্রবেশ করে তারা, যারা অসম্ভূতি (না-হওয়া, জন্ম-রাহিত্য) উপাসনা করে আর যেন ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে তারা, যারা সম্ভূতিতে (জন্মে) রত থাকে।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥১৩

নিম্নে স্থূলরূপে অভিব্যক্তিতে এবং ঊর্ধ্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মে সব অভিব্যক্তির বাস্তব সত্যে উপনীত হয়।

(৯) 'অন্যদেব'—এখানে 'এব' অব্যয় 'অন্যৎ' শব্দের জোর বাড়িয়ে দিচ্ছে। "উপরের শ্লোকে যে-ফলের কথা বলা হয়েছে তার থেকে একেবারেই অন্য প্রকারের হল জ্ঞানের ও অজ্ঞানের পরিণাম।" সে-ফলের—'অন্যৎ'-এর—বিবরণ পাই এর পরের শ্লোকে। সাধারণ যে অনুবাদ—জ্ঞানের ফল একরূপ, অজ্ঞানের ফল অন্য-রূপ,—তাতে সবার জানা একটা সহজ কথা সাড়ম্বরে বলা হয়, তাতে কোন নূতন ভাব যোগ করা হয় না, চিন্তার পারম্পর্যেও তার কোন স্থান নাই।

১৩। (আচার্যেরা) কিন্তু বলেছেন যে সম্ভূতির ফল অন্যরূপ হয় আর অসম্ভূতির ফল অন্যরূপ হয়; যে-সব সুধীরা বুদ্ধিগ্রাহ্য করে' তা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের কাছ থেকে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥১৪

১৪। যিনি তৎস্বরূপকে একাধারে বিনাশ (অসম্ভূতি) ও সম্ভূতি এই উভয়রূপে জানেন তিনি অসম্ভূতির দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জন্মের দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করেন।

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥১৫

১৫। উজ্জ্বল হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে; হে পূষণ্,[১০] জগতের পোষক, সে আবরণ উন্মোচন কর——সত্যধর্মের জন্য, দৃষ্টির জন্য।

(১০) বেদের অন্তনিহিত অর্থে সূর্যদেবতা হলেন সত্যদ্রষ্টা কবির দিব্য আলোকের প্রতীক; সে আলোক মনের অতীত, স্বয়ংপ্রভ বিশুদ্ধ সত্য। তাঁর প্রধান শক্তি হল স্বতঃপ্রকটিত জ্ঞান——বেদে তাকে পরাদৃষ্টি বলা হয়েছে। তাঁর লোককে সত্য-ঋত-বৃহৎ বলে' বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই 'পূষন্' পুষ্টি ও উপচয়ের কর্তা, কারণ তিনিই মানুষের অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ সত্তাকে প্রসারিত ও উন্মুক্ত করে' জ্যোতির্ময় অনন্তচেতনাতে রূপান্তরিত করেন। তিনিই 'একর্ষি' একমাত্র দ্রষ্টা, একত্বদর্শী ও আত্মবিৎ, এবং মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষদর্শনের উর্ধ্বতম সীমাতে দিশা দিয়ে নিয়ে যান। তিনি 'যম', নিয়ন্তা ও বিধাতা, কারণ 'সত্যধর্ম', সাক্ষাৎ সত্যের নিয়মে এবং সেই জন্যই 'যাথাতথ্যতঃ', আমাদের স্বভাবের যথার্থ প্রকৃতি অনুসারে, তিনি মানুষের কর্ম ও ব্যক্তসত্তাকে শাসন করেন; সমস্ত অস্তিত্বের পিতা, 'প্রজাপতি' থেকে উদ্ভূত জ্যোতির্ময় শক্তি তিনি, সর্বভূত যাঁর অভিব্যক্তি সেই দিব্য পুরুষকে তিনি নিজের মধ্যে প্রকটিত করেন। তাঁর 'রশ্মি' হল সত্য ও বৃহৎ থেকে যে-সব চিন্তা জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে বিকীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মন বিভাজন ও প্রতিফলনের তত্ত্ব বলে' মনের স্তরে এসে সে-সব বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত, ছিন্ন-ভিন্ন ও বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। সত্যের মুখ আবৃত করে যে-হিরন্ময় পাত্র তাও এই সব বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারাই

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬

১৬। হে পূষন্, হে একমাত্র দ্রষ্টা, হে সংযমনকর্তা যম, হে আলোক-দাতা সূর্য, হে প্রজাপতির সন্তান, তোমার রশ্মি সব সুবিন্যস্ত কর, তোমার আলোক সংহত কর; যে তেজ তোমার কল্যাণতম রূপ, তোমাতে আমি সেই রূপ দেখি। ওই, ওই যে পুরুষ, আমিও সেই।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭

১৭। সব বস্তুর নিঃশ্বাস, বায়ু,[১১] এক অমর প্রাণ; কিন্তু এ দেহের পরিণাম ভস্ম। ওঁ, হে ক্রতো,[১২] (ইচ্ছাশক্তি,) স্মরণ কর, নিজের কৃত কর্ম স্মরণ কর।

অগ্নে নয় রায়ে সুপথা অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮

নির্মিত। ঋষি তাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করছেন, প্রথম, যেন যথাযথ ব্যবস্থা ও সম্বন্ধের অনুক্রমে তাদের সাজিয়ে নেওয়া হয়, পরে, যেন তাদের সংহত করে' উদ্ঘাটিত পরম সত্যে একাগ্র করা হয়। আভ্যন্তরীণ এই সাধনার ধারার ফলে নিখিল বিশ্বের দিব্য আত্মার মধ্যে সর্বভূতের একত্বের প্রত্যক্ষ বোধ জন্মে।

(১১) 'বায়ু' হলেন বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি; অন্যত্র তাঁকে মাতরিশ্বাও বলা হয়েছে। সূর্যের আলোকে অস্তিত্বের এক অমরতত্ত্বরূপে তিনি নিজেকে প্রকটিত করেন; জন্ম-মৃত্যু ও দৈহিক জীবন তাঁরই সব বিশিষ্ট বাহ্যক্রিয়ামাত্র।

(১২) বেদে 'ক্রতু' শব্দের অর্থ কর্ম বা কর্মের পশ্চাতে কার্যকরী শক্তি, মানস চেতনাতে তা ইচ্ছাশক্তির রূপ ধারণ করে। অগ্নিই এ শক্তি, জড়ে তাঁরই দিব্য-শক্তির প্রথম প্রকাশ হয় উত্তাপ, আলোক ও স্থূল ক্রিয়াশক্তিরূপে এবং পরে, মানব চেতনার অন্য সব স্তরে বিভিন্নরূপ ধারণ করে' ক্রমপরিণামী অভিব্যক্তির পথে তিনিই মানুষকে ঊর্ধ্বে, সত্য ও আনন্দের পানে চালিয়ে নেন।

১৮। হে অগ্নি, অভিব্যক্ত সব বস্তু তুমি জান, শুভ পথে আমাদের পরম সুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাও; পাপের[১৩] সব কুটিল প্রলোভন আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তোমার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের পূর্ণতম প্রণতির স্তোত্র নিবেদন[১৪] করি।

(১৩) বেদ থেকে এ শ্লোকটি অবিকল নেওয়া হয়েছে। বেদের শিক্ষাতে 'পাপ' হল যা সব বৃত্তিকে উত্তেজিত, শশব্যস্ত করে' সুপথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আছে একটা সরল পথ, স্বাভাবিকভাবে ক্রমবর্ধমান জ্যোতি ও সত্যের পথ ('ঋজু পন্থা', 'ঋতস্য পন্থা'); অসংখ্য লোকসমূহ পার হয়ে নূতনতর অনন্ত দৃশ্যের দিকে---'বীতানি পৃষ্ঠানি'---চলেছে সে পথ; আর সাধারণতঃ সেই পথ ধরেই পরমার্থের দিকে মানবকে নিয়ে যাওয়া হল স্বভাবের ধর্ম। কিন্তু তার পরিবর্তে বারবার পদস্খলিত হয়ে সংকীর্ণ দেশ দিয়ে, বন্ধুর সর্পিল পথের কুটিল আঁক-বাঁক ঘুরে ('দূরিতানি', 'বৃজিনানি') পাপ তাকে চলতে বাধ্য করে।

(১৪) 'বিধেম' শব্দ যজ্ঞের সুব্যবস্থা করা ও পূজার উপচার সাজান অর্থে এবং সাধারণভাবে পূজা ও যজ্ঞের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদিক 'নমস্', আন্তর ও বাহ্য প্রণতি, হল আমাদের অন্তরে এবং বিশ্বে অবস্থিত ভাগবত সত্তার কাছে আত্মসমর্পণের চিহ্ন। এখানে নিবেদিত হল 'প্রণতি'---দিব্য ইচ্ছাশক্তি বা অগ্নির কাছে অহংভাবিত মানবপ্রকৃতির পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, যাতে আভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে সত্যের পথে, আধ্যাত্মিক সম্পদে পূর্ণ পরম সুখের পানে ('রায়ে') তিনি আমাদের চালিয়ে নিতে পারেন। এই আত্যন্তিক সুখের অবস্থাই হল বেদের মর্মজ্ঞ বিপ্রেরা যাকে বিশ্বে দিব্য অস্তিত্বের উৎস এবং মানব সত্তাতে দিব্য জীবনের ভিত্তি বলে মনে করতেন সেই বিশুদ্ধ প্রেম ও আনন্দ-তত্ত্বের অভীপ্সিত আত্মরতি। নিম্নতর সব লোকে অহংকারের দ্বারা এই তত্ত্বের বিকৃতিই বাসনা ও প্রভুত্বকামনারূপে প্রতিভাত হয়।

আলোচনা

ভূমিকা

এ উপনিষদে বিচারের ধারা

উপনিষদ মাত্রেই আধ্যাত্মিক আলোকের আধার, শিক্ষার বাহন নয়; যে-সব সাধকের জন্য উপনিষদ রচিত হয়েছে তারা বেদবেদান্তের ঋষিদের উপদেশের সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত এবং, এমন কি, যে-সব সত্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত তারও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। সুতরাং রচনাতে চিন্তার যোগবাহ বা গৌণ ও উপলক্ষিত বিষয়ের কোন বিস্তার করা হয় নাই।

ঈশোপনিষদের প্রত্যেক শ্লোকের তাৎপর্য কতকগুলি প্রচ্ছন্ন ভাবের উপর নির্ভর করে; মূলে সে-সবের নির্দেশ থাকলেও বিশদ ক'রে তা বলা হয় নাই, এমনকি যে-যুক্তির উপর তার সিদ্ধান্ত স্থাপিত, মূলে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেই সেসবের ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু বিচারবুদ্ধির কাছে স্পষ্ট ক'রে তা বলা হয় নাই। ধরে নেওয়া হত যে, পাঠক---বরং শ্রোতা---নিজের বোধির সমর্থন নিয়ে বা অভিজ্ঞতাতে সপ্রমাণ ক'রে আধ্যাত্মিক এক আলোক থেকে বৃহত্তর আলোকে অগ্রসর হন, সে-সব ধারণা আলো-চনার জন্য বিচারবুদ্ধির কাছে উপস্থিত করেন না।

বর্তমান মনোবৃত্তির কাছে এ রীতি অচল, অগ্রাহ্য; তাই এখন এ উপনিষদের সব ভাব পূর্ণ আকারে ব্যক্ত করতে হবে, তার ইঙ্গিত সব ফুটিয়ে তুলতে হবে, চিন্তার যোগবাহ সব যোগাতে হবে এবং, অনুক্ত হলেও সর্বদা সূচিত, সব যুক্তি প্রকাশ করে বলতে হবে।

এ উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বরূপতঃ বিপরীত সব মূল দ্বন্দ্বের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করা; পরপর ভাবের চারিটি প্রবাহের দ্বারা তা সুসমঞ্জসভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

প্রথম প্রবাহ

চিরচঞ্চল জগতে এবং তার প্রত্যেক ব্যাপারে, গতির প্রত্যেক ধারার অন্তরে নিবাস ক'রে সে-সব যিনি শাসন করেন সেই এক স্থাণু পরমাত্মার ধারণা দিয়ে উপনিষদের বক্তব্যের ভিত্তি স্থাপন করা হল। (১ম শ্লোকার্ধ)

এ-ধারণার উপর মানবের পক্ষে দিব্য জীবনের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা হল: বাসনা বর্জন ক'রে সর্বাঙ্গীণ ত্যাগের দ্বারা সব ভোগ করা। (১ম শ্লোক, ২য় শ্লোকার্ধ)

তারপর এই মূল তত্ত্বের বলে কর্ম ও পার্থিব জীবন সমর্থন করা হল: পরমেশ্বর ও জীব অভিন্ন তাই জগতে বহুমুখী গতির মধ্যেও জীবের নিত্য স্বাতন্ত্র্য অবিচ্ছেদ্য। (শ্লোক ২)

পরিশেষে বলা হল যে, অজ্ঞানের বশে বহুর বৈচিত্র্যে একের যথাযথ অভিব্যক্তিতে বাধা দেবার পরিণাম হল মৃত্যুর পর অন্ধতামস অবস্থাতে নিবর্তন। (শ্লোক ৩)

দ্বিতীয় প্রবাহ

দ্বিতীয় প্রবাহে প্রথম প্রবাহের ভাবগুলি আবার গ্রহণ ক'রে সে-সবের আরও বিস্তার করা হল।

স্থাণু এক মহেশ্বর এবং বহুমুখী গতি উভয়ই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অভিন্ন, তবে একত্ব ও স্থাণুত্বই ব্রহ্মের উচ্চতর সত্য এবং সেইরূপেই ব্রহ্ম সব ধারণ করেন, সবার অন্তরে বাস করেন। (শ্লোক ৪, ৫)

একাত্মতার অভিজ্ঞতাতে জীবনযাত্রার নিয়মের ভিত্তির ও তার সার্থকতার সন্ধান পাওয়া যায়; সে-অভিজ্ঞতাতে মানুষ বিশ্বাত্মার এবং সর্বাতীত পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয় এবং মোহ-শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সেই অধ্যাত্মসত্তাতেই তাঁরই সম্ভূতি, সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হয়। (শ্লোক ৬, ৭)

তৃতীয় প্রবাহ

তৃতীয় প্রবাহে দ্বিতীয় শ্লোকের বিষয়বস্তু, জীবন ও কর্মের সমর্থনে ফিরে এসে তাদের দিব্য চরিতার্থতার নির্দেশ দেওয়া হল।

এক পরম সত্তার সম্ভূতি, এই সচল জগতে পরমেশ্বরের আত্ম-অভিব্যক্তির সোপানক্রমে বিভিন্ন লোকের উল্লেখ ক'রে বলা হল যে, সর্বভূতের আভ্যন্তরীণ ধর্ম তাঁর ভাবনা ও তাঁর বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। (শ্লোক ৮)

বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি-অসম্ভূতি এই সব বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য সাধিত হল মর্ত্য অবস্থা থেকে অমর্ত্য অবস্থাতে প্রগতির পথে ক্রমবর্ধমান আত্ম-

উপলব্ধির পক্ষে উভয়ের অন্যোন্য-প্রয়োজনের দ্বারা। (শ্লোক ৯-১৪)

চতুর্থ প্রবাহ

চতুর্থ প্রবাহে বিভিন্ন লোকের ধারণাতে ফিরে এসে, সূর্য ও অগ্নির প্রতীক দিয়ে পরম সত্য ও অমরত্বের (শ্লোক ১৫, ১৬), এই জীবনের কর্মের (শ্লোক ১৭) এবং মৃত্যুর পরের অবস্থার (শ্লোক ১৮) মধ্যে সম্বন্ধ রূপকের দ্বারা নির্দেশ করা হল।

প্রথম প্রবাহ

হৃদিস্থিত পরমেশ—জীবন ও কর্ম

(শ্লোক ১-৩)

বিশ্ব অস্তিত্বের মূল তত্ত্ব

ভগবান ও বিশ্ব, অধ্যাত্মসত্তা ও আকারপ্রদ প্রকৃতি, উভয়ের তুলনা ক'রে তাদের সম্বন্ধ নির্ধারণ করা হল।

জগৎ

নিখিল বিশ্ব হল অধ্যাত্মসত্তার নিজের মধ্যে সঞ্চলন; বিশ্বপ্রপঞ্চের সব রূপ, তার সব ব্যাপারই বিকারী ও ক্ষণস্থায়ী; তার একমাত্র নিত্যতা হল পুনরাবর্তনের নিত্যতা, স্থিরত্ব একটা অবভাস মাত্র আর আপাততঃ নির্দিষ্ট কতকগুলি অন্যোন্যসম্বন্ধ ও একত্র-সন্নিবেশের প্রতীতি থেকে সে অবভাস আসে।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের প্রত্যেকটি পৃথক পদার্থেই সমগ্র বিশ্ব বর্তমান রয়েছে, তবে প্রত্যেক ব্যষ্টিতে সমগ্রের একটা বিশেষ দিক, অগ্রমুখ বা বাহ্য আকৃতি উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'—ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড আর বৃহৎ বিশ্বজগৎ বিন্দু-সিন্ধুর মত অভিন্ন।

তথাপি, জগতে যে গতির তত্ত্ব রয়েছে ব্যষ্টি তারই পরিণাম; আর তাতে তাদের মধ্যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ হয়, যেন বিশ্বের মধ্যে বিশ্ব, গতির মধ্যে গতি। সুতরাং ব্যক্তিও বিশ্বজনীন প্রকৃতির অংশভাগী, কর্ম-প্রবৃত্তির উৎসের জন্য ব্যক্তিকে বিশ্বের শরণাপন্ন হতে হয় আর, আমরা যেমন বলি, ব্যক্তি বিশ্বনিয়মের অধীন, বিশ্বপ্রকৃতির অংশ।

অধ্যাত্মসত্তা

অধ্যাত্মসত্তা এই জগৎ-গতির প্রভু; তিনি এক, অব্যয়, স্বতন্ত্র, স্থাণু ও শাশ্বত।

জগৎ-প্রপঞ্চের সমস্ত গতি, সমস্ত সাকার পদার্থ অধ্যাত্মসত্তার নিবাসের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, কারণ তিনি এক হয়েও অনেকভাবে, তাঁর নানা

কক্ষে সমৃদ্ধ বহু প্রাসাদে বাস করেন।

সেই এক বিশ্বেশ্বরই পূর্ণে এবং অংশে, সমগ্রবিশ্বে এবং বিশ্বের প্রত্যেকটি জীবে, বস্তুতে ও শক্তিতে বাস করেন।

তিনি এক ও অবিভাজ্য বলেই সবার মধ্যে অধ্যাত্মসত্তাও এক, অভিন্ন; সে-সবের বহুত্ব তাঁর বিশ্বচেতনার লীলা মাত্র।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ অন্য সবার সঙ্গে একাত্ম, প্রত্যেকেই স্বাধীন, নিত্য, অব্যয় ও প্রকৃতির প্রভু।

যোগবাহ ভাব

অবিদ্যা

নিবাসের অভিপ্রায় হল সম্ভোগ ও অধিকার; সুতরাং বিশ্বজগতে অধ্যাত্মসত্তার অধিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল বিশ্বকে ভোগদখল করা। তথাপি, এভাবে স্বরূপতঃ এক, দিব্য ও নিত্য হলেও, মনে হয় যেন, মানুষ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, অন্য সবার থেকে পৃথক, প্রকৃতির অধীন, এমনকি প্রকৃতির সৃষ্টি ও তার খেলার পুতুল, মৃত্যু-অজ্ঞান-দুঃখের দাস। বিশ্ব-অভিব্যক্তির অভিপ্রায় হল যে, জীব তার জগৎকে অধিকার করে ভোগ করবে, কিন্তু সীমাবন্ধনের জন্য সে ভোগ করতে পারবে না। এ বিপরীত ফল ঘটায় অবিদ্যা, একত্বজ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞান আর সে-অজ্ঞানের গ্রন্থি হল অহংভাব।

অহং

অহংকারের হেতু হল যে, বিদ্যা-অবিদ্যার যুগল শক্তি নিয়ে পরমাত্মা বহুত্ব-সাপেক্ষত্বের চেতনাতে এবং একত্ব-অদ্বয়ত্বের চেতনাতে যুগপৎ বাস করতে পারেন বলে তিনি অজ্ঞানে বাঁধা পড়েন না বটে, তথাপি মনের দ্বারা তিনি জগৎ-প্রপঞ্চের সব বিষয়ের সঙ্গে এমন তন্ময় ভাবে একাত্ম হতে পারেন যাতে মনে হয় যেন একত্বের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এই হল অহংভাবের হেতু। বস্তুতঃ সে-জ্ঞান পিছনে সরে' গিয়ে মনোবৃত্তির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়। এই জন্যই বিশ্ব-প্রকৃতিতে মনের বৃত্তিগুলি বিষয়কেই বাস্তব বলে গ্রহণ করতে পারে এবং অন্তর্নিবাসী আত্মাকে সীমাবদ্ধ ও বিষয়ের আপাতবোধের দ্বারা নিরূপিত ব'লে ধারণা করতে পারে, অথবা কোন বিষয়কে সমগ্র বিশ্বের একটা বিশেষ দিক বা বহির্মুখ

ব'লে না দেখে প্রত্যেক বিষয়কে অপর সব বিষয় থেকে বিবিক্তভাবে অবস্থিত এক একটা পৃথক অস্তিত্ব ব'লে বোধ করে। অন্তরাত্মার সম্বন্ধেও মন এই ভ্রান্ত ভাবই পোষণ করে। এই হল অজ্ঞানের বিভ্রম, এতেই সমস্ত বাস্তব সত্য মিথ্যাতে পরিণত হয়। এই বিভ্রমকেই অহংকার বলা হয়; এই ব্যবচ্ছেদি অহংবোধের জন্য প্রত্যেক জীবেরই নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ধারণা জন্মে।

এই বিভাজনের ফলে, জীব বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি-স্থাপনের শক্তি হারায় আর তার পরিণামে বিশ্বকে ভোগদখল করবার অক্ষমতা আসে। কিন্তু ভোগদখল করবার বাসনাই অহংকারের প্রধান প্রবৃত্তি; কারণ সাপেক্ষত্বের সীমার জন্য যদিও সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তথাপি, অস্পষ্টভাবে অহং জানে যে সে-ই পরমেশ্বর। তার ফলে হয় নিজের ও অন্য সবার সঙ্গে বিরোধ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, দুর্বলতা ও অক্ষমতাবোধ, তমসাচ্ছন্নতা এবং আত্মসার্থকতার অভিপ্রায়ে বাসনা-কামনা-প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা আর অবসাদ ও হতাশার ফলে মৃত্যু ও সংহতিভেদের দিকে শক্তির পরাবৃত্তি।

পরাধীনতার নিদর্শন হল বাসনা আর তার সাথী---বিরোধ ও দুঃখ; যে মুক্ত, একাত্ম ও প্রভু তার বাসনা নাই, অবিচ্ছেদ্য নিত্য স্বত্বের বলে সে সব গ্রহণ করে, ভোগদখল করে।

দিব্যজীবনের অনুশাসন

বিশ্ব ও বিশ্বে যা-কিছু আছে সে সব সম্ভোগ করাই বিশ্ব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য; আর তার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন হল সব কামনা ত্যাগ করা।

নৈতিক শাসনে বাধ্য হয়ে বিষয় ভোগ থেকে আত্মাকে বঞ্চিত রাখবার বা দৈহিক ভোগ প্রত্যাখ্যান করবার আদেশ দেওয়া হল না, দাবী করা হল কোন সাকার পদার্থের উপর আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা থেকে জীবের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি।

এ নিষ্কৃতির অঙ্গ হল অহঙ্কার থেকে মুক্তি আর তার ফলে সমস্ত ব্যক্তিগত বাসনা থেকে মুক্তি। কার্যতঃ এই ত্যাগের অর্থ হল যে, বিশ্বের কোন দ্রব্যকে অধিকার করা প্রয়োজন বলে মনে করবে না, কোন বস্তুকে নিজের বা অপরের সম্পত্তি বলে কিংবা হৃদয়ের বা ইন্দ্রিয়ের লোভের বিষয় বলে ভাববে না।

একত্বের অনুভূতির উপর এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অদ্বিতীয় সর্বস্বামী পরমাত্মা, মহেশ্বর এবং জীব অভিন্ন; এবং পরমেশ্বর যদিও প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যেন বিভক্তভাবে বাস করেন, তথাপি কোন পদার্থই পরমাত্মার বাহিরে নয়, সবই তাঁরই অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, অহঙ্কার অতিক্রম করে এক পরমাত্মাকে উপলব্ধি করলে আমরা অবিভক্ত বিশ্বচেতনাতে সমস্ত বিশ্বের স্বামিত্ব লাভ করি, দৈহিক অধিকারের আর কোন প্রয়োজন হয় না।

মহেশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার গুণে স্বাধীনভাবে সব বিষয়ভোগের মুক্ত ও অনন্ত আনন্দ লাভ করবার সম্ভাবনা অর্জন করি বলে আমাদের মধ্যে বাসনার আর কোন স্থান থাকে না।

সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মতার বলে আমাদের পাওয়া হয় সবার তৃপ্তিতে, আমাদের নিজেদের সুখে এবং বিশ্বময়ের সার্বজনীন আত্ম-অভিব্যক্তির আনন্দের মধ্যে। যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাশ্রয়ী এই আনন্দের অধিকারে মানুষ অন্তরে মুক্ত থেকেও, মহেশ্বরের গতির জগতে মহেশ্বরেরই মত, পরিপূর্ণ সক্রিয় জীবন নিয়ে এই বিশ্বে বাস করতে পারে।

কর্মের সমর্থন

নিষ্ক্রিয়তার উপর মুক্তি নির্ভর করে না, বা বিশ্বস্বামিত্বের অর্থ জগদ্ব্যাপারে কোন অংশ না নিয়ে, কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে নিষ্ক্রিয় আত্মার বিলাস নয়। বরং এই জড়জগতে কর্ম করা এবং জাগতিক জীবনে পূর্ণায়ু সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করাই মুক্তির পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত।

কারণ, সক্রিয়ব্রহ্ম এই বিশ্বে কর্মের দ্বারাই নিজের পূর্ণতা লাভ করেন, মানুষও কর্মের দ্বারা নিজের সার্থকতালাভের উদ্দেশ্যে দেহধারণ করে। তার পক্ষে আর কোন উপায় নাই; কারণ, এমন কি তার নিশ্চেষ্টতারও ক্রিয়া হয়, জগদ্ব্যাপারে তার ফল ফলে। এই দেহ বা অন্য কোন দেহ ধারণ ক'রে কর্মবিরতির চেষ্টা বা দৈহিক জীবন পরিহারের ইচ্ছা বৃথা। কর্মপরাঙমুখতা যে মুক্তির একটা উপায় হতে পারে এ ধারণাই ভ্রমাত্মক, অজ্ঞান বা ব্রহ্মের মধ্যে জীবের পৃথক সত্তার কল্পনা থেকে সে ভ্রম জন্মে।

কর্মবর্জন করা হয়, মুক্তির সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য হয়না মনে করে'। ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ যখন কাজ করে তখন সে কর্মের পশ্চাতে বাসনা, কর্মপ্রবৃত্তির দাসত্ব বা যে-শক্তি কর্মে প্রচোদিত করে তার প্রৈতির

অধীনতা এবং কর্মফল, এই তিনের পাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। আপাত-দৃষ্টিতে তা সত্য বটে কিন্তু বস্তুতঃ নয়।

বাসনা হল মনোময় জীবের হৃদয়াবেগ প্রকাশের একটা বিশেষ ভঙ্গী––ভাবোচ্ছ্বাসের যে-বৃত্তি অজ্ঞানের বশে সব বিষয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের আনন্দ না চেয়ে, কাম্য বিষয়ের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করে। এই অজ্ঞান দূর হলে বাসনাতে বিজড়িত না হয়েও লোকে কাজ করতে পারে।

প্রেরণার যে-প্রবেগ আমাদের প্রচোদিত করে তাও মহেশ্বরেরই অধীন, পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তিনি সে শক্তির মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। প্রকৃতির পশ্চাতে প্রকৃতির প্রভুর সমীপে উপনীত হয়ে, ব্যক্তির ইচ্ছা বিশ্বজনীন ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নিমজ্জিত ক'রে লোকে দিব্য স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কাজ করতে পারে। তাতে আমাদের কর্ম সব বিশ্বেশ্বরের চরণে নিবেদিত হয় আর সে-স্বাতন্ত্র্যে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের অবসান হয়।

কর্মের শৃঙ্খল শুধু প্রকৃতির গতিকে বন্ধন করে, আত্মাকে নয়; আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা কর্মফলে বন্ধনের বাহ্যপ্রতীতিরও লোপ হয়।

সুতরাং মুক্তির পথ নৈষ্কর্ম্য নয়, পথ হল জগদ্ব্যাপারের সঙ্গে নিজের একাত্মবোধ থেকে বিরত হওয়া এবং জগতের পরিবর্তে, সব বস্তুর সার অধ্যাত্ম সত্তা, সবের ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য একাত্মতা ফিরে পাওয়া।

অপরলোক

এই পার্থিব জীবন থেকে প্রয়াণ ক'রে কেহ জগদ্ব্যাপার থেকে অন্তর্ধান করে না, এই জড় বিশ্বের বাহিরে চেতনার অন্য কোন লোকে বা চেতনার কোন সর্বসাধারণ অবস্থার মধ্যে যায়।

এই সব লোক হয় আলোকিত না হয় তমসাচ্ছন্ন অথবা অন্ধকার বা সূর্যহীন।

অজ্ঞানের সব স্থূলরূপে লিপ্ত থাকলে বা বিকৃতভাবের বশে আত্মাকে নিজের সার্থকতার আশায় কুটিল পথে চলতে বাধ্য করলে অথবা অন্যায্য-ভাবে বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে জীবের পরিণতির স্রোত রুদ্ধ করে দিলে অন্ধতামস লোকে গতি হয়, আলোকের বা মুক্ত আনন্দময় সত্তার লোকে যাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রবাহ

(১) ব্রহ্ম : ভগবান ও জগতের একত্ব

(শ্লোক ৪, ৫)

ব্রহ্ম—একত্ব

পৃথক বলে প্রতীয়মান হলেও মহেশ্বর ও বিশ্ব বিভিন্ন নয়, উভয়েই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

'অনেজদেকং'—এক স্পন্দহীন

ভগবানই একমাত্র চিরস্থির নিত্য সদ্বস্তু। তিনি এক অদ্বিতীয়, কারণ আর কিছুই নাই, যেহেতু সদসৎ উভয়ই তিনি। তিনি চিরস্থির স্পন্দহীন; কারণ গতির দ্বারা স্থানান্তর বা কালান্তর সূচিত হয় আর দেশকালের অতীত বলে তিনি অব্যয়। যা ছিল, যা আছে, ভবিষ্যতে কখনও যা হতে পারে সে সবই তাঁর মধ্যে নিত্য বিধৃত রয়েছে; সুতরাং তাঁর হ্রাসবৃদ্ধি নাই। নিমিত্ত ও সাপেক্ষত্বের অতীত তিনি, সুতরাং তাঁর সত্তার মধ্যে সম্বন্ধেরও কোন পরিবর্ত্তন নাই।

'মনসো জবীয়ঃ'—মনের চেয়ে বেগবান

বিশ্বজগৎ হল 'সংসার' বা দেশ-কালে ভাগবত চেতনার আবর্তগতি। তার ধর্ম এবং এক হিসাবে তার উদ্দেশ্য হল প্রগতি, গতিতেই তার অস্তিত্ব আর গতি রোধ হলেই তার বিলুপ্তি। কিন্তু এ গতির মূল জড়ীয় নয়, সে হল সক্রিয় চেতনার প্রৈতি; আপাততঃ বিভিন্ন কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন সব বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে তার সঞ্চরণ ও বহুলীভবনের দ্বারা সৃষ্ট হয় সব একত্ব-বহুত্বের বিরোধ, দেশকালের সব বিভাগ, হেতুনিমিত্তের সব সম্বন্ধ ও সমবায়। চেতনার কাছে এ সবই বাস্তব, তবে এসব সত্তার প্রতীক মাত্র; কতকটা যেন সৃষ্টিপর মনের কল্পনার মত, সে মনের প্রকৃত প্রতিরূপ হলেও স্রষ্টার নিজের তুলনায় তা ঠিক বাস্তব নয়, অথবা তার বাস্তবতা একটু ভিন্ন প্রকারের।

কিন্তু মনোময় চেতনার শক্তিতে ত জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। বিশ্বজননী

চেতনা মনের চেয়ে অনন্তগুণে সমর্থতর, দ্রুততর ও বাধাহীন। সে হল পরম তুর্যাতীতের বিশুদ্ধ সর্বক্ষম আত্মপ্রতীতি, সাপেক্ষত্বের কোন নিয়ম সে মানে না। দেবতাদের দ্বারা সংরক্ষিত, সাপেক্ষত্বের সব ধর্ম তাঁরই সাময়িক সৃষ্টি। আমাদের কাছে অপরিমিত হলেও সে-সব ধর্মের আপাত নিত্যতার অবধি হল দেবতাদের শাসিত জগতের স্থিতিকাল। গতি ও পরিবর্তন সুনিয়ন্ত্রিত করে সে-সব ধর্ম, গতাগতির প্রভু মহেশ্বর সে-সবের বাধ্য নন। সুতরাং দেবতাদের বলা হল অবিরত নির্দিষ্ট পথে ধাবমান কিন্তু মহেশ্বর মুক্ত, তাঁর নিজের গতি তাঁকে প্রভাবিত করে না।

'তদেজতি তন্নৈজতি'––তিনি চলেন আবার চলেন না

শাশ্বত স্থিতির শাসনে চলে বিশ্বজগতের গতি। পরিবর্তনের অর্থ হল নিত্য অব্যয়ের মধ্যে আপাত সম্বন্ধের অবিরাম অবস্থান্তর।

'অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ'––এক অদ্বিতীয় নিস্পন্দ হয়েও মনের চেয়ে বেশী বেগবান, 'তদেজতি তন্নৈজতি'––তিনি চলেন আবার চলেন না, 'তদ্ধাবতোঽন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ'––স্থির থেকেও কর্মপ্রবৃত্ত চেতনাতে তিনি ধাবমান অপর সবাইকে অতিক্রম করে যান, এই সব সূত্রে এই সত্যই বিবৃত হয়েছে।

যোগবাহ ভাব : বহু *

এক অদ্বিতীয়ই অবশ্য প্রকৃষ্টরূপে বাস্তব কিন্তু, 'অপর সব', বহুও অবাস্তব নয়। বিশ্বজগৎ মনের অলীক কল্পনাপ্রসূত নয়।

* এ প্রসঙ্গে যে-সব ভাবের উল্লেখ করা হল, আমার মনে হয়, সে সব এ উপনিষদের তাত্ত্বিক ভিত্তির পক্ষে অপরিহার্য। বিশ্বকে মিথ্যা বলে' বর্জন করে যে বিশুদ্ধ চরমপন্থী অদ্বৈতবাদ তা ঈশোপনিষদের শিক্ষণীয় নয়; তার বাণী হল বহুকে অস্বীকার না করে' একের অস্তিত্ব, আর তার পদ্ধতি হল বহুর মধ্যে এককে দেখা। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই যুগপৎ প্রামাণ্য বলা হয়েছে এবং এ বিশ্বের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিরোধী অমৃতত্ব লাভ করাকেই কর্ম ও জ্ঞানের লক্ষ্য বলা হয়েছে। এ উপনিষদে প্রত্যেকটি বস্তুকেই দেখা হয় স্বয়ং সমগ্র বিশ্ব বলে' এবং প্রত্যেক জীবকেই স্বয়ং দিব্যপুরুষ বলে'। এই সব ভাব একত্র গ্রহণ করে' তাদের সঙ্গতি করা যায় শুধু সমগ্রদর্শী সর্বগ্রাহী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে, মায়াবাদী বিশ্বত্যাগী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য হয় না।

একত্বই সব বস্তুর চিরন্তন সত্য, বহুত্ব একত্বেরই লীলা। সুতরাং একত্ববোধকে 'বিদ্যা' বা জ্ঞান বলা হয়েছে আর নানাত্ব বা বহুত্ববোধকে 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান বলা হয়েছে। কিন্তু নিত্য ও সত্য একত্বের বোধ থেকে বিচ্যুত না হলে বহুত্ববোধ মিথ্যা হয় না।

ব্রহ্মের একত্ব সংখ্যাতে নয়, সার স্বরূপে। সংখ্যাগত একত্বের মধ্যে হয় বহুর কোন স্থান থাকবে না আর না হয় সে একত্ব হবে বিভাজ্য, বহুরই সমাহারলব্ধ, বহু হবে তার সব অংশ। ব্রহ্মের একত্ব এভাবের নয়, কারণ তাঁর হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাঁকে ভাগ করা যায় না।

কখনও কখনও বলা হয় যে, তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অংশ তেমনি বিশ্বে অবস্থিত বহুও বিশ্বময় ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু বস্তুতঃ তরঙ্গের প্রত্যেক-টিই সেই সমুদ্র, তাদের বহুত্ব ত সমুদ্রের চঞ্চলতা থেকে জাত সম্মুখবর্তী আপাতপ্রতীয়মান আকৃতির বিভেদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন সমগ্র বিশ্ব বই নয়---শুধু তার বিভিন্ন দিক থেকে দেখা বিশেষ বিশেষ আকৃতি, তেমনি প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবও সমগ্র ব্রহ্ম---বিশ্বচেতনার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র থেকে নিজেকে ও বিশ্বকে পর্যবেক্ষণে রত।

কারণ, তৎস্বরূপ অনন্যরূপী একাত্মা, তিনি একক নন। দেশে ও কালে, সর্বত্র ও সর্বদা, তথা দেশকালের ওপারে, তিনি অনন্যরূপী একাত্মা। তাঁর স্বরূপ-একত্বে সংখ্যাগণনার একত্ব ও বহুত্ব উভয় সংজ্ঞাই সমভাবে প্রযোজ্য।

আমরা যে ভাবে বুঝি তাতে অপর সব সংজ্ঞার মতনই, এক ও বহু চিৎ-বস্তুতে পরমের প্রতিচ্ছবি মাত্র :---পরাৎপর যে-রূপে তাঁর নিজের স্বতন্ত্র ও সর্বস্রষ্টা আত্মবোধে নিজেকে অনন্ত অসংখ্য বহুবিচিত্র ভাবে দেখে' সেই প্রতীতিকে অভিব্যক্ত করেন, তারই একটা প্রতিরূপ মাত্র। 'চিৎ' শুদ্ধমাত্র জ্ঞানের শক্তি নয়, প্রকাশক্ষম ইচ্ছাশক্তিও বটে; শুদ্ধমাত্র রূপদ্রষ্টা নয়, রূপস্রষ্টাও বটে; বস্তুতঃ এ উভয় শক্তিই অভিন্ন। কারণ, চিৎ হল সত্তার শক্তি, শূন্যের নয়। সে যা দেখে তাই সম্ভূত হয়। দেশ-কালের ওপারে সে নিজেকে দেখে আর দেশকালের আবেষ্টনে তারই অভিব্যক্তি হয়।

শূন্য থেকে কিছু নির্মাণ করাকে বা এক পদার্থ থেকে অপর কোন পদার্থ প্রস্তুত করাকে সৃষ্টি বলে না, দেশকালের আবেষ্টনে ব্রহ্মের নিজেকে প্রক্ষেপ করাই হল সৃষ্টির অর্থ। সৃষ্টি অর্থ প্রস্তুত করা নয়, হওয়া :

সচেতন অস্তিত্বের নামরূপে সম্ভূত হওয়া।

এই সম্ভূতিতে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি জীবই ব্রহ্ম—দিব্যচেতনার লীলাতে নানা ভাবে রূপায়িত ব্রহ্ম, নিজেরই সঙ্গে নানা প্রকারের সম্বন্ধে সংযুক্ত; আর সত্তাতে প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবই সমগ্র ব্রহ্ম।

সাপেক্ষ জগতে নিজের অভিব্যক্তি থেকে ইচ্ছামত নিজেকে পিছনে সরিয়ে নেবার ক্ষমতা পরাৎপর ও বিশ্বময় ব্রহ্মের আছে। চেতনার একটা গৌণ ক্রিয়ার দ্বারা তিনি ব্যষ্টিকে বিশ্ব থেকে বিবিক্তভাবে এবং সাপেক্ষ জগৎকে নিরপেক্ষ কেবল থেকে পৃথক রূপে ধারণা করতে পারেন। বিচ্ছেদের এই প্রবেগ না থাকলে ব্যষ্টিসত্তা নিয়ত বিশ্বের মধ্যে নিজেকে হারাতে চাইত, পরাৎপরে বিলুপ্ত হবার প্রবণতা সাপেক্ষ জগতে অবিরত থাকত। এই ভাবে, ব্যষ্টির মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার একটা আশ্রয় আসে, যাতে সে নিজেকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ব্রহ্ম থেকে এবং অভিব্যক্ত বহুর অপর সব বিগ্রহ থেকে ভিন্ন মনে করে, একাত্মবোধ অপসারিত ক'রে ভেদদর্শী অহংবোধের মধ্যে সত্তার প্রকাশ প্রবর্তিত করে।

ব্যষ্টি জীব মনে করতে পারে যে, সে পরম অদ্বিতীয় থেকে নিত্য ভেদযুক্ত কিংবা নিত্যই তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ভেদযুক্ত ; অথবা সে তার চেতনাতে সম্পূর্ণরূপে একান্ত অভেদে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।* কিন্তু কখনই সে মনে করতে পারে না যে, তার সঙ্গে পরম একত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই, কারণ সে ধারণা বিশ্বের বা বিশ্বাতীতের সম্ভবপর কোন সত্যের অনুযায়ী হবে না।

ব্যষ্টিমনের এই তিনটি ভাব ব্রহ্মের তিনটি সত্যভাবের অনুরূপ; কিন্তু তিনটিকেই একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, অন্যোন্য-অনুপূরকস্বরূপ অপর দুটির সঙ্গে ছাড়া তার কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিচার বুদ্ধির কাছে তাদের যুগপৎ অবস্থান কষ্টসাধ্য হলেও, চেতনাতে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার অভিজ্ঞতাতে তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

এমনকি, ব্রহ্মের একত্বের কথাও যখন বলি তখনও স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাধির অতীত, বিকল্পাত্মক মনের

* এই হল বেদান্তের তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদ—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ।

নির্ণীত কোন তথ্য ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম বাস্তব সত্তা—সাপেক্ষাতীত, অনন্ত, অনির্বচনীয়। আমাদের চেতনার ধর্ম হল প্রতিরূপ ও প্রতীক নিয়ে কাজ করা, বস্তু-স্বরূপ বা সাপেক্ষাতীতকে সে ধারণা করতে পারে শুধু 'নেতি' 'নেতি' বলে, অনেকটা যেন সর্বশূন্যের মত, পরমকে আধার করে' এ-বিশ্বে যা কিছু আছে বলে মনে হয় সে-সবই বিসর্জন করে'। কিন্তু পরাৎপর ত শূন্যরূপী বা নাস্তি নন। এখানে কালে যা কিছু বর্তমান আছে এবং কালের ওপারে যা কিছু আছে তৎস্বরূপই ত সব।

একত্ব ত একটা প্রতিরূপ মাত্র, বহুত্বের সঙ্গে সম্বন্ধেই তার অস্তিত্ব। বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই সমভাবে পরম চিতের নিত্য শক্তি। বিদ্যাই হক অবিদ্যাই হক কোন একটাকে নিয়ে পরম জ্ঞান হয় না।
(৯-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

তবে, সব সম্বন্ধের নিগূঢ় ভিত্তি হল একত্ব, বহুত্ব নয়। একত্বই বহুত্বের উপাদান ও আধার, বহুত্ব একত্বের উপাদান বা আধার নয়।

সুতরাং, একত্বকে আমাদের ধারণা করতে হবে আত্মারূপে, সত্তার সারস্বভাবরূপে; আর বহুত্বকে দেখতে হবে সত্তার প্রতিচ্ছবিরূপে, হওয়া বা 'সম্ভূতি'রূপে। আগে সব পদার্থের এক পরমাত্মারূপে ব্রহ্মকে জানতে হবে, তারপর বহুর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেই এক সত্তার সব সম্ভূতি জ্ঞানে। কিন্তু সত্তা ও সম্ভূতি, ('আত্মন্' ও 'ভূতানি',) উভয়ই ব্রহ্ম; একেকে ব্রহ্ম ব'লে গ্রহণ করে অপর সবকে অবাস্তব, ব্রহ্ম নয়, বললে চলবে না। উভয়ই বাস্তব; একের বাস্তবত্ব উপাদানরূপী এবং সর্বাশ্রয়ী আর অপর-সবের বাস্তবত্ব যৌগিক এবং আশ্রিত।

দেবতাদের গতি

অক্ষর বা স্থাণুরূপে বিশ্বে নিজেকে রূপায়িত ক'রে, 'সৎ' বা অব্যয় অস্তিত্বের গুণে ব্রহ্ম হন পুরুষ, ভগবান, অধ্যাত্মসত্তা; আবার ক্ষর বা গতিশীলরূপে রূপায়িত করে' তাঁর কর্মপ্রবৃত্ত চেতনার সামর্থ্যের গুণে তিনিই হন 'প্রকৃতি', 'শক্তি', 'মায়া' বা স্বভাব, বল, জগৎতত্ত্ব।* এই

* 'প্রকৃতি' হল কার্যকরী স্বভাব বা নিসর্গ, তার প্রতিপক্ষ হল 'পুরুষ' বা চৈতন্যময় আত্মা, প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্রষ্টা সাক্ষী নিয়ন্তা ও ভোক্তা। 'শক্তি' হল বিশ্বপ্রভুর ('ঈশ্বর', 'দেব' বা 'পুরুষ'-এর) স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংবেদী স্বয়ংক্রিয় সামর্থ্য, প্রকৃতির ক্রিয়ার

দুটি তত্ত্বের খেলা নিয়েই হল বিশ্বের জীবন। দেবতারা হলেন বিশ্ব-ব্যাপারে এক পরমদেবের বিভূতিরূপে ব্রহ্মের নিজেকে প্রতিরূপিত করা; নির্ব্যক্তিক ক্রিয়াতে তাঁদের প্রকাশ হয় বিশ্ব-প্রকৃতির সব তত্ত্ব বা বৃত্তির নানাবিধ ক্রীড়ারূপে।

'অন্যান্' বা অপর সবকে পরের শ্লোকে 'সর্বাণি ভূতানি' বলা হয়েছে, সে হল সব সম্ভূতি, বহুর বিভক্ত চেতনাতে ব্রহ্মের নিজেকে প্রতিরূপিত করা।

বিশ্বে সবারই, এমন কি দেবতাদেরও প্রত্যেকের মনে হয় যেন তারা জগতের সাধারণ গতির সঙ্গে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আর সে লক্ষ্য তার বাহিরে অবস্থিত অথবা তখনকার মত তার নিজের সম্বন্ধে যা ধারণা, তার থেকে ভিন্নরূপ। সে লক্ষ্য ব্রহ্ম, কারণ, ব্রহ্মই আদি ও অন্ত, সকল গতির হেতু ও পরিণাম।

কিন্তু প্রকৃতির গতিসীমার মধ্যে চরম লক্ষ্যের ধারণা একটা বিভ্রম বই নয়। কারণ, ব্রহ্ম সাপেক্ষাতীত ও অনন্ত। ব্রহ্মকে পাবার প্রয়াসে দেবতারা যে-লক্ষ্যেই উপনীত হন না কেন, তাঁরা দেখেন যে, ব্রহ্ম সম্মুখে আরও দূরের সিদ্ধির দিকে অবিরত অগ্রসর হয়ে চলেছেন। প্রাতিভাসিক জগতে কোন বস্তুই সাপেক্ষধর্মী চেতনার কাছে সম্পূর্ণরূপে তৎস্বরূপ বলে প্রতীত হতে পারে না, সবই অজ্ঞেয়কে প্রতীকে প্রতিরূপিত করে মাত্র।

ব্রহ্মে সবই উপলব্ধ, আদি থেকেই বাস্তবরূপে সবই বর্তমান রয়েছে। নিসর্গপ্রবাহে 'অপর' সবের ধাবিত হবার তাৎপর্য হল ব্রহ্মে থেকে পূর্ব বর্তমান কোন বস্তুকে কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা দেশকালের ক্ষেত্রে 'প্র-কৃতি' বা ক্রমশঃ প্রকাশিত করা।

এমন কি, তাঁর বিশ্বময় সত্তাতেও ব্রহ্ম জগৎ-গতিকে অতিক্রম করে'

মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ হয়। 'মায়া' শব্দের বেদে প্রথম অর্থ ছিল সর্বাশ্রয়ী সৃষ্টিপর অনাদি জ্ঞান, 'পুরাণী প্রজ্ঞা'; পরে এ শব্দ আর একটা যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, চাতুর্য যাদুবিদ্যা বা বিভ্রম বোঝাতে। এই দ্বিতীয় অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে শুধু 'অপরা প্রকৃতি' বা নিম্নতর স্থূল নিসর্গের বিষয়ে যা দিব্যপ্রজ্ঞাকে অপ-সারিত করে' বিভাজনাত্মক অহংভাবের সব অভিজ্ঞতাতেই নিমগ্ন আছে। উপনিষদে 'মায়া' শব্দ প্রাচীন বৈদিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে: অবশ্য উপনিষদে এ শব্দের প্রয়োগ বিরল।

যান। কালের অতীত তিনি, নিজের মধ্যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সমকালে ধারণ করে' আছেন বলে' আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য কালের অন্ত অবধি তাঁকে ধাবিত হতে হয় না। দেশের অতীত তিনি, সাকার সকল দ্রব্যই একাধারে যুগপৎ ধারণ করে আছেন ব'লে আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য দেশের অন্ত অবধি তাঁকে যেতে হয় না। নিমিত্তের অতীত তিনি, সহজভাবে অবাধে——আপাত-দৃষ্টিতে যে কার্যকারণশৃঙ্খলে সে-সব গ্রথিত তার দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে—— সব পরিণাম ও সব সম্ভাব্যতা নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন। মহেশ্বররূপে সবই তৎস্বরূপের দ্বারা পূর্বেই সম্ভূত হয়ে আছে বলেই, পরে তাঁর বিভক্ত সব ব্যষ্টিবিভূতির দ্বারা জগৎ-গতিতে সে-সব সম্পূর্ণ হতে পারে।

প্রাণতত্ত্ব : মাতরিশ্বা ও জলরাশি

তাহলে জগৎ-গতিতে ব্রহ্মের নিহিত অভিপ্রায়টি কি?

বিশ্বপ্রাণরূপে তৎস্বরূপ নিজের প্রতিরূপ সমূহের দ্বারা, পরম সচেতন সত্তার নামরূপে জগৎ-গতি যে সুছন্দে কল্লোলিত সে সুষমা ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন। অজ্ঞেয়কে প্রতীকে প্রকাশ করবার এ একটা পদ্ধতি: এমনভাবে তার বিন্যাস করা হয়েছে যাতে চেতনার প্রতিস্তর নিজের অতীত অপর কিছুকে——তার গভীরের গভীরকে, তার আধারের আধারকে——প্রতিরূপিত করে। দিব্যচেতনার এ একটা লীলা,* তার নিজের তৃপ্তির জন্যই তার অস্তিত্ব, তাতে তৎস্বরূপের কোন বৃদ্ধি হয় না কারণ তিনি ত সর্বদাই পরিপূর্ণ। সচেতন সত্তার এ একটা প্রত্যক্ষ সত্য, তার অস্তিত্ব আছে সেই যথেষ্ট, তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন কোন উদ্দেশ্য নাই। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একটা ধারণা হয় কারণ, বিশ্বের সব আধারে অধিষ্ঠিত ব্যষ্টি জীবগণের কাছে বিশ্বের প্রকৃত স্ব-ভাব ক্রমশঃ বেশী করে উদ্ঘাটিত হয়; কারণ, পরম সত্তা তাঁর সব সম্ভূতির অন্তরে তাঁর স্বরূপ ক্রমশঃ উন্মুক্ত কারন, যাতে বহুত্বের মধ্যে থেকে প্রকৃত একত্ব আবির্ভূত হয়ে আমাদের চেতনার কাছে বহুত্বের তাৎপর্য সম্পূণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

* লীলার এ চিত্র হল বৈষ্ণবদের, সাধারণতঃ বিশ্বে ভগবানের বা পুরুষোত্তমের ক্রীড়ার বিষয়ে তা প্রযুক্ত হয়; কিন্তু সক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয়েও তা সমভাবেই প্রযোজ্য।

কোন ক্ষেত্রে, কি অবস্থাতে পরমসত্তা এভাবে নিজেকে প্রকটিত করবেন, বিশ্বব্যাপারে চেতনার জটিলতার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়।

কারণ চেতনা সরল বা সমসত্ত্ব নয়, তা সপ্ততন্ত্রী। অর্থাৎ, শুদ্ধসত্তা থেকে অবতরণ করে জড়ীয় সত্তা অবধি সজ্ঞান কর্মপ্রবৃত্তির সপ্ত প্রকারে বা সপ্ত পর্যায়ে তা রূপায়িত হয়। সেই সাতটির অন্যোন্য ক্রীড়াতে বিশ্ব-সৃষ্টি হয়, সব ক্রিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং সব সম্ভূতি বিরচিত হয়।

এই লীলা বা কর্মপ্রবৃত্তির নিত্য আধার ব্রহ্ম। দেশে ও কালে ব্রহ্মের আত্ম-বিস্তারই বিশ্ব।

এই আত্মবিস্তৃতিতে রূপনির্মাতা প্রকৃতিরূপে বা বিশ্বজননীরূপে ব্রহ্ম নিজেকে প্রতিরূপিত করেন; আমাদের কাছে তার প্রথম প্রতীতি হয় স্থূল জড় রূপে, আর তাকেই বলা হয় 'পৃথ্বী' বা ভূ-তত্ত্ব।

জড়ে বা স্থূল সত্তাতে ব্রহ্মের প্রতিরূপ হল 'মাতরিশ্বা' বা সার্বজনীন 'প্রাণ' বা ক্রিয়াশক্তি যা তার মধ্যে বিচরণ করে' অধ্যক্ষরূপে তার সমস্ত রূপায়ণ ও ব্যবস্থাপন আফলোদয় নিয়ন্ত্রিত করে।

জড়ের আচ্ছন্নতার মধ্যে, সপ্ততন্ত্রী চেতনা প্রতিষ্ঠা করে সার্বজনীন 'প্রাণ'; এবং সবপদার্থের এই মাতৃকা বা মূল তত্ত্বের উপর 'প্রাণের' বা কর্মপ্রবৃত্ত শক্তির ক্রিয়াতেই তার মধ্য থেকে বিবিধ আকার অভিব্যক্ত হয়; সব ক্রমপরিণতির সেই হল আধার।

যোগবাহ ভাব : জলরাশি

সুতরাং চিৎ-এর সাতটি উপাদান বিশ্বে কাজ করে।

সাধারণতঃ আমাদের সত্তাতে আমরা তার তিনটিকে জানি—দেহ-প্রাণ-মন। এই তিনটি উপাদানের দ্বারা আমাদের যে বিভক্ত পরিণামী অস্তিত্ব গঠিত হয় তার সামঞ্জস্য ক্ষণভঙ্গুর এবং তার কাজ হয় ভাবা-ভাবের সব শক্তির সংঘাতের দ্বারা ও জন্মমৃত্যুর কোটিদ্বয়ের মধ্যে। কারণ সমস্ত জীবনই হল অবিরাম জন্ম বা হওয়া, ('সম্ভূতি', 'সম্ভব', ১২, ১৪ শ্লোকের)। জন্মমাত্রই অবিরাম মৃত্যুর সঙ্গে বাঁধা, যা সম্ভূত হয়েছে নিত্য তার বিনাশ বা বিলোপ হয়, যাতে নূতনতর সম্ভূতিতে তার পরিণতি সম্ভবপর হতে পারে। সুতরাং, অস্তিত্বের এ ভাবকে 'মৃত্যু' নাম দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, প্রগতির পথে এ একটা অবস্থা, তা পার হতে হবে, তাকে অতিক্রম করতে হবে।

কারণ, এ অস্তিত্ব আমাদের সমগ্র সত্তা নয়, সুতরাং আমাদের শুদ্ধ সত্তাও নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে আমাদের অতিচেতন অস্তিত্ব আর তারও তিনটি উপাদান : 'সৎ', 'চিৎ', 'আনন্দ'।

'সৎ' হল আমাদের সত্তার সারস্বরূপ—বিশুদ্ধ, অনন্ত ও অবিভক্ত; তার বিপরীত হল জড়পদার্থের চিরচঞ্চলতার উপর স্থাপিত এই বিভাজ্য সত্তা। 'সৎ' হল জড় পদার্থের দিব্য অনুরূপ।

'চিৎ-তপস্' হল চেতনার বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় অবস্থাতেই সে স্বাধীন, তার সংকল্প সর্বজয়ী; তার বিপরীত হল আমাদের প্রাণের বাধাহত সব ক্রিয়াশক্তি,—জড় পদার্থ থেকে তাদের আহার্য* আহরণ করতে হয় বলে সে-পুষ্টির উপরে তাদের নির্ভর করতে হয়, তার দ্বারা তারা সীমাবদ্ধ। 'তপস্' হল এই নিম্নতর স্নায়বিক বা জৈব শক্তির দিব্য অনুরূপ।

'আনন্দ' হল পরম সুখ, শুদ্ধ সচেতন অস্তিত্বের ও শক্তির আনন্দ; তার বিপরীত হল সংবেদন ও ভাবাবেগময় জীবন, যা প্রাণ ও জড়ের বাহ্য সংস্পর্শের খেলার পুতুল, আর সে-সবের প্রিয়াপ্রিয় প্রতিক্রিয়ার—সুখদুঃখ-হর্ষবেদনার—দাস। 'আনন্দ' হল নিম্নতর ভাবময় ও সংবেদী সত্তার দিব্য প্রতিরূপ।

দিব্য সচ্চিদানন্দের নিজস্ব এই ঊর্ধ্বতর অস্তিত্ব একাত্মক ও স্বপ্রতিষ্ঠ, জন্মমৃত্যুর দ্বৈতরূপের দ্বারা তা বিভ্রান্ত নয়। সুতরাং তারই নাম 'অমৃতং' বা অমরত্ব; এই হল আমাদের সাধনার লক্ষ্য, মর্ত্য অবস্থা অতিক্রম করে' গেলে এই পরমসুখেরই ভাগী আমরা হব।

(১২, ১৪, ১৭, ১৮ শ্লোক)

ঊর্ধ্বতর দিব্য অস্তিত্বের সঙ্গে নিম্নতর মর্ত্য অস্তিত্বের সংযোগ সাধন করে 'বিজ্ঞান'—কারণময় ভাবনা বা অতিমানস জ্ঞান-ইচ্ছাশক্তি। এই বিজ্ঞানই+ মন প্রাণ দেহের অব্যবস্থিত সব ক্রিয়ার আশ্রয় হয়ে এবং

* এই জন্যই উপনিষদে জড় পদার্থকে 'অন্নং', আহার্য, বলা হয়েছে। আদিতে অবশ্য এ শব্দের অর্থ ছিল শুধু সত্তা বা পদার্থ।

+ 'বিজ্ঞান' মনের বস্তুবিবিক্ত ভাবনা বা ধারণা নয়, কিন্তু অতিমানস সত্য ভাবনা—সত্তার চেতনা বল ও আনন্দ, নিজের অস্তিত্বের সমস্ত সত্য ও সামর্থ্য সামান্য ও বিশেষ জ্ঞানে নিক্ষিপ্ত : তার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে রয়েছে আত্ম-অভিব্যক্তির

নিগূঢ়ভাবে সে-সব নিয়ন্ত্রিত করে' বিশ্বের যথাযথ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাব্য করে। বেদে একে সত্যং ঋতং বৃহৎ' বলা হয়েছে: 'সত্য', কারণ তা সব বস্তুর, বাহ্য প্রতিভাস সহ এবং তা থেকে মুক্ত, সত্যরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করে' প্রতিরূপিত করে; 'ঋত' বা ধর্ম, কারণ 'চিৎ'-এর সিদ্ধিপ্রদ ক্রিয়াশক্তি তার মধ্যে নিহিত আছে ব'লে সব বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সহকারে সবের অভিব্যক্তি সে সাধন করে; 'বৃহৎ', কারণ তার স্বরূপ হল অনন্ত বিশ্বধীর মতন, সব বিশিষ্ট ক্রিয়া যার অন্তর্ভুক্ত।

পরমসত্য রূপে 'বিজ্ঞান' বিভক্ত চেতনাকে আবার এক অদ্বিতীয়ের দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। বহুত্বের মধ্যেও সে সববস্তুর সত্যরূপ দর্শন করে। নিম্নতর বিভক্ত বুদ্ধির দিব্য অনুরূপ হল 'বিজ্ঞান'।

চিৎ-এর এই সাতটি সামর্থ্যকে বেদের ঋষিরা 'অপস্' বা জলরাশি বলতেন; তাদের তাঁরা চিত্রিত করেছেন যেন মানব সত্তার অন্তরস্থিত সর্বসাধারণ চেতনার সমুদ্র* থেকে উদ্ভূত বা তার দিকে প্রবাহিত সব স্রোত।

এই তত্ত্বগুলি সবই বিশ্বে নিত্য ও অবিচ্ছেদ্যভাবে একসঙ্গে বর্তমান আছে; তবে তার প্রত্যেকটি অপর যে-কোনটির মধ্যে নিবর্তিত হয়ে আবার নূতন করে অভিব্যক্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্থূল প্রকৃতির মধ্যে সবগুলিই নিবর্তিত রয়েছে এবং তার মধ্যে থেকে সবগুলিকেই অবশ্য আবার অভি-ব্যক্ত হতে হবে। শুদ্ধ অনন্ত সত্তার মধ্যে সব তত্ত্বই প্রত্যাহৃত হতে পারে, আবার তার মধ্যে থেকে প্রকটিতও হতে পারে।

সুতরাং একের মধ্যে বহুর এবং বহুর মধ্যে একের একবার সম্পুটিত আবার অভিব্যক্ত হওয়াই হল বিশ্ব-সংসৃতির নিত্য আবর্তন চক্র।

ব্রহ্মদর্শন

এ উপনিষদ শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে বিশ্বে ও আমাদের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সংকল্প এবং সব সম্ভাব্যতার এবং সব বিগ্রহের সামর্থ্য। একাধারে এ হল যে ক্ষমতা কাজ করে, সংকল্প সাধন করে এবং যে জ্ঞান তার নিজের ক্রিয়ার অধীশ্বর।

* 'হৃদ্যসমুদ্র'; ঋগ্বেদ ৪।৫৮।৫

অক্ষর ও ক্ষর, স্থাণু এবং গতিশীল, এই উভয়রূপে সমগ্রভাবে ব্রহ্মকে জানতে হবে। নিত্য অব্যয় পরমাত্মাতে তথা বিশ্বে ও সাপেক্ষ সব বিকারী অভিব্যক্তির মধ্যে, উভয়ত্র ব্রহ্মকে দেখতে হবে।

কি দূরের কি নিকটের, স্মরণাতীত অতীতে, সাক্ষাৎ বর্তমানে বা অনন্ত ভবিষ্যতে, তার সব আধেয় ও সব ব্যাপারসহ দেশে কালে অবস্থিত সব পদার্থকেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

দেশ-কাল-নিমিত্তের অতিশয়ী, বিশ্বের এবং ব্যষ্টির অতি-স্থিত আধার ও আশ্রয়রূপেও ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে। আবার, ব্রহ্মকে বিশ্বের এবং বিশ্বে বিধৃত সব বস্তুর অন্তর্যামী স্বামীরূপেও অনুভব করতে হবে।

এই সর্বাতীত, বিশ্বময় ও ব্যষ্টিব্রহ্মই—মহেশ্বর, সর্বাধার ও সর্বান্তর্যামী পরমাত্মাই একমাত্র জ্ঞেয়। তাঁকে উপলব্ধি করাই হল পূর্ণ পরিণতির জন্য প্রথম প্রয়োজন এবং অমরত্বের অনন্য পথ।

দ্বিতীয় প্রবাহ

(২) আত্ম-উপলব্ধি

(শ্লোক ৬, ৭)

আত্ম উপলব্ধি

ব্রহ্মের প্রত্যক্ রূপ হল আত্মন্, বা বিশ্বে যা কিছু আছে সে সবের অব্যয় অস্তিত্ব। আমাদের মধ্যে বিকারশীল যা কিছু আছে––মন-প্রাণ-দেহ, স্বভাব-চরিত্র, কর্ম,––তার কিছুই আমাদের প্রকৃত অবিকারী অধ্যাত্ম সত্তা নয়, সে-সবই 'জগতী' বা বিশ্বসংসৃতিতে পরমাত্মার সম্ভূতি।

সুতরাং প্রকৃতিতে সজীব নির্জীব যা কিছু আছে সে সবই হল এক সর্বভূতাত্মার সম্ভূতি। এই সব বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থ ও জীব সেই এক অবিভাজ্য অস্তিত্ব বই নয়। প্রত্যেককেই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

ব্যষ্টিজীব যখন তার প্রতি অংশে এই একত্ব উপলব্ধি করে তখন সে হয় পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, অহং ও দ্বন্দ্ববোধ থেকে মুক্ত, দিব্য পরমসুখের সমগ্র অধিকারী।

আত্মন্

আমাদের প্রকৃত সত্তা 'আত্মন্'ই ব্রহ্ম: বিশুদ্ধ অবিভাজ্য সত্তা, স্বয়ং-প্রভ, চেতনাতে আত্মসমাহৃতি, শক্তিতে আত্মসমাহিত, আত্মানন্দময়। তার অস্তিত্বই হল জ্যোতি ও পরম সুখ। তা কালাতীত, দেশাতীত, মুক্ত।

ত্রিবৃৎ পুরুষ *

সৃষ্ট জীবের চেতনার কাছে, 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' বা সত্তা ও স্বভাবের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারে, আত্মার প্রকাশ হয় তিন ভাবে: 'অক্ষর'––অচল ও অব্যয়, 'ক্ষর'––সচল ও বিকারী, এবং 'পর' বা 'উত্তম'––পরম বা ঊর্ধ্বতম।

* গীতা ১৫ অধ্যায় ১৬, ১৭ শ্লোক এবং ১৩শ অধ্যায় সাধারণভাবে, দ্রষ্টব্য।

'ক্ষর পুরুষ' হল আত্মন্ যে-ভাব ধরে' প্রকৃতির গতি ও বিকার প্রতিফলিত করে' তার অংশ নেয়; গতির চেতনাতে নিমজ্জিত থাকে বলে' মনে হয় যেন তার মধ্যেই তার জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি, বিকার প্রগতি হচ্ছে। ক্ষররূপে আত্মন্ বিকার বিভাজন দ্বৈতবোধ উপভোগ করে, তার নিজের সব বিকৃতি গোপনে নিয়ন্ত্রিত করে---যদিও মনে হয় যেন সে সবের দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সুখ-দুঃখ এবং শুভাশুভের সব দ্বন্দ্ব উপভোগ করে---যদিও মনে হয় যেন সে সবেরই সে দাস; যে প্রকৃতির সৃষ্টি বলে তাকে মনে হয়, তারই সে ভর্তা ও আশ্রয়। কারণ সব অবস্থাতে আত্মা প্রভু ও ঈশ্বর কখনও তার অন্যথা হয় না।

'অক্ষর পুরুষ' হল আত্মনের যে-ভাব প্রকৃতির গতিবৃত্তি ও বিকারের প্রতি উদাসীন, শান্ত, বিশুদ্ধ, নিরপেক্ষ, তটস্থ, সে সবের দ্রষ্টা কিন্তু ভাগী নয়, তুঙ্গস্থ যেন শিখরাসীন, সে প্রবাহে নিমজ্জিত নয়। এই শান্ত আত্মন্ই অচঞ্চল অবিকারী নভস্তলের মত চিরচঞ্চল বারিরাশিকে ঊর্ধ্ব থেকে দর্শন করে। অক্ষরই ক্ষরের নিগূঢ় মুক্তির রূপ।

'পরপুরুষ' বা 'পুরুষোত্তম' হল আত্মনের যে-ভাব স্থিতি ও গতি উভয়েরই ভোক্তা ও আধার কিন্তু কোন ভাবের দ্বারাই বিশেষিত বা সীমিত নয়। সে-ই মহেশ্বর, ব্রহ্ম, সর্বময়, অনির্দেশ্য ও অজ্ঞেয়।

ক্ষর ও অক্ষর, বিকারী ও অবিকারী উভয় ভাবের মধ্যেই এই পর-মাত্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে।

প্রকৃতিস্থ পুরুষ *

প্রকৃতির সপ্তপর্ব গতিতে, ব্যষ্টিজীবে চেতনার প্রবলতম তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্নভাবে আত্মন্ নিজেকে প্রতিরূপিত করেন।

দৈহিক চেতনাতে আত্মনের হয় অন্নময় পুরুষ বা জড়ীয় সত্তার রূপ।

জৈব বা স্নায়বিক চেতনাতে আত্মনের হয় প্রাণময় পুরুষ বা জৈব কর্মপ্রবৃত্ত সত্তার রূপ।

মানসচেতনাতে আত্মনের হয় মনোময় পুরুষের রূপ।

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।১-৬

বুদ্ধির অতিশয়ী চেতনাতে সত্য বা ঋতচিৎই প্রধান তত্ত্ব, বেদে তাকে 'সত্যং ঋতং বৃহৎ' বলা হয়েছে; সেখানে আত্মনের হয় মহৎ আত্মা * বা বিজ্ঞানময় পুরুষের রূপ।

সার্বজনীন পরমসুখের বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মনের হয় সর্বসুখময় সর্বভোক্তা, সর্বজনয়িতা আনন্দময় পুরুষের রূপ।

অনন্ত দিব্য আত্মজ্ঞান, যা একাধারে অনন্ত সর্ববিধাত্রী ইচ্ছাশক্তি ('চিৎতপস্') তার বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মন্ হন সর্ববিৎ চৈতন্য পুরুষ যিনি বিশ্বের যোনি ও ঈশ্বর।

বিশুদ্ধ দিব্য অস্তিত্বের বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মন্ হন 'সৎপুরুষ' বা বিশুদ্ধ ভাগবত সত্তা।

মানবের প্রকৃত সত্তা সর্বান্তর্যামী মহেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে' সে পরমাত্মার এই সব অবস্থার যে-কোনটাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তার অভিজ্ঞতার অংশ নিতে পারে। শারীর সত্তা থেকে সর্বানন্দময় সত্তা অবধি তার যা ইচ্ছা সে তাই হতে পারে। এবং আনন্দময়ের মাধ্যমে 'চৈতন্য' ও 'সৎ' পুরুষেও সে প্রবেশ করতে পারে।

সচ্চিদানন্দ

সচ্চিদানন্দ ঊর্ধ্বতর পুরুষের অভিব্যক্তি; তাঁর স্বভাব হল অনন্ত সত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দ, সে-ই ঊর্ধ্বতর বা 'পরা' প্রকৃতি। মন-প্রাণ-দেহ হল নিম্নতর বা 'অপরা' প্রকৃতি।

সচ্চিদানন্দ ভাব হল বিশ্ব অস্তিত্বের ঊর্ধ্বতর অংশ বা 'পরার্ধ', তার স্বভাব হল 'অমৃতং' বা অমরত্ব; জড় মর্ত্য অস্তিত্বের ভাব হল নিম্নতর অংশ বা 'অপরার্ধ', তার স্বভাব হল মৃত্যু।

দেহাশ্রিত মনপ্রাণ মর্ত্য অবস্থাতে পড়ে আছে কারণ অজ্ঞানের জন্য তারা সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হলে তারা নিজেদের রূপান্তরিত করতে পারে: মন রূপান্তরিত হয় 'বিজ্ঞানে', বা সত্যের স্বভাবে, প্রাণ চৈতন্যের স্বভাবে, দেহ 'সৎ'-এর

* মহৎ আত্মা বা বিরাট সত্তার উল্লেখ উপনিষদে বহুস্থানে আছে; তাকে 'ভূমা'ও বলা হয়েছে।

স্বভাবে অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ-সত্তাতে। দেহে অবস্থান করে' যদি তা পরিপূর্ণ-রূপে সাধিত না হয় তাহলে অস্তিত্বের অপর কোন ক্ষেত্রে বা অন্য কোন লোকে, সূর্যকরোজ্জ্বল ভুবনে বা পরম সুখের অবস্থাতে, জীবাত্মা তার প্রকৃত স্বরূপে অবস্থান করে এবং দৈহিক ক্রমবিবর্তন সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে আবার জড়জগতে প্রত্যাবর্তন করে।

মানব বিবর্তনের লক্ষ্য হল এ দেহে অবস্থান ক'রে ক্রমশঃ পূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করা।

অবশ্য, জীবের পক্ষে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ভাবের মধ্যে প্রত্যাহৃতিও সম্ভবপর।

সচ্চিদানন্দরূপে পরমাত্মার উপলব্ধিই হল মানব-অস্তিত্বের উদ্দেশ্য।

আত্ম-উপলব্ধির জন্য প্রথম প্রয়োজন *

সচ্চিদানন্দ সর্বদাই পরমাত্মার বিশুদ্ধ ভাবের স্বরূপ; তিনি আত্ম-সমাহিতভাবে, যেন বিশ্ব থেকে বিবিক্তরূপে থাকতে পারেন আবার প্রভু-রূপে বিশ্বকে উর্ধ্বে থেকে দর্শন করতে, আলিঙ্গন করতে এবং অধিকার করতেও পারেন।

বস্তুতঃ, তিনি যুগপৎ এই উভয় ভাবেই অবস্থিত থাকেন (শ্লোক ৮)। বিরাট পুরুষ (৮ম শ্লোকের 'পরিভূ', পরম অদ্বিতীয় যিনি সর্বত্র সম্ভূত হন) বা বিশ্বময় অধ্যাত্মসত্তারূপে মহেশ্বর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; জগৎ-গতিতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন—জ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যষ্টিচেতনা ও ব্যষ্টিবিগ্রহের আধারভূত ব্রহ্মরূপে, আর অজ্ঞানের কাছে ব্যষ্টিভূত সসীম সত্তারূপে তিনি প্রতিভাত হন। সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে তিনি 'জীবাত্মা' বা ব্যষ্টি 'অহং'রূপে অভিব্যক্ত হন।

* এই প্রসঙ্গে এবং এই অনুচ্ছেদ ক'টিতে আত্মন্ সম্বন্ধে উপনিষদের প্রধান প্রধান সবগুলি ভাবই সংকলন করা হয়েছে যদিও তার সবগুলি এ উপনিষদে পরিষ্কার বলা হয়নি বা প্রসঙ্গক্রমেও উল্লেখ করা হয়নি; কারণ, এই সব শ্রুতির দার্শনিক তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে বা তাদের সঙ্গে, ঈশোপনিষদের চিন্তার ধারার যে বিস্তার এখানে করা হয়েছে, তার অন্যোন্যসম্বন্ধ বুঝতে হলে সে-সবের অবশ্য প্রয়োজন আছে।

মৃত্যু ও সীমার রাজত্বে আমাদের নিম্নতর অবস্থার দিক থেকে, পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ, মনের অতীত কিন্তু মনে প্রতিফলিত। মন বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও নিস্তব্ধ হলে তাঁর প্রতিবিম্ব হয় যথার্থ আর মন অবিশুদ্ধ, বিক্ষিপ্ত ও তমসাবৃত হলে সে প্রতিবিম্ব হয় বিকৃত, অজ্ঞানের কুটিল ক্রিয়ার অধীন।

বিম্বগ্রাহী মনের অবস্থা অনুসারে আমাদের বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানলাভ হতে পারে অথবা সত্য-মিথ্যা, যাথার্থ্য-ভ্রমের দ্বৈতের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ ও বিকৃতিও হতে পারে; অহংলেশহীন ইচ্ছার বিশুদ্ধ ক্রিয়াও হতে পারে অথবা পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের দ্বৈতের মধ্যে ইচ্ছার আবরণ ও অপগতিও হতে পারে; পরমানন্দের বিশুদ্ধ ভাব ও অবিমিশ্র লীলাও হতে পারে অথবা ন্যায় ও অন্যায় সম্ভোগ, সুখদুঃখ ও হর্ষশোকের দ্বৈতের মধ্যে তার আবরণ ও উন্মার্গগমনও হতে পারে।

অধ্যাত্মসত্তাকে সীমা দিয়ে ভাগ ক'রে মানস অহঙ্কারই এই বিকৃতির সৃষ্টি করে। সমগ্র সমষ্টি-অস্তিত্বের ও বহু ব্যষ্টি-অস্তিত্বের সঙ্গে একত্ব বর্জন ক'রে ক্ষরপুরুষ নিজেকে পৃথক দেহে, ব্যষ্টি জীবনে এবং অহংবুদ্ধ মনে রূপায়িত, প্রকৃতির বিকারী বিগ্রহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তাতেই এই সীমার আরোপ হয়।

জগৎ-গতিতে ক্রমবিবর্তনের অতীত ধারাতে অর্জিত একটা দৃঢ় অভ্যাসের ফলে, বুদ্ধি এই একত্ববোধ হারায়, পার্থক্যবোধ মানব সংবিতের অপরিবর্তনীয় ধর্ম নয়। আত্ম-উপলব্ধির জন্য প্রথম প্রয়োজন হল এই পার্থক্যবোধ অপনয়ন করা এবং ক্রমশঃ তার সম্পূর্ণ নিরসন করা।

প্রজ্ঞা, পরিপূর্ণতা ও পরমানন্দের সূত্রপাত হল পরম একের দর্শন।

আত্ম-উপলব্ধির ক্রমপর্যায়

সর্বময়ের দর্শন

বিশ্বের অপর সব অস্তিত্বের সঙ্গে একত্ববোধ হল আত্ম-উপলব্ধির প্রথম সোপান। তার আদিম অপরিণত রূপ হল অপর সবকে বুঝতে এবং সবার সঙ্গে সহানুভূতি করতে চেষ্টা করা, অপরের প্রতি প্রেম মৈত্রী সমবেদনার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করবার প্রবৃত্তি এবং পরের জন্য কাজ করবার প্রেরণা।

এইভাবে উপলব্ধ একত্ব হয় বহুত্বের অনুগামী—সমধর্মী বহু বস্তু একত্র আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত একত্ব সৃষ্টি না করে' বরং একটা সমষ্টি বা

সংঘ গঠন করে। চেতনার কাছে বহুর প্রকৃত অস্তিত্ব থেকেই যায়, একত্ব হয় তার ফল মাত্র।

প্রকৃত জ্ঞানের আরম্ভ হয় স্বরূপ একত্বের অনুভূতি থেকে,---যেন এক জড়, এক প্রাণ, এক মন, এক আত্মা বহু বিগ্রহে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত।

এই জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন সবের এই আত্মাকে সচ্চিদানন্দ বলে প্রতীতি হয়। কারণ, তখন জড়কে দেখা যায় প্রাণের একটা লীলা বলে, প্রাণকে দেখা যায় স্থূল উপাদানে মনের তেজ সঞ্চারের একটা ক্রীড়া বলে, মনকে দেখা যায় সত্যের বা বীজভাবনা ঋতচিতের বিচিত্রভাবে সত্তার তত্ত্বকে সম্ভবপর সকল মনোময় রূপে প্রতিরূপিত করবার একটা খেলা বলে; সত্যকে দেখা যায় সচ্চিদানন্দের লীলা বলে আর সচ্চিদা-নন্দকে দেখা যায় অজ্ঞেয় পরব্রহ্মের বা পরমপুরুষের আত্মঅভিব্যক্তিরূপে।

আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, সবদেহেই দেহী বা জীবাত্মারূপে সেই এক অধ্যাত্মসত্তা বা সচ্চিদানন্দ নিজেকে ব্যষ্টি সংবিতে বহুসংখ্যায় রূপায়িত করেছেন। আরও দেখি যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি মন-প্রাণ-দেহই পরব্রহ্মের বিভু অস্তিত্বে সেই এক অদ্বিতীয় আত্মার ভিন্ন ভিন্ন সক্রিয় বিগ্রহ।

এই হল পরমাত্মাতে সর্বভূত দর্শন ও সর্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন; পূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য এবং পূর্ণ সুখ ও শান্তির এই হল ভিত্তি।

কারণ এ অনুভূতি হলে, তার পূর্ণতা ও তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টি মনোবৃত্তি থেকে সব 'জুগুপ্সা' দূর হয়; অর্থাৎ বিরাগ, সঙ্কোচ, প্রতিকূলতা, দ্বেষ, হিংসা, ভয় ইত্যাদি যে-সব ভাবের বিকৃতি জন্মে বিভাজন থেকে এবং পরিবেশের সব সত্তার ও পদার্থের প্রতি ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে, সে সবই দূর হয়। আত্মার পূর্ণ সমত্ব* প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্ভূতিতে ভগবদ্দর্শন

দর্শনই যথেষ্ট নয়, অন্তরে যা দর্শন হয়েছে তা হতে হবে। সমগ্র

* এই অবস্থাকে গীতাতে 'সমত্ব' বলা হয়েছে। 'জুগুপ্সা' হল নিজের সীমিত ব্যষ্টি বিগ্রহের সঙ্গে বাহ্য সংস্পর্শের সঙ্গতির অভাববোধ থেকে জাত বিরাগের ভাব আর তার ফলে শোক, ভয়, ঘৃণা, অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া। এর বিপরীত হল অনুরাগ, যার থেকে বাসনা ও আসক্তির উদ্ভব হয়। অনুরাগ-বিরাগ অপসারিত হলে সমত্ব আসে।

আভ্যন্তর জীবনকে পরিবর্তিত করতে হবে, বুদ্ধি যা বুঝেছে বা অন্তর্দৃষ্টি যা দেখেছে, সত্তার প্রত্যেক অংশে তাকে রূপায়িত করতে হবে।

প্রথমতঃ ব্যষ্টিজীবকে ('একত্বং অনুপশ্যতঃ') একত্বদর্শনের দ্বারা বিশ্বাত্মাতে প্রসারিত করতে হবে এবং ('বিজানতঃ') পূর্ণজ্ঞান থেকে জাত সববস্তুর যথাযথ অন্যোন্যসম্বন্ধের পরিপূর্ণ জ্ঞান অনুসারে, নিজের চিন্তা ভাবাবেগ সংবেদন সব সুব্যবস্থিত করতে হবে; তারপর ('সর্বাণি ভূতানি অভূৎ') পরমচেতনার যে ক্রিয়ার দ্বারা নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ এক অদ্বিতীয় সত্তা নিজের মধ্যে বিশ্বের বহুত্ব অভিব্যক্ত করেন, ব্যষ্টি সত্তাতে সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

অর্থাৎ, অহংভাবিত দৃষ্টিতে মানব দেখে জগতে অগণিত পৃথক পৃথক জীব, প্রত্যেকেই বিবিক্তভাবে নিজ স্বরূপে অবস্থিত এবং বিশ্ব থেকে ও অপর সব জীবের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব সুবিধা আদায় করতে যত্নবান; কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বে দেখেন নিজেকে, একমাত্র দেহীরূপে তিনি অসংখ্য অস্তিত্বের মধ্যে বাস করেন, আর সে-সব অস্তিত্বও তিনি নিজেই, সবকে তিনিই আশ্রয় দেন, নিরপেক্ষভাবে সবকে সাহায্য করেন; পূর্বনির্দিষ্ট সব প্রথম ধর্ম অনুসারে অনাদিকাল থেকে সম্ভূতির বিরাট সুসঙ্গতি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করেন এবং দিব্য চরিতার্থতার পথে তাকে পরিচালিত ক'রে সে প্রগতির শেষপদ, সচ্চিদানন্দ বা অমৃতত্ব অবধি নিয়ে যান। এই হল সমগ্র জগৎ-গতিতে অনুপ্রবিষ্ট সর্বেশ্বররূপী পরমাত্মার বিশ্বদর্শনের রূপ। ব্যষ্টিজীবকে ক্ষুদ্র অহংভাবিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে দিব্য পরম ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী অঙ্গীকার ক'রে, সেই উপলব্ধির মধ্যে বাস করতে হবে।

সুতরাং, 'সোহহং' অথবা 'আমিই সেই', এই পরম একত্ববোধে বিশ্বাতীত পরমাত্মা বা অদ্বিতীয় একত্বের জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সজ্ঞান অস্তিত্বকে প্রসারিত ক'রে নিখিল বিশ্বের বহুত্বকে সমগ্ররূপে আলিঙ্গন করা আবশ্যক।

এই হল ঈশোপনিষদের দ্বিদল বা সমন্বয়ী আদর্শ: যুগপৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা এক ও বহুকে সাদরে গ্রহণ করা, বিশ্বে বাস করা কিন্তু তার মর্ত্য ধর্মকে অমৃতের সংজ্ঞাতে পরিবর্তিত করা, জন্মরাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও শান্তিকে জন্মের ও কর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুগপৎ বরণ করা। (শ্লোক ৯-১৪)

নিম্নতর সত্তার প্রত্যেক অংশকেই এই উপলব্ধিতে সম্মত হতে

হবে, শুধু বুদ্ধি নিয়ে বোঝাই যথেষ্ট নয়। হৃদয়কে বিশ্বজনীন প্রেম ও আনন্দ গ্রহণ করতে হবে, ইন্দ্রিয়মানসকে সর্বত্র ভগবানের ও পরমাত্মার সংবেদন চাইতে হবে, প্রাণকে বিশ্বব্যাপারের সমগ্র লক্ষ্য এবং সমস্ত কর্ম-প্রবৃত্তি নিজের সত্তার অংশ বলে বুঝতে হবে।

কর্মপ্রবৃত্ত আনন্দ

এই উপলব্ধিই হল পরিপূর্ণ আত্যন্তিক আনন্দ, তাতে কর্ম অঙ্গীকার করা হয়, কিন্তু শোক-মোহ থেকে মুক্ত হয়ে।

মোহের কোন সম্ভাবনা থাকে না; কারণ সর্বভূতের পশ্চাতে অজ্ঞেয়ের অনুভূতি অধিগত হয়েছে বলে জীব আর সম্ভূতিতে আসক্ত থাকে না, কিংবা তার নিজস্ব একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে বা নিজগুণে তাকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে ক'রে বিশ্বের কোন বিশেষ পদার্থকেই আর অনপেক্ষ মর্যাদা দেয় না। সবই উপভোগ্য, সবেরই মূল্য আছে পরমাত্মার অভিব্যক্তি বলে এবং তাতে অভিব্যক্ত পরমাত্মার প্রসাদে, কিন্তু কোন বস্তুরই নিজস্ব কোন মূল্যই নাই।* বাসনা বিভ্রম দূর হয়, বিভ্রমের স্থলে আসে জ্ঞান আর বাসনার স্থলে আসে বিশ্বজনীন স্বামিত্বের ক্রিয়াশীল দিব্যানন্দ।

দুঃখশোকের কোন সম্ভাবনা থাকে না; কারণ সবই দৃষ্ট হয় সচ্চিদা-নন্দরূপে, সুতরাং অনন্ত সজ্ঞান অস্তিত্বের, অনন্ত ইচ্ছাশক্তির ও অনন্ত সুখের সংজ্ঞাতে। সুতরাং, দেখা যায় যে, দুঃখ-বেদনাও আনন্দের বিকৃত রূপ; আর দুঃখ-বেদনা যে-আনন্দকে আচ্ছাদন করে রাখে এবং যে-আনন্দের জন্য নিম্নতর অস্তিত্বকে প্রস্তুত করে, (কেননা, ক্রমপরিণতিতে আমরা দুঃখকষ্টের দ্বারাই বল ও সুখের জন্য প্রস্তুত হই) এভাবে মুক্ত ও সংসিদ্ধ জীবেরা পূর্বেই সে আনন্দ অর্জন, আস্বাদন ও উপভোগ করে-ছেন; কারণ, এ সব যে নিত্য সদ্বস্তুর বাহ্যরূপ তাঁরা তাকে লাভ করেছেন।

এই ভাবে ব্রহ্মের সমগ্র জ্ঞানের দ্বারা, 'ঈশ' ও 'জগতী', বিশ্ব ও ভগ-বানের একত্ব উপলব্ধি ক'রে শুদ্ধ পরাত্মনে এবং অসম্ভূতিতে অধিরোহণের ফলে বাসনা ও বিভ্রম পরিত্যাগ ক'রেও, সর্বভূতে অবস্থিত সচ্চিদানন্দের সঙ্গে তাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুক্ত একাত্মতার ফলে, অভিব্যক্ত সব বস্তুর মধ্য দিয়ে বিশ্বে ভগবানের আনন্দ লাভ করা সম্ভবপর হয়।

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২।৪।৫, ৪।৫।৬

উপসংহার

সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রবাহে উপনিষদের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। প্রথম শ্লোকার্ধে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে সব জীবই হল সব বস্তুর অন্তর্নিবাসী ঈশ্বর এবং সব বস্তুই হল বিশ্বের অভ্যন্তরে বিশ্ব, সাধারণ গতির মধ্যে বিশেষ গতি; ব্রহ্মের সমগ্র একত্বের সূত্রে সে উক্তির এখানে ব্যাখ্যা করা হল---ব্যষ্টি সত্তাতে অবস্থিত হয়েও ব্রহ্ম বিশ্বাতীত ও বিশ্বময়, একে বহু ও বহুতে এক, স্থাণু ও গতিশীল, সব বৈপরীত্য তিনি অতিক্রম করেন, সমন্বয় করেন। দ্বিতীয় শ্লোকার্ধে, অধ্যাত্মসত্তাতে সার্বজনীন ভোগের জন্য অবশ্য প্রয়োজন ব'লে, অন্তরে সার্বজনীন বাসনা বর্জন করা দিব্য জীবনের নিয়মরূপে নির্ধারিত হয়েছে; আর তার ব্যাখ্যা করা হল আত্ম-উপলব্ধির অবস্থা দিয়ে,---স্বতন্ত্র সর্বাতীত পরমাত্মাকে নিজের প্রকৃত-সত্তা বলে আর সেই পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপে উপলব্ধি করা, এবং বিশ্বকে সেই সচ্চিদানন্দের সম্ভূতি বলে দেখে, রাগ-দ্বেষ শোক-মোহের হেতু অজ্ঞানের আশ্রয় আর না নিয়ে, প্রকৃত জ্ঞানের আশ্রয়ে তাকে ভোগদখল করা।

তৃতীয় প্রবাহ

(১) ঈশ্বর

(শ্লোক ৮)

'সঃ'

এ উপনিষদের বিচারের তৃতীয় প্রবাহে কর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্লোকে সাধারণভাবে এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন আরও বিশেষভাবে সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল ব্রহ্ম বা মহেশ্বর-রূপে পরমাত্মার ধারণার উপর; 'ঈশ', 'পরঃ' 'পুরুষঃ', 'সঃ', ব্যক্তিত্বের যিনি মূল কারণ, গুণের যিনি আঁধার এবং যিনি শাশ্বত কাল ব্যেপে তাঁরই আত্মসত্তার অভ্যন্তরে কল্পিত ও রূপায়িত জগৎগতির ছন্দ ও সব-লোকের বিন্যাসক্রম তাঁর কর্মের নিয়মে শাসন করেন।

একটা ভুল ধারণা আছে যে, উপনিষদের শিক্ষাতে একমাত্র সত্য অস্তিত্ব হল নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, বিভূতিহীন উপাধিহীন নির্গুণ ভগবান। বরং তার বাণী হল যে, এক পরম অজ্ঞেয় আমাদের কাছে সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপে অভিব্যক্ত হন। অত্যন্ত সাধারণ ও ব্যাপকভাবে এই অজ্ঞেয়ের কথা বলতে হলে ক্লীবলিঙ্গ 'তৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাতে সক্রিয় বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত সগুণভাবকে বর্জন করা হয় না (যথা, কোনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড)। তথাপি সগুণভাবের উপর জোর দেবার ইচ্ছা হলে প্রায়ই পুংলিঙ্গ 'সঃ' শব্দ ব্যবহৃত হয় অথবা কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যেমন, দেব, ভগবান, দৈবত অথবা পুরুষ, সজ্ঞান অধ্যাত্মসত্তা, প্রকৃতি বা মায়া যাঁর কার্যকরী শক্তি।

এ উপনিষদে পূর্বেই ব্রহ্মকে বহুবিভাবে ও বহুরূপে অভিব্যক্ত এক-মাত্র সদ্বস্তু বলা হয়েছে, আন্তরভাবে তিনি পরমাত্মা, সর্বভূত যে অদ্বিতীয় সত্তার বিভূতি এবং যাঁকে আমাদের মধ্যে সববস্তুর অতীতরূপে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে; এখন কথঞ্চিৎ বাহ্যভাবে সেই ব্রহ্মকেই বলা হল ঈশ্বর, যিনি নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেন আবার তার মধ্যে বাস করেন।

তিনি নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সব বিগ্রহের অন্তর্নিবাসী মহেশ্বর, 'ঈশঃ', (যাঁর নামে এ উপনিষদের আরম্ভ) এবং 'ব্রহ্ম', পরমাত্মা,

অভেদ; এবং (পরে দেখব ১৬ শ্লোকে) বিশ্বময় পুরুষের সঙ্গেও তাঁর কোন ভেদ নাই ('যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি', ওই ওই যে পুরুষ সেও আমি)। সববস্তু সবসত্তা হয়েছেন তিনিই—সেই পরম সচেতন সত্তা, একমাত্র সৎ ও স্বয়ম্ভূ; তিনি যা হয়েছেন সে সবের তিনিই প্রভু ও ভোক্তা। এখন এ উপনিষদে আমরা যাকে বিশ্ব বলি, ভগবানের সেই সম্ভূতির প্রকৃতি ও বিকাশপদ্ধতি, তার সব সাধারণ ধর্ম সূত্রিত হবে। কারণ, মৃত্যু ও অমরত্বের কোটিদ্বয় সম্বন্ধে বেদের শিক্ষা, অজ্ঞানের অস্তিত্বের হেতু এবং বিশ্বে কর্মের আবশ্যকতা নির্ভর করে এই ধারণার উপর।

যোগবাহ ভাব

ভগবানের সগুণত্ব

বেদান্তের 'সঃ', ভগবান, দেব বা ঈশ্বরের ভাবনাকে সগুণ ভগবান সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাসের সব চল্‌তি ধারণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। সাধারণতঃ গুণময়ত্বকে ব্যক্তিত্বের সমার্থক বলে নেওয়া হয়; এবং সগুণ ভগবান সম্বন্ধে প্রাকৃতজনের ধারণা হল, স্বভাবে অতিকায় ব্যষ্টি মানবের মত, তবে পৃথক, বৃহত্তর মহত্তর ও সর্বগ্রাসী। মানুষের মধ্যে ও মানুষের কাছে ব্রহ্মের মানবরূপে অভিব্যক্তি বেদান্ত স্বীকার করে বটে কিন্তু তাকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব বলে গ্রহণ করে না।

ভগবান সচ্চিদানন্দরূপী। তাঁর আত্মপ্রকাশ হয় অন্তহীন অস্তিত্বরূপে, সে অস্তিত্বের সারস্বরূপ হল চেতনা, আর সে চেতনার সারস্বরূপ হল আনন্দ, আত্মরতি। আনন্দই যেন নিজের বৈচিত্র্য অবগত হতে এবং নিজের বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে এই বিশ্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সব ত বস্তুবিচ্ছিন্ন সংজ্ঞা; বস্তুবিচ্ছিন্ন ধারণা ত আর নিজে থেকে প্রকৃত বস্তুরূপ উৎপাদন করতে পারে না। এসব নির্গুণ অবস্থা, নির্গুণ অবস্থা থেকে ত আর স্বতঃ সগুণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয় না।

সচ্চিদানন্দের অভিব্যক্তি বিচার করলে এ কথা আরও স্পষ্ট হবে। সে অভিব্যক্তিতে আনন্দ রূপান্তরিত হয় প্রেমে, চেতনা বুদ্ধিগ্রাহ্য পরমজ্ঞান ও কার্যকরী পরাশক্তির যুগ্ম সংজ্ঞাতে, আর অস্তিত্ব সত্তাতে অর্থাৎ পরম-পুরুষ ও মূলপদার্থে। কিন্তু প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ না হলে প্রেম অপূর্ণ থাকে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা না হলে জ্ঞান অপূর্ণ থাকে, কর্তা ও ক্রিয়া না হলে শক্তি অপূর্ণ থাকে, দ্রষ্টা ও উপাদানরূপী পুরুষ না হলে পদার্থ অপূর্ণ

থাকে।

তার কারণ, মূল সংজ্ঞাগুলিও প্রকৃতপক্ষে বস্তুবিবিক্ত বা গুণাতীত নয়। ব্রহ্মানন্দে আনন্দের ভোক্তা একজন আছেন, ব্রহ্মচেতনাতে সংবেত্তা একজন আছেন, ব্রহ্মের অস্তিত্বে সৎপুরুষ একজন আছেন; কিন্তু ব্রহ্মের আনন্দ ও চেতনার বিষয় এবং তাঁর অস্তিত্বের মূলবস্তু ও উপাধি তিনিই স্বয়ং। পরমপুরুষে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এক, এবং সেই জন্যই আনন্দ-ভোক্তা-ভোগ্যও অবশ্যই এক।

ব্রহ্মের এই আত্মসংবিৎ ও আত্মানন্দের চেতনা-শক্তিতে, প্রকৃতি বা মায়াতে, ক্রিয়ার দুইটি ধারা আছে: আত্মসংহতিতে সমাহৃত এবং আত্ম-বিস্তৃতিতে বিক্ষেপী। সমাহৃতি শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের আর বিক্ষেপ সক্রিয় ব্রহ্মের নিজস্ব ধারা। স্বীয় অস্তিত্বের উপাধি ও উপাদানে স্বয়ম্ভুর এই বিকিরণকেই আমরা বলি ('ভুবনং', 'জগৎ') বিশ্বসম্ভূতি বা নিত্যগতি। ব্রহ্মই সব হন এবং ব্রহ্ম যা হন সে সবও ব্রহ্ম। প্রেমিক নিজেই প্রেমাস্পদ, কর্তার আত্মরূপায়ণই কর্ম, নিখিল বিশ্ব হল ঈশ্বরের দেহ ও ক্রিয়া।

সুতরাং, আমরা যখন অনন্ত অস্তিত্বের বস্তুবিবিক্ত বা গুণাতীত বিভাব বিচার করি তখন বলি 'তৎ' আর যখন আত্মচেতন আত্মানন্দময় সৎ-পুরুষের কথা বিচার করি তখন বলি 'সঃ'। এ দুটি ধারণার কোনটাই সম্পূর্ণ নয়। ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ নির্গুণ সব ধারণার অতীত, অজ্ঞেয়। আমাদের বাক্য থেকে সব উপাধি ও সংজ্ঞা বর্জন করতে হলে তাঁকে আমরা 'তৎ' বলি, আবার সমানই কঠোরভাবে নির্গুণত্ব বর্জন করবার ইচ্ছা বোঝাতে তাঁকে 'সঃ' বলি। 'তৎ' ও 'সঃ' অভিন্ন, দুই-ই সেই অনির্দেশ্য পরম অদ্বিতীয়।

বিশ্বে রয়েছে একত্ব-বহুত্বের অবিরাম সম্বন্ধ। তার প্রকাশ হয় বিশ্ব-পুরুষ ও বহু পুরুষরূপে; এবং এক বহুর মধ্যে, তথা বহুর সংখ্যাতীত বিগ্রহের মধ্যে, অনন্তবৈচিত্র্যময় অন্যোন্যসম্বন্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ-বত সত্তার লীলার দ্বারা, তাঁর নিজের অভিব্যক্ত সব আবাসে ঈশ্বরের অনুপ্রবেশের ধারার দ্বারা সে সব সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। প্রথম হয় বিভিন্ন ব্যষ্টিজীবের সজ্ঞান অন্যোন্যসম্বন্ধ, পরে তারা সেসব সম্বন্ধকে ঊর্ধ্বমুখী ক'রে পরমের সঙ্গে সজ্ঞান সম্বন্ধ স্থাপনের অবলম্বনরূপে ব্যবহার করে। পরমের সঙ্গে এইরূপে সম্বন্ধস্থাপনই আনুষ্ঠানিক ধর্মের কার্য ও উদ্দেশ্য, এই অপরিহার্য প্রয়োজন সাধনই সব ধর্মের সার্থকতা, সব ধর্মই এই

এক সত্য নানাভাবে প্রকাশ করে এবং এই এক লক্ষ্যে বিভিন্ন পথে গমন করে।

ব্যষ্টিজীবের কাছে সগুণ ঈশ্বর নানানামে, নানারূপে আবির্ভূত হন। এক হিসাবে এসব নামরূপ মানবচেতনার গড়া, অন্য হিসাবে সে সব ভগবানের প্রত্যাদিষ্ট নিত্য প্রতীক; এইভাবে বহুত্বচেতনার কাছে মনোময় আকারে মূর্ত হয়ে ভগবান তাকে নিজের একত্বে প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য করেন। *

সর্বতোগামী

সম অব্যয় ও নিত্য আনন্ত্যে আশ্রিত সাপেক্ষচেতনার যেসব সসীম ও সবিকারী ব্যাপারের সমষ্টিকে আমরা বিশ্ব বলি তার মধ্যে তিনিই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। 'স পর্যগাৎ'।

সুতরাং, এ আত্মবিস্তৃতিতে দুটি বিভাব দেখি; একটি হল বিশুদ্ধ অনন্ত নিরপেক্ষ অব্যয়ত্ব, অপরটি হল দেশে কালে অবস্থিত বিষয়ের সমষ্টি, যা নিমিত্তের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্যোন্যসম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ করে চলেছে। উভয়ই হল সেই এক অজ্ঞেয়, 'সঃ', পরম পুরুষের বিভিন্ন পরস্পর-অনুপূরক অভিব্যঞ্জনা।

অনন্ত অব্যয়ত্ব প্রকাশ করতে এ উপনিষদে সব ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে: 'শুক্রং', 'অকায়ং', 'অব্রণং' 'অস্নাবিরং', 'অপাপবিদ্ধং'। সেই পরাৎপরকেই হেতু-আধার-শাস্তারূপে এবং বিশ্বের পদার্থসমষ্টির ও তার প্রত্যেক পদার্থের ('জগত্যাং জগৎ') অধিষ্ঠাতারূপে প্রকাশ করতে চারটি পুংলিঙ্গ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে: 'কবিঃ', 'মনীষী', 'পরিভূঃ', বিশ্বযোনি এবং 'স্বয়ম্ভূঃ' স্বপ্রতিষ্ঠ বা 'স্বয়ং পরিণামী'।

অবশ্য জগতে লীলার স্থির গোপন আশ্রয় সেই অব্যয় বই নয়, অপক্ষপাতে সমভাবে তিনিই সব বস্তুতে পরিব্যাপ্ত ('সমং ব্রহ্ম' +), ক্রিয়াতে

* এই সব ধারণা যে মূলতঃ পরবর্তী হিন্দুধর্মের উদ্ভাবিত, সে কথা মনে করা ভুল। পরম একের বহুনামের ধারণা ঋগ্বেদের সমান প্রাচীন।

+ গীতা, ৫।১৯

কোন অংশ না নিয়ে নির্বিচারে তিনি সবকে আশ্রয় দেন। তাঁর নিত্য অব্যয়ত্বে তিনি বিম্নাতীত ও মুক্ত ব'লে, ঈশ্বর স্বচ্ছন্দে গতির লীলাতে নিজেকে প্রক্ষেপ করেন এবং নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বে তাঁর মধ্যস্থিত কবি যা দেখেছেন বা মনীষী যা ধারণা করেছেন সে লীলাতে তিনি সেই সবেই পরিণত হন। 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'।

শুদ্ধ অব্যয়

ঈশ্বরের শুদ্ধ অব্যয়ত্ব 'শুক্র' বা উজ্জ্বল। শুদ্ধ আত্মসংহত আত্ম-প্রতীতির দীপ্তি সে, প্রতিসরণের দ্বারা ভগ্ন নয় বা বর্ণরূপে বিকীর্ণ নয়। এ হল পরমপুরুষের বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, তাতে তাঁর তেজ বা ক্রিয়াশক্তি সংবৃত নিষ্ক্রিয়।

তা 'অকায়', অরূপ, অবিভাজ্য ও বিভাজনের লক্ষণহীন। সব বস্তুর মধ্যে সেই সমসত্ত্ব পরমপুরুষ, দেশকাল বিভাগে অখণ্ডিত, এক শুদ্ধ আত্মসচেতন কৈবল্য।

তা 'অব্রণ', কিণাঙ্করহিত অর্থাৎ দোষত্রুটি ছিদ্র বা অপূর্ণতাহীন। কোন বিকার বা পরিণাম তাঁকে স্পর্শ করে না বা প্রভাবিত করে না। সেসবের সম্বন্ধের সব সংঘর্ষ, সব ন্যূনাধিক্য বা হ্রাসবৃদ্ধি, সব অনুপ্রবেশ ও অন্যোন্যসঞ্চার,—সব খেলার সেই আশ্রয়। কারণ স্বতঃ সে অব্যয়ত্ব ক্রিয়াহীন, 'অচলঃ সনাতনঃ'।*

তা 'অস্নাবির', স্নায়ুরহিত। 'অব্রণ', কারণ তৎস্বরূপ তাঁর শক্তি প্রকাশ করেন না, বহুমুখী প্রণালীতে বলের প্রবাহ বিকিরণ করেন না, একস্থানে বলক্ষয় অন্যত্র বলবৃদ্ধি ক'রে পূরণ করেন না, অথবা প্রেমের সহায়ে বা বলপ্রয়োগে তাঁর অর্ধাঙ্গের বা অন্নের সন্ধান করেন না। বলবেগ সঞ্চলনের স্নায়ু তাঁর নাই, প্রাণশক্তির বা মাতরিশ্বার তেজরূপে তিনি নিজেকে বিকীর্ণ করেন না।

তা 'শুদ্ধ' 'অপাপবিদ্ধ'। আমরা যাকে পাপ বা অমঙ্গল বলি সে শুধু মাত্রার আধিক্য বা ন্যূনতা, অনুপযুক্ত স্থলে স্থাপনা, সামঞ্জস্যহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমত্বের দ্বারা সব কর্মের আশ্রয় হয়েও নিষ্ক্রিয়তার

* গীতা, ২।২৪

দ্বারা সচেতন পরমাত্মা তাঁর নিত্যমুক্তি ও নিত্য পবিত্রতা অটুট রাখেন। কারণ, তিনি অবিকৃত, সাক্ষীরূপে তিনি প্রকৃতির সব পরিণাম দর্শন করেন কিন্তু তার কোন অংশগ্রহণ করেন না, সে সবের কোন ভার বা ছাপ তাঁর উপর পড়ে না। 'ন লিপ্যতে'।

নিত্যমুক্ত পরমাত্মা

এই শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সঙ্গে কি সম্বন্ধ কর্মপ্রবৃত্ত ব্রহ্মের বা মানবাত্মার? অভেদ—উভয়ই সেই তৎস্বরূপ। ক্রিয়াতে পরমাত্মার স্বভাবে কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় শুধু বিভিন্ন বিগ্রহের স্বভাবে। কর্মপ্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত, যে অবস্থাতেই হ'ক না কেন, পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ, নিত্য পরিপূর্ণ ও নিত্য আনন্দময়।

পরমাত্মাই একাধারে সব বস্তু ও সর্বাতীত। মন যা নিয়ে লিপ্ত থাকে সে সব হল তিনি কোন বিশেষ দেশ-কালে নিজের প্রতিমারূপে যে আকার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি সেসবের অতিশয়ী। সীমাহীন সমগ্রতা নিত্য পরিপূর্ণ। সর্ব সমষ্টি ত্রুটিবিচ্যুতিহীন পূর্ণ সামঞ্জস্য। অংশকে সমগ্র বলে গ্রহণ করে যে দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ অজ্ঞান, সত্যকে সে প্রতিফলিত করে ভগ্ন বিকৃতরূপে, আর তা থেকেই সৃষ্ট হয় সীমাবন্ধন, অপূর্ণতা ও বিরোধের বোধ। দেখব পরে যে, ব্রহ্মের লীলাতে এ অজ্ঞানেরও একটা প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু অজ্ঞানকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে অমঙ্গলের জনক বলেই মনে হয়।

মনপ্রাণদেহকে তাদের উদ্ভব, সচ্চিদানন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অজ্ঞানের আবরণ। সে ছায়াতে আচ্ছন্ন হয় ব'লে অজ্ঞানের সৃষ্ট সব অমঙ্গলের দ্বারা মন নিজেকে বিদ্ধ বোধ করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দই দেহ-প্রাণ-মনের সব বিগ্রহকে আত্ম-অভিব্যক্তি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, সক্রিয় ব্রহ্মরূপে; সুতরাং সেসবের অভিজ্ঞতা তিনি সচ্চিদানন্দের দৃষ্টিতেই দেখেন। অমঙ্গলের দ্বারা তিনি বিদ্ধ হন না। কারণ, তিনিও সেই অদ্বিতীয়ই এবং সর্বত্র তিনি একত্বই দেখেন। তাঁর সৃষ্টির অবরপদরূপে তিনি অজ্ঞানকে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তিনি তার দ্বারা অভিভূত হন না।

মানবাত্মাও ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তারও পূর্ণস্বরূপ হল অবরপদরূপে অজ্ঞানের প্রযোক্তা সচ্চিদানন্দ। কিন্তু এই অবরপদের মধ্যে সে তার সব বাসনা কল্পনা প্রক্ষেপ করেছে, তার মধ্যে সব আবদ্ধ আর তারই

মধ্যে, সসীম মনে, সে তার দর্শনের কেন্দ্র, তার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিষ্ঠা করেছে। সে অপূর্ণতা এবং তার ফলে জাত অভাব-বিরোধ-বাসনা-দুঃখের বোধ সে তার নিজের উপর আরোপ করে। অন্তরালে অবস্থিত প্রকৃত মানবকে এসব বিভ্রাট স্পর্শ করে না, কিন্তু আপাত বাহ্যমানবকে তা বিচলিত করে। স্বাধীনতা ফিরে পেতে হলে তাকে তার পূর্ণতা ফিরে পেতে হবে, তার পরিপূর্ণ প্রকৃত সত্তা, অন্তরস্থ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তাহলেই সে, ঈশ্বরের মত, প্রকৃতির কর্মফলের সঙ্গে একাত্মতার ভ্রান্ত ধারণা স্বীকার না ক'রে প্রকৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। উপনিষদের বাণী, 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না, এই প্রত্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে, তাকে অন্তরস্থ শান্ত ব্রহ্মকে পেতে হবে। ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর এই উভয় বিভাবেই অধিষ্ঠিত, তাই তিনি বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েও নিজের কর্মে লিপ্ত না হয়ে বা তার দ্বারা সীমিত না হয়ে বিশ্বব্যাপার পরিচালনা করেন। মনে বিজড়িত বলে মানবাত্মার দৃষ্টি প্রকৃতির প্রচণ্ড কর্মস্রোতে আচ্ছন্ন, নিজেকে এ প্রবাহের অংশরূপে কল্পনা করে বলে তরঙ্গাবর্তে সে ভেসে যায়। প্রকৃতির গতির মধ্যে তার আত্মসম্ভূতিতেও তাকে তার নিত্যসত্তা শান্তপুরুষে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাহলে সেই শান্তপুরুষের মত, সে প্রকৃতির ও তার কর্মের দ্রষ্টা ভর্তা ত হবেই, তদুপরি তার ঈশ্বর ও মুক্ত ভোক্তাও হবে। বিশ্বে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের যে স্বভাব দেখি তা হল অন্তরে অনবচ্ছিন্ন শান্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব, পবিত্রতা ও সমতা আর বাহিরে সর্বক্ষম অফুরন্ত কর্মতৎপরতা।

সুতরাং, কর্মে আর কোন আপত্তি থাকে না। বরং ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, উভয় বিভাবের সঙ্গে একাত্ম ও উভয়ের অংশভাজন হওয়াতে কর্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আত্মার পক্ষে সমত্ব আর শক্তির পক্ষে ক্রিয়া, এই দুয়ের সাম্য নিয়ে মানবের মধ্যে ভাগবত ছন্দের সঙ্গতি গঠিত হয়।

বস্তুর ধর্ম

নিখিল বিশ্বের সব পদার্থের সমষ্টি ('অর্থান') হল তাঁর আত্মসত্তার বিস্তৃতিতে ঈশ্বরের সম্ভূতি। তার তত্ত্ব দ্বিদল, চেতনা ও সত্তা। চেতনা **যখন** তার আত্মসত্তার উপর আত্মশক্তি ('তপস্') প্রয়োগ করে তখন

উদ্ভূত হয় আত্মভাবনা ('বিজ্ঞান'), আর সে ভাবনার অনুরূপ আকার ও ক্রিয়া অব্যর্থভাবে প্রসূত হয়। ভারতে এই হল সৃষ্টির মৌলিক ধারণা, আত্মউৎপাদনরূপে আত্ম-প্রসর্পণ ('সৃষ্টি', 'প্রসব')। আবার, সত্তা তার আত্মশক্তি প্রয়োগ ক'রে, প্রত্যেকটি আকারের অন্তর্নিহিত বীজভাবনার বিস্তৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজের অসংখ্যরূপ অভিব্যক্ত করে। ভারতে এই হল ক্রমবিবর্তনের মৌলিক ধারণা, সাংখ্য প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় তা বিশেষ লক্ষণীয়। 'পরিণাম', 'বিকার', 'বিবর্ত'——একই ব্যাপার বিবিধ-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে বিশ্ব-অভিব্যক্তি চেতসিক মাত্র ('বিবর্ত') স্থূল ব্যাপাররূপে তা বাস্তব নয়। অন্য মতে বিশ্ব অভিব্যক্তি একটা স্থূল ব্যাপার, বস্তুতঃই তাতে অবস্থান্তর হয় ('পরিণাম') তবে তাতে পরম সত্তার স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ হয় না। উভয় মতই উপনিষদ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করে; আর, এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যেমন দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে এ দুই মতের বিরোধ এসেছে প্রাচীন বেদান্তে যা অভেদ ছিল তার দুদিক পৃথকভাবে দেখে।

ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয়, নিজেই নিজের বিষয়ী, সে তার শুদ্ধ স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বেই হ'ক বা বহুবিচিত্র আত্মসম্ভূতিতেই হ'ক। তাঁর আত্ম-সংবিতের তিনিই বিষয়, তাঁর আত্মসত্তার তিনিই জ্ঞাতা। এ বিভাবদ্বয় অবিচ্ছেদ্য, যদিও মনে হয় যেন একটি অপরটির মধ্যে একবার অন্তর্হিত হয় আবার তার মধ্য থেকে প্রকটিত হয়। যাকে অবিমিশ্র বিষয়ী বলে' মনে হয়, তারও সেই বিষয়ীভাবের মধ্যেই সে ভাব বিষয়রূপে উহ্য রয়েছে, আর অবিমিশ্রবিষয়রূপে যা প্রতিভাত হয় তার গোচরতার মধ্যেই সে ভাব বিষয়ীরূপে উহ্য রয়েছে।

সব স্থূল অস্তিত্বই নিত্যসৎ, স্বয়ম্ভূ; প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বীজ-ভাবনার বলে তার পরিণতি হয়। ভাবনা হল ঘটনাতে যা অভিব্যক্ত হয় তার আত্মসংহত রূপ। কারণ, স্বয়ম্ভূ কবিরূপে ব্যাপারের সাররূপের মধ্যে নিজেকে দেখেন বা অবধারণ করেন, মনীষীরূপে তার সব সম্ভাব্যতার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে নিজেকে মননের দ্বারা নির্দিষ্ট করেন এবং পরিভূ-রূপে দেশকালে গতিতে নিজেরই আকাররূপে পরিণত হন। এ তিনটি মিলে হয় একই ক্রিয়া তবে সাপেক্ষজগতে দেশকালগত চেতনাতে প্রক্রিয়া তিনটি ক্রমিক বলে' মনে হয়।

অতএব নিষ্পন্ন হয় যে, প্রত্যেক পদার্থই নিজের মধ্যে নিয়ত তার সত্তার ধর্ম বহন করে, 'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ', সংখ্যাহীন বর্ষ ধরে, নিত্য কালে। সুতরাং পদার্থসমষ্টির অন্যোন্যসম্বন্ধ নির্দিষ্ট হয় প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্নিবাসী স্বয়ং-পরিণামী স্বয়ম্ভূর দ্বারা; সব বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে তা বিধৃত থাকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের দ্বারা, কারণ তিনি নিজেকে যে ভাবে দেখেন সেই হল সবের অন্তর্নিহিত মর্মসত্য; তাঁর আত্মসম্ভূতিই হল অন্তহীন সম্ভাব্যতার পটভূমিতে সবের স্থূলব্যাপারে ক্রমপরিণতির অবশ্যম্ভাবী ধর্ম।

সুতরাং সব বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন হওয়া উচিত ঠিক সেই ভাবেই, 'যাথাতথ্যতঃ', তাঁর দ্বারা সব সুব্যবস্থিত হয়। সমষ্টির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় একটা সামঞ্জস্য আছে, তার দ্বারা ব্যষ্টি অভিব্যক্তির সব বিরোধ শাসিত হয়। সে বিরোধ প্রকৃত হত, নিত্য বিশৃঙ্খলতার মধ্যে তার প্রকাশ হত, যদি বিশ্বে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি বিগ্রহ ও শক্তি সব থাকত, যদি প্রত্যেক ব্যষ্টি বিগ্রহ ও শক্তি নিজের মধ্যে স্বয়ম্ভূ সর্বময় ঈশ্বরকে ধারণ না করত এবং বস্তুতঃ তাঁর সঙ্গে একাত্ম না হত।

সৃষ্টিক্রম

সৃষ্টিক্রমের সাপেক্ষ ধারণাতে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রথম প্রকাশিত হন কবি, প্রাজ্ঞ বা ঋষিরূপে। কবি দেখেন স্বরূপ পরম সত্য—তার সম্ভূতিতে, তার সত্তাতে, তার সব সম্ভাবনাতে ও অধিগত সিদ্ধিতে সত্য। বীজ ভাবনাতে, 'বিজ্ঞানে', তিনি সেসব ধারণ করে আছেন, তাই তাঁকে বলা হয় 'সত্যং ঋতং', সত্য ও ধর্ম। তিনি তা সমগ্ররূপে ধারণ করেন, খণ্ড খণ্ড করে নয়, সব বস্তুর সত্য ও ধর্ম হল 'বৃহৎ', ভূমা। শুধু বিজ্ঞানকে দেখলে তাকে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির, আত্মসংহতির ও ভবিষ্য-নিয়ন্তা বীজভাবের ক্ষেত্র বলে মনে হয়। কিন্তু সে নির্দেশ বিগত কোন কালে দেওয়া হয় নাই, তা নিত্যকালের; সে নিয়তি আত্মার প্রবর্তিত, আত্মা তার বাধ্য নয়; কিন্তু ক্রিয়া ও পরিণাম তার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, বিশ্বব্যাপী গতিতে তথা বীজভাবনার সংহতিতে, উভয়ত্র তা বর্তমান। সুতরাং আত্মার সত্যধর্ম স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব, বন্ধন ও দাসত্ব নয়। পুরুষ প্রকৃতিকে শাসন করে, প্রকৃতি পুরুষকে বাধ্য করে না। 'ন কর্ম লিপ্যতে নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না।

মনীষীর আসন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে। তাঁর পশ্চাতে রয়েছে অনন্তের স্বাতন্ত্র্য এবং তাকে পটভূমিরূপে গ্রহণ ক'রে, তাতে প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি সান্তকে নিরূপিত করেন। সুতরাং বিশ্বে প্রত্যেকটি ক্রিয়া, মনে হয় যেন, নানা সম্ভাবনার সংঘাত এবং ভারসাম্য থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যা অভিব্যক্ত করতে হবে তার অন্তর্নিহিত ধর্মের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা না হলে এ সব সম্ভাবনার কোনটাই বিশ্বক্রিয়া নিরূপণের জন্য কার্যকর হয় না। মনীষীর মধ্যেও কবি আছেন, তিনিও তাঁর ক্রিয়ার আশ্রয়। কিন্তু শুদ্ধমাত্র মনীষীর ক্ষেত্র দেখলে মনে হয় যেন সে হল নমনীয়তার, স্বাধীন ইচ্ছার, বহুবলের অন্যোন্যক্রিয়ার ক্ষেত্র; কিন্তু সে স্বাধীন ইচ্ছা শুধু মননে, তার প্রতিপক্ষ রয়েছে সব বস্তুর নিয়তি।

কারণ, মনীষীর ক্রিয়ার অভীষ্ট পরিণাম হল 'পরিভূ'র সম্ভূতি। 'পরিভূ'কে বিরাটও বলা হয়, ঘটনার ক্ষেত্র ব্যেপে তিনি অবস্থিত আছেন। তিনি সম্পাদন করেন সত্যে যা বিধৃত রয়েছে, মনের দ্বারা প্রতিফলিত সব সম্ভাবনার মধ্যে যা বিকশিত হচ্ছে, স্থূলরূপে সিদ্ধ বলে' যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। পৃথকভাবে বিরাটের ক্ষেত্র দেখলে মনে হয় যেন সে এক অলঙ্ঘ্য বিধান ও নির্দিষ্ট নিয়তির ক্ষেত্র, যার শাসনে সে ক্ষেত্রের প্রত্যেক বস্তু ক্রমপরিণত হতে বাধ্য হয়, যেন তা কর্মের একটা লৌহ-শৃঙ্খল, যান্ত্রিক অবশ্যম্ভাবিতা ও দুর্বোধ্য নিয়মের একটা নিরঙ্কুশ রাজত্ব।

কিন্তু 'পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'—বিরাটের সম্ভূতি ত স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরেরই সম্ভূতি। সুতরাং, সে সম্ভূতির সত্য উপলব্ধি করতে হলে, উজান বেয়ে পশ্চাতে যা রয়েছে সে সবই আবার অঙ্গীকার করতে হবে। মুক্ত অনন্ত সচ্চিদা-নন্দের পূর্ণ সত্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ঊর্ধ্ব থেকে, একত্ব থেকে দেখলে এই হল বস্তুর সত্য, এই হল ভগ-বানের দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু মানবের দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদের বিচার করতে হবে; সে দৃষ্টির আরম্ভ নীচে থেকে, অজ্ঞান থেকে অগ্রসর হয়ে, একের পর এক, এই সব তত্ত্ব সে দেখে, তাও সমগ্রভাবে নয়, চেতনার পৃথক পৃথক অবস্থারূপে। মানবত্বের স্বভাব হল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সচ্চিদা-নন্দে প্রত্যাবর্তন করা; তাই তার যাত্রা সুরু হয় নীচে অবিদ্যা থেকে, যেখানে মন জড়-দেহাশ্রিত, যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার কারাগারে রুদ্ধ মনীষী ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করছেন। এই কারারুদ্ধ মনীষীই মানব, 'মনু'।

মৃত্যু ও বিভাজন থেকে আরম্ভ করে তাকে অমরত্ব ও একত্বে উপনীত হতে হয়। তাকে ব্যষ্টি সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তাকে, সাপেক্ষজগতের মধ্যে অনন্যসাপেক্ষকে উপলব্ধি করতে হয়। মানবই ব্রহ্ম,—বিষয়ের বহুত্বের মধ্যে আত্মসংবিৎ অর্জনে রত। বিশ্বে মানুষই 'অহং', নিজের সর্বময়ত্ব ও সর্বাতীতত্ব প্রতিপাদনে রত।

তৃতীয় প্রবাহ

(২) জ্ঞান ও অজ্ঞান

(শ্লোক ৯-১১)

বিদ্যা ও অবিদ্যা

বিদ্যা অবিদ্যা, একত্বের চেতনা ও বহুত্বের চেতনা, এই দুই উপাধি অবলম্বন ক'রে সব অভিব্যক্তি সাধিত হয়। মায়ার, ব্রহ্মের সৃষ্টিপর আত্মবিভাবনার, এই হল দুইটি রূপ।

একত্ব হল নিত্য ও মৌলিক সত্য, একত্ব ব্যতীত বহুত্ব অসত্য হত, একটা অসম্ভব বিভ্রম হত। তাই একত্বের চেতনাকে 'বিদ্যা' বা জ্ঞান বলা হয়।

বহুত্ব হল পরম অদ্বয়ের লীলা বা নানাভাবে আত্মবিস্তার, তার উপাধি-সব পরিবর্তনশীল, তার নিজের দৃষ্টিতে সে বিভাজ্য; তাই তার বলে বিশ্বজগতে পরম এক যুগপৎ চেতনার বহুকেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন, শক্তির বহু বিগ্রহে বাস করেন। একত্বের মধ্যে বহুত্ব হয় ব্যক্ত না হয় প্রচ্ছন্ন থাকে। বহুত্ব ব্যতীত একত্ব অনস্তিত্বের শূন্য হত অথবা নির্বিশেষ আত্ম-সমাহৃতিতে বা রিক্ত নিবৃত্তির অবস্থাতে অক্ষম ও বন্ধ্যাভাবে সীমাবদ্ধ থাকত।

কিন্তু বহুর মধ্যে স্বকীয় স্বরূপ-একত্বের সত্যজ্ঞান থেকে বিযুক্ত হলে বহুত্ব-চেতনা হয় ভ্রম ও মোহের অবস্থা; আর এই হল বিভিন্ন বিগ্রহের ও সসীম ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম, বিভক্ত অহংএর দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষের মধ্যে বহুত্বের চেতনা এই রূপ নেয়। সুতরাং তাকে 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান বলা হয়।

ব্রহ্ম ঈশ্বর, তিনি এক ও সর্বানন্দময় কিন্তু তার একত্বের সীমার দ্বারা আবদ্ধ নন; সর্বশক্তিমান তিনি, বহুকেন্দ্রে অবস্থিত থেকে নিজেকে বহু বিগ্রহে বিভাবিত করতে পারেন, সেসব থেকে এবং সেসবের উপরে বহুবিধ তেজের স্রোত প্রবাহিত হয়, সেসবকে আমরা বিবিধ শক্তির কাজ বা খেলা বলে দেখি। এভাবে বহুরূপে বিভাবিত হয়েও তিনি তাঁর বহুত্বের দ্বারা অবরুদ্ধ হন না, পরন্তু সব নানাত্বের মধ্যেও তাঁর স্বীয় একত্বে নিত্য

প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিদা-অবিদ্যা উভয়ের তিনি প্রভু, এ তাঁর মায়া বা আত্ম-বিভাবনের দুদিক, তাঁর চিৎশক্তির যুগ্ম সামর্থ্য।

ব্রহ্ম 'ঈশ' : তাঁর মায়ার লীলাতেই অধিষ্ঠিত হন বা মায়াতীত ভাবেই অবস্থান করুন, তিনি নিত্যই সে মায়ার প্রভু, স্বতন্ত্র। মানব সে লীলার মধ্যে বাস করে, সে 'অনীশ' : প্রভু নয়, মুক্ত নয়, অবিদ্যার অধীন। কিন্তু এ অধীনতাও অজ্ঞানের একটা খেলা, পরমার্থতঃ মিথ্যা—সত্য শুধু ব্যবহারে, বাহ্য ব্যাপারের সব সম্বন্ধে, দিব্য চিৎশক্তির ক্রিয়ার ক্রমবিকাশে। তার স্বরূপগত সত্য হল মুক্তি, তা ফিরে পেতে হলে তাকে পরম একত্বের বোধ, ব্রহ্মচেতনা বা ঈশ্বরচেতনা পুনরর্জন করতে হয়, ব্রহ্মের মধ্যে ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি করতে হয়। এই মুক্তি অর্জিত হলে এবং, সে নিজেই যে অদ্বয় পরম সত্তা ('সোঽহং অস্মি') সর্বভূত তাঁরই সম্ভূতি, এই জ্ঞানে সবার সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি হলে, বিশ্বে সে ভাগবত কর্ম করতে সক্ষম হয়, অজ্ঞানের অধীন আর থাকে না, কারণ সেই পরম-জ্ঞানের গুণে সে মুক্ত হয়েছে।

সুতরাং মানবের পরিপূর্ণতা হল বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে এই পরম সঙ্গতি অবলম্বন করে ব্যষ্টি সত্তাতে ভগবানের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাতে বহুত্ব তার একত্বের জ্ঞান লাভ করবে, একত্ব বহুত্বকে আলিঙ্গন করবে।

চরম পন্থা

বিদ্যা অবিদ্যার কোন একটাকে অনুসরণ ক'রে বিশ্বে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করা যায় না।

যারা কেবলমাত্র বহুত্ব ও বিভাজনতত্ত্বকে উপাসনা করে তাদের প্রগতির মুখ একত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তারা অন্ধতামসে প্রবেশ করে। কারণ, সে তত্ত্বের প্রবৃত্তিই হল ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচন ও সীমাবন্ধন, অর্জিত জ্ঞানের ক্রমশঃ লোপ এবং প্রকৃতির যান্ত্রিক আবশ্যকতার ও পরিশেষে তার বিভেদী ও আত্মবিনাশী শক্তির ক্রমশঃ বেশী অধীনতা। একত্বের অভিমুখে প্রগতি থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অর্থ হয় আলোক ও অস্তিত্বের প্রতি বিমুখ হওয়া।

যারা মাত্র নির্বিশেষ একত্বতত্ত্বের উপাসনা ক'রে ব্রহ্মের সমগ্রত্ব প্রত্যা-খ্যান করে, তারা জ্ঞান ও পূর্ণতা প্রত্যাখ্যান করে এবং, মনে হয় যেন, গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। চেতনায় পরিবর্জনকেই তাদের মনে হয়

যেন চেতনাতে উৎক্রমণের লক্ষণ, তাই একটা বিশেষ অবস্থাতে প্রবেশ ক'রে তাকেই তার সমগ্র বলে মনে করে। স্বেচ্ছায় সজ্ঞান নির্বাচনের ফলে তারা উপেক্ষা করে, অন্যেরা যেমন ভ্রমের দ্বারা বাধ্য হয়ে অজ্ঞান থাকে। সব অতিক্রম করে যাবার উদ্দেশ্যে সব জানাই হল বিদ্যার প্রকৃত পথ।

অপর অবস্থাটির চেয়ে উচ্চতর হলেও এ পরম নিশাকে বৃহত্তর অন্ধকার বলা হয়েছে, কারণ নিম্নতর শৃঙ্খলাহীন অবস্থা থেকে আবার সুসঙ্গতি বিধান করা সর্বদাই সম্ভবপর; কিন্তু উচ্চতরটি হল শূন্য বা অসতের বিভাবনা এবং পরাত্মনের অনস্তিত্বের উপরে আসক্তি আর তা থেকে পরাত্মনের পরিপূর্ণতায় প্রত্যাবর্তন করা সমধিক কষ্টসাধ্য।

উভয় পথে লাভ

কথঞ্চিৎ কম একান্তভাবে আসক্ত হয়ে অনুসরণ করলে দুপথেই মানবাত্মার বিহিত ফললাভ হয়; কিন্তু তার কোনটাই বিশ্ব-অভিব্যক্তিতে ব্যষ্টিসত্তার পরম বা সমগ্র ব্রত নয়।

বিদ্যার দ্বারা উপনীত হওয়া যায় শান্ত ব্রহ্মে বা অক্ষর পুরুষে, যিনি বিশ্ব-ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ না নিয়ে তা দর্শন করেন মাত্র, অথবা তাঁর চিৎ-এর শুদ্ধ সৎ-এ অভিনিবিষ্ট অবস্থাতে, যা থেকে বিশ্ব উৎসারিত হয় এবং আবার যাতে প্রত্যাবর্তন করে। উভয় অবস্থাতেই লাভ হয় শান্তভাব, প্রাচুর্য, বিশ্বের দুঃখ-মোহ থেকে মুক্তি।

কিন্তু মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল আত্মচরিতার্থতা, তবে জগৎ-গতিতে পৃথক ব্যষ্টিরূপে নয় অথবা জগৎ থেকে বিযুক্ত হয়ে পরম নৈঃশব্দ্যে নয়, পুরুষোত্তমে বা ঈশ্বরে, যিনি সর্বত্রগ এবং যিনি ক্ষর অক্ষর উভয়কে নিজের সত্তার অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ধারারূপে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন। সেই সর্বোত্তম এক সর্বাত্মাকে নিজের ব্যষ্টি সত্তাতে এবং বিশ্বের জন্য উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যেই মানবদেহী বা জীবাত্মা এখানে এসেছে। আর সেই পরম চরিতার্থতার প্রথম সোপানরূপে, বিশ্বে ব্যষ্টিত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যন্ত্ররূপে, অবিদ্যাসৃষ্ট অহং-এর প্রয়োজন।

অবিদ্যার দ্বারা শক্তি, সুখ, জাগতিক জ্ঞান ও সত্তার প্রসারে এক-প্রকার পূর্ণতা লাভ করা যায়, আর সেই হল অসুরদের বা দেবতাদের, ইন্দ্র-প্রজাপতির অর্জিত পূর্ণতা। সে পূর্ণতা অর্জনের পথ হল, বহুত্বের

সকল সম্ভাবনা উদারভাবে স্বীকার ক'রে এবং বিশ্ব তাকে যা কিছু পারে সে সব সামগ্রী গ্রহণ ক'রে, ব্যষ্টি সম্পদ অবিরাম বৃদ্ধি ক'রে নিজেকে ক্রমশঃ প্রসারিত করা। কিন্তু তাও মানবের লক্ষ্য নয়, কারণ তাতে সাধারণ মানবত্বের সীমা অতিক্রম করা যায় বটে কিন্তু বিশ্বপ্রভুর অন্তঃপ্রবিষ্ট দিব্য বিশ্বাতীত অবস্থা আসে না। তাতে অজ্ঞানের বিভ্রম অতিক্রম করা হয় বটে কিন্তু জ্ঞানের সীমা নয়, দেহের মৃত্যু অতিক্রম করা হয় কিন্তু সত্তার সীমা নয়, দুঃখের অধীনতা অতিক্রম করা হয় কিন্তু সুখের নয়, নিম্নতর প্রকৃতিকে অতিক্রম করা হয় কিন্তু ঊর্ধ্বতরকে নয়। প্রকৃত মুক্তি ও পূর্ণ অমরত্ব লাভ করতে হলে, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সে সবে আবার অবতরণ করতে হবে, মৃত্যু-দুঃখ-অজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

প্রকৃত জ্ঞান হল ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে অনুভব করা, সাগ্রহে এক চেতনা ছেড়ে অন্য চেতনা অনুসরণ না করা, অবিদ্যার চেয়ে বিদ্যাতে বেশী আসক্ত না হওয়া। এ জ্ঞান ছিল প্রাচীন ঋষিদের; তাঁরা 'ধীরাঃ', তাঁদের মননের স্থির দৃষ্টি ছিল, যে-কোন এক আলোকের আকর্ষণে পূর্ণজ্ঞান থেকে তাঁরা ভ্রষ্ট হন নি, সুতরাং তাঁদের ব্রহ্ম-অনুভূতি ছিল সমগ্র ও সর্বগ্রাহী আর সে অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাও ছিল সমানভাবেই সমগ্র ও সর্বগ্রাহী ('বিচচক্ষিরে')। এই সব প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে লব্ধ বিদ্যাই এ উপনিষদে বিবৃত হয়েছে।

সমগ্র পথ

বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, অভিব্যক্তিতে উভয়েরই স্থান আছে, কারণ তার অস্তিত্ব ও সার্থকতার জন্য দুই-এরই প্রয়োজন আছে। অবিদ্যা বর্তমান থাকতে পারে বিদ্যায় আশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত রূপে——মহৎ একত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জীবের প্রস্তুতি ও অগ্রগতির জন্য অবিদ্যার উপর বিদ্যাকে নির্ভর করতে হয়। এর কোন একটিকে ছেড়ে অন্যটি থাকতে পারত না, কারণ কোনও একটির লোপ হলে অন্যটিও অবসিত হয়ে এমন কিছুতে পরিবর্তিত হত যা তার কোনটিই নয়, যা অচিন্ত্য এবং সব অভিব্যক্তির ওপারে, যা অনির্বচনীয়।

নিকৃষ্টতম অজ্ঞানেও সে-জ্ঞানের কোন না কোন বিন্দু বর্তমান আছে আর তাতেই অজ্ঞানের সে আকার নিরূপিত হয়, একত্বের কিছু না কিছু

আশ্রয় আছে আর তাতেই চরম বিভাজন, সীমাবন্ধন ও অন্ধকারের অবস্থাতেও শূন্যে বিলীন হয়ে তার অস্তিত্ব লোপ হওয়া নিবারিত হয়। অজ্ঞানের নিয়তি অস্তিত্বের বাহিরে লয়প্রাপ্ত হওয়া নয়, বরং তার সব উপাদানের জ্ঞানে উদ্ভাসিত ও একীভূত হওয়া, সে সবের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশের প্রয়াস করছে তা প্রকটিত ও সংসাধিত হওয়া এবং সেই সংসিদ্ধি-তেই সে সবের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হওয়া।

জ্ঞান যে চরমতম একত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম তাতে বহুত্বের সব উপকরণ অন্তর্নিহিত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, কর্মপ্রবৃত্তিতে যে কোন মুহূর্তে সে সব নির্গত হতে পারে। অবিদ্যার যেন কখনই অভিব্যক্ত হওয়া উচিত ছিল না এভাবে তাকে ধ্বংস করা বিদ্যার কাজ নয়, তার কাজ অবিদ্যাকে অবিরাম নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করা, সর্বক্ষণ তাকে আশ্রয় দেওয়া এবং—অজ্ঞানের যা স্বভাব, তার অজ্ঞান নাম যেজন্য হয়েছে—স্বরূপ একত্বের বিস্মৃতি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে তাকে সাহায্য করা।

ক্রমশঃ বেশী করে বিদ্যাভিমুখী হবার ফলে অবিদ্যার উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয় তখন ব্যক্তি ও বিশ্বের পক্ষে স্ব-স্বরূপে ঈশ্বর যা, তা হওয়া সম্ভবপর হয়: সে নিজের প্রকাশ সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় অপ্রকাশ সম্বন্ধেও সচেতন হয়, জন্মেও মুক্ত জন্মরাহিত্যেও মুক্ত হয়।

বিশ্ব-প্রগতির যে বিন্দুতে বিশ্বের বহুত্বের মধ্যে এই বিদ্যাভিমুখিতা ও সার্থকতা সজ্ঞানে সাধন করবার ক্ষমতা আসে তা সূচিত হয় মানবে। তার স্বাভাবিক সার্থকতা এই সমগ্র পথ অনুসরণ করেই লাভ হয়—যেপথে অবিদ্যা বিদ্যার কাছে, বহুত্ব একত্বের কাছে, অহং সর্বময় ও সর্বাতীত পরম অদ্বিতীয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এবং যে পথে বিদ্যা অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করে, একত্ব বহুত্বকে সার্থক করে এবং পরম অদ্বিতীয় কোন আবরণ না রেখে বিশ্বে ও ব্যষ্টিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন।

মর্ত্যভাব ও অমরত্ব :

মর্ত্যভাব

অবিদ্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে মানব মৃত্যু অতিক্রম করে, বিদ্যা নিজের মধ্যে অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করলে সে অমরত্ব উপভোগ করে।

মৃত্যুর অর্থ, মর্ত্য অবস্থা: সুখদুঃখ, শুভাশুভ, সত্যমিথ্যা, রাগদ্বেষ, হর্ষবেদনা, এই সব দ্বৈতে আবদ্ধ সসীম অহংরূপে অবিরাম জন্মমৃত্যুর

অধীনতা।

এ অবস্থা আসে সীমাবন্ধন ও আত্মবিভাজনের দ্বারা সর্বময় সর্বান্তর্যামী ও সর্বাতীত পরম অদ্বিতীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য এবং দেশকালের ক্ষেত্রে দেহমনপ্রাণের একটিমাত্র বিগ্রহের সঙ্গে আত্মবোধের প্রতি আসক্তির জন্য; কারণ, সেই হেতুতেই হৃদিস্থিত পরমাত্মা প্রকৃত পক্ষে যা, তার আর কিছুই না দেখে, গ্রহণ করেন মাত্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সমষ্টি যা একটি বিশেষ কেন্দ্রের উপর ও সেই কেন্দ্র থেকে বাহিরে প্রবহমান এবং মাত্র একটি দেহপ্রাণ-মনের আধারের সামর্থ্যের দ্বারা সীমিত। অভিজ্ঞতার সেই সমষ্টি মনের অন্তঃস্থিত অহংকেন্দ্রের চারিদিকে সুব্যবস্থিত ক'রে এবং, অপ্রবৃত্তিতে নিষ্ক্রিয় ও কর্মপ্রবৃত্তিতে সক্রিয়, স্মৃতি শক্তির এই দ্বিদল ক্রিয়ার দ্বারা কালপ্রবাহের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে সে ব্যষ্টি-আত্মা অবিরাম বলে, 'এই আমি'।

তার ফল হয় যে, প্রকৃতির বা চিৎশক্তির লীলার মাত্র একটা বিশেষ অংশকে জীব নিজের বলে গ্রহণ করে, সুতরাং চেতনার শক্তির মাত্র একটা বিশেষ সংকীর্ণ অংশকে নিজস্ব বলে অঙ্গীকার করতে পারে; আর জীব যা অনাত্ম বাহ্য বলের প্রবাহ ব'লে বোধ করে, সে সবের অভিঘাতের সম্মুখীন তাকে হতে হয় সেই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে। সে সবের বিরুদ্ধে সে তার ব্যষ্টি সত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে বিলয় বা প্রকৃতির আধিপত্য থেকে রক্ষা করে। সে চেষ্টা করে যে, ব্যষ্টি বিগ্রহে বাস ক'রে এবং তাকে অবলম্বন ক'রে নিজের অন্তর্নিহিত 'ঈশ' বা বিশ্বপ্রভুর স্বভাবসিদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের জগৎ ভোগদখল করবে।

কিন্তু, অহং-এর সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, তার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির গতি দিয়ে গড়া যে বিগ্রহকে সে অহং বলে অঙ্গীকার করছে, সংসৃতির সাধারণ প্রবাহের মধ্যে তা স্থায়ী হতে পারে না। সে গতির একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে তার বিগ্রহ গড়ে নিতে হয়---সেই জন্ম, আর একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা সে বিগ্রহের বিলয় সাধন করতে হয়---সেই মৃত্যু।

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার যে অংশের সাদৃশ্য আছে মাত্র ততটাই সে তার বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করতে পারে; আর সেসব আয়ত্ত করবার পদ্ধতিও তার অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক, কারণ সমগ্রদৃষ্টি বা সর্বময়ের দৃষ্টি তার নাই। সে যা জানে তা ভ্রমাত্মক আর বাকী যা, তা সে উপেক্ষা

করে।

তার অভিজ্ঞতার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই সে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ও গ্রহণ করতে পারে, শুদ্ধমাত্র এই হেতুতে যে মাত্র সেই ক'টিকেই সে আত্মসাৎ করবার মত করে বুঝেছে। তাতেই তার সুখ, বাকী সবই তার কাছে হয় দুঃখজনক না হয় আকর্ষণহীন।

বাহ্য অনাত্মশক্তির মধ্যে মাত্র গুটি কতকের সঙ্গে সে তার দেহ-স্নায়ু-মনে অধিষ্ঠিত শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে। তাতেই সে আনন্দ পায়, আর সবেই তার বেদনা বা ঔদাসীন্য।

সুতরাং, মৃত্যু হল দেহ-প্রাণ-মনের ব্যষ্টি বিগ্রহের মধ্যে অহং যে নিজেকে মিথ্যা সীমাবদ্ধ করে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার। ভ্রম হল অল্পজ্ঞানকে যথেষ্ট মনে ক'রে সে মিথ্যা ধারণাতে অহং যে তৃপ্ত থাকে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার। দেহ-মনের ক্লেশ হল সার্বজনীন আনন্দকে সীমাবদ্ধ ও একাধিকৃত করে নিজস্ব সম্ভোগের মিথ্যা ও স্বার্থপর আকারে আবদ্ধ রাখতে অহং যে চেষ্টা করে, সর্বময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার।

একমাত্র সর্বময়ের সঙ্গে একাত্মত্ব অঙ্গীকার ক'রেই, ব্যষ্টিজীব প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় এই অবিরাম অস্বীকার থেকে মুক্ত হয়ে ওপারে উপনীত হতে পারে। তখন সর্ব-সত্তা, সর্ব-শক্তি, সর্ব-চেতনা, সর্ব-সত্য ও সর্ব-আনন্দ ব্যষ্টিজীবকে অধিকার করেন, তাতে তার মরত্ব অমরত্বে রূপান্তরিত হয়।

মরত্ব ও অবিদ্যা

কিন্তু ব্যষ্টি বিগ্রহকে প্রকৃতিপ্রবাহে নিজে বিলীন করা অথবা প্রকৃতি যাঁর অভিব্যক্তি সেই সর্বাত্মাতে অকালে লয়প্রাপ্ত হওয়া অমৃতত্ব অর্জনের পথ নয়। বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে যিনি তার পূর্ণতা সাধন করেন তাঁর অভিমুখে হয় মানব-প্রগতি। সে অতিক্রান্তির ও সে সিদ্ধির জন্য মানবের ব্যষ্টি জীবকে প্রস্তুত করতে হবে।

অবিদ্যা মরত্বের হেতু হলেও, মরত্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত হবারও পথ। প্রকৃতি-প্রবাহের প্রতিকূলে ব্যষ্টি সত্তা আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রে পরিণামে তাকে অতিক্রম, অধিকার ও রূপান্তরিত করবে বলেই ত সীমার বন্ধন সৃষ্ট হয়েছে।

সুতরাং, মানবের প্রথম প্রয়োজন হল অহং-এর সীমার মধ্যেই অবিরাম সত্তাতে, জ্ঞানে, আনন্দে ও শক্তিতে আত্মপ্রসার বৃদ্ধি করা, যাতে ক্রমশঃ সে তার বৃহত্তর সত্তার ধারণাতে উপনীত হতে পারে---যে-সত্তা এই সব অবলম্বন ক'রে, নিজে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তার মধ্যে অভিব্যক্ত হচ্ছে, প্রকৃতির বাধা প্রতিরোধ করবার শক্তি যার ক্রমশঃ বাড়ছে এবং, ব্যষ্টি-বিগ্রহে, অজ্ঞান-দুঃখ-অক্ষমতার ব্যাপারগুলিকে জ্ঞান-আনন্দ-সামর্থ্যের রূপে পরিবর্তিত করবার, এমন কি মৃত্যুকেও বিশালতর জীবনের উপায়রূপে পরিণত করবার ক্ষমতা যার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

তারপর, এই আত্মপ্রসারের ফলে তার বোধ জাগা চাই যে, সে বিস্তৃতির অতিশয়ী, তার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির অতিশয়ী আরও কিছু আছে। মানুষকে নিজের আত্মার ধারণা এতটা প্রসারিত করতে হবে যাতে সে সর্বভূতকে নিজের মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখে (শ্লোক ৬)। তাকে দেখতে হবে যে, এই 'আমি', যা সবের আধার ও সবের আধেয়, সে-ই পরম অদ্বিতীয়, সে-ই বিশ্বময়, তার ব্যক্তিগত অহং নয়। তার অহংকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, তার স্বভাবে তাঁকে প্রতিরূপিত ক'রে তাঁতেই পরিণত হতে হবে, সব রূপে ও বৃত্তিতে আত্মার সমতা নিয়ে তাঁকে লাভ ও উপভোগ করতে হবে।

তাকে দেখতে হবে যে, এই এক বিশ্বময় সর্বথা বিশ্বাতীত, তিনিই অদ্বয় পরমসত্তা; দেখতে হবে যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সব রূপ, সব ক্রিয়া ও সব ব্যষ্টিসত্তা সেই পরমেরই সম্ভূতি (শ্লোক ৭)। জগৎ একটা সম্ভূতি; দেশকালের গতিতে, দেহ-প্রাণ-মনের ক্রমপরিণতিতে অবিরাম সে সম্ভূতি যাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে তিনি সব সম্ভূতির অতীত, সব দেশ-কালের, সব দেহ-প্রাণ-মনের অতীত।

এইভাবে বিদ্যা অবিদ্যার সঙ্গে এক হয়। অবিদ্যার দ্বারা লোকে প্রথম মৃত্যু-দুঃখ-অজ্ঞান-অক্ষমতা অতিক্রম করে---মানব-অস্তিত্বের ব্যব-হারিক সংজ্ঞা সে-সব, বহুত্বের সীমাবন্ধন ও বিভাজনের মধ্যে পরমের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জন্মের উপর তার প্রথম নির্বন্ধ। বিদ্যার দ্বারা, জন্ম নিয়েই লোকে অমরত্ব লাভ করে।

অমরত্ব

অমরত্বের অর্থ দেহ বিলয়ের পরে আত্মার বা অহং-এর উদ্বর্তন

নয়। দেহ বিলয়ের পরে আত্মা বর্তমান থাকেই, কারণ দেহ-জন্মের পূর্বেও সে বর্তমান ছিল। আত্মা অজ, অমর। মৃত্যুর পরে অহং-এর বর্তমান থাকা একটা প্রাথমিক অবস্থা––তার দ্বারা ব্যষ্টি জীব অবিদ্যার ক্ষেত্রে তার সব অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে চালিত করতে ও একসূত্রে গ্রথিত ক'রে নিতে পারে, যাতে ক্রমশঃ বেশী আত্মস্থ হয়ে, বেশী প্রভুত্বের সঙ্গে, আত্মপ্রসারণের যে পদ্ধতি পরিশেষে বিদ্যাতে পরিণত হবে তা অনুসরণ ক'রে যেতে পারে।

অমরত্বের অর্থ যে চেতনা জন্মমৃত্যুর অতীত, কার্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত, সব বন্ধন ও সীমার অতীত, মুক্ত, আনন্দময়, সচেতন সত্তাতে স্বপ্রতিষ্ঠ––ঈশ্বরের, পরমপুরুষের, সচ্চিদানন্দের চেতনা।

অমরত্ব ও জন্ম

মানব এই উপলব্ধির উপর বিশ্বে মুক্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

কিন্তু তা অধিগত হলে, জীবের পক্ষে জন্ম বা কর্মের আর কি প্রয়োজন থাকে? নিজের জন্য কিছু থাকে না, কিন্তু ভগবান ও বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণই থাকে।

বিশ্বাতীত অমরত্ব বিশ্ব-অভিব্যক্তি'র উদ্দেশ্য নয়, কারণ সে অমরত্ব পরমাত্মার নিত্য অধিগত। মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল, যেন তার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মা যেমন অসম্ভূতিতে তেমনি জন্মেও অমরত্ব উপভোগ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত মোক্ষও শেষ সিদ্ধি নয়, কারণ সে ত শুধু অহং-এর চরম পরিতৃপ্তি, ঈশ্বরের আশ্রয়ে সবের মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি নয়।

নিজের অমরত্ব অর্জন করবার পরেও মুক্তজীবের বিশ্বে ভগবানের কাজ করবার আছে। সব জীবের দেহ-প্রাণ-মনকে ক্রমশঃ বেশী ক'রে, মর্ত্যভাব নয়, অমরত্ব অভিব্যক্ত করতে সাহায্য করতে হবে।

স্থূল দেহ ধারণ ক'রে (যাকে আমরা জন্ম বলি) এ কাজ সে করতে পারে, আবার অপর কোনও লোকে, কোনও ভাবে সংস্থিত হয়ে, এমনকি বিশ্বের ওপার থেকেও (তাও সম্ভবপর) তা সাধন করতে পারে। কিন্তু দেহে জন্মগ্রহণই হল জন্মপ্রগতিতে নিম্নতম অজ্ঞানলোকে যারা এখনও আবদ্ধ আছে, মুক্ত জীব তাদের যে সাহায্য করতে পারে তার সবচেয়ে সন্নিহিত, দিব্য ও আশুফলপ্রদ উপায়।

তৃতীয় প্রবাহ

(৩) জন্ম ও জন্মরাহিত্য

(শ্লোক ১২-১৪)

জন্ম ও জন্মরাহিত্য

প্রকৃতির বাহিরে আত্মনের কোন বিবর্তন হয় না, তা অব্যয় ও নিত্য। প্রকৃতিতে অবস্থিত পরমাত্মার বিবর্তন হয়, তার অবস্থার ও রূপের পরিবর্তন হয়। প্রকৃতিতে জন্ম হল কালের ক্রমগতিতে সেই বিবিধ আকারে ও অবস্থাতে প্রবেশ করা।

পরমাত্মার এই দুই বিভাব আছে: প্রকৃতির অভ্যন্তরে ও প্রকৃতির বাহিরে, জগতের গতির সঙ্গে চলমান ও সে গতির ঊর্ধ্বে আসীন, জীবন-বৃক্ষের পরিণতিতে সক্রিয় ও তার ফলাশী অথবা নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র; সুতরাং মানবাত্মার পক্ষেও সচেতন অস্তিত্বের পরস্পর একান্তবিরোধী দুইটি অবস্থা সম্ভবপর: জন্মের অবস্থা ও জন্মরহিত অবস্থা।

জন্মের বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে যাত্রা আরম্ভ ক'রে, সংসৃতি থেকে মুক্ত হয়ে মানব সচেতন অস্তিত্বের শান্তস্থিতিতে উপনীত হয়—তাকেই জন্মরাহিত্য বলা হয়। জন্মের গ্রন্থি হল অহংবোধ, এই অহংবোধের বিলয়ই আমাদের জন্মরহিত ভাবে নিয়ে যায়। সেইজন্য সে ভাবকে 'বিনাশ'ও বলা হয়।

স্বরূপতঃ জন্ম ও জন্মরাহিত্য স্থূল দৈহিক অবস্থা নয়, আত্মিক অবস্থা। অহংবোধের গ্রন্থি ভেদ করেও লোকে স্থূল দেহে অবস্থান করতে পারে; কিন্তু শুদ্ধমাত্র অহংবিনাশের উপরই যদি সে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহলে তার আবার দেহে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। প্রকৃতির যে উপস্থিত প্রবেগ দেহমনের কাজ চালিত করে, সে প্রারব্ধ ক্ষয় হলেই জন্ম থেকে তার মুক্তি হয়। অপরপক্ষে, জন্মে যদি সে আসক্ত থাকে, তাহলে তার অন্তরের অহংতত্ত্ব অবিরত নূতন মানসিক ও দৈহিক আকারের পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করতে চেষ্টা করে।

চরমপন্থার অশুভ ফল

জন্ম বা জন্মরাহিত্য, কোন ভাবে আসক্তিই নির্দোষ পথ নয়। কারণ আসক্তি মাত্রেই অজ্ঞানের ক্রিয়া, সত্যের উপর অত্যাচার। তার পরিণামও অজ্ঞান অন্ধতামস অবস্থা।

জন্মরাহিত্যে ঐকান্তিক আসক্তির ফলে নির্বিশেষ প্রকৃতিতে বা নাস্তিত্বে, মহাশূন্যে, বিলয় হয়; আর এই উভয়ই হল অন্ধতামস অবস্থা। কারণ, নাস্তিত্বের প্রয়াস হল, জন্ম নিয়ে অস্তিত্বের অবস্থাকে অতিক্রম করা নয়, তাকে রহিত করা, সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব অতিক্রম করে অসীম অস্তিত্বে যাওয়া নয়, অস্তিত্ব থেকে তার বিপরীতে যাওয়া। আর অস্তিত্বের বিপরীত চেতনা ত হতে পারে শুধু নাস্তিচেতনার রাত্রি—সেও অজ্ঞানের অবস্থা, মুক্তির নয়।

অপরপক্ষে, দেহে জন্মের প্রতি আসক্তির অর্থ হল অবিরাম নিজেকে সীমা দিয়ে বাঁধা, নিষ্ক্রান্তি বা মুক্তির কোন আশা না রেখে অহং-এর নিম্নতর সব অবস্থাতে অহংভাবিত জন্মের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। বিশেষ একটা দিক থেকে দেখলে এ অবস্থাকে অপর অবস্থার চেয়ে গভীরতর অন্ধকারময় বলে মনে হয়, কারণ মুক্তির প্রেরণাও তার অজ্ঞাত। সত্য অবধারণে ভ্রম নয়, এ হল অন্ধ অবস্থাতে চিরকাল সন্তুষ্ট থাকা। পরি-ণামেও তাতে বৃহত্তর কোন মঙ্গলে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ উচ্চতর কোন অবস্থার স্বপ্ন অবধি সে দেখে না।

চরমপন্থার শ্রেয়ঃ

তবে, কথঞ্চিৎ পরস্পরসাপেক্ষভাবে অনুসৃত হলে এ প্রবৃত্তিদ্বয়ের প্রত্যেকটি থেকে তার নিজস্ব পরিণাম, নিজস্ব শুভফল পাওয়া যায়। সম্ভূতির লক্ষ্যরূপে এবং উচ্চতর পূর্ণতর সত্যতর অস্তিত্বের রূপে অসম্ভূতিকে অনুসরণ করলে, তার ফলে অক্ষর ব্রহ্মে বা অসতের বিশুদ্ধ মুক্তিতে নিবৃত্তি হতে পারে। প্রগতি ও আত্মবিস্তৃতির উপায়রূপে জন্ম অনুসরণ করলে তার ফলে বৃহত্তর পূর্ণতর জীবন লাভ হতে পারে, সে জীবন আবার পরম সিদ্ধির দ্বারও হতে পারে।

আদর্শ পথ

কিন্তু এসব ফলের কোনটাই স্বতঃ-সম্পূর্ণ নয় বা মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। একপথের সিদ্ধি অন্যপথের দ্বারা অনুপূরিত হলেই

মানবের পূর্ণ মঙ্গলে প্রত্যেকটি পথের নিজস্ব উদ্দিষ্ট সিদ্ধি লাভ করা যেতে পারে।

ব্রহ্ম বিদ্যা অবিদ্যা, সম্ভূতি অসম্ভূতি দুই-ই। পরমাত্মাকে অজরূপে উপলব্ধি এবং জন্মমৃত্যুর ওপারে অনন্ত সর্বাতিশয়ী অস্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভূতিতে মুক্ত জীবনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। প্রত্যেকটির পক্ষে অপরটি আবশ্যক। বিশুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের ভাগী হয়েই জীব সংসার-প্রবাহে নিমজ্জনের হাত থেকে উদ্ধার পায়। এ মুক্তি পেলে সে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়, তাঁর কাছে সম্ভূতি-অসম্ভূতি নিজের অস্তিত্বের দুই বিভাব মাত্র; সুতরাং অভিব্যক্তির মধ্যেই প্রকৃতির বিভ্রম-চক্রে পিষিত না হয়ে সে অমৃতত্ব উপভোগ করতে পারে। তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ব'লে জন্মের প্রয়োজন শেষ হয়; কিন্তু সম্ভূতি অঙ্গীকারের স্বাতন্ত্র্য তার থাকে। কারণ, ভগবান যুগপৎ সমানভাবে তাঁর নিত্যতার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভূতির স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করেন।

এমন কি, বলা যেতে পারে যে, সত্তাকেই পূর্ণতম মুক্ততম ভাবে পেতে হলে পরম অসতে সত্তার ধারণা পর্যন্ত বিলীন হবার সজ্ঞান অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। পূর্ণসমন্বয়ের দিক থেকে দেখলে, বৌদ্ধধর্মে ভাবাত্মক সত্তার স্বরূপের বিশুদ্ধতম বা ব্যাপকতম প্রত্যয়কেও অতিক্রম করবার যে মহৎ প্রয়াস করা হয়েছিল, এই হল তার তাৎপর্য।

সুতরাং অহংএর প্রতি এবং জন্মের প্রতি আসক্তির বিলয় ক'রে জীব মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, সব দ্বন্দ্ববোধের সীমাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সে মুক্ত-জীব সম্ভূতি স্বীকার করে আত্মার অনুগত ভাবে প্রকৃতির একটা প্রক্রিয়ারূপে, প্রকৃতির অধীন হয়ে নয়; এবং সে মুক্ত ও দিব্য সম্ভূতির দ্বারা সে অমৃতত্ব উপভোগ করে।

জীবনের সমর্থন

এভাবে, উপনিষদের তৃতীয় প্রবাহে জীবনের ও কর্মের প্রয়োজন শিক্ষা দেওয়া হল; দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্বেই সত্যসন্ধানীকে সে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কর্ম জীবনের সার। জীবন ব্রহ্মের অভিব্যক্তি; সে অভি-ব্যক্তির নিবর্তন-বিবর্তনের বিকাশ সাধিত হয় সচেতন সত্তার যে সাতটি তত্ত্বের দ্বারা, ব্রহ্মে তাদের সুসঙ্গতি বিধান করে প্রাণতত্ত্ব। মাতরিশ্বা ব্রহ্মে সব জলরাশির, দিব্য অস্তিত্বের সপ্তধারায় গতির, যথাযথ বিন্যাস

করেন।

সে দিব্য অস্তিত্বই ঈশ্বর। বিশ্ব-সংসৃতিতে তিনি সর্বত্র বহির্মুখে গমন করেছেন তাঁর তিনটি বিভাবে:---সব বস্তু-সত্যের সর্বময় দ্রষ্টারূপে, মনের দ্বারা সব সম্ভাব্যতার নির্দেষ্টারূপে, দৃশ্যমান সব ব্যাপারের স্থূল পরিণতির কর্তারূপে তিনি বিশ্বকে প্রকটিত করেছেন। প্রত্যেকের বিশিষ্ট প্রকৃতি, বিকাশ ও লক্ষ্য অনুসারে, অনাদিকাল থেকে তিনি অমোঘভাবে সব বস্তুর আকার ও পরিণতি নিরূপিত করেছেন।

এই নিরূপণ তাঁর বিদ্যা-অবিদ্যা--স্বরূপ-একত্বের চেতনা ও প্রাতিভাসিক বহুত্বের চেতনা--এই যুগ্ম সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

চরম সীমাতে উপনীত হয়ে বহুত্ব পুনরাবর্তিত হয় সজ্ঞান ব্যষ্টি সত্তাতে,---সেই ঈশ্বর, সংসারে সব বিগ্রহে বাস ক'রে প্রথমতঃ অজ্ঞানের লীলা উপভোগে রত। পরে, অজ্ঞানের মধ্যে বাস ক'রে আত্মবিকাশের ফলে জীব জ্ঞানের সামর্থ্য ফিরে পায় এবং জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব উপভোগ করে।

সে অমরত্ব অর্জন করা যায় নিত্যমুক্ত, অজ ও অমর, ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের চেতনাতে সসীম অহং-এর এবং তার জন্মশৃঙ্খলের বিলয় ক'রে। কিন্তু তা ভোগ করতে হয় বিশ্বে দিব্য মুক্ত সম্ভূতির দ্বারা, বিশ্বের বাহিরে নয়; কারণ, সেখানে তা নিত্য অধিগত, কিন্তু এখানে, এই জড়দেহে, দিব্য অন্তর্যামী সত্তাকে সাধনার দ্বারা সে অমরত্ব অর্জন ক'রে উপভোগ করতে হবে আপাতদৃষ্টিতে তার সর্বাপেক্ষা বিপরীত সংজ্ঞাতে, ব্যষ্টি জীবনে এবং বিশ্বের বহুমুখী চেতনাতে।

জীবন অতিক্রম করতে হবে, যাতে তাকে মুক্তভাবে গ্রহণ করা যায়; বিশ্বে কর্ম উত্তীর্ণ হতে হবে, যাতে সে কর্ম দিব্যভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

এমন কি, আপাত বন্ধনের মধ্যেও জীব প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, বন্ধন তার একটা খেলা বই নয়; কিন্তু মুক্তির চেতনাতে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং, এই বস্তু কি ওই বস্তু নয়, বিশ্বজনীনভাবে ভাগবত সত্তাকে, সর্বময়কে লাভ করতে ও উপভোগ করতে হবে।

চতুর্থ প্রবাহ

(১) লোকসমূহ—সূর্য

(শ্লোক ১৫-১৬)

পরলোক

তৃতীয় শ্লোকে অন্ধতমসাবৃত সূর্যহীন লোকের উল্লেখ রয়েছে। বিচারের তৃতীয় প্রবাহে আত্মার অন্ধতামসে প্রবেশের কথা দুবার বলা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় যেন এখানে উদ্দিষ্ট হল চেতনার অবস্থা, লোক নয়। তবে, বস্তুতঃ এ দুই উক্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কারণ বেদান্তমতে লোক ত সচেতন সত্তার অভিব্যক্তি অস্তিত্বের উপাদানভূত সপ্ততত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটা সুবিন্যস্ত সংস্থিতি বই নয়। এখানে, পৃথিবীতে দেহধারণ ক'রে আমরা চেতনার যে অবস্থাতে উপনীত হই, আমাদের মনোময় সত্তা দেহ থেকে প্রয়াণ করবার পরেও আমাদের চেতনার অবস্থা এবং তার দ্বারা ব্যবস্থিত পরিবেশ তারই অনুযায়ী হবে। কারণ, বিদেহী ব্যষ্টি আত্মার পক্ষে মাত্র তিন প্রকার গতি সম্ভব: হয় তাকে অস্তিত্বের সাধারণ সব উপাদানের মধ্যে মিশে যেতে হবে, না হয় ব্রহ্মে বিলীন হতে হবে আর না হয় পার্থিব ছাড়া চেতনার অপর কোন সংস্থিতিতে এবং, দেহাশ্রিত জীবনের জন্য বিহিত সব সম্বন্ধ ব্যতীত, বিশ্বের সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে বর্তমান থাকতে হবে। চেতনার এই সব অবস্থা এবং তার উপযুক্ত সব সম্বন্ধই হল অপর লোক বা মৃত্যুর পরের লোক।

অবস্থাত্রয়

অভিব্যক্ত বিশ্বসম্পর্কে আত্মার তিন অবস্থার কথা এ উপনিষদে পাওয়া যায়: দেহে জন্মগ্রহণের ফলে পার্থিব অবস্থা, মৃত্যুর পরে অন্যান্য অবস্থাতে ব্যষ্টি আত্মার উদ্বর্তন এবং অমর অস্তিত্ব, যা জন্মমৃত্যুর অতীত এবং অভিব্যক্তির অতীত হলেও, অন্তর্নিবাসীরূপে সব আধারে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রভুরূপে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে পারে। প্রথম দুই অবস্থা সম্ভূতির অধিকারে, অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অসম্ভূতিতে, পরমাত্মাতে—সম্ভূতির তিনিই ভোক্তা।

পার্থিব দেহে পুনর্জন্মের কথা এ উপনিষদে পরিষ্কার করে বলা না হলেও, তার ভাব ও ভাষাতে সে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, বিশেষ ক'রে ১৭শ শ্লোকে। পুনর্জন্মে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে, মৃত্যুর পরে মানুষ তিনটি পৃথক উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রাখতে পারে: পৃথিবীতে উৎকৃষ্টতর ও সুভগতর এক বা বহুজীবন, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে জ্যোতি ও সুখের লোকে হর্ষোল্লাসে নিত্যরতি অথবা সর্বাতিশয়িত্ব, অর্থাৎ সব বিশ্ব-অস্তিত্ব বর্জন ক'রে, অনন্তচেতনার বাস্তবে সিদ্ধ বা সম্ভাব্য কোন আধেয়ের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রেখে, নিজের সত্য সত্তার মধ্যে যেমন, তেমনি পরাৎপরে মিশে যাওয়া।

পুনর্জন্ম

এ উপনিষদের শিক্ষাতে পৃথিবীতে সুভগতর এক বা বহু জীবনকে মানবাত্মার চরম পরিণতি বলা হয়নি। কিন্তু মুক্তি অর্জনের পূর্বে, জীব যতদিন নিজের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাধনে নিরত থাকে ততদিন উপস্থিত উদ্দেশ্যরূপে তার একটা আবশ্যকতা থাকে। জন্মমৃত্যুর অধীনতা থেকে বোঝা যায় যে, মনোময় পুরুষ এখনও তার প্রকৃত অতিমানস ও অধ্যাত্ম সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় নাই, কিন্তু "অবিদ্যার মধ্যে, অবিদ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে" বাস করছে।* সে মিলনলাভের বিধিনির্দিষ্ট উপায় হল পৃথিবীতে মানব জীবন। মুক্তির পরে জীবাত্মা স্বাধীন, কিন্তু তখনও ইচ্ছামত সে সমগ্র জগৎ-গতিতে যোগদান করতে পারে এবং জন্মে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তবে তার নিজের প্রয়োজনে আর নয়, অপরের জন্য এবং তার সব প্রবৃত্তির প্রভু অন্তর্যামী দিব্যসত্তার ইচ্ছাতে।

স্বর্গনরক

ওপারে, স্বর্গে পরম সুখ-ভোগও চরম সার্থকতা নয়। তবে, বেদান্তমতে পুনর্জন্মের অর্থ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন দেহে জন্মগ্রহণ নয়। মানবের মনোময় সত্তা তার শারীর ও জৈব সত্তার সঙ্গে তেমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ নয়; এদিকে, তার শারীর ও জৈব সত্তা সাধারণতঃ মৃত্যুর পরেই একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং, আবার পার্থিব জীবনে আকৃষ্ট হবার পূর্বে মানবাত্মার একটা অবকাশ চাই, যাতে সে পার্থিব সব অভিজ্ঞতা

* অবিদ্যায়াং অন্তরে বর্তমানাঃ—কঠ, ১।২।৫; মুণ্ডক, ১।২।৮

পরিপাক ক'রে পৃথিবীতে নূতন শারীর ও জৈব সত্তা গঠন করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই সময়ে তাকে ওপারে কোন না কোন সংস্থিতিতে বা লোকে বাস করতে হয়; এবং সেসব লোক বা অবস্থা তার ভবিষ্যৎ প্রগতির অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে। পরম সত্যের আলোক (সূর্য যার প্রতীক) সে-সবের মধ্যে যতটা প্রবেশ করেছে সেই পরিমাণে সে-সব লোক প্রগতির অনুকূল হয়, কিন্তু অন্তর্বর্তী অজ্ঞান অন্ধকারের সব অবস্থা আত্মার প্রগতির পক্ষে হানিকর। তৃতীয় শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, সে-সব লোকে প্রবেশ করে যারা আত্মঘাতী, যারা আলোকের পথ রোধ ক'রে বা পরিণতির সাধারণ ধারা বিকৃত ক'রে নিজেদের অনিষ্ট করে। বেদান্তের স্বর্গ হল এই সব আলোকের ও আত্ম-প্রসারের অবস্থা, আর যে-সব নরক আত্মাকে পরিহার করতে হবে সে-সবের প্রকৃতি হল অন্ধকার, আত্ম-আবরণ, আত্মবিকৃতি।

সুতরাং, আত্মার ব্যক্তিগত পরিণতির দিক থেকে, পার্থিব জীবনের মতই, পারলৌকিক জীবন একটা উপায় মাত্র, স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নয়। মুক্তির পর জীবাত্মা ভাগবত অভিব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে যেমন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, তেমনি সে-সব লোকেও বিচরণ করতে পারে, কারণ সে-সব নিয়েই পূর্ণ অভিব্যক্তির ক্ষেত্র রচিত হয়, তার প্রত্যেকটিই অন্য সবার সঙ্গে গ্রথিত, অপর সবের আশ্রয় এবং সচেতন সত্তার সমগ্র সুবিন্যস্ত সংস্থিতির এক একটি অংশ।

উৎক্রান্তি

পরিণতির লক্ষ্য উৎক্রান্তি, কিন্তু তাতে যাকে অতিক্রম করা হল তাকে যে বর্জন করতেই হবে, তা নয়। জীবের পক্ষে, উৎক্রান্তিকে নিজের নির্বাণ অবধি টেনে নেবার প্রয়োজন নাই, তা উচিতও নয়। নির্বাণ হল অহংএর সব সীমার বিলোপ, অভিব্যক্তির সব সম্ভাবনার বিলোপ নয়; কারণ দেহ ধারণ ক'রেও তা লাভ করা যায়।

জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে জীবকে যে-সব বাসনা ত্যাগ করতে হয় তার সর্বশেষ হল ঐকান্তিক মুক্তির বাসনা, সর্বশেষ মোহ যা নষ্ট করতে হয় সে হল যে, জন্মের দ্বারা সে বদ্ধ হয়।

সূর্য ও অগ্নি

লোকসমূহের এই ধারণাকে এবং আত্মার সব বিভিন্ন সংস্থিতির অন্যোন্যসম্বন্ধকে ভিত্তি ক'রে, এ উপনিষদে পরম অনুভব ও দিব্যসুখে উপনীত হবার জন্য জ্ঞান ও কর্ম এই দুই পথের নির্দেশ আছে। আর তা দেওয়া হয়েছে সূর্য ও অগ্নির কাছে প্রার্থনার আকারে। তাঁরা বৈদিক দেবতা, সূর্য ও পরম সত্য ও তার আলোকের প্রতীক আর অগ্নি, যে ভাগবত ইচ্ছাশক্তি মানবের কর্ম ঊর্ধ্বমুখী করে, পবিত্র করে, পূর্ণাঙ্গ করে তার প্রতীক।

লোকসমূহের বিন্যাসক্রম

সূর্যের আসন ও কার্য সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে, সপ্তলোক সম্বন্ধে ও সে-সব লোকে চেতনার কোন্ কোন্ তত্ত্ব প্রতিরূপিত হয় সে সম্বন্ধে বেদের ধারণার মধ্যে একটু গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে।

সচেতন সত্তা মাত্রেই স্বরূপতঃ এক ও অবিভাজ্য কিন্তু অভিব্যক্তিতে তা পরিণত হয় একটা জটিল কল্লোলে, একটা সুসঙ্গত স্বরগ্রামে, স্থিতির বা গতির মর্যাদা অনুযায়ী একটা ক্রমবিন্যাসে। কারণ, আমরা যাকে স্থিতি বলি সে'ও জটিল গতির একটা বিন্যাস। সে বিন্যাসক্রম গঠিত হয় দুইটি গতির দ্বারা: একটা অবরোহণ বা নিবর্তনের গতি আর একটা অধিরোহণ বা বিবর্তনের গতি; আর তার ঊর্ধ্বতম পদ হল অধ্যাত্ম-সত্তা আর নিম্নতম, জড়।

অধ্যাত্ম সত্তাই 'সৎ' বা শুদ্ধ অস্তিত্ব--('চিৎ') আত্মসংবিতে শুদ্ধ, ('আনন্দ') আত্মরতিতে শুদ্ধ। সুতরাং, অধ্যাত্মসত্তাকে সব সচেতন পুরুষের ত্রিবৃৎ ভিত্তি বলা যেতে পারে। তিনটি পদ আছে কিন্তু সে তিনটি প্রকৃত-পক্ষে এক। কারণ, শুদ্ধ অস্তিত্ব মাত্রেই স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মচেতনা এবং শুদ্ধ আত্মচেতনা মাত্রেই স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মানন্দ। তথাপি, আমাদের চেতনা এ তিনের মধ্যে ভাবনার ও বাক্যের দ্বারা প্রভেদ রচনা করতে পারে, এমন কি নিজের বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ গতি-বৃত্তিতে নিজের কাছে তাদের আপাতবিপরীত বোধেরও সৃষ্টি করতে পারে।

সচেতন সত্তার স্বভাব সম্বন্ধে সমগ্র সম্বোধি থেকে জানা যায় যে, স্বরূপতঃ অবশ্যই তা এক, কিন্তু আত্ম-অভিজ্ঞতাতে অনন্ত জটিলতার ও বহুত্বের অব্যক্ত সামর্থ্য তার মধ্যে নিহিত আছে। সেই পরম একের মধ্যে অব্যক্ত জটিলতার ও বহুত্বের বিকাশকেই আমাদের দিক থেকে

আমরা বলি অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি, জগৎ বা সম্ভূতি ('ভুবন', 'ভাব')। তাছাড়া কোন বিশ্ব-অস্তিত্ব সম্ভবপর হত না।

এ অভিব্যক্তি সাধন করে সত্তার আত্মসংবিৎ। নিজের মধ্য থেকে আত্মসংবিতের সব অব্যক্ত জটিলতা প্রকটিত করবার ক্ষমতাকে বলা হয় 'তপস্', বল বা শক্তি; এবং আত্মসচেতন ব'লে প্রকৃতিতে তা 'ক্রত' বা সংকল্পের মত। তবে সংকল্প বলতে আমরা বুঝি, উদ্দিষ্ট বিষয়ের বাহিরে অবস্থিত বাহ্য উপাদানের উপর ক্রিয়াশীল, তার ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু, কিন্তু এ তা নয়; এ সংকল্প পরম সত্তাতে অন্তর্নিহিত, সম্ভূতিতেও অন্তর্নিহিত ও জগৎ-গতি থেকে অভিন্ন; এ আত্মসচেতন সংকল্প নিজের মধ্যে যা দেখে বা বোধ করে তাতেই পরিণত হয়, নিজের ক্রিয়ার শক্তিরূপে তার প্রকাশ হয় আর সে ক্রিয়ার পরিণাম রূপে তার স্বরূপ প্রকটিত হয়। এই সংকল্পের দ্বারা, 'তপস্' বা চিৎশক্তির দ্বারা সব বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে।

উচ্চতর লোক

আত্মসংহত সত্তার যে-সব বিন্যাস শুদ্ধ সৎ-এর একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-সব হল 'পরার্ধে'র, ঊর্ধ্বতম সৃষ্টির অঙ্গীভূত,—চিন্ময় সব লোক। তার তিনটি প্রধান সংগঠন আমাদের কল্পনায় আসে।

আত্মসংবিতের শক্তি বা 'তপস্', যখন 'সৎ' বা শুদ্ধ অস্তিত্বকে ভিত্তি ক'রে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'সত্যলোক', বা সত্য অস্তিত্বের জগৎ। সত্যলোকে আত্মা তার সব অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বরূপে একত্বের গুণে অভিন্ন, সুতরাং আত্মসংবিতের শক্তিতেও অভিন্ন, এবং আনন্দেও অভিন্ন।

চিৎ-এর ক্রিয়াশক্তিকে ভিত্তি ক'রে তপস্ যখন অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'তপোলোক' বা আত্মসংবিতের শক্তির জগৎ। তপোলোকে আত্মা তার সব অভিব্যক্তির সঙ্গে এই পরাশক্তিতে অভিন্ন ব'লে সে সবের সমষ্টি-গত আনন্দও অভিন্নরূপে উপভোগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বরূপ একত্বের ভাজন হয়।

সত্তার কর্মপ্রবৃত্ত আনন্দকে ভিত্তি ক'রে তপস্ যখন অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় 'জনলোক', সৃষ্টিপর আনন্দের জগৎ। জনলোকে আত্মা সব অভিব্যক্তির সঙ্গে সত্তার আনন্দে অভিন্ন আর সেই আনন্দের মাধ্যমেই সচেতন শক্তিতে ও স্বরূপ সত্তাতেও অভিন্ন।

চেতনার এই সব সংস্থিতির কোনটিতেই একত্ব ও বহুত্ব এখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সব আছে সবের মধ্যে, প্রত্যেকে আছে সবার মধ্যে, সব আছে প্রত্যেকের মধ্যে,—সহজভাবে, সচেতন সত্তার প্রবৃত্তি বশেই; সে বোধের জন্য ধারণার কোন উদ্যম বা প্রতীতির কোন ক্লেশ আবশ্যক হয় না। সেখানে কোন রাত্রি নাই বা অন্ধকারও নাই। আর প্রকৃতপক্ষে আলোক দেবার জন্য সূর্যের কোন বিশিষ্ট ক্রিয়াও নাই। কারণ, চেতনার সবটাই সেখানে স্বতঃ জ্যোতির্ময়, অপর কোন আলোকের প্রয়োজন সেখানে নাই। ঈশ্বর বা পরমপুরুষের একত্বের মধ্যে সূর্যের বিবিক্ত অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয় আর সেই ভাস্বর একত্বই হল সূর্যের সর্বাপেক্ষা কল্যাণময় রূপ।

নিম্নতর সৃষ্টি

নিম্নতর সৃষ্টিতেও তিনটি তত্ত্ব আছে: জড়, প্রাণ, মন। সৎ সেখানে দেশে ব্যাপ্তিশীল পদার্থের বা জড়ের রূপে প্রতিভাত হয়; ইচ্ছাশক্তি প্রাণরূপে প্রতিভাত হয়—তবে প্রকৃতিতে প্রাণ সৃজনের বা অভিব্যক্তির শক্তি, আর তার সৃষ্ট সব বিগ্রহে নিবর্তিত ও প্রচ্ছন্ন হলেও, স্বভাবতঃ তা আত্মসংহত ইচ্ছাশক্তি। বাসনা ও সংবেদনের মধ্যে সত্তার আনন্দ আত্মসচেতন হতে যে প্রয়াস করে তার দ্বারা প্রাণ নিবর্তনের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত হয়; আর তার ফলে মনের আবির্ভাব হয়। অন্ততঃ, অধিরোহণ বা ক্রমবিবর্তনের ধারাতে আমরা অবস্থিত ব'লে আমাদের সেই প্রতীতি জন্মে।

যেখানেই জড় আছে সেখানেই নিবর্তিত বা বিবর্তনশীল প্রাণ ও মন রয়েছে। তেমনি আবার, প্রাণ-মনের ক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে জড়ীয় কোন না কোন আকার থাকে। বিভাজনাত্মক অবিদ্যাতত্ত্বের অধীন ব'লে এই তিন তত্ত্বকে ত্রৈক মনে না হয়ে ত্রিধাভিন্ন মনে হয়।

চেতনার যে সংস্থিতির অন্তর্ভুক্ত আমরা, তপস্ সেখানে জড়কে ভিত্তি ক'রে অধিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য আকার নিয়ে, দেশে বিস্তৃত পদার্থের বিভাজ্যতার দ্বারা আমাদের চেতনা নিরূপিত হয়। এই হল 'ভূর্লোক', জড়বিশ্ব, সাকার সম্ভূতির জগৎ।

কিন্তু আমরা এমন জগতের কল্পনা করতে পারি যেখানে ভিত্তি হল কর্মপ্রবৃত্ত প্রাণশক্তি এবং তাতে প্রকাশমান সংবেদন, যেখানে স্থূল জড়ের

বাধার দ্বারা ব্যাহত না হয়ে প্রাণশক্তি তার সব আকার নিরূপণ করতে পারে। চেতনার এ বিন্যাসের ক্ষেত্র হল 'ভুবর্লোক', জৈবতত্ত্বের ইচ্ছামত আকারে স্বচ্ছন্দ সম্ভূতির সব জগৎ।

আবার, চেতনার সুবিন্যস্ত এমন একটা সংস্থিতিরও কল্পনা করতে পারি, যেখানে চেতনা জড়সংস্পর্শজাত সংবেদনের অধীনতা থেকে মুক্ত এবং জৈব অভিব্যক্তির ফলে যে-আধারে সে অধিষ্ঠিত হয়েছে তার দ্বারা নিরূপিত নয়, কিন্তু প্রভুভাবে নিজের সব আকার নিজেই নিরূপণ করতে পারে। এই সংগঠন হল 'স্বর্লোক' বা স্বাধীন বিশুদ্ধ এবং ভাস্বর মনোবৃত্তির জগৎ।

এই সব নিম্নতর লোকে চেতনা সাধারণতঃ বিচূর্ণ ও বিভক্ত থাকে। সূর্যের আলোক, বা পরম সত্য, অবচেতনের অন্ধকারে অবরুদ্ধ থাকে অথবা কয়েকটি মাত্র কেন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে প্রকাশিত হয় কিংবা সেই কেন্দ্র ক'টিতেই গৃহীত হয় এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তার কিরণ ব্যবহৃত হয়।

মধ্যবর্তী লোক

এই দুই সৃষ্টির মাঝে, তাদের একত্র গ্রথিত ক'রে আছে যে লোক বা চেতনার যে সংস্থিতি তার ভিত্তি হল বস্তুর অনন্ত সত্য। সর্বব্যাপী আত্মা সেখানে আর প্রবল ব্যষ্টিভাবের দ্বারা গ্রস্ত নয়, সেখানে চেতনার ভিত্তি হল সে আত্মার বৃহৎ সমগ্রতা, সে জগৎ-গতির সব ব্যষ্টি-কেন্দ্র সেই ভূমাতেই বিন্যস্ত আর তার কোন ব্যষ্টিই সমষ্টির সমগ্রতাবোধ বা অপর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতাবোধ কখনই হারায় না। বহুত্ব আর প্রবল হয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে না, বরং সে-জগতের গতির সব জটিলতার মধ্যেই স্বরূপ একত্ব এবং স্বীয় সমষ্টির সমগ্রতার প্রতি উন্মুখ থাকে। সুতরাং এ জগৎকে 'মহর্লোক' বা ভূমাচেতনার জগৎ বলা হয়।

মহর্লোকের তত্ত্ব হল বিজ্ঞান বা ভাবনা। কিন্তু এ বিজ্ঞান বুদ্ধি-প্রসূত প্রত্যয় নয়, সম্বোধি-জাত, বরং বলা যেতে পারে, সত্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বযুক্ত ভাবনা*। প্রভেদ হল যে, বুদ্ধিপ্রসূত প্রত্যয় আকারপ্রবণ, সে আকার

* সম্বোধি (প্রত্যাদেশ, অনুপ্রেরণা, বোধিজাত অনুভব বা বিবেক) হল মনের মধ্যে, মনের সব সীমা মেনে নিয়ে, মনের সব রূপের উপর ক্রিয়াশীল বিজ্ঞান বই

কোন একটা ধারণার রূপ নেয় এবং একবার সে রূপ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে, তা অপর সব প্রত্যয় থেকে একান্তভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। কিন্তু বিশুদ্ধ সম্বোধিজাত বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞ ভাবনা পরম সত্তা ও সম্ভূতি, উভয়ের মধ্যেই নিজেকে দেখে। যে অস্তিত্ব নিজের প্রতীকরূপে আকার প্রকটিত করেছে তাঁর সঙ্গে সে একাত্ম, সুতরাং আকারে প্রচ্ছন্ন সত্যের জ্ঞান তার সর্বদাই জাগ্রত আছে। সত্তার আত্মসংবিৎ এবং পরম অদ্বিতীয়ের শক্তি তার প্রকৃতিগত, তাঁর সমগ্রভাব সম্বন্ধে সর্বদাই সে সজ্ঞান, সুতরাং সমগ্র অস্তিত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে তার সব আধেয় সাক্ষাৎ ভাবে সে প্রত্যক্ষ করে। সে-প্রত্যক্ষের প্রকৃতি হল 'দৃষ্টি': দেখা, ধারণা করা নয়। সে-দর্শন, যুগপৎ স্বরূপের ও প্রতিরূপের দর্শন। এই সম্বোধি বা তত্ত্ববিজ্ঞানই হল বেদের সত্য, সূর্যের আত্মদর্শন ও সর্বদর্শন।

সত্য ধর্ম

এ সত্যের মুখ একটা উজ্জ্বল আবরণে, যেন স্বর্ণপাত্রের দ্বারা, আচ্ছাদিত; অর্থাৎ আমাদের মানব-চেতনার দৃষ্টি থেকে নিগূঢ়। কারণ, মনোময় জীব আমরা, আমাদের সাধারণ মন দিয়ে দেখার ঊর্ধ্বতম রূপও মনেরই সব প্রতীতি ও প্রত্যয় দিয়ে গড়া; সে-সব অবশ্যই জ্ঞানের উপায়, পরম সত্যের রশ্মি, কিন্তু স্বভাবতই সৎস্বরূপের সত্য নয়, বাহ্যরূপের সত্য মাত্র; সেসবের সাহায্যে আমরা বস্তুর প্রতিভাসের জ্ঞান সুবিন্যস্ত ক'রে তার পশ্চাতের সত্য অনুমান করতে চেষ্টা করি। সৎ-স্বরূপের সত্যই প্রকৃত জ্ঞান, মাত্র বাহ্যরূপ বা প্রতিভাসের সত্য জ্ঞান নয়।

প্রকৃত সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি শুধু যদি সূর্য আমাদের মধ্যে কাজ ক'রে প্রতীতি-প্রত্যয়ের এই উজ্জ্বল রূপায়ণ দূর ক'রে, তার স্থলে আত্মদর্শন ও সর্বদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেন।

সেজন্য আমাদের মধ্যে পরম সত্যের ধর্ম ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত হওয়া

নয়। সত্য বিজ্ঞান বা প্রকৃত অতিমানস হল মনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটা শক্তি, পরম সত্তার সাক্ষাৎ একত্ব থেকে স্বীয় ধর্ম অনুযায়ী তার সব কাজ হয়; এ তাঁরই অনন্যসাপেক্ষ আত্মসংবিতের সত্য, সে নিজেকে নিজেরই অনন্যসাপেক্ষ আলোকের জ্যোতিতে জানে, কোন প্রয়াসের, এমন কি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানদীপ্ত প্রয়াসেরও, তার কোন প্রয়োজন হয় না।

প্রয়োজন। সব-বস্তু ঠিক যা, আমরা যা, তা দেখতে আমাদের শিখতে হবে। বর্তমানে আমাদের কাজের যা ধারা তাতে আত্মজ্ঞান ও সংকল্প বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের অস্তিত্ব অপর সবার থেকে পৃথক, এই মূল মিথ্যা নিয়ে আরম্ভ ক'রে আমরা সব পৃথক সত্তার পার্থক্যের মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধ জানতে চেষ্টা করি এবং সেই মিথ্যায় গড়া জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করি। পরম সত্যের ধর্ম আমাদের মধ্যে কাজ করলে আমরা দেখতাম যে, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে অপর সবাই অন্তর্ভুক্ত, আমাদের অস্তিত্বের সব রূপ সমগ্রের ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত, এবং সমগ্রের মধ্যে ও সমগ্রের ক্রিয়ার দ্বারাই তার সব শক্তি কাজ করে। তাহলে, সত্যকে বিকৃত ক'রে মিথ্যা-রূপে প্রতিফলিত করাই যার প্রকৃতি, এমন একটা মধ্যবর্তী তত্ত্ব থেকে উত্থিত না হয়ে আমাদের আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া স্বাভাবিক ও সাক্ষাৎভাবে আমাদের আত্মসত্তা থেকে ও বস্তুর মূল সত্য থেকে উৎসারিত হত।

মানবের মধ্যে সূর্যের পূর্ণোদয়

তবে, যে পরম সত্য আমাদের মুক্ত করবে তার অঙ্কুর, অন্ততঃ তার বীজ, আমাদের সাধারণ ক্রিয়াতেও আছে। প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতীতির পশ্চাতে একটা বোধি, একটা সত্য আছে, তার বাহ্যরূপ অবিরত বিকৃত হয়ে মিথ্যাতে পরিণত হলেও তার সারস্বরূপ অবিকৃত থাকে এবং তার কাজ হল নিজের আলোক ও পরিসর বৃদ্ধি ক'রে অভিব্যক্তির সত্যের দিকে আমাদের পরিচালিত করা। এই সব বিভাজন ও ভেদ-দর্শনের ক্লেশের পশ্চাতে রয়েছে ঐক্যসাধনের একটা সনির্বন্ধ প্রবেগ এবং, ক্ষেত্র-ভেদে পৃথক ফলের জন্য অবিরাম তার বিকৃতি হলেও, অবিচল অধ্য-বসায়ের সঙ্গে তা আমাদের জ্ঞানে, সত্তাতে ও সংকল্পে অবশ্যম্ভাবী সমগ্রতার দিকে নিয়ে যায়।

সূর্যই 'পূষন্', পুষ্টি ও বৃদ্ধিদাতা। তাঁরই কাজ, এই খণ্ডিত আত্ম-প্রতীতি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া প্রসারিত ক'রে, সমগ্র জ্ঞান ও ইচ্ছাতে পরিণত করা। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা, অন্যবিধ সব জ্ঞানের স্থলে তাঁর অভেদদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত ক'রে পরিণামে তিনিই আমাদের একত্বে উপনীত হবার ক্ষমতা দেন। তখন বোধিলব্ধ এই সমগ্র দর্শন, অর্থাৎ সর্বময়ের মধ্যে মধ্যে প্রত্যেককে ও প্রত্যেকের মধ্যে সর্বময়কে প্রত্যক্ষ করাই হয় আমাদের

যথাযথ কর্মপ্রেরণার বা সত্যধর্মের প্রবর্তক। কারণ, সূর্যই 'যম' বা নিয়ন্তা ও বিধাতা, তিনিই ধর্ম স্থাপন ও রক্ষা করেন। এইভাবে আমাদের মধ্যে আলোকদাতা সূর্যের ক্রিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সত্যবিজ্ঞানের সমগ্রতা সিদ্ধ হয়। তখন আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যের সত্তাতে, অর্থাৎ যে-বিজ্ঞানের দ্বারা পর পর সব লোক সৃষ্ট হয় তাতে যা কিছু আছে সে-সবই হল এক-মাত্র অস্তিত্ব ও সব সম্ভূতির একমাত্র অধীশ্বরের মধ্যে, অর্থাৎ পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দের মধ্যে জগতের সম্ভূতি। সব সম্ভূতিরই জন্ম পরম সত্তা থেকে, কিন্তু তিনি নিজে সব সম্ভূতির ঊর্ধ্বে, তিনি সে সবের প্রভু, প্রজাপতি।

সূর্যের দর্শনলাভ হলে সে উদ্ভাসনে সত্যজ্ঞান গড়ে ওঠে। সে গঠনের ধারাতে দুইটি ক্রিয়ার পারম্পর্যের উল্লেখ এ উপনিষদে আছে। প্রথমত সূর্যের সব রশ্মি সুবিন্যস্ত বা যথাযথ ক্রমে সজ্জিত হয়, অর্থাৎ বস্তু-স্বরূপের ও তার প্রতীকের জ্ঞান পৃথক পৃথক বোধির দ্বারা লাভ ক'রে, সে-সবের সাহায্যে আমাদের প্রতীতি-প্রত্যয়ের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সব সত্য আবিষ্কার করা হয় এবং প্রকৃত অন্যোন্য-সম্বন্ধ অনুসারে সে-সব সাজিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে সববিষয়ে বোধিলব্ধ অখণ্ডিত সব জ্ঞানে উপনীত হয়ে, আমরা পরিশেষে তা অতিক্রম ক'রে একত্ব-জ্ঞান লাভ করতে পারি। সে-ই হল সূর্যালোক সমাহৃত বা সমূহিত করা। আমাদের মনোবৃত্তির বিশেষ গঠনের জন্যই এই দ্বিদল ক্রিয়া আবশ্যক হয়, কারণ আদিম সত্যবিজ্ঞানের মত, আমাদের মন সাক্ষাৎভাবে সমগ্র থেকে আরম্ভ ক'রে, অভ্যন্তর থেকে তার মধ্যে কি আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বিমূর্ত বা বস্তুবিবিক্ত একটা ভাব, অথবা সমাহার বা শূন্য ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমাদের মন একত্বের প্রায় কোন ধারণা করতে পারে না। সুতরাং, মনকে তার স্বকীয় ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে ঊর্ধ্বতর পদ্ধতির দিকে ধীরে ধীরে চালিয়ে নিতে হয়। নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিন্যাসের কাজই তাকে করতে হয়, তবে ঊর্ধ্বতর বৃত্তির সাহায্যে ও তার ক্রিয়ার দ্বারা; তাতে সে বিন্যাস আর মনের ইচ্ছামত হয় না, হয় অস্তিত্বের পরম সত্যের ক্রিয়ার ধারা অনুসরণ ক'রে। পরে, এইভাবে ধীরে ধীরে তার অভ্যস্ত ক্রিয়ার ধারা ক্রমাগত সংশোধন ক'রে, সে ধারাকেই বিপরীতমুখী ক'রে মন সমগ্র থেকে তার সব আধেয়ে অগ্রসর হতে শিখতে পারবে; আর এখনকার মত, অংশগুলিকে* পূর্ণবস্তু ব'লে ভুল ক'রে, সে-সব থেকে তাকে আর

* প্রকৃতপক্ষে অংশ ব'লে কিছুই নাই কারণ অস্তিত্ব অবিভাজ্য।

একটা এমন বস্তুতে অগ্রসর হতে হবে না, যাও আবার আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে অংশমাত্র এবং যাকে পূর্ণবস্তু বলে গ্রহণ করা ভুল হয়েছে।

‘একং সৎ’

এইভাবে সূর্যের উদ্ভাসনের ফলে, আমরা পরম অতিচেতনের যে আলোকে উপনীত হই তাতে, এমন কি, সমগ্রদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুসত্যের সম্বোধিলব্ধ জ্ঞানও ‘একং সৎ’-এর স্বয়ংপ্রভ আত্মদর্শনে পরিণত হয়; আর সে পরম অদ্বিতীয়ের আত্ম-অনুভব কখনও স্বকীয় একত্ব বা আত্মজ্যোতি হারায় না এবং সে আত্ম-অনুভবের অনন্ত জটিলতার মধ্যেও তিনি নিত্য এক। এই হল সূর্যের দিব্যতম রূপ। কারণ, এই হল পরম জ্যোতি, পরম ইচ্ছাশক্তি, অস্তিত্বের পরম আনন্দ।

তিনিই ঈশ্বর, পরমপুরুষ, আত্মচেতন সত্তা। এ দৃষ্টি হলে সমগ্র আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এই হল দর্শনের পরাকাষ্ঠা, আর এ উপনিষদে তারই বর্ণনা করা হয়েছে ‘সোঽহং’, এই মহাবাণীর দ্বারা। “ঐ, ঐ যে যে-পুরুষ সেই আমি”। ঈশ্বর জগতের সব গতিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, বহুরূপের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু সবের মধ্যেই বাস করেন পরম অদ্বিতীয়। এই আত্মজ্ঞ সত্তাই সত্য আমি, যাকে ব্যষ্টি বিগ্রহে অধিষ্ঠিত মনোময় সত্তা নিজের প্রকৃত অহং বলে জানতে পারে,——এই ‘সঃ’, পরমদেব। ইনিই সর্বময়, তথা সর্বাতিশয়ী তৎ-স্বরূপ।

চতুর্থ প্রবাহ

(২) কর্ম ও দিব্যক্রতু

(শ্লোক ১৭-১৮)

কর্মের দিক

তাহলে মর্ত্যভাব থেকে অমরত্বে প্রগতির মূলসূত্র আমরা পাই সূর্যের সাহায্যে, যে আলোক নিয়ে মন পরিণামে নিজেকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় ক্রমশঃ তার বৃদ্ধি ক'রে। সূর্যদ্বার* দিয়েই ব্যষ্টিজীবের সীমাবদ্ধ চেতনা সর্বাশ্লেষী এক পরমাত্মার ক্রোড়ে পূর্ণ চেতনাতে ও জীবনে উপনীত হয়।

চেতনা ও জীবন উভয়ই অমরত্বের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কর্ম ছাড়া জ্ঞান অপূর্ণ থাকে। তপসের দ্বারা চিৎ, শক্তির দ্বারা সংবিৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এবং পুরাতন ঋষিদের কাছে সূর্য যেমন দিব্য জ্যোতির প্রতীক, অগ্নিও তেমনি বল, সামর্থ্য চেতনার অন্তঃস্থিত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। অগ্নির কাছে প্রার্থনা ক'রে সূর্যের কাছে প্রার্থনা সম্পূর্ণ করা হল।

ব্যষ্টি সংকল্প

যেমন জ্ঞানে তেমনি কর্মে, একত্বই হল সবের প্রকৃত আশ্রয়। বিভাজনকে স্বধর্ম বলে স্বীকার ক'রে ব্যষ্টি জীব নিজেকে তার অহংভাবিত সীমার অবরোধ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে, তাই তার ক্রিয়াবৃত্তি মৃত্যুর অধীন, তমসাচ্ছন্ন ও জ্ঞানহীন না হয়ে যায় না। তার কর্মের উদ্দেশ্য ও উপায় সে স্থির করে যে জ্ঞান অনুসরণ ক'রে তাও ব্যক্তিগত এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় বাসনা, অভ্যস্ত চিন্তার ধারা ও অবচেতনার সব অন্ধ প্রেরণার দ্বারা অথবা বড়জোর একটা ভগ্ন, আংশিক ও চঞ্চল আলোকের দ্বারা। সে বাস করে দিনের ছায়ালোকে, সূর্যের পূর্ণ দীপনে নয়। আন্তর বিষয়ী ও বাহ্য বিষয়, উভয়েরই জ্ঞান তার সংকীর্ণ, আর কোন দিকেই তা সমপ্রজ্ঞান বা বিশ্বের সমগ্র ব্যাপার ও সমগ্র ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে একাত্ম নয়।

* মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।১১

সুতরাং তার কর্মের প্রেরণা ও ধারা দুই-ই হয় কুটিল, বহুশাখায় প্রধাবিত, দ্বিধাখণ্ডিত ও অস্থির। সত্যের সন্ধানে সে মিথ্যার প্রান্তরে হারা-উদ্দেশ্যে ঘোরে, সমগ্রকে গড়বার ইচ্ছায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড চয়ন ক'রে বা যদৃচ্ছাক্রমে সংগ্রহ ক'রে সে সব একত্র করে, সুনৃতের সন্ধানে ভ্রম ও পাপের অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে স্খলিত পদে বিচরণ করে। একত্বদর্শী বা সর্বগ্রাহী দৃষ্টি তার নাই, বিশ্বক্রতুর সমগ্রতা বা সর্বাতিশয়ীর সংহত একত্বও তার নাই; ব্যষ্টির সংকল্প সেইজন্য ন্যায় ও মঙ্গলের ঋজু পথে সত্য ও অমরত্বের দিকে চলতে পারে না। সে বাসনার দ্বারা চালিত হয়, তার চারদিক থেকে নানা শক্তির সব অভিঘাত তার উপরে আসে আর অহং ও অজ্ঞানের বাধার জন্য সেসবের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না; তাই সে অজ্ঞানের যমজ সন্তান, দুঃখ ও মিথ্যার অধীন হয়। দিব্য সত্য ও সুনৃত তার নাই বলে দিব্য সুখও সে পেতে পারে না।

অগ্নি ভাগবত ইচ্ছাশক্তি

কিন্তু আমাদের স্থূল মন ও বুদ্ধির অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে যেমন একটা দিব্য জ্যোতি আছে যা এই গোধূলি ছটায় মানুষের মধ্যে পরম সত্যের প্রভাত আলোর পূর্ণ বিকাশ প্রস্তুত করছে, তেমনি আমাদের সব ভ্রান্তি পাপ ও পদস্খলনের অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে এক নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তি আছে যা আমাদের প্রেম ও সুসঙ্গতির দিকে প্রবর্তিত করে, সে জানে তার গতি কোন মুখে এবং আমাদের কুটিল বহুশাখ বিপথগতির প্রবেগকে প্রস্তুত ক'রে, একমুখী ক'রে তাদের প্রয়াস ও সন্ধানের চরম ফল মিলবে যে সহজপথে, সে পথ ধরিয়ে দেয়। এই দিব্যক্রতু ও দিব্য জ্যোতির আবির্ভাবই হল অমরত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন।

এই দিব্যক্রতুই অগ্নি। এ উপনিষদের শেষ শ্লোক ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। বেদে অগ্নি হলেন দিব্যক্রতু বা বিশ্বে কর্মপ্রবৃত্ত চেতনার শক্তির শিখা। তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মর্ত্যজীবের অন্তরে অমর সত্তা; তিনি অধ্বরের নায়ক, পথের দিশারী; দিব্য অশ্বরূপে সে পথে তিনি আমাদের বহন ক'রে নিয়ে যান; "কুটিলতার পুত্র"* তিনি, কিন্তু নিজে ঋজু পথ ও পরম সত্য জানেন, তিনি নিজেই সে পথ ও সে সত্য। এই

* 'পুত্রো ন হ্বার্যানাং'—ঋগ্বেদ ৫।৯।৪

জগতের সব ব্যাপারের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ও দুরধিগম্য থাকেন, কারণ সে সবই অহং ও বাসনার দ্বারা মিথ্যাতে পরিণত হয়; কিন্তু সে-সব ব্যবহার করেই তিনি সে-সব অতিক্রম করেন এবং ক্রমে আবির্ভূত হন 'অগ্নি বৈশ্বানর' রূপে, মানবের মধ্যে সার্বজনীন তত্ত্বরূপে অথবা বিশ্বজনীন শক্তিরূপে; তিনি সব দেবতাদের ও সবগুলি জগৎ নিজের মধ্যে ধারণ করেন, সব বিশ্বজনীন ব্যাপারের আশ্রয় দেন এবং পরিণামে পরমদেবত্ব ও অমৃতত্ব পূর্ণসিদ্ধ করেন। দিব্যকর্মের তিনিই কর্মী। এ উপনিষদের শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই সব প্রতীকের দ্বারা নিরূপিত হয়।

অমর প্রাণতত্ত্ব

প্রাণ হল যে ক্ষেত্র থেকে দিব্য ক্রতু ও দিব্য আলোক আবির্ভূত হতে পারে। বেদে* বলা হয়েছে যে 'বায়ু মাতরিশ্বা' বা প্রাণতত্ত্বই সুদূরে ঊর্ধ্বে পরমলোকে আসীন সূর্যের কাছ থেকে অগ্নিকে নামিয়ে আনে। সত্য-বিজ্ঞানের লোক থেকে দিব্যক্রতুকে প্রাণ নিম্নে, দেহমনের রাজত্বে আহ্বান ক'রে আনে, এখানে প্রাণের মধ্যে তার নিজের অভিব্যক্তি প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে। প্রাণের সব বস্তু ভোগ ক'রে গ্রাস ক'রে, অগ্নি উৎপাদন ক'রে মরুৎদের বা প্রাণের যেসব স্নায়বিক শক্তি চিন্তার শক্তিতে পরিণত হয় তাদের, অগ্নির আশ্রয়ে তারা প্রস্তুত করে ইন্দ্রের ক্রিয়া। ইন্দ্র হলেন প্রদীপ্ত মন, আমাদের প্রাণের সব শক্তির পক্ষে তিনিই ঋষি বা সত্য ও ধর্মের দ্রষ্টা। আচ্ছাদক বৃত্রকে বধ ক'রে ইন্দ্র অন্ধকার দূর করেন, তাঁর প্রভাবে আমাদের সত্তার উপর সূর্য উদিত হয় এবং সত্তার সমগ্র ক্ষেত্রের উপর বিচরণ ক'রে সর্বত্র সত্যের রশ্মি বিকিরণ করেন। সূর্যই 'সবিতা', স্রষ্টা বা অভিব্যক্তা, এই মরলোকে তিনিই অমর লোক বা সংস্থিতি প্রকাশিত করেন, অহংকার পাপ ও দুঃখের দুঃস্বপ্ন দূর ক'রে জীবনকে অমরত্ব মঙ্গল ও পরম সুখে রূপান্তরিত করেন। পরমদেবের অভিমুখে মানবজীবনের উদয়ন, অধিরোহণ ও আত্ম-উন্নয়নের প্রতীক হলেন বেদের দেবতারা।

দেহ প্রাণ কর্ম সংকল্প, এই ক'টি হল আমাদের প্রথম সাধন। জড় আমাদের দেহ যোগায়, কিন্তু তা জগৎ-গতিতে একটা সাময়িক গ্রন্থি

* ঋগ্বেদ ১।১২৮।২, ৬।৮।৪

মাত্র, পরমপুরুষ তাতে অধিষ্ঠান ক'রে প্রাণতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত সব ক্রিয়া-বৃত্তির উপর অধ্যক্ষতা করেন। প্রাণ-তত্ত্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেই তার সংহতিভেদ হয়, ভস্মই তার পরিণাম। সুতরাং দেহ আমাদের সত্তা নয়, একটা বাহ্য আয়ুধ বা যন্ত্র মাত্র। কারণ জড়তত্ত্বের প্রকৃতিই হল বিভাজন ও তামসিকতা, জন্ম ও মৃত্যু, সংগঠন ও সংহতিভেদ। মৃত্যুর জয় সে ঘোষণা করে। অমর মানবের পক্ষে দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করা চলবে না।

আমাদের উপাদানের মধ্যে প্রাণতত্ত্ব মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে। এ হল অমর নিঃশ্বাস বায়ু ('অনিলং অমৃতং'), আর তার প্রকৃত তাৎপর্য হল, জন্মমৃত্যুর নিয়মের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অস্তিত্বের সূক্ষ্ম শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জন্মমৃত্যু প্রাণেরই ধর্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, জন্মমৃত্যু জড়ের বা দেহেরই প্রক্রিয়া। দেহের উদ্ভবে বা বিলয়ে প্রাণতত্ত্বের উদ্ভব বা বিলয় হয় না; তা যদি হত তবে ব্যষ্টি-অস্তিত্বের ধারাতে ছেদ পড়ত এবং মৃত্যুর পরে সবারই আবার নিরাকারে প্রত্যাবর্তন করতে হত। প্রাণ দেহ গঠন করে, দেহের দ্বারা গঠিত হয় না। প্রাণের সূত্র দিয়েই আমাদের দৈহিক জীবন-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রথিত, শুদ্ধ এই কারণেই যে প্রাণ নিজে অমর। নশ্বর দেহের সে সহযোগী এবং মনোময় সত্তাকে বা মনে অধিষ্ঠিত পরম-পুরুষকে তার যাত্রাপথে সে বহন ক'রে নিয়ে যায়।

সংকল্প ও স্মৃতি

সে যাত্রা হল এই জগতে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে অনুক্রমী কর্মপরম্পরা, আর তার অবকাশে অপর কোন সংস্থিতিতে (বা লোকে) জীবন যাপন। প্রাণতত্ত্বই সে কর্মপরম্পরা পোষণ করে, আকার দেবার যে শক্তি তার মধ্যে গড়ে ওঠে, কর্মের উপাদানরূপে সে শক্তি সে-ই যোগায়। কিন্তু তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাণতত্ত্ব নয়, সংকল্প। সংকল্পই 'ক্রতু' বা কর্মের পশ্চাতে কার্যকরী শক্তি। চেতনার সমধর্মী সে, চেতনারই সে শক্তি এবং, চেতন-অবচেতন-অতিচেতন, জৈব-দৈহিক-মানসিক, সব বিগ্রহে বর্তমান থাকলেও, মনে আবির্ভূত হয়েই সে তার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মৃতি মনের একটা বৃত্তি, তার সাহায্যে সে-ই সব কর্ম একসূত্রে গ্রথিত ক'রে ব্যষ্টির লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে।

মানুষের মধ্যে মানস সংকল্পের দ্বারা চেতনার প্রয়োগে ত্রুটি আসে স্মৃতিশক্তির সংকীর্ণতার জন্য। আমাদের ক্রিয়া যেমন বিক্ষিপ্ত তেমনি সীমাবদ্ধ হয়, কারণ মন নিয়ে আমরা কালপ্রবাহের প্রতিক্ষণে বাস করি, এবং আমাদের অহংভাবিত মনের কাছে যা আশু প্রয়োজন বোধ হয় বা সে মনকে যা আকর্ষণ করে আমরা শুধু তাই ধরে থাকি। যা করছি তাতেই আমরা নিবিষ্ট থাকি, যা করা হয়ে গেছে সে-সব আমরা নিয়ন্ত্রণ করিই না বরং আমরাই স্মৃতিচ্যুত অতীত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। তার কারণ, আমরা কর্মের মধ্যে ও কর্মফলেই অভিনিবিষ্ট থাকি, আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়ে পিছন থেকে কর্মস্রোত নিরীক্ষণ করি না। ঈশ্বর বা সত্য-সংকল্প কর্মপ্রবাহের বাইরে অবস্থান করেন, তাই তিনি সব কর্মের প্রভু, কর্মের অধীন নন।

এ উপনিষদে 'ক্রতু'কে বা সংকল্পকে, দেবতাজ্ঞানে আহ্বান ক'রে তাকে অনুষ্ঠিত সব কর্ম স্মরণ করতে উপরোধ করা হয়েছে, যাতে সে ভবিষ্যৎ সম্ভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার আধার হতে পারে এবং শুদ্ধমাত্র অনুপ্রেরণা ও আত্মরূপায়ণের শক্তি না হয়ে জ্ঞান ও আত্মলাভের শক্তিও হতে পারে। তাহলেই ক্রমশঃ সে সত্যসংকল্পের অনুরূপ হতে পারবে এবং ভবিষ্য জন্মপরম্পরা সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ ক'রে অধ্যক্ষরূপে তার সমন্বয় বিধান করতে পারবে। এখানকার মত, যেন বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বাঁকা পথে না ঘুরে, অধিকতর সুনিয়ত অনুক্রমে, অধিকতর জ্ঞানের ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি নিয়ে এক জন্মের সঙ্গে অন্য জন্ম গ্রথিত ক'রে, অপেক্ষাকৃত ঋজুপথে অগ্রসর হতে পারবে; আর পরিণামে, পূর্ণজ্ঞানময় সংকল্পের রূপে সেই জ্ঞানদীপ নিয়ে সরল পথে মৃত্যুহীন পরমসুখের পানে চলতে সক্ষম হবে। মানসিক সংকল্প বা 'ক্রতু', এখন সে যার প্রতিভূ, সেই দিব্য সংকল্পে, অগ্নিতে, পরিণত হবে।

সংকল্প ও জ্ঞান

দিব্য সংকল্পের স্বরূপ হল যে, তাতে চেতনা ও শক্তি, জ্ঞান ও বল অভিন্ন। সব অভিব্যক্তি, সব জগতে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, সবই সে জানে। 'জাতবেদা' সে, সব জন্মের যথাযথ জ্ঞান তার আছে। সবের সত্তার ধর্ম, অপর যা কিছু জন্মেছে সে সবের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াপদ্ধতি, সবের গতিপথ ও গন্তব্যস্থল, সবের সঙ্গে প্রত্যেকের একত্ব

ও পার্থক্য——সব দিক থেকেই সববস্তু তার জানা। এই দিব্য সংকল্পই বিশ্ব পরিচালনা করে; যে সব বস্তু সে সংযোজন করে সে সবের সঙ্গেই সে একাত্ম, এবং তার সত্তা জ্ঞান এবং ক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। সে যা তা সে জানে; সে যা জানে তা সে করে এবং তাতে সে পরিণত হয়।

কিন্তু অহংভাবিত চেতনা আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপারে যেই হস্তক্ষেপ করে অমনি একটা বিক্ষোভ, একটা বিভাজন, একটা মিথ্যাক্রিয়া আসে। সংকল্প তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অজ্ঞ একটা প্রেরণাতে পরিণত হয়, জ্ঞান একটা দ্বিধাহত আংশিক আলোকরশ্মিতে পরিণত হয় এবং সংকল্প ঘটনা ও পরিণামের উপর স্বামিত্ব হারিয়ে ফেলে, থাকে কেবলমাত্র সে সব অধিকারের ও অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াস। কারণ, আমরা 'আত্মবান' থাকি না, প্রকৃত আত্মাকে না নিয়ে অহংকে গ্রহণ করি। আমরা জানি না আমরা কি, যা জানি তা কার্যে পরিণত করতে পারি না। কারণ, জ্ঞান প্রকৃত হয় এবং কর্ম সত্যজ্ঞানের অনুযায়ী হয় তখনই, যখন জ্ঞান ও কর্ম, প্রবুদ্ধ প্রদীপ্ত ও আত্মবান যে জীবের সত্তা ও কর্মের গতি অভিন্ন, তার অভ্যন্তর থেকে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ উৎসারিত হয়।

দিব্যসংকল্পের নিকট আত্মসমর্পণ

এ পরিবর্তন আসে, মানস সংকল্প দিব্যসংকল্পের ক্রমশঃ অনুরূপ হবার ফলে যখন অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়। ক্রমবর্ধমান সেই জ্ঞান ও বলই কুটিল পথ ছাড়িয়ে পরিশেষে আমাদের সরল বা শুভ পথ ধরিয়ে দেয়। দিব্য জ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম এই দিব্য সংকল্পই আমাদের পরম সুখের ও অমরত্বের পানে পরিচালিত করে। যা কিছু অহংএর বিপথগতির অঙ্গীভূত, যা কিছু দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে এবং কপট প্রলোভনের মোহে ও পদস্খলনের প্রমাদে মিথ্যার এপথে ওপথে নিয়ে যায়, সে সবই আমাদের কাছ থেকে সেই দূরে সরিয়ে দেয়। সংকল্পের দিব্যভাবে রূপান্তর হলে এ সবই দূর হয়, আমাদের চেতনাতে আর তারা বাসা বাঁধতে পারে না।

সুতরাং, যথাযথ কর্মের লক্ষণ হল, ব্যষ্টির মধ্যে সূর্য্যালোকে আবিষ্কৃত দিব্য সংকল্পের কাছে ব্যষ্টিসংকল্পের ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ও পরিশেষে সম্পূর্ণ আনুগত্য। ব্যষ্টির চেতনাতে অভিব্যক্ত হলেও এ সংকল্প ব্যষ্টিসত্তার নয়। এ হল সর্বান্তর্যামী ও সর্বাতীত পরমপুরুষের

সংকল্প, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

সম্পূর্ণ আত্মসচেতন সত্তাতে ঈশ্বরকে পরম অদ্বিতীয়রূপে জানা এবং সম্পূর্ণ সজ্ঞান কর্মে সর্বময় ও সর্বাতীত ঈশ্বরের অনুগত হওয়া, এই দুটি হল স্বর্গের দরজার চাবি, অমৃতলোকে প্রবেশের অধিকারপত্র।

আর এ দুইয়ে মিলিত হলে তার স্বরূপ হয় জ্ঞানদীপ্ত ভক্তি, যা মানবজীবনে ভগবানকে স্বীকার করে, তাঁর জন্য আকুল হয় এবং তাঁকে উপলব্ধি করে।

উপসংহার

বিচারের তৃতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল, অন্তরে আনন্দ ও সত্যের অবস্থা এবং মৃত্যুর পরে জ্যোতির্ময় সব লোক লাভ করা, আর পরিণামে, স্বয়ংপ্রভ পরম অদ্বিতীয়ের সঙ্গে একাত্মতা; আর এখানে, চতুর্থ প্রবাহে, মনোবৃত্তির দিক থেকে সেই অমরত্ব লাভের দ্বিবিধ সাধন নির্দেশ করা হল। আবার, দ্বিতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মার ও তাঁর সব সম্ভূতির সঙ্গে একাত্মভাব অর্জনের পদ্ধতি, এবং প্রথম প্রবাহের শেষে ছিল মুক্ত কর্মের আদেশ; আর সে সবই এখানে বৈদিক রূপকের সাহায্যে ব্যষ্টির পক্ষে বিশেষিত ক'রে বলা হল। সুতরাং এখানে, এই চতুর্থ প্রবাহে, এ উপনিষদ তার উপযুক্ত সমাপ্তি ও সম্পূর্ণতা লাভ করছে।

বিচারের চুম্বক ও সিদ্ধান্ত

ঈশোপনিষদ ভাব ভাষা ও ছন্দে বেদান্তগ্রন্থগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। অবশ্য ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকের পরবর্তী, হয়ত বা তৈত্তিরীয় ঐতরেয়েরও পরবর্তী। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ উপনিষদ যে ক'টি এখন আমরা পাই তার মধ্যে ঈশ প্রাচীনতম। উপনিষদের ভাবধারাকে সহজেই দুইটি বড় যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীনতর প্রথম যুগে চিন্তার ধারা বৈদিক মূলের অনেকটা নিকটবর্তী ছিল, মনোবৃত্তির গতি বৈদিক ঋষিদের অনুগামী ছিল এবং অধ্যাত্মবিদ্যাতেও ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। পরবর্তী দ্বিতীয় যুগে চিন্তার ধারা ও রূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, পূর্বতন রূপকের পরিচ্ছদমুক্ত ও মূল থেকে বিচ্যুত ; বৈদিক চিন্তার ও মনোবৃত্তির কতকগুলি প্রধান অঙ্গ এযুগে পরিত্যক্ত হল অথবা সেসবের জাত্যর্থ পরিবর্তিত হল এবং পরবর্তী কালের সন্ন্যাসবাদী ও অব্যবহারিক বেদান্ত দেখা দিতে আরম্ভ করল। ঈশ প্রথম বা বৈদিক যুগের উপনিষদ। তবে ইতিমধ্যেই অদ্বৈত মতবাদের সঙ্গে মানবজীবন ও কর্মের সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যা তার সম্মুখে এসেছে। এবং এ উপনিষদে সে সমস্যার যে ব্যাপক সমাধান করা হয়েছে, বেদান্ত সাহিত্যের সে একটা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী অংশ। একমাত্র এই উপনিষদই শঙ্করাচার্যের ঐকান্তিক মায়াবাদ ও অব্যবহার-বাদের প্রায় অনতিক্রমণীয় বাধা সৃষ্টি করেছে ; এবং সেই জন্যই তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য এই উপনিষদকে প্রামাণিক বলে গণনা করতে চাননি।

এ উপনিষদের বিচার-পদ্ধতি

আদ্যন্ত, এ উপনিষদের অনুসৃত বিচার-পদ্ধতি হল চরম বিরোধী সংজ্ঞার কোনটির অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তাদের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা। বিশ্ব, ভোগ, কর্ম, বহু, জন্ম ও অজ্ঞান––সংজ্ঞার এই পর্যায়কে পরবর্তীযুগের চিন্তাতে গৌণস্থান দিয়ে সেসবের বিপরীত পর্যায়কে–– ভগবান, বৈরাগ্য, শম, এক, জন্মরাহিত্য, পরমজ্ঞান এই সবকে––উচ্চতর

আসন দেওয়া হয়েছে; আর ক্রমে এ চিন্তার ধারা মায়াবাদে উপনীত হয়েছে, জাগতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা দাঁড়িয়েছে যেন, জীব কোন অবোধ্য কারণে নিজের জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে বা নিজের উপর একটা অনর্থক ভার চাপিয়েছে আর তাথেকে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্কৃতি পেতে হবে। তার চরম পরিণতি হল প্রচণ্ড আঘাতে গ্রন্থিভেদ ক'রে এ বিরাট প্রহেলিকার সহজ সমাধান। কিন্তু এ উপনিষদের চেষ্টা হল সব গ্রন্থির চরম প্রান্তদ্বয় গ্রহণ ক'রে, পৃথক ক'রে পাশাপাশি রাখা, যাতে গ্রন্থিমোচন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যথাযথ স্থান ও সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হতে পারে। চরম প্রান্ত-দ্বয়ের একটি অন্যটির উপর আশ্রিত, স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনটির স্বরূপের সঙ্কোচ করা হয় নাই বা কোনটিকে অযথা গৌণস্থান দেওয়া হয় নাই। চরম ত্যাগ চাই কিন্তু ভোগও সমানই সমগ্র হওয়া চাই; কর্ম সুসম্পন্ন ও অকুণ্ঠ হওয়া চাই কিন্তু কর্ম থেকে জীবের মুক্তিরও পরাকাষ্ঠা চাই; কেবল ও ঐকান্তিক একত্বই চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু সে একত্বের মধ্যে বস্তুর অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করে কৈবল্যের চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া চাই।

এই সত্যের উপর এ উপনিষদের এত বেশী নিষ্ঠা যে, 'অজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞানের দ্বারা অমৃত ভোগ করবে', এই সূত্রে নিজের মত প্রকাশ ক'রেই তার আশঙ্কা হয়েছে যে, তাতে হয়ত জাগতিক জীবনকে ওপারের অস্তিত্বের জন্য প্রস্তুতির ভূমি মাত্র বলে বোধ হতে পারে; তাই তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাদুটির বিন্যাসক্রম পরিবর্তন ক'রে সমতুল অপর সূত্রে, 'বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে জন্মের দ্বারা অমৃত উপভোগ করবে', এই আদেশ দিয়ে উভয়ের সমগৌরব স্থাপন করা হল এবং এইভাবে জীবনকেই সর্বজীবের অভীপ্সিত লক্ষ্য, অমর অস্তিত্বের ক্ষেত্ররূপে নির্দেশ করা হল। বেদের একটা প্রাচীন ধারণার সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মিল আছে। সে কালে সুধীদের বিশ্বাস ছিল যে, বিভিন্ন সব লোক, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মৃত্যু-জীবন-অমরত্ব, সবই রয়েছে দেহধারী মানবের সত্তাতে, সেখানেই সবের ক্রমবিকাশ হচ্ছে, সেখানেই সেসব উপলব্ধি করা যায়; সুতরাং সেখানেই সেসবকে লাভ ও ভোগ করতে হবে, এবং সেসব সম্পদ অর্জন বা উপভোগ করবার জন্য জীবন বা দৈহিক অস্তিত্ব পরিহার করবার কোন প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় দর্শন থেকে এ ধারণা কখনই একেবারে দূর হয় নাই, তবে এখন তার স্থান গৌণ, অবান্তর প্রতিজ্ঞারূপে তা স্বীকার

করা হয় মাত্র। এদিকে এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবলতর হয়েছে যে, আমাদের মুক্তির জন্য পার্থিব অস্তিত্বের নির্বাণ অবশ্যপ্রয়োজন আর সেই হল প্রাজ্ঞ-জনের একমাত্র শ্রদ্ধেয় লক্ষ্য। এ মতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবার শক্তি পূর্বতর ধারণার এখন আর নাই।

বিপরীত সংজ্ঞাসমূহ

বিপরীত যেসব সংজ্ঞাযুগল গ্রহণ ক'রে এ উপনিষদে সমন্বয় করা হয়েছে, যথাক্রমে সে সব হল:

১। চিন্ময় ঈশ্বর ও প্রাতিভাসিক প্রকৃতি।
২। ত্যাগ ও ভোগ
৩। প্রকৃতিতে কর্ম ও আত্মাতে মুক্তি
৪। এক স্থাণু ব্রহ্ম ও বহুমুখী গতি
৫। সত্তা ও সম্ভূতি
৬। সক্রিয় ঈশ্বর ও উদাসীন অক্ষর ব্রহ্ম
৭। বিদ্যা ও অবিদ্যা
৮। জন্ম ও জন্মরাহিত্য
৯। কর্ম ও জ্ঞান

পরপর এসব বিরোধের সমাধান করা হয়েছে এভাবে:—

ভগবান ও প্রকৃতি

১। প্রাতিভাসিক প্রকৃতি চিন্ময় ঈশ্বরেরই একটা গতি। সে গতির উদ্দেশ্য হল তাঁর চেতনার সঞ্চালনের দ্বারা তাঁরই সব আকার সৃষ্টি করা যাতে তিনি বহু দেহে এক আত্মারূপে অধিষ্ঠান করতে পারেন এবং বহুত্ব ও গতি এবং সে সবের সব অন্যোন্যসম্বন্ধ উপভোগ করতে পারেন।*

ভোগ ও ত্যাগ

২। এই গতির ও বহুত্বের সত্যকে ও অনন্তবৈচিত্র্যকে সমগ্রভাবে ও প্রকৃতরূপে উপভোগ করতে হলে চাই চরম ত্যাগ; কিন্তু এখানে অভি-প্রেত ত্যাগ হল অহংতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বাসনাতত্ত্বের ঐকান্তিক ত্যাগ,

* গীতারও এই মত এবং সাধারণতঃ তা স্বীকৃত।

জাগতিক জীবন ত্যাগ নয়।* এ সমাধানের মূলে বিশ্বাস রয়েছে যে, এই বিশ্ব যে দৈব আনন্দ বা সত্তার হর্ষোল্লাস থেকে জন্মেছে, বাসনা তারই অহংঘটিত জৈব বিকৃতি; সুতরাং অহং ও বাসনা উন্মূলিত হলে সেই আনন্দই আবার সজ্ঞানে জীবনের মূল কারণে পরিণত হবে। মর্ত্যজীবন থেকে অমরজীবনে আত্মরূপান্তরের মর্মই হল বাসনার স্থলে আনন্দের প্রতিষ্ঠা। অমরত্ব সম্ভোগের অর্থ হল, অহং থেকে নিস্কৃতি লাভ ক'রে ঈশ্বরের অভ্যন্তরে, সর্বভূতের একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অনন্ত আনন্দ উপভোগ করা।

কর্ম ও মুক্তি

৩। আত্মার মুক্তির সঙ্গে কর্মের কোন বিরোধ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে মানবকে কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের অভ্যন্তরে একত্বের, নিজের মধ্যে একত্বের এবং সর্বভূতের সঙ্গে একত্বের বোধ পুনরর্জন ক'রে তাকে তার অবিচ্ছেদ্য নিত্যসিদ্ধ মুক্তির বোধ ফিরে পেতে হবে।+ সে সিদ্ধি লাভ হলে জীবন ও কর্ম সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করা সম্ভব ও তা কর্তব্য; কারণ জীবনে ও কর্মে ঈশ্বরের অভিব্যক্তিই হল আমাদের সত্তার ধর্ম ও আমাদের জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য।

স্থিতি ও গতি

৪। তাহলে পরমপুরুষের নিশ্চলতার স্থান কোথায়? আর, সাধারণতঃ যে নিশ্চলতাকে পরম সুখের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন বলা হয়, তার সঙ্গে তাহলে কি করে জগৎ-গতির মধ্যে অবস্থানের সামঞ্জস্য হয়?

* গীতারও এই মূল শিক্ষা, তবে তাতে জাগতিক জীবনের ত্যাগকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। বেদান্তের সাধারণ চিন্তার ধারাতেও অহং ও বাসনা ত্যাগের অপরি-হার্যতা স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু তা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অহং বর্জনের অর্থই হল জাগতিক জীবনের পরিহার, কারণ সে মতে জাগতিক জীবনের হেতু হল বাসনা, আনন্দ নয়।

\+ এ সত্যও আবার সাধারণতঃ স্বীকৃত হবে বটে কিন্তু তা থেকে যা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা গৃহীত হবে না।

স্থিতি ও গতি উভয়ই সমভাবে একই ব্রহ্ম, তাদের মধ্যে পার্থক্যবোধ আমাদের প্রাতিভাসিক চেতনার একটা ব্যাপার। দেশ-কাল, দূর-অন্তিক, বিষয়-বিষয়ী, অন্তর-বাহ্য, আপন-পর, এক-বহু,—এসব ধারণাও তাই। সদ্বস্তু ব্রহ্ম আমাদের চেতনার কাছে এই সব রূপেই প্রতিভাত হন, কিন্তু তাঁর অনির্বচনীয় স্বরূপে তিনি স্বয়ং এসব ব্যবহারিক প্রভেদের ঊর্ধ্বে। গতিও স্থিতিরই একটা ব্যাপার, আবার স্থিতিকেও বলা যেতে পারে এত দ্রুত গতি যে দেবতাদের অর্থাৎ আমাদের সংবিতের বিবিধ বৃত্তির পক্ষে তার প্রকৃত স্বভাব অনুভব করা অসম্ভব। কিন্তু সে গতি হয় কেবলমাত্র চেতনাতে, আকারে বা উপাদানে বা দেশ-কালে নয়। জ্ঞানের দৃষ্টিতে সবই এক; বিভাজন আনে অজ্ঞান, যেখানে কোন বিরোধ নাই, আছে শুধু একই চেতনার নিজের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ, সেখানে অজ্ঞান বিরোধ সৃষ্টি করে। দেহস্থিত অহং বলে, "আমি আছি ভিতরে, আর সব আছে বাহিরে, আবার বাহিরে যা আছে, তার মধ্যে দেশে ও কালে এটা আমার নিকটে, ওটা দূরে।" উপস্থিত সম্বন্ধ ধরলে এ সবই ঠিক কিন্তু স্বরূপতঃ সবই ব্রহ্মের অবিভাজ্য গতি, আর তা স্থূল জড়গতি নয়, অখণ্ড এক চেতনাতে অবস্থিত সব বস্তু দেখবার একটা রীতি।

সত্তা ও সম্ভূতি

৫। আমরা কি দেখি, আমাদের অন্তরাত্মার চক্ষু দিয়ে অস্তিত্বকে কি ভাবে নিরীক্ষণ করি, তার উপর সব নির্ভর করে। সত্তা ও সম্ভূতি, এক ও বহু, দুই-ই একবস্তু, দুই-ই সত্য; সত্তা এক, সম্ভূতি বহু; কিন্তু তার অর্থ হল শুধু, এক পরম সত্তা যে তাঁর চেতনার প্রাতিভাসিক গতির মধ্যে নিজেকে নানাভাবে স্থাপিত করেছেন, তাঁর সেই বিভাবই হল সব সম্ভূতি। এক পরম সত্তার প্রতীতি অবশ্যই চাই, কিন্তু সম্ভূতির বহুত্ব-দৃষ্টিও রোধ করলে চলবে না, কারণ সেসবও আছে এবং সেসবকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করেই ব্রহ্ম নিজেকে দেখেন। তবে, দেখতে হবে জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে, অজ্ঞানে নয়। উপলব্ধি করতে হবে যে, এক অবিভাজ্য অব্যয় ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত সত্তা। দেখতে হবে যে, সব সম্ভূতিই আমাদের সত্য 'আমি'র মধ্যে জগৎ-গতির পরিণাম, আর সে 'আমি'-কে দেখতে হবে শুধু আমাদের দেহে নয়, সব দেহে নিবাসী এক আত্মা রূপে। জগতের সঙ্গে সব সম্বন্ধেও, আমরা প্রকৃতপক্ষে যা, সজ্ঞানে আমাদের তাই হতে

হবে---আমাদের দৃশ্য সব বিষয় হয়েছেন যিনি সেই এক আত্মা। দেখতে হবে যে, সমগ্র গতি, সব শক্তি, সব আকার, সব ঘটনা হল বহু আধারে অধিষ্ঠিত আমাদেরই অদ্বিতীয় প্রকৃত সত্তার ক্রিয়া, সবই তাঁর বিশ্ব অস্তিত্বে ঈশ্বরের ইচ্ছা-জ্ঞান-আনন্দের লীলা।

তাহলে আমরা অহংজ্ঞান, বাসনা, পৃথক অস্তিত্বের বোধ থেকে মুক্ত হব এবং, তার ফলে, দুঃখ-শোক-মোহ-স্পর্শভীরুতা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। কারণ, দুঃখের উদ্ভব হয় জাগতিক সব সংস্পর্শে পরাঙ্‌মুখ হবার জন্য অহংএর যে ভয়-দুর্বলতা-দৈন্য-বিরাগ ইত্যাদি সব বোধ জাগে তা থেকে; সেসব আবার জন্মে বিবিক্ত অস্তিত্বের মোহ থেকে---আমার স্বতন্ত্র 'আমি' নিয়ে, 'আমি' নই এমন অনেক কিছুর সংস্পর্শের সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি, এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে। এ ধারণা ত্যাগ কর, সর্বত্র একত্ব দর্শন কর, সর্বজীবে অভিব্যক্ত পরম অদ্বিতীয় অস্তিত্বে পরিণত হও, তাহলে অহংকার দূর হবে, আমি এ নই, আমার তা নাই, এই বোধ থেকে জাত বাসনা দূর হবে, বাসনা ও তার তৃপ্তি-অতৃপ্তির স্থলে, পরম অদ্বিতীয়ের নিজের অস্তিত্বে অনুভূত মুক্ত অবিচ্ছেদ্য আনন্দে* অভিষিক্ত হবে। অমরত্ব লাভ করবে, বিভাজন থেকে জাত মৃত্যু পরাভূত হবে।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম

৬। এক পরমাত্মা, এক ব্রহ্ম যিনি বিশ্বেশ্বর তাঁরই দুই বিভাব হল সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। জগৎ-গতিতে তিনি সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় বিভাবে তিনি নিজেকে সব বিকার থেকে মুক্ত রাখেন। নৈষ্কর্ম্যই কর্মের ভিত্তি, কর্মের মধ্যেই তা বর্তমান: নৈষ্কর্ম্য হল তিনি যা করেন, যা হন সে সবের মধ্যেই সে-সব থেকে তাঁর নির্লিপ্ততা। এক অবিভাজ্য চেতনার এ হল ভাবাভাবের দুই কোটি। এ উভয়কেই আমরা পরস্পরসাপেক্ষ, পরস্পর ভেদরহিত এক অখণ্ড গতি এবং এক অখণ্ড স্থিতির যুগপৎ অনুভবে একত্র গ্রহণ করতে পারি। স্থিতির অস্তিত্ব গতিসাপেক্ষ, গতি স্থিতিসাপেক্ষ। ব্রহ্ম দুয়েরই অতীত। একটা মত আছে যে, গতি ও স্থিতি বস্তুতঃ এক

* সাধারণ দৃষ্টিতে এ সবই স্বীকৃত হবে বটে, কিন্তু সন্দেহ আসবে যে জগতে জন্মগ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে চেতনার এ অবস্থা রক্ষা করা বাস্তবে সম্ভবপর কি না।

বলে ভেদরহিত; কিন্তু এখানে তা বলা হচ্ছে না, বরং আমাদের চেতনার পক্ষে দুইয়েরই ব্যবহারিক প্রয়োজন মেনে নিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হলে আমরাও এই উভয় অবস্থা সম্বন্ধে যুগপৎ সচেতন অস্তিত্বের অংশভাগী হতে পারব।*

বিদ্যা ও অবিদ্যা

৭। পরম অদ্বিতীয়ের জ্ঞান ও বহুর জ্ঞান, উভয়ই এক অখণ্ড চেতনার ক্রিয়ার ফল আর সে চেতনা তার সত্যবিজ্ঞানে সব বস্তুকে দেখে একব্রহ্মরূপে, আবার মনোবৃত্তিতে ও সাকার সম্ভূতিতে সবের ভেদ সৃষ্টি করে। মন ('মনীষী') যদি সাকার সম্ভূতিরূপী ভগবানের ('পরিভূ'র) মধ্যে বিলীন হয়ে, সত্যবিজ্ঞানী ভগবান ('কবি') থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সে পরম অদ্বিতীয়ের জ্ঞান ('বিদ্যা') হারায়, তার থাকে মাত্র বহুর জ্ঞান; সে জ্ঞান আর জ্ঞান থাকে না, হয় অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই হল বিবিক্ত অহংবোধের হেতু।

মনে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের ('মনীষী'র) পক্ষে অবিদ্যা অঙ্গীকার করবার উদ্দেশ্য হল বিভাজনের সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে এবং তার সমস্ত পরিণাম মেনে নিয়ে, যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রসারিত করা, আবার সেই সব ব্যষ্টি সম্বন্ধের সাহায্যেই প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে সর্বভূতের অন্তর্যামী পরম একের জ্ঞানে প্রত্যাবর্তন করা। সত্যদর্শী ('কবি'র) সংবিতে সে জ্ঞান কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তবে, আমাদের মধ্যে এই সত্যদর্শী অবস্থান করেন মনোময় ভাবুকের অন্তরালে; সেই বিচ্ছেদের জন্যই ব্যষ্টির অন্তর্নিবাসী মনোময় সত্তাকে ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতার দ্বারা মৃত্যু ও বিভাজনকে জয় করতে হয় এবং পরিশেষে একাধারে মিলিত এক ও বহুর জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব পুনরর্জন করতে হয়। এই হল আমাদের যথার্থ পথ, ঐকান্তিক-ভাবে অবিদ্যাময় জীবনে রত থাকাও নয় অথবা অবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান ক'রে এক অদ্বিতীয়ের মধ্যে স্পন্দহীন বিলয়ও নয়।

জন্ম ও জন্মরাহিত্য

* প্রচলিত মতে জীব যুগপৎ এই দুই ভাবে অবস্থান করতে পারে না, তার মোক্ষ হয় স্থিতির মধ্যে বিলয়ে, কর্মপ্রবৃত্ত ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতাতে নয়।

৮। মনীষীর এইভাবে দুধারাতে গতির হেতু হল যে, আমাদের জন্মের মধ্যেই অমরত্ব লাভ করা হল সৃষ্টির অভিপ্রায়। আত্মা সমসত্ত্ব ও মৃত্যুহীন এবং স্বরূপে নিত্য অমরত্বের অধিকারী। জন্মরাহিত্যের বিশিষ্ট অমরত্ব লাভের জন্য অবিদ্যাতে ও জন্মে অবতরণের প্রয়োজন তাঁর নাই, কারণ তা তাঁর চিরকালই আছে। বিশ্ব-অস্তিত্বের লীলাতে ব্যষ্টি ব্রহ্মরূপে অমরত্ব সাধন ও লাভ করবার উদ্দেশ্যেই আত্মা অবিদ্যাতে অবতরণ করেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু অঙ্গীকার করেন, অহং-এর পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন আবার তার বিলয়ের দ্বারা একত্ব পুনরর্জন ক'রে নিজেকে ঈশ্বররূপে, পরম অদ্বিতীয়রূপে উপলব্ধি করেন এবং জন্মকে সাকার সত্তাতে ঈশ্বরের সম্ভূতিরূপে অনুভব করেন। তখন তাঁর সম্ভূতি সত্যদর্শী 'কবি'র সত্যদৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একবার এ সিদ্ধিলাভ হলে সত্তার সঙ্গে সম্ভূতির আর কোন অসঙ্গতি থাকে না, জন্মও এই সাকার অধিষ্ঠানে ঈশ্বরের অমরত্ব উপভোগের বাধা না হয়ে তার একটা উপায় হয়।* এই হল আমাদের যথার্থ পথ, জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ থাকাও নয় বা জন্ম থেকে পলায়ন করে শুদ্ধ অসম্ভূতিতে লয়ও নয়। দৈহিক সম্ভূতির ব্যাপারটাই আমাদের বন্ধন নয়, বন্ধন হল অজ্ঞান থেকে জাত পৃথক অহংবোধের দৃঢ়তা। শৃঙ্খল রচনা করে মন, দেহ নয়।

কর্ম ও জ্ঞান

৯। যতদিন কেবলমাত্র অহংভাবিত মনোবৃত্তির দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয় ততদিনই তাদের মধ্যে বিরোধ থাকে। মনের জ্ঞান সত্যজ্ঞান নয়, সত্যজ্ঞান হল যা 'কবি'র সত্যদৃষ্টির উপর, সূর্যের দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের সব সংস্কার-সিদ্ধান্ত জ্ঞান নয়, সে একটা 'হিরন্ময় পাত্র', সত্যের ও প্রত্যক্ষদৃষ্টির উপর, দিব্যভাবনার বা সত্যবিজ্ঞানের উপর সুবর্ণের আবরণ। তা উন্মোচিত হলে মনের স্থলে আসে প্রত্যক্ষ দর্শন, মনোবৃত্তির বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার স্থলে আসে সর্বশ্লেষী সত্যভাবনা—'মহস্',

* সাধারণ দর্শনের পক্ষে এই হল প্রধান বিপত্তি; কারণ জগতের নশ্বরত্বের ধারণা সব দর্শনের মজ্জাগত, এমন কি যে সব দর্শনে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় নাই সে সবেরও। সকলেই বলে, জন্ম অজ্ঞানের একটা খেলা, পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে একযোগে তা বর্তমান থাকতে পারে না।

'বেদ', 'দৃষ্টি'। ইন্দ্রিয় মানসের উপর নির্ভর ক'রে বুদ্ধির যে বিক্ষিপ্ত ক্রিয়া হয় তার স্থলে আবির্ভূত হয় প্রকৃত বুদ্ধি বা 'বিজ্ঞান'। সে 'বিজ্ঞান' আমাদের নিয়ে যায় বিশুদ্ধ জ্ঞানে ও বিশুদ্ধ সংবিতে—'চিৎ'-এ। সেখানে আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত মূলে ও সর্বভূতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সঙ্গে সমগ্র একত্ব উপলব্ধি করি।

কিন্তু পরম চেতনাতে সংকল্প ও দর্শন অভিন্ন। সুতরাং চিৎ থেকে পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হয় যে বিজ্ঞান বা সত্যভাবনা তাতেও সংকল্প ও দৃষ্টি সম্মিলিত থাকে, আমাদের মনে এ বৃত্তিদুটি যেমন পরস্পর বিযুক্ত সেখানে তা নয়। অতএব, আমরা যখন সত্যদৃষ্টি লাভ ক'রে ঋতচেতনে বাস করি তখন আমাদের সংকল্প হয় আমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের ধর্ম; এবং তার সব কর্ম ও সেসবের প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায় তার জানা আছে বলে ঋজুপথে মানবপ্রগতির লক্ষ্যের দিকে তা আমাদের পরিচালিত করে। আর সে লক্ষ্য চিরকালই ছিল পরম আনন্দ ঈশ্বরের আত্মসত্তাতে পরমসুখ এবং অমরত্বের অবস্থা উপভোগ করা। কর্মেও আমরা তখন সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করি। আমাদের জীবনও পরিপুষ্ট হয়ে সত্যের ও দিব্য আনন্দের প্রতিমাতে পরিণত হয়, বিভাজন, ভ্রম ও পদস্খলনে ভরা অহং-এর কুটিল পথে আর আমাদের চলতে হয় না। এক কথায়, আমাদের অস্তিত্বের যা উদ্দেশ্য—মরজগতে পার্থিব দেহ ধারণ ক'রে, জড়ের বাধা অতিক্রম ক'রেই হক অথবা জড়াতীত অপর কোন লোকেই হক, দিব্যজীবনের তথা পরমদেবের মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত করা, কিংবা সকললোকের ওপারে তাঁতে প্রবেশ করা—সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

কেনোপনিষদ

কেনোপনিষদ

প্রথম খণ্ড

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১

১। কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিক্ষিপ্ত মন তার লক্ষ্যে পতিত হয়? কার দ্বারা যুগে বদ্ধ হয়ে প্রথম প্রাণ তার পথে এগিয়ে চলে? কার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে লোকে এই সব বাক্য বলে? কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে তাদের কাজে নিযুক্ত করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২

২। শ্রোত্রের পশ্চাতে যা শ্রোত্র, মনের যা মন, বাক্যের পশ্চাতে যা বাক্, প্রাণবায়ুরও তাই প্রাণ, চক্ষুর পশ্চাতে চক্ষু। ধীমান ব্যক্তিরা এই সব অতিক্রম করে মুক্তি অর্জন করেন এবং ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে অমর হন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥ ৩

৩। সেখানে চক্ষু উপনীত হয় না, বাক্যও যায় না, মনও নয়।

জানি না, বুঝতেও পারি না যে, কি করে সেই তৎস্বরূপের বিষয় কেহ শিক্ষা দিতে পারে; কারণ, বিদিত থেকে তা অন্যতর, ঊর্ধ্বে অবিদিতের ওপারে; তাই শুনেছি আমরা পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে যাঁরা সেই তৎস্বরূপকে বোধগম্য করে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৪

৪। বাক্যের দ্বারা যা অব্যক্ত থেকে যায়, বাক্য যাঁর দ্বারা ব্যক্ত হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেন আহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৫

৫। যিনি মনের দ্বারা চিন্তা করেন না, (অথবা মনের দ্বারা যাঁকে চিন্তা করা যায় না) যাঁর দ্বারা, বলেন জ্ঞানীরা, মনকে মনন করা হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৬

৬। যিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না,* যাঁর দ্বারা লোকে চক্ষুর দর্শন সব দেখে, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ করে তা ব্রহ্ম নয়।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭

৭। যিনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন না,+ যাঁর দ্বারা শ্রুত সব শ্রবণ

* অথবা, "চক্ষুর দ্বারা যাঁকে কেহ দর্শন করে না"

+ অথবা, "কর্ণের দ্বারা যাঁকে কেহ শ্রবণ করে না"

করা হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ করে তা ব্রহ্ম নয়।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮

৮। যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করেন না, (অথবা, প্রাণবায়ুর দ্বারা যাঁকে নিঃশ্বাসে নেওয়া, অর্থাৎ আঘ্রাণ করা, যায় না) যাঁর দ্বারা প্রাণবায়ু তার পথ বেয়ে অগ্রে চালিত হয়, জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং॥ ১

১। যদি তুমি মনে কর যে, ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছ তাহলে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জান। তাঁর যা তুমি, তাঁর যা আছে দেবতাদের মধ্যে, তাই তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। আমি মনে করি, তাঁকে জেনেছি।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ ২

২। আমি মনে করি না যে, তাঁকে উত্তমরূপে জেনেছি, তবে জানি যে, তিনি আমার অবিদিতও নন। আমাদের মধ্যে এই জ্ঞান যার হয়েছে সে-ই সে তৎস্বরূপকে জানে, সে জানে যে, তার কাছে তিনি অবিদিত নন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ স।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্॥ ৩

৩। যে তাঁকে মননের দ্বারা নির্ণয় করে না সেই তাঁকে মননে পায়, মননের দ্বারা যে তাঁকে নির্ণয় করে সে তাঁকে জানে না। যে তাঁকে বিশেষ করে জানতে চায় তার তিনি অবিজ্ঞাত, তিনি বিজ্ঞাত তাদেরই যারা তাঁকে বিশিষ্ট করে জানে না।

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং॥ ৪

৪। প্রতিবোধের দ্বারা, অনুভবে প্রতিভাত করে' যে তাঁকে জানে সে-ই মননের দ্বারা তাঁকে জানে: কারণ সে অমৃতত্ব লাভ করে; আত্মার দ্বারা লাভ হয় তাঁতে উপনীত হবার বীর্য, জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয় অমৃতত্ব।

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ৫

৫। ইহলোকেই যে তাঁকে জানে তারই অস্তিত্ব সত্য, সফল; ইহ-লোকে না জানলে মহৎ বিনাশ। ধীসম্পন্নব্যক্তিরা প্রতি ভূতে তাঁকে বিশেষ করে চয়ন করে', পৃথক করে' বেছে নিয়ে, ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে' অমৃত হন।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত।
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি॥ ১

১। ব্রহ্ম দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করলেন, ব্রহ্মের সে বিজয়ে দেবতারা মহীয়ান হলেন। তাঁরা দেখলেন, "এ বিজয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই।"

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি॥ ২

২। ব্রহ্ম তাঁদের এই ভাব লক্ষ্য করলেন; তৎস্বরূপ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না কি এই যক্ষ, এই পূজার্হ মহাভূত।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি॥ ৩

৩। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, "হে জাতবেদা, সর্বজন্মজ্ঞ, বিশেষ করে জেনে এস এই যক্ষ কি।" তিনি বললেন, "তথাস্তু"।

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীত্যগ্নির্বা
অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি॥ ৪

৪। তিনি যে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন; সে যক্ষ তাঁকে বললেন, "কে তুমি?" তিনি বললেন "আমি অগ্নি, আমি সর্বজন্মজ্ঞ জাতবেদা।"

তস্মিংস্ত্বয়ি কিংবীর্যমিতি।
অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৫

৫। "সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নাম-গুণ-বান) কি বীর্য আছে?" "সবই আমি দগ্ধ করতে পারি, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।
তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি॥ ৬

৬। তিনি তাঁর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন; "এটিকে দগ্ধ কর"। অগ্নি সেটির সন্নিকটে গেলেন, তাঁর সর্ববেগ দিয়েও সেটিকে পারলেন না দগ্ধ করতে। সেখানেই তিনি নিবৃত্ত হলেন, ফিরে এলেন; "পারলাম না বুঝতে কে এই যক্ষ।"

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি॥ ৭

৭। তখন তাঁরা বায়ুকে বললেন, "হে বায়ু তুমি জেনে এস কি এই যক্ষ।" "তথাস্তু।"

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্বা
অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি॥ ৮

৮। বায়ু সে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন; সে যক্ষ তাঁকে বললেন, "কে তুমি?" তিনি বললেন "আমি বায়ু বা আমি মাতরিশ্বা, আকাশ-মাতার ক্রোড়ে বিচরণ করি।"

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিত্যপীদং
সর্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥ ৯

৯। "সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নামগুণবান) কি বীর্য আছে?" "এ সবই আমি নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি
তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি॥ ১০

১০। সে যক্ষ তার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন; "এটিকে

গ্রহণ কর।" তিনি তার সন্নিকটে গেলেন, সর্ববেগ প্রয়োগ করে তা গ্রহণ করতে পারলেন না। সেখানেই তিনি নিবৃত্ত হলেন, ফিরে এলেন; "আমি পারলাম না বুঝতে কে এই যক্ষ।"

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে॥ ১১

১১। তখন তাঁরা ইন্দ্রকে বললেন, "হে মঘবন্‌, পূর্ণৈশ্বর্যশালিন্‌, তুমি জেনে এস কে এই যক্ষ।" "তথাস্তু"। ইন্দ্র তাঁর অভিমুখে ধাবিত হলেন। তাঁর সম্মুখ থেকে সে যক্ষ তিরোহিত হলেন।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি॥ ১২

১২। সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপের সাক্ষাৎ পেলেন, তিনিই হিমবানের কন্যা বহুরূপে দীপ্তিমতী উমা। তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই যক্ষ?"

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ১

১। সেই উমা ইন্দ্রকে বলেন, "এই ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এই বিজয়, তার দ্বারা তোমরা মহিমা লাভ করবে।" তাতেই তিনি জানতে পারলেন যে, সেই যক্ষই ব্রহ্ম।

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্দেবান্যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে
হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ২

২। সেই হেতুতেই এই দেবতারা যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম

করেছিলেন, এই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র, যাঁরা তৎস্বরূপের সমীপবর্তী হয়ে স্পর্শ করেছিলেন। *

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং
পস্পর্শ স হ্যেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥ ৩

৩। সেই হেতুতেই ইন্দ্র যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন কারণ তিনি সন্নিহিততম হয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন, কারণ তিনিই প্রথম সে যক্ষকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন।

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্‌বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্
ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ৪

৪। সেই ব্রহ্মের নির্দেশ এই,—এই যে আমাদের উপর বিদ্যুতের স্ফুরণ অথবা এই যে চক্ষুর নিমেষ, এইরূপ হয় দেবতাদের যা তার মধ্যে, এই 'অধিদৈবত'।

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্প॥ ৫

৫। তারপর 'অধ্যাত্ম', আত্মার যা তার মধ্যে,—যেমন এ মনের গতি সেই তৎস্বরূপের কাছে উপনীত হয় বলে বোধ হয়, এবং পরে তার সহায়ে সংকল্পের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাকে স্মরণ করে।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং
বেদাভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ ৬

* পূর্বযুগের শ্রুতিধর বা পরবর্তী লিপিকরদের ভ্রমের জন্য এই শ্লোকের অবশিষ্ট অংশ এমন বিকৃত হয়েছে যে পাঠোদ্ধারের আশা নাই। "তাঁরা তিনি প্রথম জানলেন যে, এই ব্রহ্ম"—এ উক্তি ঘটনার বিপরীত, অর্থহীন, ব্যাকরণদুষ্ট। তৃতীয় শ্লোকের শেষ অংশ দ্বিতীয় শ্লোকে প্রবেশ করে' তার শেষ অংশের স্থান নিয়েছে।

৬। তৎস্বরূপের নাম 'তদ্বন', সেই অনন্যসাপেক্ষ আনন্দ; সেই আনন্দরূপেই তাঁকে উপাসনা করতে হবে। যিনি ব্রহ্মকে এভাবে জানেন সব জীব তাঁর সঙ্গ ইচ্ছা করে।

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি॥ ৭

৭। "আমাকে উপনিষদ উপদেশ দিন", বলেছিলে তুমি, এই তোমাকে উপনিষদ বলা হল। তোমাকে যা উপদেশ দিয়েছি সে ব্রহ্মেরই উপনিষদ।*

তস্মৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদা
সর্বাংগানি সত্যমায়তনম্॥ ৮

৮। সে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হল তপস্যা, দম ও কর্ম; বেদ তার সর্বাঙ্গ; সত্য তার আবাসস্থান।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৯

৯। যে এই জ্ঞান বিদিত হয় তার কাছ থেকে পাপ বিদূরিত হয় এবং সেই বৃহত্তর লোকে এবং অনন্ত স্বর্গে সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সত্যই সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

* 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, প্রত্যক্ উপলব্ধি যা চরম সত্যে প্রবেশ করে' তাতে অধিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা

১

বারখানা প্রধান উপনিষদই লেখা হয়েছে একই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নিয়ে; কিন্তু তারা বিচারে অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ের বিভিন্ন দিক থেকে। ব্রহ্মবিদ্যার বিশাল রাজত্বে প্রত্যেকে প্রবেশ করেছে তার নিজস্ব দ্বার দিয়ে, চলেছে নিজের পথে নিজের ইচ্ছামত চক্র ঘুরে, লক্ষ্য রেখেছে নিজের উদ্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে। 'ঈশ' ও 'কেন' এ দুই উপনিষদেরই বিচার্য একই মহৎ সমস্যা: অমৃতত্ব-অর্জন, বিশ্বের ও মানব-চেতনার সঙ্গে দিব্য সর্বাধার সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মচেতনার সম্বন্ধ, আমাদের বর্তমান অবস্থার খণ্ডসত্তা-অজ্ঞান-দুঃখ অতিক্রম করে একত্ব-সত্য-আনন্দে উপনীত হবার উপায়। ঈশ উপনিষদের শেষ কথা হল পরম সুখের অভীপ্সা––'অগ্নে নয় রায়ে'; তেমনি, কেন উপনিষদের শেষ কথা হল ব্রহ্মের আনন্দময় সংজ্ঞা––'তদ্ধ তদ্বনং নাম', আর ব্রহ্মকে আনন্দময়রূপে উপাসনা ও সন্ধান করবার আদেশ। তবে, তাদের বিচারের অবতারণাতে প্রভেদ আছে, এমন কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও ভাবের পার্থক্য বেশ অনুভব করা যায়।

কারণ, এ উপনিষদ দুটির বিষয়-বস্তুও ঠিক অভিন্ন নয়। ঈশ নিয়েছে ব্যাপক প্রশ্ন: ব্রহ্মের পরম সত্যের সঙ্গে বিশ্বের, জীবনের, কর্মের ও মানব নিয়তির সম্বন্ধ নিয়ে যত সমস্যা ওঠে সে সবই। পরমাত্মা আর তার সম্ভূতির, পরমেশ্বর আর তার ক্রিয়াকলাপের ধারণাকে সমাধানের সূত্র রূপে নিয়ে আঠারটি শ্লোকের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সে জীবনের প্রায় সমস্ত মূল সমস্যা দ্রুতগতিতে বিচার করেছে। তার প্রধান সুর হল সকল অস্তিত্বের একত্ব।

কেনোপনিষদ নিয়েছে সংকীর্ণতর সমস্যা, সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ প্রশ্ন তুলে সে তার বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছে। তার বিচার্য শুধু মানস-চেতনার সঙ্গে ব্রহ্মচেতনার সম্বন্ধ, আর তার বিষয়ের এ নির্দিষ্ট সীমা সে কখনও লঙ্ঘন করে নাই। জড়জগৎ ও দৈহিক জীবন সে মেনেই নিয়েছে, তাদের উল্লেখই প্রায় করে নাই। কিন্তু স্থূল জগৎ ও দৈহিক জীবনের অস্তিত্ব আমাদের কাছে আছে ত শুধু আন্তর জীবনের প্রসাদে। আমাদের অন্তঃকরণ বাহ্য জগতের যে-প্রতিরূপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে, মনের আদেশে আমাদের প্রাণশক্তি বাহ্য অভিঘাতের ও বাহ্য বিষয়ের যে-রকম ব্যবহার করে, আমাদের বাহ্য জীবন ও অস্তিত্ব সেই রকমই

হয়। আমাদের মন ও আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে তাদের যে-রূপ প্রকাশ করে, বিশ্ব আমাদের কাছে তাই; আমাদের জীবন যা হবে বলে আমাদের মানসপ্রকৃতি স্থির করে, আমাদের জীবন হয়ও তাই। সুতরাং, এ উপনিষদে প্রশ্ন তুলেছে: তাহলে মনের এই যন্ত্রগুলি কি? যে মানস-প্রকৃতি বাহ্যজীবন ব্যবহার করে তা-ই বা কি? এদের সাক্ষ্যই কি শেষ প্রমাণ? এ-ই কি চরম ও শ্রেষ্ঠ শক্তি? এই মনই কি সব? না, এ মানব-অস্তিত্ব তার চেয়ে বৃহত্তর, সমর্থতর, দূরতর, গভীরতর অন্য কিছুর বহিরাবরণ মাত্র?

এ উপনিষদের উত্তর হল যে, অন্তরালে আছে এক বৃহত্তর সত্তা, আর তার ক্রিয়ার সঙ্গে মন ও তার যন্ত্রগুলির সম্বন্ধ বাহ্যজগতের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের অনুরূপ। জড় মনকে জানে না, মন জড়কে জানে, জড়দেহধারী জীব যখন মনের বিকাশ সাধন করে' মনোময় জীবে পরিণত হয় তখনই সে তার মনোময় পুরুষকে জানতে পারে আর, সেই সত্তা দিয়ে, মনের কাছে জড়ের যা বাস্তবরূপ সেই রূপে জড়কেও সে জানতে পারে। তেমনি, মনের পশ্চাতে যা আছে মন তাকে জানে না কিন্তু তা মনকে জানে; মনে নিবর্তিত সত্তা যখন মনের বাহ্যবোধ থেকে তার সত্য সত্তাকে মুক্ত করতে পারে শুধু তখনই সে সেই সদ্বস্তুতে পরিণত হতে পারে, জানতে পারে যে সে-ও তা-ই, আর তখন তার দ্বারা মনের চেয়ে যা বাস্তবতর তার কাছে মনের যা বাস্তবরূপ সেই রূপে মনকে সে জানতে পারে। কি উপায়ে মন ও অন্তঃকরণের উপরে ওঠা যায়, কি উপায়ে নিজের অন্তরে প্রবেশ করা যায়, কি উপায়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়---এই হয় তাহলে মনোময় জীবের চরম লক্ষ্য, তার অস্তিত্বের সার প্রশ্ন।

কারণ, যদি স্বীকার করা যায় যে, মানস সত্তার চেয়ে বাস্তবতর সত্তা আছে এবং দৈহিক জীবন থেকে মহত্তর জীবন আছে, আহলে এই রূপ-সমৃদ্ধ নিম্নতর জীবন কিংবা যেসব ভোগ-বিলাস সংসারে লোকে পূজা করে, অনুসন্ধান করে সেসব ত আর জাগ্রত আত্মার কাম্য হতে পারে না। তার অভীপ্সা লোকাতিগ হবেই, বাহ্যপ্রত্যক্ষসার এই মর্ত্য জগৎ থেকে তাকে মুক্ত হতেই হবে, তবেই এসবের উপরে তার যে অমর-স্বভাব সত্তা আছে তা সে হতে পারবে। তার অস্তিত্ব সত্য হবে তখনই, যখন সে এই মর্ত্য জীবনেই নিজেকে মর্ত্য চেতনা থেকে মুক্ত করে' শাশ্বত অমর পুরুষকে জেনে তা হতে পারবে। তা না হলে তার মনে হবে যে,

সে পথ হারিয়েছে, তার প্রকৃত শ্রেয় থেকে সে ভ্রষ্ট হয়েছে।

কিন্তু এ উপনিষদে বলছে না যে, সে ব্রহ্মচেতনা মনের গ্রাহ্য জড় বিশ্বে একেবারে পরদেশী বা দূরের জিনিষ, অথবা এ বিশ্বব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন। বরং ব্রহ্মই বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্তা, মর্ত্য চেতনাতে দেবতাদের যে-শক্তি কাজ করে সে তাঁরই শক্তি, দেবতারা যে জয়ী ও মহীয়ান হন তার কারণ ব্রহ্ম যুদ্ধ করে জয়লাভ করে রেখেছেন। এ বিশ্ব তাহলে তার চেয়ে অনন্ত গুণে গরীয়ান, পূর্ণতর, বাস্তবতর অন্য কোন বস্তুর অবর-প্রকাশ বা বাহ্য-প্রতিরূপ।

কি সেই বস্তু? সর্বময় আনন্দ যা অনন্তসত্তা ও অমরশক্তি। মানুষের কর্তব্য সংসারে ভোগবিলাস সন্ধান করা নয়, সেই বিশুদ্ধ পরম আনন্দের পূজা ও অন্বেষণ করা। কি করে তাকে সন্ধান করতে হবে, এই হল সার প্রশ্ন আর নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে অনুসরণ করাই হল একমাত্র সত্য, পরম পুরুষার্থ।

২

মন নিম্নতর বা প্রাতিভাসিক চেতনার কাজ করে। মনের যন্ত্র হল জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু, বাক্ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। প্রাণ বা নাড়ীতন্ত্রে সঞ্চারিণী জীবনীশক্তিই হল আসলে আমাদের মানস চেতনার একমাত্র প্রকৃষ্ট যন্ত্র। কারণ, তার দ্বারাই মন স্থূলজগতের স্পর্শ গ্রহণ করে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে, আর তার বিষয়ের উপর কাজ করে বাক্ ও অপর চারিটি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে; এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজই নির্ভর করে স্নায়বিক প্রাণশক্তির উপর। তাই এ উপনিষদে প্রথম জিজ্ঞাস্য হল, মন-প্রাণ-বাক্ ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূল কারণ কি? তাদের চরম নিয়ন্তাই বা কি?

প্রশ্ন তোলা হল 'কেন'? কিসের বা কার দ্বারা? বিশ্বসম্বন্ধে পুরাতন মতে, আমাদের স্থূল অস্তিত্ব পঞ্চভূতে গড়া, আকাশ বায়বীয় আগ্নেয় তরল ও কঠিন––জড় ধাতুর এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার সংযোগে নির্মিত; তাই, আমাদের স্থূল অস্তিত্বের সম্পর্কিত যা কিছু আছে সেসবকে 'অধিভৌত' বলা হয়। মন-প্রাণের যেসব শক্তি জড়ের উপর কাজ করে সেসবের মধ্য দিয়ে এই স্থূল জগতে সূক্ষ্ম জড়াতীত শক্তিও কাজ করছে; তাদের বলা হয়, 'দেবতা' আর জড়াতীত ক্রিয়া সম্পর্কিত যা কিছু আছে আমাদের মধ্যে, তাকে বলা হয় 'অধিদৈব' বা দেবতাদের বিষয়ীভূত।

কিন্তু এই সূক্ষ্মশক্তিগুলির উপরে, তাদের ধারণ করে রয়েছে তাদের চেয়ে মহত্তর চিন্ময় সত্তা বা আত্মন্; আর আমাদের মধ্যে এই মহত্তম সত্তার সম্পর্কিত যা কিছু আছে তাকে 'অধ্যাত্ম' বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম যা আছে, স্থূল জড়ধাতুর প্রতিপক্ষ মন-প্রাণ যার বিগ্রহ, তাই 'অধিদৈব', কারণ দেবতাদের বিশিষ্ট ক্রিয়া মন-প্রাণেই সম্পন্ন হয়।

স্থূল বা 'অধিভৌত' এ উপনিষদের বিষয়ের বাইরে; 'অধিদৈব' ও 'অধ্যাত্ম', সূক্ষ্ম ও চিন্ময় সত্তার মধ্যে সম্বন্ধই তার বিচার্য। তবে, মন-প্রাণ-বাক্-ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বশক্তি-সমূহের দ্বারা, দেবতাদের দ্বারা, ইন্দ্র-বায়ু-অগ্নির দ্বারা। এই সব সূক্ষ্ম বিশ্ব শক্তি-সমূহই কি অস্তিত্বের আদি কারণ, মন-প্রাণের প্রকৃত প্রবর্তক? না, তাদের সবার পশ্চাতে কোন ঊর্ধ্বতর সমন্বয়ী শক্তি আছে, স্বরূপতঃ যা এক?

সুনিপুণ ধানুকীর ছোঁড়া তীর যেমন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পতিত হয়, প্রভুর আদেশে তার সচিব বা বার্তাবহ যেমন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তেমনি মন যে প্রেরিত হয়ে তার নির্দিষ্ট বিষয়ে পতিত হয় সে কার বা কিসের কাজে, কার বা কিসের বার্তা নিয়ে? আমাদের অন্তরের বা বাহিরের কোন্ বস্তু সে, যা মনকে তার কাজে প্রণোদিত করে, যা মনকে দিশা দিয়ে চালিয়ে নেয় তার বিষয় পানে?

তারপর, প্রাণ বা জীবনীশক্তি, আমাদের জৈব সত্তাতে ও নাড়ীতন্ত্রে যা কাজ করে। এই উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ প্রাণবায়ু; শ্রুতিতে অন্যত্র তাকে বলা হয়েছে 'মুখ্য' 'আসন্য', প্রধান বা মুখের বায়ু। তারই অন্তরে বিধৃত রয়েছে বাক্ বা সৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রকাশশক্তি। মানুষের দেহে 'পঞ্চপ্রাণ' বা প্রাণশক্তির পাঁচরকম ক্রিয়ার কথা বলা হয়। প্রথম, যাকে বিশেষ করে 'প্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয় তা দেহের উপরিভাগে সঞ্চরণ করে আর প্রকৃষ্টভাবে সেই প্রাণবায়ু, কারণ বিশ্ব-প্রাণশক্তিকে সর্বত্র বিতরণ করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্যষ্টি আধারে সেই নামিয়ে আনে। দ্বিতীয়, 'অপান' দেহের নিম্নভাগে বিচরণ করে, প্রশ্বাস বা মৃত্যুবায়ু সে, কারণ প্রাণশক্তিকে সে দেহ থেকে বার করে দেয়। তৃতীয়, 'সমান', প্রাণ-অপানের মিলনস্থলে তাদের আদানপ্রদান নিয়ন্ত্রিত করে' তাদের সাম্য বিধান করে, জীবনীশক্তি ও জৈব বৃত্তিগুলির ক্রিয়া-সাম্য বিধানের সে-ই প্রধান উপায়। চতুর্থ, 'ব্যান', ব্যাপক, দেহের সর্বত্র সে জৈব তেজ পরিবেশন করে। পঞ্চম, 'উদান', দেহ থেকে উপরদিকে মাথার তালু অবধি সঞ্চরণ করে, দৈহিক জীবনের সঙ্গে মহত্তর অধ্যাত্ম জীবনের আদান-প্রদানের প্রণালী সে। এদের কোনটিই প্রথম বা মুখ্য প্রাণ নয়। তবে প্রাণ তার নিকটতম অনুরূপ। যে প্রাণের উপর উপনিষদ এত জোর দিয়েছে তা হল বিশুদ্ধ প্রাণশক্তি,—প্রথম, কারণ অপর সব শক্তিই তার গৌণরূপ, তার থেকে তারা জন্মেছে, তার বিশেষবৃত্তি-রূপেই তারা কাজ করে। বেদে তার প্রতীক হল 'অশ্ব', তারই বিবিধ শক্তি দেবতাদের রথ টানে। এ উপনিষদের ভাষাও বেদের সেই ছবিই মনে করিয়ে দেয়: 'যুক্ত', রথে জোতা, 'প্রৈতি', অগ্রসর হয়, যেমন সারথির চালনায় রথের ঘোড়া তার পথ বেয়ে এগিয়ে চলে।

তাহলে, এই প্রাণশক্তিকে জগতের সব কাজে নিযুক্ত করেছে কে? অথবা নিজের চেয়ে বৃহত্তর কোন্ শক্তির জোরে প্রাণ তার পথে এগিয়ে

চলেছে? এ প্রশ্ন ওঠে, কারণ প্রাণ মৌলিক শক্তি নয়, তার অস্তিত্ব স্ব-প্রতিষ্ঠ নয়, তার কর্ম স্বতন্ত্র নয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে, তার পেছনে আর একটা শক্তি আছে যা তাকে তার পথের দিশা দেয়, তাকে চালায়, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে ব্যবহার করে। যে-বাক্যের দ্বারা আমরা আমাদের সংকল্প ভাবনা ও চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্ত সব ব্যক্ত করি, জগতের কর্মপ্রবাহে ও নূতন সৃষ্টির উদ্যমের মধ্যে তাদের ছেড়ে দি সে বাক্য অন্তর থেকে তুলে এনে বাইরে প্রচার করতে পারি এই প্রাণবায়ুর শক্তিতে। সে বাক্যকে চালায় প্রাণবায়ু, তাকে গড়ে অগ্নি বা দেহ-মনে নিগূঢ় শক্তি, রূপনির্মাতা বহ্নিতেজ। কিন্তু এরা সব ত কর্মচারী মাত্র। তাদের অন্তরালে রয়েছে কোন্ সে গোপন শক্তি বা কে সে শক্তিমান, যিনি মানুষের বাক্যের ঈশ্বর, প্রকৃতপক্ষে যিনি বাক্যকে আকার দেন আর বাক্যে যা আত্মপ্রকাশ করে তার উদ্ভব যেখান থেকে হয়?

কানে শব্দ শোনে, চোখে রূপ দেখে; কিন্তু দেখাশোনা ত আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তিরই বিশেষ ক্রিয়া, আর তাদের ব্যবহার করে মন, যাতে মনোময় জীব যে জগতে বাস করে তার পরিচয় সে নিতে পারে, তাকে ইন্দ্রিয়বোধরূপে অবধারণ করতে পারে। প্রাণশক্তি তাদের রূপ দেয়, মন তাদের ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের বিষয় বা যন্ত্রগুলিকে আকার দেবার এবং সে-সব ব্যবহার করবার সামর্থ্য দেয় প্রাণ-মন ছাড়া অপর কিছু। কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে তাদের কাজে প্রবৃত্ত করেন? আলোর দেবতা সূর্য নন, দ্যৌ, আকাশ বা অন্তরীক্ষ লোক নয়, কারণ আলো-আকাশ ত দেখা-শোনার নিমিত্তকারণ মাত্র।

দেবতারা প্রত্যেকে তাঁদের অবদান এনে, সেসব মিলিয়ে স্থূলজগতের সব ব্যাপার একত্র সংগ্রহ করেন আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করি মনোময় জগতের ব্যাপার বলে, কারণ আমাদের প্রত্যক্ষবোধের সেই একমাত্র পদ্ধতি। কিন্তু সমগ্র বিশ্বক্রিয়া এক অখণ্ড, বিশ্ব অকস্মাৎ আপতিত পরমাণু-সমূহের সমষ্টি নয় তা এক অবিভাজ্য; তার বিভিন্ন অংশ সুব্যবস্থিত হচ্ছে, তার বহুমুখী ক্রিয়া সুসঙ্গত হচ্ছে এক দ্বৈতরহিত সচেতন অস্তিত্বের প্রসাদে; আর সে অস্তিত্ব 'অকৃত', তাকে গড়া বা জোড়া দেওয়া যায় না, কিন্তু তা আছে এসব ব্যাপারের আগে থেকে। দেবতারা কাজ করেন শুধু তাঁদের পূর্বে জাত এই শক্তি দিয়ে, জীবনধারণ করেন শুধু তার জীবন নিয়ে, ভাবেন শুধু তার চিন্তা দিয়ে, কর্ম করেন শুধু তারই

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা নিজেদের মধ্যে এবং সব বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে দেখলে সেখানে সে সত্তাকে অহং-অস্তি-আত্মন্-রূপে অবগত হতে পারি—যেন আমার আমিত্ব, যেন একটা কিছু আছে যা যে-কোন ব্যষ্টি বা পৃথক সত্তা থেকে অন্যতর সংহততর বৃহত্তর।

কিন্তু মন যাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করতে পারে কিংবা ইন্দ্রিয় যাকে মনের গ্রাহ্য রূপ দিতে পারে, তার কিছুই ত সে নয়; তা হলে কি সে বা কে সে? কোন্ নিরুপাধিক চিৎ-সত্তা? কোন্ অদ্বিতীয় শাশ্বত পরম-দেবতা? 'কো দেবঃ'?

৩

চিরন্তন প্রশ্ন এই উত্থাপন করা হল। এ প্রশ্ন মনে জাগলে মানুষের দৃষ্টি ফেরে দৃশ্য বাহ্য জগৎ থেকে পরম অন্তরতমের দিকে, সে এখন যা হয়েছে তার জানা এই ক্ষুদ্র সত্তা থেকে ক্রমশঃ নিজের পরিণতি সাধন করে' তাকে এখানেই যা হতে হবে সেই বৃহৎ অজ্ঞাতের দিকে; কারণ, সে-ই তার প্রকৃত সত্তা এবং প্রপঞ্চ ও প্রতিভাসের ছদ্মবেশ ছেড়ে সে পরম সত্তাকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করতেই হবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার স্বয়ম্ভূ সৃষ্টি করেছেন রূপময় জগতের দিকে মুখ করে', কিন্তু যে-মানব একবার প্রগতির এই অনতিক্রমণীয় শাসনে ধরা দিয়েছে, সেই বহির্মুখী দ্বার দিয়ে এই মর্ত্য আপাতদৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করে' সে ত আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, বাধ্য হয়ে তাকে অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নূতন সত্যের জগৎ নিরীক্ষণ করতেই হবে।

সে জানে যে ইহলোক তার অনেক কিছুই আছে, তা যতই অনিশ্চিত বা অপূর্ণ হক না কেন তার কাছে সে সবের আদর আছে। কারণ, তার আকিঞ্চন হল সত্তার বিস্তৃতি, জ্ঞানের প্রসার, ভোগ-সুখের ক্রমিক উপচয়, আর সেসব সে কিছু পরিমাণে পায়ও। এবং এসবের মূল্য তার কাছে এত বেশী যে, তার যতটুকু সে সংগ্রহ করতে পারে তারই বিনিময়ে সেসবের বিপরীত অভিঘাতের অবিরাম দুঃখ সে ভোগ করতে প্রস্তুত। সুতরাং, এখানে সে যা সন্ধান করে, আঁকড়ে ধরে' থাকে সেসব যদি তাকে ছাড়তে হয় তাহলে ওপারের আকর্ষণ আরও অনেক বেশী প্রবলতর হওয়া চাই, গোপন প্রতিশ্রুতি তার চাই এতবড় কোন জিনিসের যাতে এখানকার যত কিছুই তাকে পরিত্যাগ করতে বলা হক না কেন সেসবের উপযুক্ত প্রতিমূল্য হবে। আছে সে প্রতিশ্রুতি:––বিস্তৃত সম্ভূতি নয়––অনন্ত সত্তা, সাপেক্ষ জ্ঞানের টুকরোগুলো তখনকার মত পূর্ণজ্ঞান বলে ভুল করে' চিরদিন জোড়া দেওয়া নয়––আমাদের স্বরূপ-চেতনার আর তার প্রকৃত সত্যের জ্যোতিঃ-প্রপাতের ভাগী হওয়া, আংশিক পরিতৃপ্তি নয়––পরমানন্দ। এককথায় অমরত্ব।

এ উপনিষদের ভাষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জীবের অভীপ্সার এই যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল তা দার্শনিকের কোন অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব নয়, নীরব মহাশূন্য বা নির্বিশেষ পরব্রহ্ম নয়, বরং জীব যে অন্যোন্য-

সম্বন্ধের জগতে বিচরণ করছে সেখানে তার যা কিছু থাকতে পারে সেসবের চরম পূর্ণতম রূপ। এখানে মানসলোকে আছে শুধু ক্ষুদ্র জ্যোতি এবং চেতনা ও প্রাণের ক্রমবৃদ্ধি, সেখানে অতিমানসে সবই অনন্তজীবন অনন্তজ্যোতি অনন্তচেতনা। এখানে যা অন্বেষণ করে' বা সন্তর্পণে অনুসরণ করে' আহরণ করতে হয় সেখানে তা অধিগত, এখানে যা অপূর্ণ সেখানে তা পূর্ণসিদ্ধ। 'লোকাতীত' অর্থে লোকের অবলুপ্তি নয় বরং এখানে সাকার জগতে আমরা যা সেসবের নবরূপায়ণ:—এই মনের সে হল সর্বক্ষম মন, এই প্রাণের সে গোপন প্রাণ, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় দেয় ও সার্থক করে সে অব্যাহত সংবোধ।

আমরা নিজেদের ত্যাগ করি সত্য করে নিজেদের পাবার জন্য; কারণ মনের দ্বারা চালিত এই জীবনে আছে শুধু খোঁজা, মনকে অতিক্রম না করলে পরম পাওয়া কখনও হয় না। সেই জন্যই আমাদের মনে হয় যেন, আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের পশ্চাতে আমাদের পূর্ণতার যে-রূপ রয়েছে তার আকৃতি ও প্রকৃতি আমরা যা তার বিপরীত। কারণ, এখানে আমাদের আছে শুধু অবিরাম হওয়া—সম্ভূতিময় আমরা, সেখানে আমরা পাই আমাদের শাশ্বত সত্যসত্তাকে। এখানে আমরা আমাদের ধারণা করি বিপরিণামী চেতনা বলে', কালের তাড়নায় সদা ব্যাহত চেষ্টার ফলে তার পরিণতি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে; সেখানে আমরা অব্যয় চেতনা, কাল প্রভু নয় তার যন্ত্র মাত্র, তার সৃষ্ট ও দৃশ্য বিশ্বের ক্ষেত্র। আমরা এখানে, ক্ষণস্থায়ী জগৎরূপে যা প্রতিভাত হয় মর্ত্যচেতনার আরোপিত সেই ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি আর সেখানে, যে অনন্ত আত্মদর্শন নিখিল বিশ্বকে শাশ্বত অমর অস্তিত্বের আলোকে দেখে' জানে তার সব সুষমার মধ্যে মুক্তিলাভ করি। ওপারেই আমাদের প্রকৃত সত্তা, আমাদের ঐশ্বর্য, আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের চরম আপ্তকাম তৃপ্তি। সে-ই অমরত্ব, সে-ই পরম আনন্দ।

এখানে দেহকারারুদ্ধ মানসে, আমাদের অহং তার আন্তর ক্ষেত্র ও বাহ্য পরিবেশের প্রভু হতে, সে সব অধিকার করতে, অবিরাম চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই ধরে রেখে ভোগ করতে পারছে না, কারণ আমাদের কাছে যা অনাত্ম তাকে প্রকৃতভাবে অধিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে নিত্য সত্তার স্বাতন্ত্র্যে আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা বিনা বিরোধে, সবই যে সে নিজেই শুধু এই তথ্যেরই বলে, সবই পেতে পারে।

এখানে রয়েছে আপাত মানব, সেখানে প্রকৃত মানব, অধ্যাত্ম পুরুষ; এখানে রয়েছেন দেবতারা, সেখানে পরম দৈবত; এখানে আছে বর্তমান থাকবার প্রয়াস, সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কবলে ফুটছে জীবনের মুকুল আর সেখানে আছে কেবল অস্তিত্ব, কালহীন অমরত্ব।

এই যে উত্তর দেওয়া হল, মূল প্রশ্নের ধরণের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে রয়েছে যে সত্য তা অবশ্যই এমন কিছু যা তাদের চেয়ে বৃহত্তর বলেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে; সে-ই মহেশ্বর, সবার স্বামী, পরম দেব। ঈশোপনিষদ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল সব অস্তিত্বের সমন্বয় করে, কেনোপনিষদ তাতে এসেছে ব্যতিরেকের পথে,—এই যেসব পদার্থ নিজেদের বাহিরের অপর কোন সত্তার শক্তি'র সাহায্যে এখানে নানা ভাবে বর্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে সর্বনিয়ন্তা স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের বৈপরীত্য বিচার করে। উভয়েই তার নিজস্ব বিচারের ধারা ধরে' এক সদ্বস্তুতে সকল বস্তুর সমাধান করে' চলেছে, কিন্তু উভয়েই উপস্থিত হয়েছে একই সিদ্ধান্তে। যে সদ্বস্তু সবের প্রভু ভোক্তা মহেশ্বর, তাঁকে পাওয়া যায় পৃথক সত্তা, পৃথক নিজস্ব, পৃথক আনন্দ অঞ্জলি দিয়ে।

ঈশোপনিষদের শ্রোতা প্রবুদ্ধ সাধক; কাজেই তার প্রথম কথা সর্বান্তর্যামী ঈশ্বর, তা থেকে এসেছে আত্মন্ সর্বভূত যার সম্ভূতি, শেষে আবার সে ফিরে এসেছে বিশ্ব-স্পন্দের পরমাত্মা সেই পরমেশ্বরে; কারণ, অজ অক্ষরের উপাসককে তাকে শেখাতে হবে কর্মের সার্থকতা, অমরত্বের আনন্দের উপর এবং বিশ্বচেতনার সঙ্গে একীভূত ব্যক্তিচেতনার উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দিব্যজীবন। কেনোপনিষদ যাদের উদ্দেশ করছে তাদের কাছে বাহ্যজীবনের আকর্ষণ এখনও রয়েছে, তারা এখনও সম্পূর্ণ জাগেনি, সাধনা পুরোপুরি নেয় নি। তাই, তার প্রথম উক্তি হল, ব্রহ্ম মনের অতীত পরমাত্মা; তার থেকে এসেছে যে, ব্রহ্ম আমাদের মন ও প্রাণের সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় ঈশ্বর; কারণ তাকে তার শ্রোতার দৃষ্টি ফেরাতে হবে উপরদিকে, বাহ্য দৃশ্য জগতের ওপারে। কিন্তু কেনোপনিষদের প্রথম দুই অধ্যায়ে ঈশোপনিষদের আত্মন্ ও তার সম্ভূতির তত্ত্বই শিক্ষা দিচ্ছে, যদিচ অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপকভাবে এবং তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে; আর তার শেষ দুই অধ্যায়ে অন্য ভাষায়, চিন্তার অন্য সংজ্ঞা দিয়ে ঈশোপনিষদেরই পরমেশ্বর এবং তাঁর লীলার তত্ত্বের পুনরুক্তি করছে।

৪

এ উপনিষদের প্রথম উক্তি, আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে এই গভীরতর বৃহত্তর সমর্থতর চেতনার অস্তিত্ব। এর আদেশ, এই চেতনাই ব্রহ্ম। মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক্ এর কোনটাই পরম ব্রহ্ম নয়, এসব অভিব্যক্তির গৌণ রীতি বা বাহ্য যন্ত্র মাত্র। ব্রহ্মচেতনাই আমাদের সত্তা, আমাদের সত্য অস্তিত্ব।

দেহ বা মন আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়, পরিবর্তনশীল বিগ্রহ বা প্রতিমা মাত্র, কালের প্রেরণাতে, আমাদের অতীত কর্মপ্রবৃত্তির প্রবেগ-সমূহের সমবায়ের ফলে তাদের আমরা নিরন্তর নির্মাণ করে চলেছি। কারণ, এই সব কর্মপ্রবৃত্তির কাহিনী পেছনে ফেলে এসেছি বলে যদিও আমরা সে-সবকে অতীত বা মৃত মনে করি তথাপি সে-সব সমষ্টিভাবে সর্বদা বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাদের কাজ হচ্ছে ও হবে।

তেমনি, অহংভাবও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। অহংজ্ঞান মনের একটি বৃত্তি মাত্র, আমাদের বিচারশীল তত্ত্বনির্ণয়ী মনের দ্বারা তা বিসৃষ্ট হয়েছে যাতে তাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়-মানসের অভিজ্ঞতাগুলিকে তার চারদিকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে, চাকার কীলকের মত প্রকৃতির গতি অটুট রাখাই তার কাজ। যন্ত্রের বেশী কিছু সে নয়, যদিও একথা সত্য যে, যতদিন আমরা সাধারণ মনোবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকব ততদিন সেই মনোবৃত্তির প্রকৃতির দ্বারা ও অহং-যন্ত্রের প্রয়োজনের দ্বারা বাধ্য হয়েই এই অহংভাবকে আমাদের প্রকৃত সত্তা বলে ভুল করতে থাকব।

আবার, স্মৃতিও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। স্মৃতি আর একটি যন্ত্র, আমাদের জাগ্রত কর্মসমূহের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচক যন্ত্র। পারম্পর্যবোধ রক্ষা করবার জন্য অহং-বৃত্তি তাকে অবলম্বন ও আশ্রয়রূপে ব্যবহার করে, নতুবা সুপরিসর ক্ষেত্রে ব্যক্তির বহুমুখী ভোগের উপযোগী করে, মন ও প্রাণের ব্যাপারগুলি সুসম্বন্ধভাবে সাজান যেত না। কিন্তু, এমনকি আমাদের মানস সত্তার ও যা উপাদান অথবা যা তাকে প্রভাবিত করছে, তার মধ্যেও এমন অনেক জিনিষই আছে যা স্মৃতিতে বর্তমান নেই, কিন্তু রয়েছে অবচেতনে, আমাদের উপরিচর সত্তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের অহংবোধের অবিচ্ছিন্নতার জন্য

স্মৃতিশক্তির অবশ্য-প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তা আমাদের অহংবোধের উপাদান নয়, সত্তার ত নয়-ই।

তেমনি, আমাদের বিবেক বা নৈতিক ব্যক্তিত্বও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। সেত পরিণামী একটা বিগ্রহ বা নমনীয় একটা ছাঁচ, আমাদের আন্তর জীবন তাকে গড়ে' ব্যবহার করছে যাতে আমাদের মনের অপূর্ণতায় ভ্রান্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র চঞ্চল ভাবকে আমরা 'আমি' 'আমি' বলতে লোভ করতে পারি তার মধ্যে কথঞ্চিৎ স্থিরত্বের আভাস আসতে পারে।

কিংবা, এই যে-সমস্ত বিকারী ভাব সম্বন্ধে আমরা সচেতন, তার নীচে অবচেতনে যা কিছু আছে তার দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও, তাদের সমষ্টি আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। আমরা যা হই সে ত জীবননদীর তরঙ্গ-সংগ্রহ, কালে প্রধাবিত অভিজ্ঞতার স্রোত, প্রকৃতিপ্রবাহের যে ঊর্মিশীর্ষে আরোহণ করে' আমাদের মনোবৃত্তি চলে। আমরা যা সে হল সেই জীবনের যে শাশ্বত স্বরূপ, সেইসব অভিজ্ঞতা বহন করে যে অব্যয় চেতনা, প্রকৃতির ও মনোবৃত্তির যা অমর উপাদান।

কারণ, আমরা যা হই বা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি সে-সবের পশ্চাতে সবার শাস্তা আছেন একজন যিনি সবের উদ্ভব করেন, সব ব্যবহার করেন, ভোগ করেন অথচ তাঁর সৃষ্টির নিমিত্ত কোন পরিবর্তনই তাঁর হয় না, তাঁর যন্ত্রের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না, তাঁর নিরূপণের দ্বারা তিনি বিশেষিত হন না, তাঁর উপর তাঁর ভোগের কোন ক্রিয়া হয় না। আমাদের মানস সত্তার আবরণের পশ্চাতে না গেলে সে-সত্তা যে কি তা আমরা জানতে পারি না; কারণ মানস সত্তা জানতে পারে শুধু যা প্রভাবিত হয় বা যা নিরূপিত হয়, যার উপর কোন ক্রিয়া হয় বা যার পরিবর্তন হয়। মন সেই সদ্‌বস্তুর এইমাত্র বোধ গ্রহণ করতে পারে যেন আছে একটা কিছু আর আমরা যা অনির্বচনীয়ভাবে সে-ও তাই, সংজ্ঞা দেবার মতন করে মন যা জানতে পারে সে-সবের মত কিছু তা নয়। কারণ, আমাদের মনোবৃত্তি যে-মুহূর্তে এই 'কিছু'-কে নির্দিষ্ট করে ধরতে যায় তখনই প্রবাহ ও গতির মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে এবং মজ্জমানের তৃণাশ্রয়ের মত, বিশৃঙ্খলার কল্লোলে নিরাপদ হবার আশায় তার কোন বিশেষ অংশ বা বৃত্তি অথবা কোন কল্পনা বা প্রতিভাসকে আঁকড়ে ধরে কিংবা অনন্তের মধ্য থেকে একটা সান্তরূপ কেটে বার করতে চেষ্টা করে' বলে 'এই আমি', 'এই আমি'। বেদের ভাষায়, মন যখন সে তৎস্বরূপের

কাছে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে যায় তখনই তিনি অন্তর্হিত হন।

কিন্তু আমাদের মনের পশ্চাতে রয়েছে অন্যতর এই ব্রহ্মচেতনা, যা আমাদের মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ। তাতে উপনীত হলে আমরা আমাদের আত্মাতে উপনীত হই, প্রতিমূর্তি-স্বরূপ মন থেকে সরে গিয়ে প্রকৃত সত্যবস্তু ব্রহ্মে যেতে পারি।

কিন্তু সেই সত্যবস্তুকে এই প্রতিভাসের সত্তা থেকে কি দিয়ে বিশেষিত করা যায়? অথবা––যেহেতু সংজ্ঞা হিসাবে আগেই যা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়, যেহেতু আমরা শুধু এইটুকু নির্দেশই দিতে পারি যে সে তৎস্বরূপ ইহলোক যা তা নন কিন্তু এখানে যা-কিছু আছে সে-সবের মনের দ্বারা অনির্বচনীয় পরম স্বরূপ, সেইজন্য––প্রশ্ন তুলতে হবে, কি সম্বন্ধ এই প্রতিভাসের সঙ্গে সেই সদ্‌বস্তুর? কারণ, এই সম্বন্ধের প্রশ্ন থেকেই এ উপনিষদের বিচারের সূত্রপাত হয়েছে; আর তার প্রথম প্রশ্নই ধরে নিচ্ছে যে, একটা কোন সম্বন্ধ আছে আর সেই সত্যবস্তু থেকেই এই বিশ্ব প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে, সেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

অবশ্য, সহজেই বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম আমাদের মন ইন্দ্রিয় বাক্ বা প্রাণশক্তির গোচর কোন বস্তু নন, অথবা দৃষ্ট শ্রুত ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত বা চিন্তা দিয়ে গড়া কোন বিষয় নন, অথবা জীবনের পরিণামী প্রগতিতে আমরা যা হতে পারি আমাদের দেহের বা মনের এমন কোন অবস্থা নন। কিন্তু এই উপনিষদের বিচারধারার চেষ্টা হল ব্রহ্মের এই সহজবোধ্য মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচরত্ব অস্বীকারের চেয়ে গভীরতর প্রতি-ধ্বনি আমাদের অন্তরের গহন গুহা থেকে জাগিয়ে তোলা। তার উক্তি হল যে, ব্রহ্ম মনের বিষয় বা প্রাণের নির্মাণ ত ননই, এমন কি তাঁর শাসনপ্রয়োগ বা তাঁর ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁকে কোন নির্ভরই করতে হয় না। যিনি মন দিয়ে চিন্তা করেন না, প্রাণ দিয়ে বাঁচেন না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধগ্রহণ করেন না, বাক্যে যাঁর প্রকাশ হয় না বরং যিনি এই সবকেই তাঁর শ্রেষ্ঠতর সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ চেতনার বিষয় করে নেন, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম মনকে মনন করেন মনের যা অতীত তা দিয়ে, দৃষ্টিকে দেখেন, শ্রুতিকে শোনেন সেই পরম সর্বাতিশয়ী দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা যা যন্ত্রসাপেক্ষ

বা প্রাতিভাসিক নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও নিত্য-সিদ্ধ; আমাদের অর্থব্যঞ্জক বাক্যকে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর সৃষ্টিপর পরাবাক্ থেকে; এই যে প্রাণকে আমরা আঁকড়ে ধরে' থাকি তাকে তিনি সবেগে প্রেরণ করেন তাঁর সেই শক্তির শাশ্বত স্পন্দন থেকে যে-শক্তি খণ্ডরূপে বিভক্ত নয় ও নিজের অক্ষয্য আনন্ত্যের জন্য যার স্বাতন্ত্র্য নিত্য অব্যাহত। এ উপনিষদ তার প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করল এই ভাবে—ব্রহ্মকে প্রথম বর্ণনা করা হল মনের মন, শ্রোত্রের শোত্র, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ বলে'। তারপর এর প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে পর পর আরও বিস্তৃত করে বলা হল যাতে তার অর্থ বোধ, কথা দিয়ে যতটা পারা যায়, ততটা বিশদ ও ব্যাপক হয়। 'মনের যা মন' এই বাক্যের অনুগামী বিস্তৃততর বাক্য হল "মনের দ্বারা যা মনন করে না যার দ্বারা মন মত হয়"; ইত্যাদি করে' প্রথম বর্ণনার প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে শেষসূত্র প্রাণের যে সংজ্ঞা 'প্রাণের যা প্রাণ' তার অনুগামী "প্রাণের দ্বারা যে বাঁচে না যার দ্বারা প্রাণশক্তি তার প্রগতির পথে প্রেরিত হয়" এই বিশদ বাক্য পর্যন্ত সবের ব্যাখ্যা করা হল।

আবার, এই বিশদ ব্যাখ্যার প্রত্যেকটি পংক্তির উপর জোর দেবার জন্য, "সেই ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর, মানুষ এখানে যা অন্বেষণ করে তা ব্রহ্ম নয়", এই আদেশের পুনরুক্তি করা হল। যে সত্যবস্তু আমাদের জানতে হবে, অন্বেষণ করতে হবে তা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক্য বা তাদের বিষয় বা অভিব্যক্তি, এ সবের কিছুই নয়। সত্যজ্ঞান সেই তৎস্বরূপকে জানা যিনি আমাদের জন্য এই সব যন্ত্র গড়েছেন কিন্তু যিনি নিজে তাদের ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। প্রকৃত অধিকার, প্রকৃত ভোগ হয় তাঁরই যিনি আমাদের কামনার এই সব বিষয় সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু নিজে কোন বিষয়ের অনুসরণ বা বাসনা করেন না, যিনি সব বস্তু নিয়েই তাঁর অমর সত্তার আনন্দে নিত্য পরিতৃপ্ত।

৫

আমাদের বিচারে আমরা প্রথম স্থান দিই হয় মন ও ইন্দ্রিয়কে, না হয় প্রাণকে আর গৌণবৃত্তি বলে' বাক্যের স্থান দিই সবার পশ্চাতে; কিন্তু এ উপনিষদে ন্যায়সম্মত এই সাধারণ পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম করে' ব্রহ্মের নেতিমূলক বর্ণনা কেন আরম্ভ করা হয়েছে "আমাদের বাক্যের যে বাক্য" এই উক্তি দিয়ে। আর, দেখতে পাই যে, তার উদ্দেশ্য হল আমাদের বাক্যের চেয়ে ঊর্ধ্বতর পরাবাক্, অবিকল্প যার পরম অভিব্যঞ্জনা, মানুষের ভাষা যার ছায়ামাত্র,—যেন কৃত্রিম অনুকরণের মত। কি ভাব রয়েছে উপনিষদের এই উক্তির পশ্চাতে, বাক্‌শক্তিকে এই প্রাধান্য দেবার মূলে?

উপনিষদ অধ্যয়নের সময় আমাদের বর্তমান ধারণা সব অবিরাম বর্জন করে, প্রাচীন বেদান্তে ব্যবহৃত শব্দের পশ্চাতে যে আনুষঙ্গিক চিন্তার ধারা রয়েছে যথাসম্ভব অন্তরঙ্গভাবে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক আম্নায়ে পরাবাক্‌ই সৃষ্টিকর্ত্রী, পরাবাক্ দিয়েই ব্রহ্ম নিখিল সাকার বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আর, আমাদের মনের উপলব্ধির ওপারে, অনন্তে নিত্য বর্তমান সত্যের নির্বিকল্প পরম অভিব্যঞ্জনাকে ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা এবং সত্যদৃষ্টি বা সত্য-শ্রুতিদ্বারা পুনরর্জন করতে চেষ্টা করা,—এই মাত্র হল মানব বাক্যের চরম পরিণতির অবস্থা। সে পরাবাক্‌কে গড়বার শক্তিও, এই একই কারণে, আমাদের মনের নাই।

সৃষ্টিমাত্রই হল পরাবাকের দ্বারা অভিব্যক্তি; কিন্তু অভিব্যক্ত রূপ ত যে-বস্তু আছে তার প্রতীক বা প্রতিকৃতি মাত্র। মানুষের কথার বেলাতেও আমরা দেখতে পাই যে তাতে বিষয়ের মনোময় প্রতিরূপ আমাদের মনের সামনে ধারণ করে; কিন্তু যে-বিষয় সে প্রকাশ করতে চায় তাও আবার আর এক সদ্বস্তুর প্রতিরূপ বা অনুকৃতি। সেই সদ্বস্তুই ব্রহ্ম। পরাবাক্ দিয়ে ব্রহ্ম তাঁর নিজেরই কোন প্রতিরূপ বা প্রতিকৃতি ব্যক্ত করেন ইন্দ্রিয় ও সংবিতের গ্রাহ্য যেসব বিষয়বস্তু দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত তার মধ্যে, ঠিক যেমন সেই সব বিষয়েরই মানস অনুকৃতি ব্যক্ত হয় মানুষের বাক্যে। সে পরাবাক্‌কে সৃষ্টিপর বলা হয় মানুষের বাক্যের চেয়ে অনেক মৌলিক-তর ও গভীরতর অর্থে, আর তার যে-শক্তি আছে মানুষের বাক্যের মহত্তম সৃষ্টিপরতা তারই সুদূরের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি।

এখানে উচ্চারিত অর্থে 'অভ্যুদিত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; তার আক্ষরিক অর্থ হল মনের সম্মুখীন হবার জন্য উত্থিত। এ উপনিষদ বলছে যে, এই ভাবে মনের সামনে বাক্যের দ্বারা যাকে তুলে ধরা যায় না সে-ই ব্রহ্ম।

দেখতে পাই যে, মানুষের কথাতে ফুটে ওঠে প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি: একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মের প্রতিরূপ হল সব বিষয়, আবার তারই মানস প্রতিরূপ হল বাক্যের প্রতিপাদ্য। নূতন সৃষ্টির একটু ক্ষমতা তার আছে বটে কিন্তু তারও দৌড় হল নূতন মানস প্রতিরূপ গড়া অবধি: পূর্বগৃহীত মানস প্রতিরূপসমূহ নিয়ে তাদের অদল-বদল করে' কালোপযোগী নূতন রূপ দেওয়া, এই পর্যন্ত। মানব বাক্যের এই সংকীর্ণ শক্তি থেকে দিব্য পরাবাকের যে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির কথা প্রাচীন মনীষীরা বলেছেন তার কোন ধারণাই করা যায় না।

কিন্তু, বহিস্তলের একটু নীচে, কিছু গভীরে নামলে মানব বাক্যের এমন একটা শক্তির সন্ধান পাই যাথেকে মৌলিক সৃজনী পরাবাকের কতকটা আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। জানি আমরা যে, রূপ সৃষ্টি--বা বিনাশ--করবার ক্ষমতা শব্দস্পন্দের আছে, আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের এ একটা অতি সাধারণ কথা। ধরে নেওয়া যাক যে, সকল রূপসৃষ্টির মূলেই রয়েছে শব্দস্পন্দ।

তারপর, মানুষের কথার সঙ্গে সাধারণ শব্দের সম্বন্ধ বিচার করা যাক। সহজেই দেখা যায় যে, মানুষের কথার ধ্বনি শব্দ উৎপাদনের সাধারণ তত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োগ: তা হল মুখ ও কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যাবার সময় প্রশ্বাস বায়ুর চাপে তৈরি স্পন্দন। নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, তার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোন ঘটনা বা বস্তু দেখে ভাবের যে আবেগ উঠেছিল তা প্রকাশ করতে গিয়ে; পরে, আমাদের মন তাকে ধরে কাজে লাগিয়েছে, প্রথমতঃ সেই বিষয়ের ধারণা করতে, পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে নানা ভাব প্রকাশ করতে। সুতরাং মনে হতেই পারে যে, প্রতীকরূপেই বাক্যের মূল্য, সৃষ্টিপর বলে নয়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাক্যের সৃষ্টিশক্তি আছে। তাতে ভাবাবেগের, মানস-প্রতিমার এবং কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন বৈদিক আম্নায়ের তত্ত্বে ও প্রয়োগে মন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা বাক্যের সৃষ্টিশক্তির বিশেষ প্রসার সাধন করা হয়েছিল। মন্ত্রবাদের তত্ত্ব হল যে, মন্ত্র শক্তিমান বাক্য, তার উদ্ভব হয় আমাদের

অন্তরের গোপন গভীর থেকে, সেখানে মনের চেয়ে বৃহত্তর চেতনা (যেন তা' দিয়ে) তাকে সঞ্জীবিত করেছে, তাকে হৃদয় রচনা করেছে বুদ্ধি গড়েনি, অন্তরে তাকে সঞ্চিত রাখা হয়েছে আবার জাগ্রত মানস-সংবিৎ তার উপর একাগ্র হয়ে' পরিশেষে, বিশেষ করে সৃষ্টির কাজে, তাকে বাহিরে প্রেরণ করেছে, কখনও বা সশব্দে কখনও বা নিঃশব্দে;—আর এই নিঃশব্দ বাক্যকেই শব্দিত বাক্যের চেয়ে সমর্থতর বলে হয়ত ধরে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্র আমাদের চিত্তবৃত্তিতে নূতন ভাব সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের চৈত্যসত্তাকে পরিবর্তিত করতে পারে, যে-সব জ্ঞান বিদ্যা বা ক্ষমতা আমাদের পূর্বে ছিল না সেসব প্রকটিত করতে পারে এবং মন্ত্রের প্রযোক্তা ছাড়া অন্য লোকের ওপরেও এইসব কাজই করতে পারে; শুধু তাই নয়, মন্ত্র মনোময় ও প্রাণময় লোকের পরিমণ্ডলে নানা স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারে, আর তার ফলে অভীষ্ট পরিণাম ও ক্রিয়া সাধিত হতে পারে, এমন কি জড়জগতে স্থূল আকারও নির্মিত হতে পারে।

বাস্তবিকই ত আমরা সাধারণ ভাবেই প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাক্যের দ্বারা আমাদের অন্তরে নানা চিন্তার স্পন্দন, চিন্তায় গড়া নানা রূপ জাগিয়ে তুলি, তার ফলে আমাদের দেহ ও প্রাণের বস্তুতে অনুরূপ স্পন্দন উঠে আর আমাদের নিজেদের উপর এবং অন্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় এবং পরিণামে পরোক্ষভাবে জড়জগতে কর্মপ্রবৃত্তি ও রূপসৃষ্টি হয়। কথিত ও অকথিত বাণীর দ্বারা মানুষ নিরন্তর মানুষকে প্রভাবিত করে' চলেছে; আবার প্রকৃতির অপর সব ক্ষেত্রেও সে একই উপায়ে কাজ করে' চলেছে, যদিও কথঞ্চিৎ কম সাক্ষাৎভাবে, কম প্রতাপে। কিন্তু মূর্খের মত আমরা বিশ্বের বাহ্যরূপ ও প্রতিভাসে লিপ্ত থাকি এবং তার জড়োত্তর কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করবার কষ্ট স্বীকার করি না, তাই আমরা এইসব প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যাই।

বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগে বাক্যের এই গুহ্য শক্তিকে সজ্ঞানে কাজে লাগান হয়। আর তার মূলে যে-তথ্য রয়েছে তার সঙ্গে যদি আমরা আমাদের পূর্ব-প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণ করি যে, প্রত্যেক রূপসৃষ্টির পশ্চাতেই রয়েছে শব্দের সৃষ্টিপর স্পন্দবৃত্তি, তাহলে আমরা সৃষ্টিপর পরাবাকের মর্ম-গ্রহণের উপক্রম করতে পারব। ধরে নেওয়া যাক যে, শব্দস্পন্দ সজ্ঞানে ব্যবহার করে, তদনুযায়ী আকারের উদ্ভব বা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু প্রাচীন দৃষ্টিতে জড় ত অস্তিত্বের নিম্নতম স্তর। তাহলে বুঝতে হবে যে,

জড়ক্ষেত্রে শব্দস্পন্দ উঠবার পূর্বে প্রাণে অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে, তা না হলে জড়ক্ষেত্রে স্পন্দ-বিলাস অসম্ভব হত; আবার তারও পূর্বে তার কারণ-ভূত অনুরূপ স্পন্দন উঠছে মনোভূমিতে; আবার, মনের স্পন্দন থেকে সূচিত হচ্ছে যে, তারও কারণভূত অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে সব বস্তুর মূলকারণ অতিমানসে। কিন্তু মানস স্পন্দনের লক্ষণ হল চিন্তা এবং বোধ, আর অতিমানস স্পন্দনের লক্ষণ পরাদৃষ্টি ও পরাপ্রজ্ঞা। তাহলে, সে ঊর্ধ্বলোকে শব্দের প্রত্যেক স্পন্দন বস্তুর কোন না কোন সত্যের সম্যক অনুভব বা পরম বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তাকে প্রকাশ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী সৃষ্টিও করছে; তার গর্ভে নিহিত কোন পরম শক্তি তার দৃষ্ট সেই সত্যকে মূর্ত করছে এবং ক্রমশঃ নিম্নতর লোকে অবতরণ করে' পরিশেষে স্থূল আকাশের শব্দ দিয়ে তাকে জড়ভূতে গড়া স্থূল আকারে রূপায়িত করছে। সুতরাং দেখা গেল যে, পরাবাক্ পরম সত্যের অবিকল্প প্রকাশরূপে সৃষ্টির আদিকারণ, আর আকাশের শব্দ জড় ভূতের সৃষ্টির কারণ, এই দুইটি প্রকল্প পরস্পর অনুগামী, একই ধারণার যুক্তিসঙ্গত দুই কোটি। উভয়েই সেই একই প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

তাহলে, এই হল পরাবাক্, আমাদের বাক্যের বাক্য। শুদ্ধ সৎ-এর স্পন্দন সে, সর্বক্ষম অনন্ত চেতনার প্রতীতি ও সৃজনের শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত, মনের পশ্চাতের দিব্যমনের দ্বারা বস্তুর পরম সত্যের দ্যোতক নিত্যসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নামের আকারে রূপায়িত; যে-কোন লোকে বা যে-কোন উপাদান দিয়ে হক না কেন, সব মূর্তি গঠিত হয়েছে, সব স্থূল অভিব্যক্তি সাধিত হয়েছে তারই সৃষ্টিশক্তির সহায়ে! বাক্প্রয়োগে প্রবৃত্ত অতিমানসই শব্দব্রহ্ম, Creative Logos।

পরাবাকের সব বীজধ্বনি আছে; বেদের নিত্য অক্ষর, ওঁ, এবং তান্ত্রিকদের সব বীজমন্ত্রের সূচনা তা থেকেই এসেছে; সব বস্তুর সারতত্ত্ব তাদের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। পরা-বাকের বিশেষ সব রূপ রয়েছে যা মানুষের মহত্তম বৃত্তিগুলির কাছে ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ থেকে যে-সব বাণী আসে তাদের জুগিয়ে দেয়, এবং সেই সবের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুর রূপ অমোঘভাবে নির্দিষ্ট হয়। তার নিজস্ব সব ছন্দ আছে কারণ তার স্পন্দন ত শৃঙ্খলারহিত নয়, বৃহৎ বিশ্বনৃত্যের তালে তার বিকিরণ হয়; আর সে যে-জগৎ গড়ে তার সব ধর্ম ও প্রকৃতি তার

সংস্থান, তার সৌষম্য, তার অভিব্যক্তির ধারা সেই সব ছন্দের অনুযায়ী হয়। এমন কি, প্রাণও ভগবানের একটা ছন্দলীলা।

কিন্তু এ জগতে পরাবাকের দ্বারা যা 'অভ্যুদিত' বা অভিব্যক্ত হয় তা কি? ব্রহ্ম নন কিন্তু ব্রহ্মের সব প্রতিকৃতি বা প্রতিভাস। পরাবাকের দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা হয় না, তা সম্ভব নয়; তিনি নিজেকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করেন না, তাঁর আত্মসংবিতের কাছে তিনি স্বতঃই বিদিত, এমনকি তাঁর যে-সব সত্য সাকার বিশ্বের নিখিল বস্তুর প্রচ্ছন্ন আধার সে-সবও তাঁর নিত্যদৃষ্টির কাছে সর্বদা স্বতঃই ব্যক্ত থাকে। বাক্য সৃষ্টি করে এবং প্রকাশ করে বটে কিন্তু তা-ও নিজেই সৃষ্ট, অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হন না, বাক্যই ব্রহ্মের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমাদের অন্বেষণের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে বিশ্ব-ব্যাপার বা প্রতিভাসসমূহকে নয়, সেসবকে যে-পরাবাক্ আমাদের সংবিতের পর্যবেক্ষণের উপযোগী করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির অন্বেষণের বিষয় করে' সাকার বিগ্রহে বিসৃষ্ট করেছিল, সেই পরাবাক্‌কে যে তৎস্বরূপ নিজের অভ্যন্তর থেকে তুলে এনেছেন, 'অভ্যুদিত' করেছেন, তাঁকে--অর্থাৎ বিশ্বকারণ পরমসত্তাকে।

মানুষের ভাষার অভিব্যক্তি হয় গৌণ, যৌগিক; দিব্য পরাবাকের--শাশ্বত কবি ও মনীষী, বিশ্ব-সুষমার সুরশিল্পী, জগৎ-স্রষ্টার সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম বাক্যের সব বীজধ্বনির, মনোজ্ঞ ছন্দের, ও মর্মোদ্ভাসক শব্দ-যোজনার--ক্ষীণতম আভাসমাত্র আসে মানুষের মহত্তম বাক্যে। মানব-প্রতিভা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাতে যে বাণী পেতে পারে--পরম সত্যকে অবিতর্কিত-ভাবে যা প্রকাশ করে অথবা পরম শক্তিমান যে অক্ষর বা মন্ত্র--তাও তার সুদূরপ্রসৃত প্রতিচ্ছবি।

৬

এ উপনিষদ যেমন আমাদের বাক্যের পশ্চাতে ব্রহ্মচেতনার অভি-ব্যঞ্জনার স্ব-রূপ পরাবাকের উল্লেখ করেছে তেমনি আবার এই মনের পশ্চাতে তার জ্ঞানের স্বরূপ দিব্য মনের উল্লেখ করেছে। অতএব আমাদের বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরাবাকের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু যেমন আমরা বিচার করেছি, তেমনি এখন আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে যে, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাত্মক বৃত্তি বা তত্ত্ব স্বীকার করবার কি যুক্তি-সঙ্গত হেতু থাকতে পারে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা দিব্য পরাবাকের অস্তিত্ব যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে সে পরাবাক্ এবং তার সমগ্র অভিব্যঞ্জনা জানতে সমর্থ দিব্যমনের অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু, দিব্যমন প্রতিষ্ঠার পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট নয়; কারণ পরাবাক্ আমরা গ্রহণ করেছি প্রকল্পনারূপে, বিচারসহ সম্ভাবনা হিসাবে। কিন্তু মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবৃত্তি এসে যায় মনেরই স্বভাব বিচার করে' তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে, আর সে সিদ্ধান্ত ন্যায়মতে অপরিহার্য।

প্রাচীন আম্নায়ে দেহান্তের পরেও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিত বলে তার কাছে অতি গভীর ও মূলগত অর্থে মনই ছিল মানব। এই পৃথিবীতে প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র বিচারশীল, একমাত্র মননক্ষম জাতি; শুধু তাই নয়, স্বরূপতঃ সে পার্থিব দেহধারী জীব, 'মনু'। সর্বজীবে এক অবিভক্ত আত্মন্ বা পুরুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিয়েও দেহ মানবের ব্যবহারিক সত্তাও নয়, দৈহিক জীবনও সে নয়; এই দুয়েরই বিনাশ হতে পারে কিন্তু মানব বর্তমান থাকে। কিন্তু মনোময় সত্তারও যদি বিনাশ হয় তবে মানব-রূপে মানবের অস্তিত্ব শেষ হয়, কারণ তার আধারের কেন্দ্র ও সন্ধি হল মন।

অপরপক্ষে, বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সমর্থিত দৈহিক অভিব্যক্তিবাদের মতে, মানুষ বস্তুতঃ জড় বই নয়, পরিবেশের অভিঘাতে অনুভব-সামর্থ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়ে তাতে মনের উদ্ভব হয়েছে, এবং জড়পদার্থই তার অস্তিত্বের ভিত্তি বলে' দেহ বিনাশের পরে দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু এ সংজ্ঞা, বড়জোর, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর কোন সত্যের বাহ্য নিকৃষ্টতর অনুবৃত্তি। জড়-পদার্থ মনের বিকাশ সাধন করতে পারত না যদি যে-শক্তি স্থূল আকার

গঠন করে তার অভ্যান্তরে বা পশ্চাতে আত্মবিকাশপ্রয়াসী মনের তত্ত্ব আগে থেকেই বর্তমান না থাকত। মন অভিব্যক্ত হবার পূর্বেও আমাদের কাছে যা নিশ্চেতন বলে' মনে হয় তার মধ্যে দেহ-প্রাণকে জ্ঞানদীপ্ত করবার এবং সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত করবার সংকল্প নিশ্চয়ই আগে থেকেই বর্ত্তমান ছিল। কারণ, মনের এরকম কোন অবশ্য-প্রয়োজন যদি জড়ে না থাকত, মনোবৃত্তির মূল উপাদান এবং আধারকে মনোময় করবার সংকল্প যদি আগে থেকেই তার মধ্যে বর্ত্তমান না থাকত তবে মনের ক্রমবিকাশ কিছুতেই সম্ভবপর হত না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাসায়নিক যে-সব উপাদানে জড়রূপ গঠিত সেসবের মধ্যে, কিংবা বিদ্যুতে বা অন্য কোন শুদ্ধমাত্র জড় কারণের মধ্যে, তার অধিকারে বা তাকে অধিকার করে' যে অচেতন ইচ্ছাশক্তি বা সংবেদনই থাকুক না কেন, তার মধ্যে এমন কিছুই আবিষ্কার করা যায় না যাথেকে সজ্ঞান সংবেদনের আবির্ভাব বোঝা যেতে পারে বা যাকে চিন্তাশক্তি বিকাশের সংকল্প বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারে অথবা যাতে অচেতন জড় পদার্থের উপর এই রকমের ক্রমবিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা আরোপ করতে পারে। সুতরাং, মনের উৎস সন্ধান করতে হবে জড়রূপের মধ্যে নয়, জড়পদার্থে যে-শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে। তাহলে সে-শক্তি অবশ্যই সচেতন, আর না হয় তার সত্তার গর্ভে নিশ্চয়ই মনোময় চেতনার বীজ নিহিত রয়েছে আর, সেই হেতুতেই, সে-চেতনা বিকাশের সম্ভাবনা, এমন কি অবশ্যম্ভাবিতাও রয়েছে। এই অবরুদ্ধচেতনা প্রথমে স্থূল রূপের পরে সেই সব স্থূল রূপের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের সৃজনে অভি-নিবিষ্ট থাকে; তথাপি সুরু থেকে নিশ্চয়ই তার গোপন সংকল্প রয়েছে—তা সে যতদিনই নিরুদ্ধ বা অন্তর্লীন থাকুক না কেন—যে, শেষ পর্যন্ত এই সব সম্বন্ধের অনুরূপ সজ্ঞান প্রেয়ত্ব বা মনের কাছে অনুরূপ অর্থ বা মূল্য সৃষ্টি করে' সে সবকে জ্ঞানদীপ্ত করবে। তাহলে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই অবচেতনের মধ্যে মনের অবশ্যম্ভাবিতা গোপন রয়েছে, জড়ের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্রপাত একবার হলেই সেই বস্তুকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে। এই হল ধাতব পদার্থে, উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে যে জৈব প্রতিক্রিয়া রয়েছে তার গুহ্যতত্ত্ব এবং হেতু।

অপরপক্ষে, যদি বলা যায় যে, মন এমনভাবে জড় ধাতুর মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে গোপনে আগে থেকেই বর্তমান ছিল না তাহলে ধরে' নিতে হয় যে,

মন জড়ের বাহিরে কোথায়ও অবস্থান করে এবং জড়কে আপনার অন্তর্ভুক্ত করে' নেয় বা তার মধ্যে প্রবেশ করে; মেনে নিতে হয় যে, অস্তিত্বের একটা মনোময় ভূমি আছে যা জড়ক্ষেত্রের উপর চাপ দিচ্ছে এবং তাকে অধিকার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। তা যদি হয় তবে মনোময় সত্তা আদিতে জড়জগতের বাহিরে গঠিত হয়েছে বটে কিন্তু জড় জগতে মনকে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ধারণ ও প্রকাশ করবার উপযোগী করে' সব দেহ প্রস্তুত করছে। কল্পনা করে' নিতে পারি যে, সে তার দেহ গঠন করে' তার মধ্যে প্রবেশ করে' তাকে অধিকার করে নিচ্ছে, যেন ভেঙ্গে ঢুকছে; ঐতরেয় উপনিষদে *পুরুষের কথা যেমন বলা হয়েছে---দেহসৃষ্টি করে', তাকে 'বিদৃত' করে' জড়ে সবলে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে' তিনি তাতে প্রবেশ করেছেন। এই মত অনুসারে মানুষ হল সজীব দেহে অবতীর্ণ মনোময় পুরুষ আর দেহের বিলয় হলে সজ্ঞানে তার সমস্ত মনোবৃত্তি সঙ্গে নিয়ে সে তার দেহ ত্যাগ করে।

এই দুইটি মতবাদ পরস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং বলা যেতে পারে যে, তারা পরস্পর-অনুপূরক, আর দুটিকেই একত্র নিয়ে এক সমগ্র সত্য পাওয়া যায়। কারণ, জড়পদার্থে মনের নিবর্তন হলে বা স্থূল বিশ্বে জড়-শক্তিতে এবং তার সমস্ত গতি-বৃত্তিতে মন সুপ্তভাবে অবস্থান করলে যে জড়-তত্ত্বের রাজত্বের ঊর্ধ্বে বা ওপারে মনোময় জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না এমন কথা নাই। বস্তুতঃ, জড়াতীত লোকের বা অস্তিত্বের মনোময় ভূমির সাহায্যের এবং তার সব শক্তির চাপের উপর এইপ্রকার প্রচ্ছন্ন মনের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি নির্ভর ত করতেই পারে, অন্ততঃ তা' থেকে নিশ্চয়ই তার অনেক সুবিধা ত হতেই পারে।

বিশ্বসম্বন্ধে দুরকম ধারণা সর্বদাই সম্ভব। তার একমতে সববস্তুর অভিব্যক্তি অনুশীলন করে', বর্তমান জড়বিজ্ঞানের মত, জড়পদার্থকেই বিশ্বের আদি বলে' গ্রহণ করা হয় অথবা, সাংখ্যদর্শনের মত, জড়পদার্থ না হলেও একটা নির্বিশেষ অচেতন সক্রিয় শক্তি বা প্রকৃতিকে আদি বলে' এবং মন বুদ্ধিকেও তারই ক্রিয়া বলে' ধরে' নেওয়া হয়, চিন্ময় পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকলেও তা হয় সম্পূর্ণ বিবিক্ত, সচেতন হলেও নিষ্ক্রিয়। অন্য মতে, চিন্ময় পরমাত্মা বা পরমপুরুষই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত দুই-ই, প্রকৃতি তাঁর শক্তি মাত্র অথবা আকারের উপাদানরূপী নিজেরই

* ঐতরেয় উপনিষদ, ১।১২

উপর ক্রিয়াশীল তাঁরই চিন্ময় সত্তার শক্তি। * সব উপনিষদেরই এই মত। অবশ্য, অন্য সমস্ত স্তরের সব প্রমাণই স্বপ্ন বা মতিভ্রম বলে' বর্জন করে' আমরা যদি শুদ্ধমাত্র স্থূল বিশ্বকেই পর্যবেক্ষণ করি আর, সেই সঙ্গে, আমাদের মনের যে-সব ক্রিয়া জড়ের সীমা অতিক্রম করে সে-সব ছেড়ে দিয়ে জড়পদার্থের সঙ্গে তার সাধারণ সমত্বই শুধু বিচার করি তাহলে জড়কেই সবের উদ্ভব বলে', অপরিহার্য আধার ও মূল বলে' গ্রহণ করতে বাধ্য হব। অন্যথা বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনিবার্য।

সে যাই হক, শুদ্ধমাত্র স্থূল বিশ্বের দিক থেকে দেখলেও, মানবের বিশিষ্ট মানবত্ব হল মনে; সে-মন শারীর প্রাণে অধিষ্ঠান করে' তাকে ব্যবহার করে এবং যে-জড়ে সে-মন আবির্ভূত হয়েছে তার চেয়ে সে মহত্তর। মন জড়বিশ্বে পরমক্রতুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; নিখিল বিশ্ব যে-শক্তি সৃষ্টি করেছে তার বাস্তব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগধারা এই পৃথিবীতে বর্তমানে যা দেখি তা থেকে তার অভিপ্রায় যতটা অনুমান করা যায় তাতে মনে হতে পারে যে, সে-শক্তি যে-বস্তু অভিব্যক্ত করতে চেষ্টা করছিল তা সাধিত হয়েছে মানুষের মধ্যে। মনের প্রচ্ছন্ন তত্ত্বকে সে উদ্ঘাটিত করেছে, তা এখন সজ্ঞানে ও সবিচারে প্রাণ ও দেহের উপর কাজ করতে পারছে। তাহলে কর্মপ্রবৃত্তির আদি থেকে যে-প্রয়োজন প্রকৃতি গোপনে তার হৃদয়ে বহন করে' এসেছে তা সিদ্ধ হয় মানবে, এই পৃথিবীতে অভিব্যঞ্জনক্ষম সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যনাম বা Noumen হয় মানুষ, সে-ই হয় পৃথিবীতে বাস্তবে অভিব্যক্ত দেবতা।

কিন্তু, এসব সিদ্ধান্ত সত্য হয় শুধু যদি আমরা ধরে' নি যে, মনই হল পৃথিবীতে প্রকৃতির ক্রিয়ার চরম সূত্র। প্রকৃতপক্ষে, চেতনার প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য সব ব্যাপার, মনোবৃত্তির সব তথ্য, মানুষের নিজের প্রকৃতির সব নিগূঢ় প্রবৃত্তি, তার অভীপ্সা এবং তার সব প্রয়োজন যদি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে দেখি যে, মানুষে অভিব্যক্তির শেষ নয়। এখন এখানে বাস্তবে যা সাধিত হয়েছে তার মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধ্য সে নয়। তার নীচে যেমন অনেককিছু আছে তেমনি তার উপরেও—সম্ভাব্যমাত্র হলেও—আছে আরও কিছু। যেমন স্থূলপ্রকৃতি তার ওপারের যে-রহস্য নিজের অন্তরে নিগূঢ় রেখেছিল পরে তাকে সৃষ্টিতে প্রকটিত

* যেমন, ঐতরেয় উপনিষদে দেখতে পাই যে, পরমাত্মা পুরুষের অবয়বকে প্রকৃতির সব ক্রিয়ার উদ্ভব রূপে ব্যবহার করেছেন। ১।১।৪

করেছে মানুষের মধ্যে, তেমনি মানুষের অন্তরে নিগূঢ় রয়েছে তার ওপারের আর একটি রহস্য এবং মানুষকেই ক্রমে সে-রহস্যকে বাস্তব আলোকে প্রকটিত করতেই হবে। এই তার নিয়তি।

তা হতেই হবে, কারণ বস্তুর মূল তত্ত্ব মন নয়, কাজেই চরম পদও তা হতে পারে না। জড় যেমন তার মধ্যে তার নিজেরই নিগূঢ় প্রয়োজন-রূপে প্রাণকে ধারণ করে' ছিল এবং কালে বাধ্য হয়ে তাকে জন্ম দিল, আর প্রাণ যেমন তার মধ্যে নিজেরই নিগূঢ় প্রয়োজনরূপে মনকে ধারণ করে' ছিল এবং কালে তার কুক্ষিস্থ সে জাতককে জন্ম দিতে বাধ্য হল, তেমনি মনও তার মধ্যে তার নিজের নিগূঢ় প্রয়োজনরূপে তার ওপারের কিছু ধারণ করে' আছে এবং সে-ও এখন চাপ দিচ্ছে সে পরম দেবজন্ম দেবার উদ্দেশ্যে।

যুক্তিসিদ্ধ এমন কি অবশ্যপ্রয়োজন আছে যাতে মনকে প্রকৃতির শেষ জন্ম বলে ধরে নেবার বাধা হয় আর যাতে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই যে, তার ওপারে তারই দ্বারা সূচিত আরও কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাই মনোবৃত্তির প্রকৃতি ও ক্রিয়া বিচার করে'। কারণ, অন্তঃ-করণের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে—চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বোধ। বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রিয়বোধ হল বিভক্তচেতনার বিষয়কে গ্রহণ করে' ভোগ করবার চেষ্টা, চিন্তা হল বিষয়ের সত্য গ্রহণ করে' তাকে অধিকারে আনবার চেষ্টা আর ইচ্ছাশক্তি হল বিষয়ের সম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করে' তাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা। অন্ততঃ এসব বৃত্তির স্বরূপ, সহজাত প্রবৃত্তি ও অবচেতন অভিপ্রায় বিচার করলে এ তিনটিকে এই প্রকারের চেষ্টাই বলতে হয়। কিন্তু বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে চেষ্টার পরিবেশ ও ব্যবস্থা অনুকূল নয়, তার সাফল্যও অসম্পূর্ণ; তার সংজ্ঞাতেই বাধা ব্যবধান অক্ষমতা সূচিত হচ্ছে। প্রাণ যেমন জড়ের সঙ্গে সংশ্লেষণ ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত, মনও তেমনি জড়ে অধিষ্ঠিত প্রাণের সঙ্গে সংশ্লেষণ ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত। জড় বা প্রাণ তাদের নিজস্ব ধর্মের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পায় নাই যার সাহায্যে এই সীমার বন্ধন জয় করতে পারে বা তার পরিধি পর্যাপ্তরূপে প্রসারিত করতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে তারা একটা নূতন তত্ত্ব নিজেদের মধ্যে আহ্বান করে' এনেছে: জড় এনেছে প্রাণকে, প্রাণ মনকে। মনও তার নিজের ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে এমন

কিছুর সন্ধান পাচ্ছে না যার সাহায্যে সে তার ক্রিয়াবৃত্তির উপর আরোপিত সীমা জয় করতে বা যথেষ্ট প্রসারিত করতে পারে; তাই মনকেও বাধ্য হয়ে তার বাইরে থেকে তার চেয়ে স্বতন্ত্রতর সমর্থতর অপর কোন নূতন তত্ত্বকে তার মধ্যে আহ্বান করতে হবে।

অর্থাৎ, চেতনার সমস্ত সম্ভাব্যতা মনে নিঃশেষে মূর্ত হয় নাই, সুতরাং চেতনার শ্রেষ্ঠ বা চরম অভিব্যক্তি তা হতে পারে না। মন সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হয় শুধু একটা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে তাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করতে; সুতরাং স্বভাবতঃই তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এমন কোন তত্ত্ব বা বৃত্তি অবশ্যই আছে যা অনবগুণ্ঠিত সত্যকে সাক্ষাৎ দেখতে পারে, আছে নিত্যসিদ্ধ সত্যের অনুযায়ী নিত্য জ্ঞানবৃত্তি। বেদ বলছে, আছে সে তত্ত্ব--সে হল 'ঋতচিৎ', যা সত্যকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, সত্য স্বতঃই যার নিত্য অধিকারে। মন তার অন্তরের সংকল্পকে সফল করতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে-সম্ভাব্যতা নিয়ে সে কাজ করে বাস্তবে তাকে সম্পাদন করতে পারে বহু আয়াসে, আংশিক ও অনিশ্চিতভাবে; সচেতন ক্রিয়াশক্তির নিশ্চয়ই এমন কোন বৃত্তি আছে যা প্রকৃতির আত্মবিকাশের স্বয়ংক্রিয় অচেতন তত্ত্বের অনুরূপ; আর সে তত্ত্বের সন্ধান করতে হবে মনের চেয়ে বৃহত্তর চেতনারূপে। পরিশেষে, মনের অভীপ্সা রয়েছে যে, সে স্বরূপ হ্লাদগুণ,--সকল দ্রব্যের রস--গ্রহণ করবে, ভোগ করবে, কিন্তু সে পারে শুধু পরোক্ষভাবে তার সান্নিধ্যে আসতে, শ্লথমুষ্টিতে তাকে ধারণ করতে, বাহ্যিক ভাবে খণ্ড খণ্ড করে' তাকে ভোগ করতে ; এমন কোন বৃত্তি নিশ্চয়ই আছে যা সাক্ষাৎভাবে তাতে উপনীত হতে পারে, যথাযথভাবে তাকে ধারণ করতে পারে, নির্বিঘ্নে অন্তরঙ্গভাবে তাকে ভোগ করতে পারে। বেদ বলছে, আছে শাশ্বত সুখময় চেতনা যা সব অভিজ্ঞতার মধুময় নিত্যরস বা সার হ্লাদ গুণের অনুরূপ, যা মানস ইন্দ্রিয়ের অনিশ্চিত অপ্রতুল ও অযথার্থ বোধের দ্বারা সীমিত নয়।

সুতরাং, যদি চেতনার এমন কোন গভীরতর তত্ত্ব থাকে, তাহলে মনকে নয়, সেই তত্ত্বকেই অভিব্যক্ত করবার আদিম ও মৌলিক অভিপ্রায় প্রথম থেকেই প্রকৃতির অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল আর শেষ পর্যন্ত কোথায়ও না কোথায়ও তা প্রকটিত হবেই। কিন্তু তাকে যে এখানেই মনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হতে হবে--যেমন মন হয়েছে প্রাণে, প্রাণ জড়ে--সে অনুমানের

কোন হেতু আছে কি? আমাদের উত্তর--হাঁ, তা হবেই; কারণ, যত অস্পষ্টভাবেই হক না কেন, সে প্রবেগ, সে অভীপ্সা আর মূলতঃ সে প্রয়োজন মনের নিজেরই আছে। উর্ধ্বতম স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত রয়েছে একই নিয়মের রাজত্ব। জড়কে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাণের সারবস্তু তাতে অনুস্যূত রয়েছে--যে-সব স্পন্দন, ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সঙ্কোচন-প্রসারণ, সম্মিলনের এবং আকার-গঠনের ও পুষ্টির প্রবৃত্তিকে আমরা প্রাণেরই প্রকৃত স্বরূপ বলে' মনে করি তার সবই আছে; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে প্রাণতত্ত্ব জড় আধারে আবির্ভূত হতে পারে শুধু যখন জড়ের মধ্যে তার সংগঠনের উপযোগী অবস্থা প্রস্তুত হয়। তেমনি আবার, প্রাণের মধ্যেও মনের সার বস্তু অনুস্যূত রয়েছে, অচেতন-সংবেদন,* ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রচুর রয়েছে; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মনের তত্ত্ব তাতে আবির্ভূত হতে পারে শুধু যখন জীবন্ত জড়ে তার সংগঠনের অনুকূল জৈব অবস্থা প্রস্তুত হয়েছে। মনের মধ্যেও অতিমানসের সারবস্তু অনুস্যূত রয়েছে: মনোবৃত্তির ছদ্মবেশে রয়েছে সব সৌহার্দ্য, ঐক্য, সম্বোধি, সনাতন জ্ঞানের স্ফুরণ, ইচ্ছাশক্তির স্বয়ংসিদ্ধি-সামর্থ্য; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অতিমানসতত্ত্ব তাতে আবির্ভূত হতে পারবে শুধু যখন মানুষে, মনোময় জীবে, তার সংগঠনের অনুকূল মানসিক অবস্থা প্রস্তুত হবে।

মানুষের ক্রমোন্নতিতে এই আবশ্যক অবস্থা প্রস্তুত হয়ে চলেছে, যেমন করে' ক্রমপরিণামের নিম্নতর স্তরে সব অনুরূপ অবস্থা প্রস্তুত হয়েছিল,--একই রকমের পারম্পর্য, গতিরোধ, বৈষম্য সব নিয়ে; কিন্তু তথাপি, তা ক্রমশঃ বেশী জ্ঞানদীপ্ত ও আত্মসচেতন হয়েছে, প্রায় সজ্ঞানে নিশ্চিত ভাবে নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করে নিচ্ছে। তারপর এই অগ্রগতিতে দেখতে পাই যে আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অংশের উপর মনোযোগ কম হয়েছে, ভ্রমের ভীতি ক্ষীণ হয়েছে, অর্জিত ভূমি সংরক্ষণের আসক্তি হ্রাস হয়েছে; তাই আশা হয়, এমন কি নিঃসংশয় প্রত্যয় হয় যে, নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব যখন হবে তখন তার জন্য অবশিষ্ট মানবজাতিকে মানুষের তুলনায় পশুর মত হীন অবস্থায় ফেলে রেখে নূতন, সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর দেহী সৃষ্টি করতে হবে না বরং সমগ্র মানবজাতিকেই সেই উচ্চতর স্তরে তুলে নেওয়া যাবে। কারণ, প্রকৃতির সন্তানদের মধ্যে মানুষই প্রথম দেখিয়েছে

* জড়বাদী হেকেলের ভাষা ব্যবহার করেছি, শব্দ যোজনাতে বিরোধাভাস সত্ত্বেও।

যে, নিজের চেষ্টাতে এবং নিজেকে অতিক্রম করবার অভীপ্সার বলে নিজেকে পরিবর্তন করবার সামর্থ্য তার আছে।

এই সব বিবেচনা থেকে বিচারবুদ্ধি মনের অতীত দিব্যমনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে সে সিদ্ধান্ত আসে শুধু জড় থেকে ক্রমপরিণামের চরমপদ রূপে। কিন্তু এ উপনিষদে তাকে আসন দেওয়া হয়েছে মনের পূর্বজাত স্রষ্টা ও শাস্তারূপে—সে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রথম থেকেই সচেতন, পদার্থের মূল বস্তুর মধ্যেই শুধু তা অচেতন অবস্থাতে বিধৃত নয়। এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ছেড়ে দিলেও, অতিমানস-তত্ত্বের স্বরূপ থেকেই এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। কারণ, ঊর্ধ্বতম অবস্থাতে তার স্বরূপ হল শাশ্বত জ্ঞান, ইচ্ছা, আনন্দ ও চিন্ময় সত্তা; সুতরাং, তা বস্তুতঃ অচিৎ কিন্তু কালে বিশ্বপরিণামের ফলে সচেতন হয়, এ সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হল যে, যদিও আমরা তার সম্বন্ধে অজ্ঞান তবু সে তত্ত্ব নিত্যচিন্ময় এবং এই বিশ্বের তা আদি কারণ। আমরা যে তার বিষয়ে অজ্ঞ তাতে প্রমাণ হয় না যে, তা আমাদের বিষয়ে অজ্ঞ; এবং প্রকৃত পক্ষে, আমাদের এই জ্ঞানের অসামর্থ্যই এখন একমাত্র যুক্তি অবশিষ্ট রয়েছে যার উপর নির্ভর করে' আমাদের মনের অতীত, তার নিজের সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বযোনি এই শাশ্বত মনকে অস্বীকার করা যায়।

পুরাতন প্রজ্ঞার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করবার অপর সব যুক্তিই বর্তমান জ্ঞানের উপচীয়মান আলোকে অপসারিত হচ্ছে বা হয়েছে।

৭

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আছে এক সর্ববিৎ বিজ্ঞান-তত্ত্ব যা মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বভাব গোচরসীমা ও সামর্থ্যে যা মনকে অতিক্রম করে' যায়। কারণ, এই উপনিষদ মনের অতীত মনের আদেশ করেছে সম্বোধি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বলে; আবার বিশ্বের ক্রমপরিণতির তথ্য থেকেও তার অস্তিত্ব হয় সমানই অবশ্যগ্রাহ্য। তাহলে মনের অতীত এই মন কি? তার ক্রিয়া হয় কিরূপে? কি উপায়ে আমরা তার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে বা তাকে লাভ করতে পারব?

এই পরম বিজ্ঞানাত্মক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই উপনিষদ বলছে, প্রথমতঃ যে, তা মন বা ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাহিরে; দ্বিতীয়তঃ যে, তা নিজে মন দিয়ে চিন্তা করে না; তৃতীয়তঃ যে, তা সেই যার দ্বারা মনকে মনন করা হয় বা মনোময় করা হয়; চতুর্থতঃ যে, তা ব্রহ্মচেতনার প্রকৃত স্বভাব বা স্বরূপের বর্ণনা।

কিন্তু যখন বলি যে, 'মনের এই মন' ব্রহ্মচেতনার স্বভাব বা স্বরূপের বর্ণনা তখন ভুললে চলবে না যে, পরম ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় সুতরাং বর্ণনার অতীত। ব্রহ্ম যে অজ্ঞেয় তার কারণ এ নয় যে, শূন্যত্ব বা নাস্তিত্ব-ছাড়া তার আর কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না অথবা তার অস্তিত্ব সদাত্মক হলেও তার কোন আধেয় বা গুণ নাই; কিন্তু তার কারণ যে, আমাদের জ্ঞান যে-সব বস্তুর ধারণা করতে পারে ব্রহ্ম সে সবের অতীত, এবং আমাদের মনোবৃত্তির ধারণা ও বর্ণনা করবার যে-সব নিজস্ব প্রণালী আছে তার কিছুই ব্রহ্মে প্রয়োগ করা যায় না। আমরা যে-সব বস্তু জানি ব্রহ্মই তার সমষ্টির এবং তার প্রত্যেকটির পরম নির্বিকল্প সত্তা, কিন্তু তার কোনটিই বা সে-সবের সমষ্টি ব্রহ্মকে রিক্ত করতে পারে না বা তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত করতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মের সত্তার ধারা আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি তার থেকে অন্যতর, তাঁর একত্ব কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাঁর বহুবিধ আনন্ত্য সব সংশ্লেষণের অতীত। সুতরাং 'মনের মন' বলে' বর্ণনা করা যায় ব্রহ্মের অনন্য-সাপেক্ষ পরম-স্বরূপকে নয়, আমাদের মনোময় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে' ব্রহ্মের মূল স্বভাবকে। ব্রহ্মচেতনা হল সবিকল্পের উপর নির্বিকল্পের শাশ্বত দৃষ্টির ভঙ্গী।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়েও বলতে পারি যে, তা আমাদের মন বাক্য বা ইন্দ্রিয়ের গোচরসীমার বাহিরে। অথচ মনে হয় যে, জ্ঞান অর্জন ও প্রকাশ করবার জন্য মন বাক্য এবং ইন্দ্রিয়, মাত্র এই উপায় ক'টিই আমাদের আয়ত্তে আছে। তাহলে কি আমরা বলতে বাধ্য নই যে, এই ব্রহ্মচেতনাও আমাদের অজ্ঞেয় এবং আমরা যতদিন এ দেহে আছি ততদিন তাকে জানবার বা পাবার আশা আমাদের নাই? কিন্তু এই উপনিষদ ব্রহ্মকে জানতে এবং জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পেতে আমাদের আদেশ দিচ্ছে,---কারণ, 'বিদ্ধি' ও 'অবেদীৎ' শব্দের উদ্দেশ্য হল যে-জ্ঞান আবিষ্কার করে, অধিকার করে; এবং পরে আবার আদেশ রয়েছে যে, এখানেই, এই দেহেই এবং এই পৃথিবীতেই, সেই ব্রহ্মকে জ্ঞানের দ্বারা পেতে হবে, নতুবা 'মহতী বিনষ্টি'---পরম সর্বনাশ। ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব এবং অজ্ঞেয়ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের বেশী চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে এই উপনিষদের ব্যাখ্যাতে অনেক বিভ্রম এসে গেছে। সুতরাং আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য তার অর্থকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে বরং এই উপনিষদে যথার্থ কি বলছে তা লক্ষ্য করতে হবে, বিশেষ করে' সর্বগ্রাহী সম্বোধির দ্বারা তার সমগ্র তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে হবে।

এ উপনিষদের বর্ণনা আরম্ভ হল এই বলে' যে, এই মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ বাক্যের শাস্তা আমাদেরই মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য; তারপর এই সব বিতর্ক-যোগ্য উক্তির উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার মাঝে আমাদের সতর্ক করে' দেওয়া হল যেন তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে যথাযোগ্য সীমার বাইরে টেনে নেওয়া না হয় বা আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিঙ্‌নির্ণয়ের ইঙ্গিতের বেশী কিছু বলে' মনে করা না হয়। কারণ, মন বাক্ ইন্দ্রিয়, কিছুই ব্রহ্ম অবধি যেতে পারে না; সুতরাং, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এসবের গোচরের অতীত, নতুবা তাদের নিজস্ব বৃত্তি ধরেই তারা ব্রহ্মকে লাভ করতে পারত। ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা দিতে উদ্যত হয়েও এ উপনিষদ বলছে, "আমরা জানি না, বুঝি না কি উপায়ে তাঁর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।" এখানে যে দুটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'বিদ্ম' ও বিজানীম', তার একটির অর্থ, মনে হয়, সহজভাবে অর্থবোধ করা বা জ্ঞানে উপলব্ধি করা আর অন্যটির অর্থ, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করে' তার সাকল্য এবং তার বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশের

সমগ্রভাবে অথবোধ করা। ঠিক তার পরেই, এই সম্পূর্ণ অক্ষমতার হেতু বলা হল: "কারণ, ব্রহ্ম যা জ্ঞাত সে সব থেকে অন্যতর, যা অজ্ঞাত তার ঊর্ধ্বে ওপারে," সব অধিকার করে' যেন সবের অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত। জ্ঞাত হল যা কিছু আমরা আমাদের বর্তমান মনোবৃত্তি দিয়ে গ্রহণ করতে পারি, ধারণ করতে পারি--পরম ব্রহ্ম যা নন সে হল সেই সব, শুধু আমাদের ইন্দ্রিয় ও মানস সংবেদনের কাছে ব্রহ্মের রূপ ও প্রতিভাস। অজ্ঞাত হল যা জ্ঞাত বিষয়ের অতীত এবং অজ্ঞাত হলেও যা অজ্ঞেয় নয়,--যদি আমরা আমাদের বৃত্তিগুলিকে প্রসারিত করতে পারি কিংবা যা আমাদের এখন নাই এমন সব বৃত্তি অর্জন করতে পারি।

তথাপি, এর ঠিক পরেই এই উপনিষদে তার প্রথম বর্ণনার দৃঢ়ভাবে পুনরুক্তি করে' এবং তার ব্যাখ্যা করে তার বর্ণিত ব্রহ্মকে জানতে আদেশ দেওয়া হল। এখানে এ বিরোধের সদ্য সমাধান করা হল না, এ বাধা দূর করা হল দ্বিতীয় খণ্ডে আর সে জ্ঞানের উপায় নির্দেশ করা হল চতুর্থ খণ্ডে। এ বিরোধ আসে জ্ঞানেরই প্রকৃতি থেকে: জ্ঞান হল অনুসন্ধিৎসু চেতনার সঙ্গে অনুসন্ধেয় চেতনার সম্বন্ধ, আর যেখানে সে সম্বন্ধ লুপ্ত হয় সেখানে জ্ঞানের স্থলে আসে শুদ্ধ অদ্বয়ত্ব। আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি তাতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের বেশী কিছু হতে পারে না আর সে জ্ঞানের স্বরূপ হল বিশিষ্ট অদ্বয়ত্ব, যাকে অবলম্বন করে' আমরা জ্ঞান অতিক্রম করে' নির্বিকল্প অদ্বয়ত্বে উপনীত হতে পারি। দর্শনের এই তাত্ত্বিক পার্থক্য নির্দেশ করা এখানে প্রয়োজন যাতে জ্ঞানময় কোন সম্বন্ধকে আমরা পরম নির্বিকল্প ব'লে ভুল না করি কিংবা যাতে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আবদ্ধ থেকে, সম্ভবপর সকল বর্ণনার অতীত এবং বর্ণনীয় সকল অভিজ্ঞতার পশ্চাতে, পরম নির্বিকল্পের মৌলিক বোধ হারিয়ে না ফেলি বা নিতে অক্ষম না হই। কিন্তু তাতে ত আর জ্ঞানে অধিগত শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, অভিজ্ঞতাতে উপলব্ধ সবিশেষ অদ্বয়ত্ব, মূল্যহীন বা নিরর্থক হয় না। বরং, এই বিশ্বে আমাদের অস্তিত্বের চরম সার্থকতা বলে' তারই উপর আমাদের সাধনার লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে যদি আমরা তা পেতে পারি--আর তাতে সীমাবদ্ধ হলে ত তাকে আর সত্য করে' পাওয়া হল না--তাহলে তার মধ্যেই এবং তাকে অবলম্বন করেই, এমন কি এই দেহ ধারণ করে'ও সর্বদা পরম নির্বিকল্পের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারব।

এই ঊর্ধ্বতম জ্ঞানলাভের উপায় হল মনের চেয়ে ঊর্ধ্বতর ক্রিয়া-বৃত্তিকে মনের মধ্যে আসতে দিয়ে মনকে অবিরত প্রস্তুত করা যতদিন না তার চেয়ে বৃহত্তর যে অতিমানস পরিশেষে তার স্থান গ্রহণ করবে তার কাছে সে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে। বস্তুতঃ, এই জগতে জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে আমাদের ক্রমবিবর্তন স্বাভাবিক প্রগতির যে নিয়মে শাসিত হয়েছে মনকেও তাই মেনে চলতে হবে। কারণ, প্রাণময় চেতনা যেমন অবরুদ্ধ জড় সত্তার সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং জড়ের নিজস্ব করণের সহায়ে অনধিগম্য, তেমনিই এই অতিমানস চেতনাও মনের বিভক্ত ও বিভাজনশীল প্রকৃতির সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং তার নিজস্ব করণের সাহায্যে অনধিগম্য। কিন্তু জড়কে যেমন প্রাণের অভিব্যক্তির জন্য অবিরাম প্রস্তুত করা হচ্ছে যতক্ষণ না প্রাণ তার মধ্যে সঞ্চরণ করতে পারে, তাকে অধিকার করতে পারে, তার মধ্যে তার বিশিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালিয়ে নিতে পারে, এবং প্রাণকে যেমন মনের অভিব্যক্তির জন্য অবিরাম প্রস্তুত করা হচ্ছে যতক্ষণ না মন তাকে ব্যবহার করতে পারে, ক্রমশঃ উচ্চতর মনোময় অর্থের বা মূল্যবোধের দ্বারা তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভাসিত করতে পারে, মন ও মনের যা অতীত তার বেলাতেও ঠিক তাই করতে হবে।

আর এই প্রগতি সম্ভবপর হয়েছে কারণ এই সব বস্তুই একই সত্তার, একই চেতনার রূপভেদ মাত্র। জড়ে যা নিবর্তিত রয়েছে, জড়ের যা নিগূঢ় তাৎপর্য ও সার সত্তা প্রাণ তাকেই জড়ে প্রকটিত করে—যেন জড় অস্তিত্বের কাছে তার নিজেরই মর্ম, নিজেরই লক্ষ্য উদ্ঘাটিত করে। তেমনই আবার, প্রাণের যা প্রকৃত তাৎপর্য, নিজের কাছে অস্পষ্ট হলেও যা তার সার স্বরূপ কিন্তু ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ সংগঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিপ্ত থাকে বলে সে নিজে যা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারে না, মন সে সবই প্রাণে প্রকটিত করে। তেমনই আবার, অতি-মানসকেও মনের মধ্যে অবতরণ করে মনের কাছে মনের নিজের স্বরূপ প্রকটিত করতে হবে, তার ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ সংগঠন-বৈশিষ্ট্যে একান্ত অভিনিবেশ থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে, যাতে মনোময় সত্তা তার বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই উপায়েই মানুষ সেই তৎস্বরূপের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যিনি তার অন্তর্যামী শাস্তা, যিনি তার মনকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

সাধনে ব্রতী করেন, যিনি তার প্রাণশক্তিকে নির্দিষ্ট পথে চালনা করেন, যিনি তার সব ইন্দ্রিয়কে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-বৃত্তিতে নিযুক্ত করেন।

এই পরম জ্ঞানাত্মক তত্ত্ব মনের দ্বারা চিন্তা করে না। তার কাছে মনের ক্রিয়া নিকৃষ্টতর, গৌণ—তার নিজস্ব পদ্ধতির অনুযায়ী নয়। কারণ, বিভাজন ও সীমাবন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে' মনের কাজ করা সম্ভবপর হয় শুধু নিম্নতর তমসাচ্ছন্ন অস্তিত্বের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে; কিন্তু অতিমানস একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্বগ্রাহী ও সর্বগামী, তার ক্রিয়া সার্বভৌম এবং নিখিল সাকার বিশ্বের ওপারের শাশ্বত সর্বাতিশয়ী বিশ্বযোনির সঙ্গে সে সজ্ঞানে নিত্যযুক্ত। অতিমানস ব্যক্তিকে দেখে বিশ্বের মধ্যে, ব্যক্তি থেকে অনুভবের আরম্ভ করে না বা তাকে পৃথক সত্তা বলে' গ্রহণ করে না। সে তূর্যাতীত থেকে আরম্ভ করে' বিশ্ব ও ব্যক্তিকে দেখে তাঁরই সম্পর্কে তারা যা সেই রূপে, তাঁরই উপাধি বা অভিজ্ঞতার সূত্র বলে', ব্যক্তি বা বিশ্ব থেকে আরম্ভ করে' তূর্যাতীতে যায় না। মন অবিরাম মনন করে' ও সংকল্প করে' জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করে; জ্ঞান ও শক্তি অতিমানসের নিত্য অধিকারে আছে বলে'ই সে নিজেকে নানাপ্রকার জ্ঞান ও সংকল্পের কাজে অবাধে বিকিরণ করে। বিভক্ত সংবেদন নিয়ে মন হাতড়ে বেড়ায়, সহানুভূতির দ্বারা একত্বের কোন রকমের একটা ধারণাতে উপস্থিত হয়; অতিমানস সব গ্রহণ করে স্বতন্ত্র সর্বগ্রাহী সম্বোধের দ্বারা। তার নিত্য নিবাস যে একত্বে নানাবিধ প্রেম ও সহানুভূতি তারই অভিব্যক্তির গৌণ লীলা মাত্র। অতি-মানস সমগ্র থেকে আরম্ভ করে' তারই মধ্যে দেখে তার সব অংশ ও ধর্ম, অংশ ও ধর্মের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের দ্বারা সমগ্রের জ্ঞান নির্মাণ করে না; এমন কি সমগ্রতাও তার কাছে যোগফলের একত্ব মাত্র, অনন্ত স্বরূপ-তত্ত্বের মহত্তর একত্বের আংশিক এবং গৌণ প্রকাশ মাত্র।

সুতরাং দেখা গেল যে, এই দুটি জ্ঞানের তত্ত্ব দুইটি বিপরীত প্রান্ত থেকে বিপরীত অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে, বিপরীত পদ্ধতিতে কাজ করে। তথাপি, জ্ঞানের নিম্নতর বৃত্তিটি উচ্চতরের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের যা অতীত তারই দ্বারা মনকে মনন করা হয়েছে; মনোময় চেতনা এই উর্ধ্বতর অতিমানস থেকে যে জ্ঞান ও প্রেরণা পায় তার দ্বারাই সে নিজের গতি-বৃত্তি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে; এমন কি যে উপাদানে সে নির্মিত হয়েছে তাও সেই মহত্তর তত্ত্বেরই বস্তু। মনোবৃত্তির অস্তিত্ব আছে

কারণ মনের যা অতীত তা নিজের সত্তার বিভিন্ন বিন্দুতে, বিভিন্ন বিগ্রহে অভিনিবেশের উপর প্রতিষ্ঠা করে' নিজের বিপরীত ক্রিয়াপ্রণালীর পরিকল্পনা করেছে। অতিমানসই এই সব বিন্দু স্থির করে দেয়, দেখে যে, কোন বিশেষ বিশ্বছন্দ বা সার্বভৌম ক্রিয়ার ধর্ম দেওয়া থাকলে সেই সব নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তার নিজেরই অন্য সব বিগ্রহের উপরে এবং সেই সব বিগ্রহের চাপ মেনে নিয়ে কি ভাবে চেতনাকে কাজ করতে হয়; এই সব যা সে স্থির করে' দিয়েছে তারই অনুযায়ী করে' সে মনোবৃত্তির সমস্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, আর দেখে। এমন কি আমাদের অজ্ঞানও অতিমানস থেকে প্রসৃত কোন সত্যের বিকৃত ক্রিয়া এবং সেই সত্যের বিকাররূপে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারত না। আর ঠিক তেমন-ই, আমাদের জ্ঞান সংবেদন হৃদয়াবেগ বা শক্তিতে, সত্যমিথ্যা শীতোষ্ণ রাগদ্বেষ ইত্যাদি, যত দ্বন্দ্ব সে সবও সেই ঊর্ধ্বতর অববোধ থেকেই এসেছে, সবই তার আদেশ মেনে চলেছে, সবই সেই প্রচ্ছন্ন অতিমানসেরই গৌণ ক্রিয়া--বলা যেতে পারে, উন্মার্গ ক্রিয়া; আর এই সব নিম্নতর ক্রিয়া অতিমানসই নিয়ন্ত্রণ করে তার সেই প্রথম পরিকল্পনার অনুযায়ী করে' যে, এ অবর চেতনা বিভক্তরূপে বিন্দুবিশেষে অবস্থিত বলে' তার জগতের বা নিজের স্বামিত্ব তার নাই বটে কিন্তু একত্ব ও স্বামিত্বের সন্ধান সে করে, কারণ আমাদের মধ্যে অতিমানস আছে বলে' সহজবোধে---যদিও অস্পষ্টভাবে-- সে জানে যে, সেই তার প্রকৃত ধর্ম, তার স্বত্ব।

কিন্তু ঠিক সেই হেতুতেই আবার, তার উদ্ভব এবং গোপন দিশারী সেই মনের মনে উদয়নের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণে মনোময় সত্তা তার বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও স্বভাবের সীমা পরিত্যাগ করে, শুধু সেই অনুপাতেই তার সে অন্ধ সন্ধান এবং অর্জনের প্রয়াস সফল হতে পারে। অতিমানসকে তার মনোবৃত্তির অন্তরে প্রবেশ করতে দিতেই হবে, মনকে প্রাণ যেমন দিয়েছে। তার অন্বেষণের বিষয় বলে' এখন সে যা মেনে নিয়েছে--- যথা, মন আর তার বিহিত সব লক্ষ্য, তার পঙ্গু ক্রিয়াপদ্ধতি, অহংবোধ বিভাজন ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নিজের গড়া সব সংকল্প সংস্কার ও ভাবাবেগ---সে সবকে যতদিন সে উপাসনা করে, অন্বেষণ করে বা সে সবে যতদিন সে আসক্ত থাকে ততদিন সে এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে' এ উপনিষদে সাধককে যে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতে উন্নীত হতে পারে না। সেই ব্রহ্মকে আমাদের জানতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে;

এখানে মানুষ যা অনুসরণ করে, উপাসনা করে সে সবকে নয়।

৮

এ উপনিষদ ব্রহ্মচেতনাকে 'মনের মন' সংজ্ঞা দিয়েই সন্তুষ্ট হয় নাই। ইতিপূর্বে যেমন তাকে 'বাক্যের বাক্' বলে' বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি এখন তাকে 'চক্ষুর চক্ষু' 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' বলা হয়। সে চেতনা ত শুধু প্রকাশলীলার পশ্চাতে পরম জ্ঞানবৃত্তি নয়, সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পশ্চাতে পরম ইন্দ্রিয়ও বটে। আমাদের সত্তার প্রত্যেক অংশই তার নিজের সার্থকতার সন্ধান পায় তার স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার বর্তমান রূপের যা ওপারে তার মধ্যে, শুধু সে-সব রূপের মধ্যে নয়।

ইন্দ্রিয় ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে সর্বনিয়ন্তা পরমচেতনার এই ধারণার সমন্বয় হয় না। বাহ্য জড়ের সঙ্গে দেহাশ্রিত মনের সংযোগ সাধনের উপায়স্বরূপ দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বলেই আমরা ইন্দ্রিয়কে জানি; আর জানি যে, ক্রমবিবর্তনের ধারাতে এই সব ইন্দ্রিয়ের পৃথকভাবে পরিণতি হয়েছে; সুতরাং, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্তু নয়, শুধু দেহাশ্রিত মনের একটা ব্যবহারিক উপযোগ মাত্র, স্থূল বস্তুর উপরে তার সাময়িক প্রয়োগের প্রণালী মাত্র। অন্যদিকে, ব্রহ্মের ধারণা আমরা করি মৌলিক যা নয় সে-সবই বর্জন করে', এমন কি মনকেও বাদ দিয়ে। এ যেন সদাত্মক কোন শূন্য বা অজ্ঞেয় কোন রাশি যাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন পরিমাণের সম্ভাব্য কোন সমীকরণের অনুযায়ী করে' নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তা সত্য হতে পারে; কিন্তু এখন আমরা অজ্ঞেয়ের কথা ভাবছি না, ভাবছি চেতনাতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির কথা আর তাকেই আমরা বলছি সবিকল্পের উপর নির্বিকল্পের শাশ্বত দৃষ্টিপাত ও এই বিশ্বের এবং আমরা যা হয়েছি তার কারণ ও নিয়ন্তা শক্তি। সেখানে, সেই সর্বনিয়ন্তা মূলকারণের মধ্যে মুখ্য ও অপরিহার্য এমন কিছু অবশ্যই আছে যাকে দেহধারী চেতনার সংজ্ঞাতে ভাষান্তর করেই আমাদের এখানকার সব স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াবৃত্তি রূপ নিয়েছে।

এদিকে, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্তু নয়, অন্ততঃ তা মনে হয় না; মনের নাড়ীতন্ত্র ব্যবহারের এ একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এমন কি, বিশুদ্ধ মনোময় ক্রিয়াও তা নয়; তাকে এতটা নির্ভর করতে হয় প্রাণশক্তির তরঙ্গের উপর, নাড়ীতন্ত্রের ঊর্ধ্বাধঃ-প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তেজের স্পন্দনের উপর যে, উপনিষদে তাকে প্রাণ আখ্যাই দিয়েছে,* প্রাণশক্তিরই বিবিধ ক্রিয়া-

* যথা, বৃহদারণ্যক ১।৫।২১; ৩।৯।৪

বৃত্তি বা বিভূতি বলে তাদের গণনা করেছে। অবশ্য স্নায়ুর উপর যেসব ছাপ পড়ে, মনের কাছে এলে মন তার নিজের সংজ্ঞাতে সে-সবকে পরিবর্তিত করে' নেয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে ত মানসিকের চেয়ে বেশী স্নায়বিক বলেই মনে হয়। কোন রকমেই, প্রথম দৃষ্টিতে এমন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না যাতে যার দেহ নাই, যে অতিমানস চেতনার এমন কোন যন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তার উপর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা নয়, এ শুধু তার বাহ্যরূপ; এ আবরণ ভেদ করে' তার পশ্চাতে আমাদের যেতে হবে। যে বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি---ক্রিয়াতে নয়---স্বরূপতঃ তা কি? তার ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, তা হল জড়ের কোন অণুবিম্বের সঙ্গে মনের সংস্পর্শ---তা সে অণুবিম্ব শব্দের স্পন্দনই হক, কোন আকৃতির আলোক-প্রতিরূপই হক, গন্ধোৎপাদক ক্ষিতি-পরমাণু বৃষ্টিই হক, আস্বাদনের মূল দ্রব বা রসের অনুভবই হক, অথবা আমাদের স্নায়বিক সত্তাতে বিক্ষোভের যে সাক্ষাৎ-বোধকে আমরা স্পর্শ বলি তাই হক। অবশ্য, জড়ের সঙ্গে জড়ের সংস্পর্শ থেকেই এসব সংবেদনের প্রথম উদ্ভব হয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে মনের কারবার শুধু জড়ের অণুবিম্ব নিয়ে---যেমন, চোখের উপর পড়েছে কোন আকৃতির যে ছবি। কারণ, জড়ের উপর মন সাক্ষাৎভাবে কাজ করে না, করে প্রাণের সাহায্য নিয়ে---প্রাণই মনের আদান-প্রদানের যন্ত্র ; আর আমাদের মধ্যে প্রাণের কাজ হয় স্নায়বিক শক্তিরূপে, জড়ীয় কোন রূপে নয়; কাজেই তা জড়কে ধরতে পারে শুধু স্নায়ুর উপর জড়ের যে ছাপ পড়ে তাকে আশ্রয় করে, যেন জড়ের সংস্পর্শজাত প্রতিচ্ছবি আমাদের তৈজস চেতনাতে---উপনিষদের ভাষায়, প্রাণে---অনুরূপ যে-বোধ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে। মন এই সব নিয়ে প্রত্যুত্তরে জাগায় তার অনুরূপ মনোময় বোধ---মনের উপর আকারের ছাপ। সুতরাং, অনুভূত পদার্থ আমাদের কাছে আসে তিনবার রূপান্তরিত হয়ে: প্রথম, জড় অণুবিম্ব, দ্বিতীয়, স্নায়বিক বা তৈজস প্রতিচ্ছবি, তৃতীয়, মনের বস্তুতে অনুকৃত প্রতিরূপ।

এই সবিস্তার প্রক্রিয়ার পারম্পর্য আমাদের অগোচর থাকে কারণ, কালগতির আমাদের বোধ অনুসারে তা তড়িদ্বেগে সম্পাদিত হয়। অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির জীবের কাছে, কাল-পরিমাণের ভিন্ন সংজ্ঞাতে, এ-ক্রিয়ার

প্রত্যেক অঙ্গই হয়ত পৃথকভাবে বোধগম্য হবে। কিন্তু তিনবার রূপান্তর হওয়া সর্বত্রই থাকবে; কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে চেতনার তিনটি কোষ আছে:—জড়ীয়, 'অন্নকোষ', যাতে বাস্তব সংস্পর্শ ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি গৃহীত ও রূপায়িত হয়; জৈব বা স্নায়বিক, 'প্রাণ-কোষ', যাতে স্নায়বিক সংস্পর্শ ও রূপায়ণ হয়; মানসিক, 'মনঃকোষ', যাতে সংস্পর্শ ও প্রতিচ্ছবি হয় মনোময়। আমরা মনোময় কোষে কেন্দ্রস্থ হয়ে কাজ করি বলে' আমাদের কাছে উপনীত হবার পূর্বে জড়জগতের সব অভিজ্ঞতাকে অপর দুটি কোষের মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

সুতরাং, সংস্পর্শই হল ইন্দ্রিয়বোধের ভিত্তি আর সার সংস্পর্শ হল মনোময়, নতুবা বোধ জন্মাবে না। যেমন, উদ্ভিদের অনুভব হয় স্নায়বিক—প্রাণশক্তির সংজ্ঞাতে—অবিকল মানুষের নাড়ীতন্ত্রের অনুভবের মত আর প্রতিক্রিয়াও উভয়ক্ষেত্রে হয় অভিন্ন; কিন্তু মনের বীজ যদি উদ্ভিদে থাকে তবেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই সব স্নায়বিক বা জৈব প্রতিরূপ বা প্রতিক্রিয়ার প্রতীতি তার হচ্ছে। তাহলেই তার অনুভব শুধু স্নায়বিক হবে না মনোময় উপাধিও তার থাকবে। তাহলে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ, ইন্দ্রিয়বোধ হল মনের দ্বারা কোন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ আর মনের উপর তার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ।

এখানে আমাদের জড়দেহাশ্রিত মনের সংজ্ঞা ধরে' সব তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিচার করা হল; কারণ এসব কোষ স্থূল জড়ের আধারে প্রতিষ্ঠিত ক্রমসূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত। কল্পনা করা যাক যে, মনোময় লোক একটা আছে যেখানে আধার হল মন, জড় নয়। সেখানে বোধের প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ পৃথক। তা হবে মন দিয়ে মনের প্রতিচ্ছবির অনুভব; অবশ্য, পরে সে-ছবি ক্রমশঃ স্থূলতর বস্তুতে রূপের আকারে নিক্ষিপ্ত হবে; আর সে-লোকে যত পার্থিব বিগ্রহই আগে থেকে বর্তমান থাকুক না কেন সে-সব সত্বর মনের ডাকে সাড়া দেবে, নিজেকে বদলাবার সপক্ষে মনের ইঙ্গিত সব মেনে নেবে। সেখানে মনই হবে প্রতাপী, সৃষ্টিপর ও প্রবর্তক প্রভু; এখানে আমাদের মধ্যে সে যেমন জড়ের আদেশবহ ও শুদ্ধমাত্র বিম্বগ্রাহী, অথবা জড়ের সঙ্গে সংঘাতে রত এবং তামসিকতার বশে তার স্পর্শে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক, নির্দিষ্টবৃত্তি প্রতিকূল উপাদানকে বহুলায়াসে কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে সক্ষম, সে অবস্থা সেখানে তার আদবেই নয়। তার উপরে যে অতিমানস শক্তিই থাকুক না কেন, তার শাসন সে মেনে

নেবে বটে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সে হবে নমনীয় আশুগ্রাহী অনুকূল উপাদানের প্রভু। কিন্তু তথাপি, সংবেদন বর্তমান থাকবেই, কারণ মনোময় চেতনাতে বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং তার প্রতিরূপ-গঠন সত্তার স্বধর্মের অঙ্গ থাকবেই।

প্রকৃতপক্ষে, মন—বা সাধারণভাবে কর্মপ্রবৃত্ত চেতনা—যেখানে যে-ভাবেই কাজ করুক না কেন তার পক্ষে অপরিহার্য চারিটি অত্যাবশ্যক বৃত্তি আছে; উপনিষদ তাদের 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞান', 'সংজ্ঞান' ও 'আজ্ঞান' নামে উল্লেখ করেছে। 'বিজ্ঞান' হল আদিম সমগ্রবোধী চেতনা,—সব বস্তুর সারস্বরূপ, তাদের সাকল্য এবং সব অংশ, তাদের সব ধর্ম ও গুণ, সবের প্রতিরূপই সে ধারণ করে' আছে; মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ত যথাযথ ও সমগ্র হল তার সে রূপদর্শন; প্রকৃতপক্ষে তা অতিমানসেরই বৈভব, সর্বদর্শী মনীষার শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিগুলিতে মন কৃচিৎ তার আভাসমাত্র পায়। 'প্রজ্ঞান' হল যে-চেতনা বস্তুর প্রতিরূপ তার নিজের সম্মুখে বিষয়রূপে ধারণ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবে বলে' এবং প্রতিবোধ ও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের দ্বারা তাকে গ্রহণ করবে বলে'। 'সংজ্ঞান' হল বস্তুর প্রতিরূপের সঙ্গে যে-সংস্পর্শের দ্বারা চেতনা নিজের সত্তাতে অনুভবগম্যভাবে তাকে গ্রহণ করে। প্রজ্ঞানকে যদি বলা যায় বিষয়কে তার সচেতন শক্তিতে গ্রহণ করবার—অর্থাৎ তাকে জানবার—উদ্দেশ্যে প্রতিবোধী চেতনার বহির্গমন, তাহলে সংজ্ঞানকে বলতে হয় তার সম্মুখে অবস্থিত বিষয়কে আবার নিজের মধ্যে এনে তার সচেতন সত্তা দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার—অর্থাৎ তাকে অনুভব করবার—উদ্দেশ্যে প্রতিবোধী চেতনার অন্তরাবর্তন। 'আজ্ঞান' হল চেতনা যে-ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুর প্রতিরূপের উপর অধিষ্ঠান করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ও নিজের শক্তির অধিকারে আনবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, এই চারিটিই হল সমস্ত সচেতন ক্রিয়ার ভিত্তি।

আমাদের মানব মনোবৃত্তির যা গঠন তাতে আমরা সংজ্ঞান থেকে বা প্রতিরূপের মধ্যে বিষয়ের বোধ থেকে আরম্ভ করি, জ্ঞানে তার প্রতিবোধ আসে পরে। তারপর আমরা চেষ্টা করি জ্ঞানে তাকে উপলব্ধি করতে এবং শক্তিতে তাকে অধিকার করতে। এসবের পূর্বে আমাদের অবচেতন ও অধিচেতন সত্তাতে আরও সব গোপন ক্রিয়া হয় কিন্তু আমাদের বহিশ্চর সত্তা সে সবের বিষয়ে অজ্ঞ সুতরাং আমাদের কাছে সে সবের কোন

অস্তিত্ব নাই। সে সবের কথা জানতে পারলে আমাদের সজ্ঞান ক্রিয়াবৃত্তি সম্পূর্ণ বদলে যেত। বস্তুতঃ, প্রথম ঘটে একটা ত্বরিত ব্যাপার যার দ্বারা আমরা একটা প্রতিরূপ অনুভব করে' তার প্রতিবোধক প্রতীতি ও প্রত্যয় গড়ি, তার পরে আসে বুদ্ধির মন্থরতর ক্রিয়া যার দ্বারা আমরা তাকে উপলব্ধি ও অধিকার করতে চেষ্টা করি। প্রথমটি হল আমাদের মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া, আমাদের মধ্যে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে; দ্বিতীয়টি আমাদের অর্জিত, মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, সম্পূর্ণ সহজ এবং নিপুণ-ভাবে যা করতে পারে শুধু মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বৃত্তি এ হল মনোময় সত্তার সেই কাজ করবার প্রয়াস। মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছা-শক্তিকে সেতু করে' অতিমানসের সঙ্গে সজ্ঞানে সংযোগ স্থাপনের এবং দেহধারী জীবকে নিজের মধ্যে অতিমানস ক্রিয়ার উপযোগী করে' প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে মনোময় সত্তার এই চেষ্টা চলেছে। সুতরাং, প্রথম ক্রিয়া হয় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, দ্রুত ও নির্দোষ আর দ্বিতীয়টি হয় মন্থর ও আয়াসবহুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের মনীষা তার ক্রিয়াতে ঈষদঙ্কুরিত অতিমানস ক্রিয়ার সহযোগ ও শাসন যত মেনে নেয়—আর তাতেই হয় প্রতিভার সৃষ্টি—এই দ্বিতীয় ক্রিয়াটিও হয় তত বেশী সহজ ও স্বতঃ-স্ফূর্ত, দ্রুত ও নির্দোষ।

মনোলোকের দেবতারা নিজেদের কীর্তি বলে' যা-সব গণনা করেন অন্তরাল থেকে সে-সবের পরিচালক, বিশ্বের অধ্যক্ষ এক পরমচেতনার অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা যায়, তাহলে সে-চেতনাকে অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রভু হতে হবে। তার ক্রিয়ার বা বিশ্বশাসনের মূল ভিত্তি হবে মৌলিক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বগ্রাহী বিজ্ঞান ও আজ্ঞান। সে তার সচেতন জ্ঞানের বলে সমস্ত বস্তু উপলব্ধি করবে, তার সচেতন শক্তির বলে সমস্ত শাসন করবে। এ-সব শক্তিই হবে নিখিল সাকার বিশ্বের যিনি স্রষ্টা ও স্বামী, তাঁরই চিন্ময় সত্তার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। তাহলে প্রতিবোধী চেতনা ও সংবোধের জন্য কি কাজ অবশিষ্ট থাকবে? স্বতন্ত্র বৃত্তিরূপে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না, সর্বগ্রাহী চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে তারই গৌণবৃত্তিরূপে তারা প্রচ্ছন্ন থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, এ চারিটি বৃত্তির মিলনে হবে একটা অখণ্ড দ্রুত ক্রিয়া। আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞান ও সংজ্ঞান যত দ্রুত কাজ করে সেই বেগে যদি এই চারিটি ক্রিয়াই একযোগে সাধিত হতে পারত তাহলে আমাদের কালের সংজ্ঞাতে পরাশক্তির পরমক্রিয়ার অনবচ্ছিন্ন একত্বের,

অপর্যাপ্ত হলেও, কথঞ্চিৎ ধারণা আমরা করতে পারতাম।

বিবেচনা করলে বুঝতে পারব যে, তা হতেই হবে। পরাচেতনাকে আত্ম-অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর প্রতিরূপ তার চিন্ময় সত্তার সমগ্রবোধে ধারণ করতে ত হবেই, আবার প্রতিবোধী চেতনার বৃত্তি দুটি দিয়ে তাঁর নিজের সত্তার সম্মুখে—অবশ্য, সর্বদাই তাঁর সত্তার মধ্যে, বাহিরে নয়,—তাদের ধারণ করে' তাদের সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতেও হবে। নতুবা, আমাদের কাছে যেরূপে বিশ্ব প্রতিভাত হয় সে-রূপ তার থাকতে পারত না; কারণ, আমরা আমাদের সংজ্ঞার দর্পণে শুধু পরাশক্তিরই সব ব্যাপার প্রতিফলিত করি। কিন্তু, সেখানে প্রতিবোধের সম্মুখে বস্তুর প্রতিরূপ বিধৃত হয়েছে সমগ্রবোধী সত্তার অভ্যন্তরে, আমাদের ব্যষ্টি মনের মত, বাহ্যবস্তুর আকারে নয়; আর এই ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্যই সে পরম মন এবং পরম সংবোধ হবে আমাদের মনোবৃত্তি ও সংবেদনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপের। সমগ্রজ্ঞান ও পূর্ণস্বারাজ্যের অভিব্যক্তি হবে সে সব, জ্ঞানান্বেষী ও গ্রহণপ্রয়াসী অজ্ঞান ও অসামর্থ্যের নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সারস্বরূপ ও সামান্যবৃত্তি অবশ্য সেই সংবোধের প্রতিফলন ও সৃষ্টি। কিন্তু এ উপনিষদে তাকে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়বোধের পশ্চাতে সংবোধ না বলে' বিশেষ করে', চক্ষুর পশ্চাতে চক্ষু ও শ্রোত্রের পশ্চাতে শ্রোত্র বলা হয়েছে। অবশ্য, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম বলে চক্ষুকর্ণকে ইন্দ্রিয়ের প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে। তবু বোঝা যায় যে, এ উপনিষদের মতে আমাদের অন্তঃকরণের অঙ্গীভূত পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-বোধের অনুরূপ কোন না কোন বিভেদ পরম সংবোধেও আছে। কি করে' তা সম্ভব হয়? এখন এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, সেজন্য আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎপত্তি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করতে হবে এবং শুদ্ধমাত্র দেহে বা প্রাণশক্তিতে তাদের বাস্তব প্রকাশের রূপে আবদ্ধ না থেকে আমাদের অন্তঃকরণে তাদের কি উৎস তাও বিচার করতে হবে। কি আছে মনের মধ্যে যা দর্শন ও শ্রবণের মূল কারণ? কেন আমরা দেখি বা শুনি, কেন শুদ্ধমাত্র মন দিয়ে বোধ গ্রহণ করি না?

৯

ভারতের মনস্তত্ত্ববিদেরা মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলেছেন, আর তাকেই প্রধান ইন্দ্রিয়ের আসন দিয়েছেন। প্রাচীন বিধানে ছিল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন উভয়াত্মক, একাধারে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ কর্মেন্দ্রিয়। মনস্তত্ত্বের এ একটা সহজ কথা যে, মনের সহযোগ ছাড়া কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজই সিদ্ধ হয় না; চোখ দেখতে পারে, কান শুনতে পারে, সব ইন্দ্রিয়ই তার কাজ করে' যেতে পারে কিন্তু মন তাতে যুক্ত না হলে মানুষের দেখা, শোনা, ছোঁওয়া, স্বাদ নেওয়া কিছুই হয় না। তেমনি, মনস্তত্ত্ব অনুসারে, কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ হয় মনের ইচ্ছাশক্তিরূপে ক্রিয়ার বলে অথবা, শারীর বিধানের ভাষায়, অভিঘাতের প্রতিক্রিয়াতে মস্তিষ্ক থেকে যে স্নায়বিক শক্তি প্রসৃত হয় তার বলে; আর বস্তুতান্ত্রিকের ধারণাতে সব ইচ্ছাশক্তিরই সেই সারস্বরূপ ও প্রকৃতি। সে যাই হক, দশ ইন্দ্রিয়ই, আর দশের বেশী হ'লে,—উপনিষদের একটি বাক্য * অনুসারে অন্যূন সপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সপ্ত কর্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় থাকা উচিত,—সব ইন্দ্রিয়ই হল মানসচেতনারই ক্রিয়ার ব্যবস্থা, ব্যাপার বা করণ, আর সজীব জড়ের আধারে ক্রমবিবর্তনের প্রয়োজনে মনই এই সব কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

বর্তমান মনোবিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করে' একটা সত্য আমাদের শিখিয়েছে যা আমাদের প্রাচীন মনীষীরা জানতেন কিন্তু অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা এ সত্য এখন জানি বা পুনরাবিষ্কার করেছি যে, মনের সজ্ঞান ক্রিয়া একটা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর সমর্থতর অবচেতন বা অন্তশ্চর মন রয়েছে ইন্দ্রিয়েরা যা আনে তার কিছুই সে হারায় না, সে সমস্ত সম্পদ সে তার অক্ষয় স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখে—'অক্ষিতং শ্রবঃ'। বহিশ্চর মন হয়ত অবধান করে না কিন্তু অন্তশ্চর মন সব অবধান করে, গ্রহণ করে, কোন ভ্রমপ্রমাদ না করে' সব ধারণ করে' রাখে। বর্ণজ্ঞানহীন দাসী তার প্রভুকে প্রত্যহ পাঠাগারে হিব্রুভাষায় আবৃত্তি করতে শোনে। বহিশ্চর মন সে অবোধ্য প্রলাপে কান দেয় না কিন্তু তার অন্তশ্চর মন শোনে, স্মরণ করে রাখে এবং অস্বভাবী অবস্থাতে যখন তা বেরিয়ে আসে তখন সে আবৃত্তি এমন

* মুণ্ডক ২।১।৮

ভ্রমপ্রমাদহীন ও বিদ্বজ্জনোচিত হয় যে পরম মেধাবী ছাত্রেরও তাতে ঈর্ষা হতে পারে। ব্যক্তপুরুষ বা মন শোনেনি কান দেয়নি বলে'; কিন্তু অন্তরের বৃহত্তর পুরুষ বা মন সব শুনেছে কারণ সে তার অসীম সামর্থ্য নিয়ে সর্বদাই অবধান করে——বরং বলা যেতে পারে, 'অনুধান' করে বা পশ্চাতে অবস্থান করে' গ্রহণ করে। তেমনি আবার কাউকে নিঃসাড় করে' তার উপর অস্ত্রোপচার করা হলে সে কোনও বেদনা অনুভব করে না বটে কিন্তু সংবেশন বা সম্মোহের অবস্থাতে তার অন্তশ্চর মন মুক্ত হ'লে সে অস্ত্রোপচারের ব্যাপার ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা সব সে সবিস্তারে যথাযথ-ভাবে বর্ণনা করবে; কারণ শারীর ইন্দ্রিয়ের বিমূঢ়ভাবের জন্য আভ্যন্তরীণ বৃহত্তর মনের অবেক্ষণে বা অনুভবে কোন বাধা হয় নি।

তেমনি আবার, আমরা জানি যে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার বহুলাংশই সাধিত হয় সহজাত সংস্কারের দ্বারা; বহিশ্চর মন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে না, করে অবচেতন অন্তশ্চর মন। আর, আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, এ সব একটা মনেরই কাজ, পশুসুলভ শারীর মস্তিষ্ক থেকে প্রসূত স্নায়বিক ক্রিয়া মাত্র নয়। যে-সব শুয়ো পোকা বা গুবরে পোকা চলচ্ছক্তিহীন করে', কুমরে পোকা তার বাসায় ডিমের সঙ্গে জীবন্তে বন্ধ করে' শিশুকীটগুলির জন্মাবার পর টাট্‌কা আমিষাহারের নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখে, সে-সবের শারীর সংস্থান তার অন্তশ্চর মন ঠিক জানে; তাই তার বহিশ্চর মনের দ্বিধাখণ্ডিত অনিশ্চিত স্নায়বিক ক্রিয়া যদি পথরোধ করে' তার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিকে ব্যাহত না করে তাহলে নিপুণতম শল্যবিদের মত সে নির্ভুল ভাবে ঠিক জায়গায় তার হুল ফুটিয়ে দেবে!

বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামির নামে, অতীত অজ্ঞানের সব বাধা আজিও কাটিয়ে উঠতে পারে নি বলে' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান যে-সত্য এখনও উপেক্ষা বা অস্বীকার করছে তার নির্দেশ পাই এই সব তথ্য থেকে। উপনিষদে স্পষ্ট বলেছে যে, আমাদের মধ্যে মন অসীম; শুধু দৃষ্ট নয় অদৃষ্ট বিষয়ও সে জানে, শ্রুত অশ্রুত, মননের দ্বারা নির্ধারিত বা অনির্ধারিত সবই সে জানে। তাহলে, আজকালকার জ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যে বহিঃসংজ্ঞ মানব তার পার্থিব অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমাবদ্ধ—— সে জানে শুধু তার দেহস্থিত স্নায়ুচারী প্রাণ তার দেহধারী মনের কাছে যা উপস্থাপিত করে, এই সব স্নায়ুবাহিত সংবাদের মধ্যেও আবার সে

জ্ঞানে ও ধারণ করে' ব্যবহার করতে পারে শুধু ততটুকুই যা তার বহিশ্চর মানসেন্দ্রিয় অবধান করে' সজ্ঞানে স্মরণে রেখেছে; কিন্তু তার অন্তরে এক বৃহত্তর অন্তশ্চেতনা রয়েছে যা সে সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। বহিশ্চর মন ও ইন্দ্রিয় যা বোধ করেনি সে অন্তশ্চেতনা তা বোধ করে, বহিশ্চর মন যা মননের দ্বারা অর্জন করে' শিক্ষা করেনি তা সে জানে। কীটের অন্তশ্চেতনা তার শীকারের শারীর সংস্থান জানে; বাহ্যতঃ নিঃসাড় ব্যক্তির অন্তশ্চেতনা শল্যবিদের শল্যের গতিবিধি অনুভব করে' স্মরণে ত রাখেই, ঔষধের প্রভাবে বোধহীন ছিল বলে' তার স্থূল দেহের কাছে যা আসতে পারেনি অস্ত্রোপচারের সেসব আনুষঙ্গিক যন্ত্রণাও যথাযথ অনুভব করে; বর্ণজ্ঞানহীন দাসীর অন্তশ্চেতনা অপরিচিত ভাষা শুনে ঠিক স্মরণ করে' রেখেছিল আর, যোগের অভিজ্ঞতাতে জানা যায় যে, নিজেরই মহত্তর ক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যতঃ অবোধ্য সে সব শব্দের অর্থবোধ করতেও পেরেছিল।

বেদান্তের যে পরিভাষা আমরা ব্যবহার করছিলাম তাতে বলতে হয় যে, সংজ্ঞানের একটা বৃহত্তর ক্রিয়া আছে যা শারীর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, আর সে চেতনাই এ সব বোধ গ্রহণ করেছে; নিজের কানে শুনে অপরিচিত ভাষার শব্দ আয়ত্ত করেছে, নিজের স্পর্শ থেকে অস্ত্রোপচারের অননুভূত গতি বোধ করেছে, নিজের মানসেন্দ্রিয় বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে গুবরে পোকার চলচ্ছক্তির স্নায়বিক কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান জেনেছে। তার সহযোগিতা করেছে বাহ্য মনের ক্ষুদ্রতর গ্রহণ-ধারণের সীমা থেকে মুক্ত, প্রজ্ঞান আজ্ঞান ও বিজ্ঞানের তদনুরূপ বৃহত্তর ক্রিয়া। সব শব্দের যথাযথ অন্যোন্যসম্বন্ধ, শল্যের গতির সঙ্গে স্নায়ুর অননুভূত বেদনার সম্বন্ধ, ঝিল্লী দেহের পর্বসন্নিবেশে অবস্থানপারম্পর্যের সম্বন্ধ---সবই এই প্রশস্ততর প্রজ্ঞানই প্রত্যক্ষ করেছে। শব্দের নির্ভুল পুনরাবৃত্তি, যন্ত্রণার যথাযথ বর্ণনা, সঠিক অনুক্রমে হুল ফোটান---এ সবের মধ্যেই এ প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্তর্নিহিত ছিল। এ সব ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে বৃহত্তর আজ্ঞান বা জ্ঞানময় সংকল্প থেকে, বহিশ্চর মনের দ্বারা চালিত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যে দ্বিধাখণ্ডিত শক্তি তার দ্বারা তা সীমাবদ্ধ নয়। আর, এ-সব উদাহরণে বৃহত্তর বিজ্ঞানের ক্রিয়া যদিও তেমন সুস্পষ্ট নয়, তবুও তা অবশ্যই ছিল এবং এ-সবের মধ্যে কাজ করে' তাদের সুসঙ্গত সন্নিবেশের ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য হল সংজ্ঞান। সর্বাগ্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, ইন্দ্রিয়গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ

একটা ক্রিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মানসের আছে, যা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে প্রতিবিম্বিত না করে'ও বিষয়কে জানতে পারে, কিন্তু কতকটা যেন গৌণ ক্রিয়ারূপেই---তবে গৌণ হ'লেও অনুভবকে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করবার জন্য তা প্রয়োজনীয়---সেই সব তন্মাত্রবোধে তাকে প্রতিবিম্বিত করে। জড়াতীত চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারে তা বেশ পরিষ্কার হয়। এ বিষয়ে যাঁরা কিছু অধ্যয়ন বা পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে, অপরের জ্ঞাত বিষয়, বহুদূরস্থিত পদার্থ কিংবা জড়াতীত ভূমিতে অবস্থিত কিন্তু ইহলোকে ফলপ্রসূ সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি; শব্দাদি প্রতিবিম্বরূপে তাদের বোধ করতে পারি, আবার যেন পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন নির্দিষ্ট প্রতিবিম্ব ছাড়াও তাদের স্বরূপ সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি।

প্রথমতঃ, এতে প্রমাণ হয় যে, চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় কেবলমাত্র পার্থিব ক্রমবিবর্তনের ধারাতে আমাদের শারীর ইন্দ্রিয়স্থানের পরিণতির ফল নয়। সব জড়ভূতের মধ্যে অবস্থিত অন্তশ্চর মন, জড়ে নিজের ক্রমবিবর্তনের ধারাতে, এই সব শারীর ইন্দ্রিয়ের পরিণতি সাধন করেছে---পার্থিব ক্ষেত্রে, পার্থিব জীবনে, পার্থিব উপায়ে, শ্রবণদর্শনাদি মনের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে; কিন্তু এসব মনেরই স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, পার্থিব ক্রমবিবর্তনের অবস্থার উপর সে সব নির্ভর করে না এবং শারীর চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-ত্বক ব্যবহার না করেও সে-সব প্রয়োগ করা সম্ভবপর। যদি চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য ধরে' নেওয়া হয় যে, চৈত্য ইন্দ্রিয় আছে আর তা চৈত্য দেহে কাজ করে, তাহলেও সে-ক্রিয়া মৌলিক সংবোধের, বা সংজ্ঞানের, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ারই একটা বিশেষ ব্যবস্থা; কিন্তু সে সংজ্ঞান নিজে কোন শারীর ইন্দ্রিয়স্থান ছাড়াও কাজ করতে পারে। এই মৌলিক সংবোধ হল চেতনার আত্মানুভবেরই আদিম বিভূতি: নিজের সৃষ্ট সব সাকার পদার্থকে নিজের মধ্যে, আর নিজেকে সব সাকার পদার্থের মূল ধর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে, অনুভব করবার ক্ষমতা সে চেতনার আছে---তা সে অনুভব জড়ীয় শব্দস্পন্দ বা আলোকবিম্ব অথবা অপর কোন স্থূল প্রতীকের দ্বারা প্রতিরূপিত হ'ক বা না হ'ক।

জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, বর্ণ-জ্যোতিঃ প্রভৃতি সাকার পদার্থের বাহ্যতম গুণগুলিই মাত্র শক্তির ক্রিয়া নয়, এমন কি আকারও শক্তিরই একটা ক্রিয়া। সে শক্তিও ত

আবার কর্মপ্রবৃত্তি ও প্রৈতির অবস্থাতে চিন্ময় সত্তারই শক্তি।* সুতরাং, কার্যতঃ চেতনা নিজের কাজ নিজের সামনে ধরাতে তার নিজের উপর যে ছাপ পড়ে সেই হল আকার। আমরা রং দেখি, কারণ চেতনার একটা ক্রিয়া বর্ণরূপে তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয়; কিন্তু রং ত আলোকরূপে ক্রিয়মাণ শক্তিরই ফল, আবার আলোক ত একটা গতিমাত্র—অর্থাৎ শক্তিরই একটা ক্রিয়া। তাহলে প্রশ্ন হল যে, শক্তির যে-ক্রিয়া আকাররূপে তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয় তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কি? কারণ, সংজ্ঞান বা মৌলিকসংবোধ যে ভূমিতেই কাজ করুক না কেন, তার ক্রিয়ার ধারা তার দ্বারাই নির্ণীত হবে।

সব জিনিষের প্রারম্ভে রয়েছে স্পন্দন বা সঞ্চলন, আদিম 'ক্ষোভ' বা বিলোড়ন। চিন্ময় সত্তার কোন সঞ্চলন না থাকলে তিনি শুধু তাঁর স্থাণু অস্তিত্বই জানতে পারেন। চেতনাতে সত্তার স্পন্দন+ বা সঞ্চলন ছাড়া জ্ঞানের কোন ক্রিয়া হতে পারে না, সুতরাং সংবোধও থাকতে পারে না; আবার শক্তিতে সত্তার স্পন্দন বা সঞ্চলন ছাড়া সংবোধের কোন বিষয়ও থাকতে পারে না। চিন্ময় সত্তার জ্ঞানরূপে সঞ্চলন নিজেকে শক্তির সঞ্চলনরূপে অবগত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান নিজের কর্ম-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে পৃথক করে' সে-কর্মকে সাক্ষীরূপে দেখে এবং অনুভবের দ্বারা আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, এই হল সার্বজনীন সংজ্ঞানের মূল। আমাদের বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ ক্রিয়ার পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য। আমি ক্রোধে পরিণত হই সচেতন শক্তির স্নায়বিক ভাবোচ্ছ্বাসরূপ স্পন্দনের প্রভাবে; আবার আমি পরিণত হয়েছি যে-ক্রোধে তাকে অনুভব করি সেই শক্তিরই জ্ঞানের আলোকরূপে অন্যতর ক্রিয়ার প্রভাবে। আমার দেহবোধ আছে কারণ আমি নিজেই সে-দেহ হয়েছি; চিন্ময় সত্তার যে-শক্তি নিজের এই মূর্তি নির্মাণ করেছে—অর্থাৎ যে-শক্তি তার ক্রিয়া নিজের কাছে এই আকারে উপস্থাপিত করেছে—সেই শক্তিই তাকে এই মূর্তিতে, এই আকারে জানে। আমি নিজে যা, তা ছাড়া কিছুই আমি জানতে পারি না;

* দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং, নিজের গুণের দ্বারা উপহিত ভাগবত সত্তার আত্ম-শক্তি। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১।৩)

+ এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত বলে নয়,—আধি-ভৌতিক কোন সংজ্ঞাই তা হতে পারে না,—নিজের সন্ধানে চেতনার প্রথম নিঃসরণের আভাস এই শব্দে সব চেয়ে বেশী আসে বলে'।

অপরকে যে জানি তার কারণ তারাও আমি নিজেই,---আমার নিজের চিৎকেন্দ্রের নিকটতম সব অভিব্যক্তির মতনই সমানভাবে আমার সত্তাই, আপাতদৃষ্টিতে অনাত্ম, এইসব রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং বাহ্যই হ'ক আন্তরই হ'ক, দৈহিকই হ'ক চেতসিকই হ'ক, সব সংবেদনই, সংবোধের সব ক্রিয়াই, স্বরূপতঃ অভিন্ন।

কিন্তু চিন্ময় সত্তার এই স্পন্দন তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়বোধের যে-সব বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় সে-সবই হল তাঁর মূর্তিগ্রহণক্রমের সোপান পরম্পরার অনুযায়ী। কারণ, বিসৃষ্টিতে প্রথম হয় স্পন্দনের তীব্রতা যাতে সুনিয়ত ছন্দের সৃষ্টি হয়, বিশ্বসৃষ্টিতে রূপনির্মাণের যা হল মূলভিত্তি বা উপাদান; দ্বিতীয়তঃ হয় চিন্ময় সত্তার সেই ছন্দোময় গতিপ্রবাহের সংযোগ ও অন্যোন্যসংমিশ্রণ; তৃতীয়তঃ হয় সংযুক্ত সেই শক্তিপ্রবাহের সব বিভিন্ন গুচ্ছের রূপরেখা নিরূপণ---তাদের আকার; চতুর্থতঃ হয় এই নির্দিষ্টাকার প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনমত শক্তির অবিরাম উৎসারণ; পঞ্চমতঃ হয় গতিপ্রবাহের নির্ধারিত আকারপোষণের জন্য শক্তির সেই ক্রিয়াতেই শক্তির ব্যবহারিক সংরোধ বা সংহতি। সাংখ্যেরা বলেন যে, জড়পদার্থ সংগঠনের এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াই পঞ্চভূতরূপে বা---আকাশ, বায়বীয়, তৈজস, তরল ও ঘন---পদার্থের এই পঞ্চ অবস্থারূপে প্রতিভাত হয়। আর, স্পন্দনের ছন্দকে তাঁরা বলেন 'শব্দ' বা ধ্বনি---শ্রবণের ভিত্তি, অন্যোন্য সঙ্গমকে বলেন সন্নিকর্ষ---স্পর্শের ভিত্তি, আকার নির্ধারণকে বলেন রূপ---দর্শনের ভিত্তি, শক্তির উৎসারণধারাকে বলেন 'রস' বা দ্রব---আস্বাদনের ভিত্তি, ঘনীভূত অণুর বিকিরণকে বলেন 'গন্ধ'---ঘ্রাণের ভিত্তি। একথা অবশ্য বিশুদ্ধ বা সূক্ষ্ম জড় সম্বন্ধেই বলা হয়েছে; আমাদের জগতে পার্থিব জড়পদার্থ ত শক্তির বিমিশ্র ক্রিয়া, তাতে এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার বা পঞ্চভূতের কোনটিকেই, বেশ বিকৃত ভাবে ছাড়া, বিবিক্তরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সবই ত স্থূল ক্রিয়া বা প্রতীকের উদাহরণ মাত্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বরূপতঃ সব রূপায়ণই---এমনকি মনের রূপ, চরিত্রের রূপ বা আত্মার রূপের মতন সবচেয়ে সূক্ষ্ম, সব চেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় পর্যন্তও---কর্মপ্রবৃত্ত চিৎ-শক্তির এই পঞ্চপর্বক্রিয়া।

সুতরাং, সংজ্ঞানের বা মৌলিক সংবোধের অবশ্যই এই সবরকমের ক্রিয়াই গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে, তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রণালীতে জ্ঞাতা

ও জ্ঞেয়ের জ্ঞানে একত্ব সাধন করে' এর সব কটিকেই নিজের অঙ্গীভূত করে' নিতে সে অবশ্যই সক্ষম। রূপের সমগ্র মর্ম বিধৃত রয়েছে যে-সব স্পন্দনে সে-সবের তীব্রতার বা ছন্দের তার যে-বোধ তা-ই মৌলিক শ্রবণের ভিত্তি আর তারই বাহ্যতম ফল হল আমাদের পার্থিব শব্দ বা কথিত বাক্যের প্রতিবোধ। তেমনি আবার, চিন্ময় শক্তির অন্যোন্যসংযোগ ও সংমিশ্রণের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক স্পর্শের ভিত্তি; শক্তির রূপরেখা বা আকারের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক দর্শনের ভিত্তি; আর, সত্তার আত্মানন্দের যা রহস্য, সেই রূপের মধ্যে সার সত্তার উৎসারণের তার যে বোধ তাই হল মৌলিক স্বাদের ভিত্তি; শক্তির আকুঞ্চনের এবং সত্তার বস্তুর স্বতঃক্ষরণের তার যা বোধ তাই হল মৌলিক প্রাণন বা নিঃশ্বসনের ভিত্তি---স্থূলভাবে পার্থিব পদার্থে যা গন্ধরূপে প্রতিভাত হয়। যে-কোন লোকে, যে-কোন সাকার পদার্থ আশ্রয় করে' মৌলিক সংবোধের এই সব সার বৃত্তি কাজ করে' যাবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের উপযোগী আয়তন বা সন্নিবেশ সন্ধান করবে, নিজেদের ক্রিয়া সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে' নেবে।

সহজেই বোঝা যায় যে, ঊর্ধ্বতম চেতনাতে এই বহুমুখী সংবোধ যৌগিক একত্বে অভিন্ন হয়ে থাকবে,---ঠিক যেমন দেখেছি যে, সেখানে জ্ঞানের বহুবিধ ক্রিয়াও যৌগিক একত্বে সম্মিলিত থাকে। এমন কি, আমরা যদি কোন শারীর ইন্দ্রিয় বিচার করি,---যেমন শ্রবণ,---যদি যত্ন করে' লক্ষ্য করি যে, অন্তরস্থ মন কি করে' তাদের কাজ গ্রহণ করে, তাহলে দেখব যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কাজের মধ্যেই অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও সূক্ষ্মভাবে বর্তমান আছে। আমরা যাকে শব্দ বলি সে মন যে শুধু সেই স্পন্দনই অবগত আছে তা নয়, শব্দে যে শক্তি আছে আর আমাদের অন্তরের যে স্নায়বিক শক্তির সঙ্গে তা মিশ্রিত হয়---এই দুই শক্তির সঙ্গম ও আদানপ্রদানও সে অবগত আছে; শব্দের রূপরেখা বা আকার এবং যে-সব জটিল সম্বন্ধ ও সংযোগ দিয়ে শব্দ গঠিত হয় তাও সে অবগত আছে; শব্দের যা মূল বা যে উৎসারিণী চিৎশক্তি শব্দের উপাদান এবং যা শব্দের অনবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে' আমাদের স্নায়বিক সত্তাতে তার স্পন্দন দীর্ঘতর করে, সে মন তাকেও অবগত আছে; শক্তির আকুঞ্চন থেকে নিঃসৃত যে অণু স্পন্দপ্রবাহ যেন শব্দের সংহতি সৃষ্টি করে, আমাদের স্নায়ুর দ্বারা নিঃশ্বাসের মত যাকে আমরা আমাদের অন্তরে

আকর্ষণ করি সে মন তাও অবগত আছে। শক্তির এই ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ পার্থিব রূপ হল সঙ্গীত; আর এই সব সংবেদনই সঙ্গীতের দরদ বা সূক্ষ্ম রসানুভবের ও আনন্দের অঙ্গীভূত---এই সব নিয়েই গড়ে ওঠে সঙ্গীতে আমাদের শারীরিক রসবেদন ও স্নায়বিক সত্তার আনন্দ; এর যে-কোন একটার ন্যূনতা হলে'ই সেই পরিমাণে আমাদের আনন্দ ও রসবেদন কমে যাবে। পার্থিব চেতনার ঊর্ধ্বে এই যৌগিক একত্ব অবশ্যই আরও অনেক বেশী আর ঊর্ধ্বতম চেতনাতে নিশ্চয়ই সে আনন্দ সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তা ছাড়াও মূল সংবোধ অবশ্যই কর্মপ্রবৃত্ত সমগ্র চিন্ময় সত্তার নিগূঢ় সারস্বরূপের বোধ গ্রহণ করতে পারে---তাঁর স্ব-রূপে, শুধু তাঁর ক্রিয়ার অভিব্যক্ত ফল থেকে নয়; এবং সংবোধ যে চিৎ-সত্তার ক্রিয়ার ফল যথাযথভাবে অবধারণ করতে পারে তাও সে প্রতিভাসের পশ্চাতে সদ্বস্তুর এই গভীরতর সাক্ষাৎ অনুভবেরই পরিণাম বই নয়।

এই রকমে, আমাদের অন্তরের গভীরতম সত্যের আলোকে এ সবের বিচার করলে এবং বাহ্য প্রতিভাসের আবরণ ভেদ করে' তাদের পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এই ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়ের---প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ের, চক্ষুর চক্ষুর, শ্রবণের শ্রবণের---একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা করতে পারব। আত্মসমাহিত পরম নির্বিকল্প ব্রহ্মচেতনার কথা এই উপনিষদে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে সবিকল্পের উপর সেই নির্বিকল্পের দৃষ্টিপাতের কথা---সেই দ্রষ্টা ভাবই মহেশ্বর ও বিশ্বপ্রভু, বিশ্বাত্মা ও বিশ্ব-শাস্তা, সর্বাতিগ ও সর্বময়; আমাদের সত্তার বিভিন্নভূমিতে দেবতাদের সব ক্রিয়ার তিনিই বিধাতা, তিনিই নিয়ন্তা। তিনিই সবের বিধাতা, তাই আমাদের কোন কাজ বা কোন বৃত্তি তাঁর সৃষ্টিপ্রবৃত্ত দৃষ্টিপাতের মূল প্রকৃতির অঙ্গীভূত কোন না কোন বিভাবের শারীরিক বা চেতসিক পরিণাম বা প্রতিরূপ বই আর কিছু হতে পারে না---আমাদের ইন্দ্রিয় সে দিব্য সংবোধের এবং আমাদের দর্শন-শ্রবণ সে দিব্য দর্শন-শ্রবণের ছায়া বই নয়। আর সে দিব্য দর্শন-শ্রবণ শুধু পার্থিব পদার্থেই সীমাবদ্ধ নয়, তার গোচরের প্রসার অনেক বেশী, চিন্ময় সত্তার সব রূপ ও সব ক্রিয়াই তা গ্রহণ করতে সক্ষম।

পরাচেতনাকে নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ দর্শন-শ্রবণের জন্য আমরা যাকে দর্শন-শ্রবণ বলি তার উপর নির্ভর করতে হয় না। তার কাজ হয় সৃষ্টিপর সর্বগ্রাহী পরম সংবোধের দ্বারা, আমাদের শারীরিক দর্শন-শ্রবণ তারই

বাহ্য পরিণাম ও আংশিক ক্রিয়া। তবে, এ সবের কিছুই তার অজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত নয়, কারণ সে-চেতনা সবের বিধাতা ও প্রেরয়িতা সুতরাং সর্বজ্ঞ; কিন্তু সে জ্ঞান হয় 'পরং ধাম', ঊর্ধ্বতম লোক থেকে, সবই যার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত; কারণ তার আদিম ক্রিয়াই বেদের ভাষায় হল বিষ্ণুর সেই ঊর্ধ্বতম প্রক্রমণ যাকে ঋষিরা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুরূপে দর্শন করেন, 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং'।* তার দ্বারাই জীব তার দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য দেখে শোনে; কিন্তু সব ইন্দ্রিয়ই তার প্রকৃত উপযোগিতা লাভ করে, তাদের পরম স্বভাব ও অমর সত্তাতে উপনীত হয় শুধু যখন আমরা বাহ্য শারীর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অনুসন্ধান থেকে বিরত হয়ে, এমন কি চেতসিক সত্তাকেও অতিক্রম করে' এই অধ্যাত্ম বা স্বরূপ সত্তার দিকে ফিরি, যিনি অপর সবের উদ্ভব ও উৎস, জ্ঞাতা বিধাতা ও সাক্ষী, যিনি সবের উপাদান, যিনি সবের প্রকৃত মর্যাদা অবধারণ করেন।

আমাদের অন্তরের এই নিগূঢ় ও অতিচেতন আধ্যাত্মিক বিষয়সংবোধ থেকেই আসে শারীরিক ও চেতসিক সব ইন্দ্রিয়বোধের প্রকৃত সত্তা, তাৎপর্য এবং বাস্তবত্ব, নতুবা তাদের নিজস্ব এসব কিছুই নাই। তাতে উপনীত হলে' এই সব নিকৃষ্টতর ক্রিয়াবৃত্তি উন্নীত হয়ে তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সমগ্র জগতের এবং বিশ্বের সব বস্তুর বোধই পরিবর্তিত হয়ে অন্যতর জড়াতীত তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। অন্তর্যামী ঐশী চেতনাই আমাদের সব সংবেদন অনুভব করেন, আমাদের দৃষ্ট-শ্রুত সব দেখেন শোনেন; কিন্তু তাতে আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ বা বাসনা তৃপ্তির উদ্দেশ্য আর থাকে না, আদি-অন্ত-হীন, নিজের অমৃতত্বের গুণে শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ পরানন্দের আলিঙ্গনে তিনি সব বেঁধে দেন।

* ঋগ্বেদ, ১।২২।২০

১০

কিন্তু ব্রহ্মচেতনা ত শুধু আমাদের মনের মন, বাক্যের বাক্, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় নয়, আমাদের প্রাণেরও তা প্রাণ। অর্থাৎ, তা অস্তিত্বের পরম সার্বজনীন শক্তি এবং আমাদের দৈহিক জীবন ও যে-শক্তি তাকে পোষণ করে উভয়ই তার অবর পরিণাম, পাথিব প্রতীক, বাহ্য সঙ্কুচিত ক্রিয়া। আমাদের অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়াবৃত্তি যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর জীবন বা কার্য্যের জন্য এসব অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না; বরং সে-সবের তিনিই ঊর্ধ্বস্থ কারণ, সে-সব সেই প্রাণাতীত তত্ত্ব থেকেই রূপ নিয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ইংরাজী life কথাটা অল্পবিস্তর বহু অর্থভেদে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উপনিষদে ও যোগের ভাষায় সুপরিচিত 'প্রাণ' শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ হল প্রাণশক্তি—হয় স্বরূপতঃ, না হয় তার ক্রিয়াবৃত্তি থেকে অনুমিত। 'প্রাণ' শব্দের লৌকিক অর্থ অবশ্য দৈহিক শ্বাস প্রশ্বাসই ছিল, সুতরাং অতি-সাধারণ ও স্থূল অর্থে তাতে জীবন বা প্রাণবায়ুই বোঝাত; কিন্তু উপনিষদে ব্যবহৃত প্রাণ শব্দের তাত্ত্বিক তাৎপর্য তা নয়। উপনিষদের 'প্রাণ' হল স্বয়ং জীবনীশক্তি; মেনে নেওয়া হত যে, পঞ্চধারায় সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে সে তার কাজ করে যাচ্ছে; তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে' নাম দেওয়া হয়েছে, দৈহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তার প্রত্যেকটিই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই অবশ্যপ্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ-শক্তির প্রধানতম—পাঁচটির মধ্যে প্রথম—প্রবাহের একটি ক্রিয়া মাত্র, স্বাভাবিক অবস্থাতে দেহের আধারে জীবনীশক্তিকে পোষণ ও পরিবেশন করতে সেই শক্তিই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য; কিন্তু তাকেও স্তম্ভন করা চলে আর তাতে জীবন যে নষ্ট হবেই তা নয়।

জৈব তেজ বা প্রাণশক্তির অস্তিত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করে না, কারণ প্রকৃতির বাহ্যতম ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই তার ব্যবহার, স্থূল উপরিচর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুরই প্রকৃতজ্ঞান তার এখনও হয়নি। এই প্রাণ বা জীবনীশক্তির স্বরূপ শারীরিক নয়, এ শক্তি জড়ীয় নয় বরং এ একটা পৃথক তত্ত্ব যা জড়কে ধারণ করে এবং জড়ে যা নিবর্তিত আছে। সব আকার সে-ই ধারণ করে' আছে, সব আকারে সে-ই ব্যাপ্ত হয়ে আছে আর সেই শক্তি ব্যতীত কোন স্থূল আকারই উৎপন্ন বা স্থায়ী হতে পারত

না। বিদ্যুৎ প্রভৃতি সব জড়শক্তির মধ্যেই সে কাজ করে, আর এসব জড়-শক্তির মধ্যে যা শুদ্ধশক্তির নিকটতম তার মধ্যেই তার প্রকাশ হয় সবেচেয় বেশী; সে-শক্তি না থাকলে এসব কোন জড়শক্তিই বর্তমান থাকতে বা কাজ করতে পারত না কারণ এসবের স্রোত ও গতি দুই-ই উদ্ভূত হয়েছে সেই শক্তি থেকে, এরা সব তারই বাহন। তবে, এসব জড়ীয় বিভাবই প্রাণের প্রয়োগের ক্ষেত্র বা তার রূপভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ প্রাণ হল শুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি, এসবের হেতু বা পরিণাম নয়। সুতরাং জড়ীয় কোন বিশ্লেষণেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে না; জড়ীয় বিশ্লেষণ পারে শুধু প্রাণের প্রয়োগফলে যে-সব স্থূল ব্যাপার ঘটে, প্রাণের স্পর্শ বা ক্রিয়ার যা বাহ্যনিদর্শন বা প্রতীক, তাদের সব সমবায়ের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করে' দেখাতে।

তাহলে আমরা তার অস্তিত্ব অবগত হই কি উপায়ে? দেহ-মন বিশুদ্ধ করে' সংবেদন ও জ্ঞানের করণগুলিকে সূক্ষ্মতর করে', আর তা সম্ভব হয় যোগের দ্বারা। তাতে বস্তুপিণ্ডের স্থূল উপাদান নির্ণয় করা ছাড়া অন্যপ্রকারের বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমাদের হয়: আমরা বিশুদ্ধ মনোময় তত্ত্বের ক্রিয়াকে জড়-তত্ত্বের ক্রিয়া থেকে পৃথক রূপে চিনতে পারি, আর তাদের উভয় থেকে পৃথক করে', যে-জৈব বা প্রৈতি-তত্ত্ব, তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে ও তাদের ধারণ করে তার ক্রিয়াকেও বিবিক্ত ভাবে দেখতে পারি। আর, সে কেবল স্থূল দেহেই নয়; যোগের দ্বারা সন্ধান পাওয়া যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থাতে আমরা যে-দেহকে জানি তার অভ্যন্তরে, তাকে পোষণ ও ধারণ করে' আছে আমাদের সত্তার আর এক সূক্ষ্ম বিগ্রহ; আর সে-দেহে প্রবাহিত প্রাণের ধারাও আমরা বিবিক্ত করে' নির্ধারণ করতে পারি। সাধারণতঃ তা সাধিত হয় প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও সংযমন করে'। দেহের এবং দেহাশ্রিত জীবন ও মনের স্বাভাবিক সব ব্যাপার সম্পাদনের জন্য প্রাণশক্তির যে-সব সাধারণ সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ার বেশী কিছু প্রকৃতির প্রয়োজন হয় না সে-সবকেই হঠযোগীরা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে, সংযম করতে, অতিক্রম করতে বা স্তম্ভিত করতে পারেন এবং যেসব পথ ধরে' নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে সে-শক্তি তার সব কাজ করে তাও তিনি জানতে পারেন। তাই, তাঁর দেহকে দিয়ে তিনি এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে অতিপ্রাকৃত বলে' মনে হবে; ঠিক যেমন, জড়-

বিজ্ঞানী জড়শক্তির ক্রিয়ার ধারা জানেন বলে' সে-সবকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা আমাদের কাছে যাদুবিদ্যা বলে' মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সে-সবের নিয়ম ও কার্যক্রম বিশদ করে' প্রকাশ না করেন। কারণ, এই স্থূল দেহে জীবনের সব ক্রিয়াই—স্বাভাবিক নিত্য ক্রিয়া বা সর্বদা সম্ভাবনীয় বলে' যাকে সহজেই ফুটিয়ে তুলে কাজে লাগান যেতে পারে সে-সব ত বটেই, গভীরে নিহিত যেসব ক্রিয়াবীজের উদ্‌গম-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে' আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাতে কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হয় সেসব ক্রিয়াও—নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণশক্তির দ্বারা।

শুধু দেহাশ্রিত জীবনের নয়, সজীব দেহাশ্রিত মনের সব কাজও এই প্রাণশক্তিই চালায়। সুতরাং প্রাণশক্তি নিয়মনের দ্বারা আমাদের দৈহিক ও জৈব ক্রিয়াবৃত্তি সব নিয়ন্ত্রিত করে' সেসবের সাধারণ কার্যক্ষমতা যেমন অতিক্রম করা যায়, তেমনি আবার মনের ক্রিয়াবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করে' তার সাধারণ কর্মক্ষমতাও অতিক্রম করা যায়। প্রকৃত পক্ষে মানব-মনকে সর্বদাই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ মনের প্রকাশ হয় দেহকে অবলম্বন করে' আর দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটায় প্রাণ-শক্তি; সুতরাং প্রাণশক্তির যতটা সে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে বা নিজের অভিপ্রায়ের অনুগামী করতে পেরেছে শুধু সেই পরিমাণেই মন তার শক্তি বিস্তার করতে পারে। সুতরাং যে-পরিমাণে কোন যোগী প্রাণশক্তিকে সংযত করতে সমর্থ হন এবং সে-শক্তি প্রয়োগ করে' যে-সব চক্র বা নাড়ীকেন্দ্রে প্রাণশক্তি এখনও শ্লথগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে বা আংশিক ভাবে কাজ করছে তাদের উন্মুক্ত করতে পারেন সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত মন-ইন্দ্রিয়-চেতনার সব ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারেন। এই সবকেই বলা হয় যোগের বিভূতি বা অলৌ-কিক শক্তি আর সে-সব স্বতঃই প্রকটিত হয় যখন যোগী প্রাণশক্তি সংযমের সাধনাতে অগ্রসর হন এবং সে শক্তি-প্রবাহের সব প্রণালী শোধন করে' সূক্ষ্ম অন্তশ্চর সত্তার সঙ্গে স্থূল শারীর বহিশ্চর অস্তিত্বের আদানপ্রদানের পথ খুলে দিতে পারেন।

অতএব, প্রাণ হল জৈব বা স্নায়বিক শক্তি, দেহমনের সব ব্যাপার সে বহন করে, তারা তাকে যেন রথে অশ্বের মত যোজনা করেছে, মন নিজের অভিলষিত পথ বেয়ে নিজের বাসনার লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই, তার বর্ণনাতে উপনিষদ বলেছে 'যুক্ত', 'প্রৈতি',

'প্রণীয়তে'––যোজনা করা হয়েছে, এগিয়ে চলেছে, আগে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঋগ্বেদে প্রাণশক্তিকে সর্বদা অশ্বের রূপকে সংজ্ঞিত করা হয়েছে আর এই সব উপমাতে সেই বৈদিক রূপকই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রকৃত-পক্ষে, জগতের সব কাজ সেই শক্তিই করে, অবশ্য সচেতন বা অবচেতন মনের নির্দেশ পালন করে' এবং জড়শক্তি ও জড় আধারের ধর্ম ও সীমা সব মেনে নিয়ে। মন যেমন আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-গতিবৃত্তি এই শারীর ও প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের ভূমিতে এবং অজ্ঞানের উপাধিত্রয়ের সীমার মধ্যে ব্রহ্মের জ্ঞানের দিককে বা জ্ঞাতৃ-চৈতন্যকে প্রতিমূর্ত করে, এবং দেহ যেমন সেই একই ভাবে প্রাতিভাসিক জগতে বিভাজ্য পদার্থের ছদ্মবেশে পরম সৎস্বরূপের সত্তাকে প্রতিমূর্ত করে, তেমনি প্রাণ বা জীবনী-শক্তি প্রাতিভাসিক সববস্তুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে তাঁর নিজের সত্তার সব অভিব্যক্তির শাস্তা-ভোক্তা-মহেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি বা কর্মপ্রবৃত্ত প্রৈতিকে প্রতিরূপিত করে। সেই সার্বভৌম শক্তি প্রতি অণুতে, প্রতি কণাতে বিদ্যমান রয়েছে এবং যে অবিরাম গতিপ্রবাহ ও আদানপ্রদান দিয়ে জগৎ গঠিত তার প্রতি তরঙ্গে, প্রতি উচ্ছ্বাসে সেই শক্তিই কাজ করছে।

তবে, যেমন মন চিন্ময় সত্তার এক নিম্নতর অভিব্যক্তি মাত্র আর তার ঊর্ধ্বে রয়েছে সে অজ্ঞান মনের নিয়ন্তা সম্বিৎ-ইচ্ছা-জ্ঞানের দিব্য অসীম তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম তাঁর নিজের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি অবগত হন সেই তত্ত্ব দিয়ে, মন দিয়ে নয়, প্রাণশক্তির বেলাতেও ঠিক তাই। আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তি প্রকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ হল বাসনা, ক্ষুধা এবং ভোগ্যবস্তুকে গ্রাস করে' ভোগ করা; আর তার ক্রিয়া ও গতির ধারা হল অধিকার করবার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে সন্ধান করা এবং কাম্য বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে', বেষ্টন করে', তাতে প্রবেশ করে' তাকে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করা।* এই বাসনা ও মর্ত্যসম্ভোগের বায়ুতে প্রকৃত জীবন গঠিত হতে পারে না বা দিব্যশক্তি কাজ করতে পারে না, যেমন অজ্ঞান অনিশ্চিত অন্ধপ্রায় সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত মনের সংজ্ঞা নিয়ে পরমজ্ঞানের চিন্তার কাজ চলে না। মনের ক্রিয়া-বৃত্তি যেমন দ্বৈতবোধ ও অজ্ঞানের ভাষাতে সত্যের

* 'প্রাণ' অর্থে 'অশ্ব' শব্দ ব্যবহার করে' বেদের ঋষিরা এই সবগুলি অর্থই বোঝাতে চেয়েছিলেন কারণ 'অশ্ব' শব্দের মূল ধাতুর এই সব অর্থই করা যায়, যেমন ঃ––'আশ্' (আশা), 'অশনা' (ক্ষুধা), 'অশ্' (আহার), 'অশ্' (ভোগ), 'আশু' (দ্রুত), 'অস্', 'অচ্' (গতি, প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি), ইত্যাদি।

অনুবাদ মাত্র, পরমচেতনা ও জ্ঞানের প্রতিফলন মাত্র, তেমনি এই প্রাণ-শক্তি'র গতি-বৃত্তিও পরাশক্তি'র ক্রিয়ার সেই একই প্রকারের প্রতিরূপ বই নয়; আর সে পরাশক্তি যে উর্ধ্বতর সত্যতর অস্তিত্বকে অভিব্যক্ত করছে তা সেই পরম চেতনা ও জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তা অশনা বাসনা বা ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগের বাধাব্যাহত ক্রিয়া থেকে মুক্ত। এখানে যা বাসনা সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেম, এখানে যা ক্ষুধা সেখানে তা অবশ্যই নিস্পৃহ পরিতৃপ্তি, এখানে যা সম্ভোগ সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, এখানে যা দ্বিধাজড়িত অন্ধক্রিয়া সেখানে তা অবশ্যই অমোঘ স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি। আমাদের প্রাণের যে প্রাণ এই নিম্নতর ক্রিয়াকে পোষণ করে' তার লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিত করছে এই-ই তার স্বরূপ। ব্রহ্ম এই বায়ুতে নিঃশ্বাস নেন না, এই জীবনীশক্তি এবং তার জন্মমৃত্যুরূপ দ্বৈতের দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করেন না।

তাহলে, আমাদের এই প্রাণের প্রাণ কি বস্তু? সে-ই পরাশক্তি,* নিজের জ্যোতির্ময় সত্তাতে কর্ম-প্রবৃত্ত পরম চিন্ময় পুরুষেরই অনন্ত শক্তি। স্বয়ম্ভূ আত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত, তাঁর আত্মানন্দ পরিপূর্ণ; সে আত্মজ্ঞান স্বরূপতঃ কালাতীত ও স্বরাট, তবে কর্মপ্রবৃত্তিতে তার প্রকাশ হয় সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম অন্তহীন চেতনার শক্তিরূপে। কারণ, তাঁর অস্তিত্বের দুইটি কোটি আছে: একটি হল শুদ্ধ নৈস্তব্ধ্য এবং শুদ্ধ অদ্বয়ত্ব, অপরটি হল শাশ্বত প্রৈতি এবং তাঁর নিজের সঙ্গে সর্বময়ের একাত্মত্ব; আর সে প্রৈতি নৈস্তব্ধ্যেই নিত্য আশ্রিত। এই হল সত্য অস্তিত্ব—যে পরমপ্রাণ থেকে আমাদের প্রাণ উৎসারিত; এই-ই অমৃতত্ব আর আমরা জীবন বলে' যাকে আঁকড়ে ধরে' রাখি সে হল "মৃত্যুরূপী অশনা"।+ সুতরাং চেতনাকে আলোকিত করে' এবং জীবন-মৃত্যুর মিথ্যা প্রাতিভাসিক সংজ্ঞা অতিক্রম করে' এই অমৃতত্বে উপনীত হবার লক্ষ্য প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই রাখতে হবে।

কিন্তু এই প্রাণশক্তি'র ক্রিয়া যতই নিকৃষ্ট হক না কেন তার অতিশয়ী যে বৃহত্তর শক্তির সে প্রতিরূপ তারই সত্তা-ইচ্ছা-আলোকের দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হচ্ছে; সেই তৎ-স্বরূপের দ্বারাই সে তার নানা পথ বেয়ে 'প্রণীত' বা অগ্রে চালিত হচ্ছে যে-লক্ষ্যের দিকে, তার নির্দেশ পাওয়া যায় তার নিজেরই অস্তিত্ব থেকে, তারই গতি ও প্রকাশ ধারার ত্রুটি দেখে।

* তপস্ বা চিৎশক্তি

+ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।২।১

জীবন নামে অভিহিত এই মৃত্যু সেই আলোরই কাল ছবি, উপরন্তু সে-ই হল আমাদের উত্তরণের সরণী, সেই পথ ধরেই সত্তার রূপান্তর সাধন করে' আমরা জড়ের মৃত্যু-নিদ্রা থেকে আত্মার অমৃতত্বে উপনীত হব।

১১

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে স্বল্পাক্ষর অর্থগর্ভ বাক্যে, উপনিষদের রীতিতে, যা বলা হয়েছে তার ভাব তাহলে দাঁড়ায় যে, মন ইন্দ্রিয় বা জৈব ব্যাপার, যে সব নিয়ে আমরা ব্যাপৃত থাকি, তা আমাদের অস্তিত্বের সবটা ত নয়ই, প্রধান অংশও নয়; তা আমাদের ঊর্ধ্বতম সত্তা নয় তার অস্তিত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, সে নিজের স্বতন্ত্র প্রভুও নয়। তার ওপারে আছে কিছু যার সে বসনপ্রান্ত, অবর পরিণাম ও গৌণক্রিয়া; এই মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্তিকর, আংশিক ও বিভক্ত চেতনা ও ক্রিয়াকে গড়ে তুলে এক অতিচেতন অস্তিত্ব তাকে পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। উপরতলের এই বহিশ্চর চেতনাকে অতিক্রম করে', সেই অতিচেতনার দিকে অধিরোহণ করে' তাতে প্রবেশ করাই হল আমাদের প্রগতির পথ ও লক্ষ্য, সেই আমাদের নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা।

আমাদের বর্তমান অস্তিত্বকে এ উপনিষদে অবাস্তব বলা হয় নাই, অসম্পূর্ণ ও নিম্নতর বলা হয়েছে। এখানে আমরা যা অনুসরণ করি তা হল অস্তিত্বের ঊর্ধ্বতর ভূমিতে পরম পরাকাষ্ঠারূপে যা নিত্য বর্তমান তারই অপূর্ণ প্রতিরূপ ও আংশিক বিভক্ত ক্রিয়া। আমাদের মন তার বিষয়ের অধিকার থেকে ভ্রষ্ট, সংশয়ে দোলায়িত, অন্ধপ্রায়, ভ্রম-অক্ষমতার দ্বারা অবরুদ্ধ; বস্তুর বাহ্যরূপের প্রতীতির উপর তার ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত; তবু সে যে অতিচেতন জ্ঞানের ছায়া সে-জ্ঞান সব বস্তুর সত্যই দর্শন করে, প্রকাশ করে, যথাযথরূপে প্রয়োগ করে কারণ তার কাছে কিছুই বাহ্য বা অনাত্ম নয়, তার সর্বগ্রাহী আত্মপ্রতীতিতে বিভক্ত বা স্ববিরোধী কিছুই নাই। সে-ই আমাদের মনের মন। আমাদের বাক্য পরিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রবৎ চালিত, বস্তুর বাহ্যরূপই অপূর্ণভাবে সে বিবৃত করে, মনের সংকীর্ণ পরিধিতে তা সঙ্কুচিত, ইন্দ্রিয়ের আপাতবোধের উপর তা প্রতিষ্ঠিত; তবু আমাদের মন ও বাক্য যে-সব আকার উপলব্ধি বা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে সেসবের নির্মাতা, পরম-অভিব্যঞ্জক সৃষ্টিপর পরাবাকেরই সে দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও অজ্ঞান প্রতিস্পন্দন। আমাদের ইন্দ্রিয় হল আমাদের চেতনার উপাদানের যে গতি-বৃত্তি বাহ্য অভিঘাতের প্রতিস্পন্দন তুলে, বিভিন্নপথে কেন্দ্রাভিসারী প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বহু আয়াসে তাদের মর্মগ্রহণ করতে চেষ্টা করে ; তবু সে যার দোষবহুল প্রতিচ্ছবি সে পরমসংবোধ

দিব্য অসীম অস্তিত্বের আত্মতৃপ্ত ক্রিয়াপ্রসঙ্গে পরম মন ও বাক্যের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ও যুগপৎ, সম্পূর্ণ ও সুষমভাবে একাত্ম হয়ে সে-সব ভোগ করে। আমাদের প্রাণ হল সাকার দেহমনের সঙ্গে সংযুক্ত, গতি-শক্তি-ভোগধর্মী নিঃশ্বাস বায়ু; তার আকারের সীমায় সে পীড়িত, তার শক্তি ক্ষুদ্র, তার গতি বাধাখণ্ডিত, তার অধিকার রিপুবেষ্টিত আর তাই সে বিরোধে ভরা--নিজের সঙ্গে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সদা বিগ্রহে রত; সে ক্ষুৎপীড়িত ও অতৃপ্তকাম, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অস্থিরচিত্তে ধাবমান ও বহুবিষয় একযোগে ধারণ ও গ্রহণ করতে অক্ষম; সে ভোগ করে ভোগ্যবস্তুকে গ্রাস করে', তাই তার সম্ভোগ হয় ক্ষণস্থায়ী। তবু সে এক অখণ্ড অসীম প্রাণের ক্ষুদ্র ভগ্নগতি বই নয় আর সে-প্রাণ সর্বরাট সর্বপ্রভু ও নিত্য-তৃপ্ত; কারণ, সববস্তুর মধ্যেই সে তার শাশ্বত দেশকাল-নিমিত্ত-মুক্ত সত্তাকে ভোগ করে--দেশবিভাগ তাকে আবদ্ধ করে না, কালগতি তাকে অধিকার করে না, কার্যকারণ বা নিমিত্তের পৌর্বাপর্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

এই এক অদ্বিতীয় অতিচেতন অস্তিত্ব নিজের আত্মসংহত শাশ্বত শান্তি ও সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম ক্রিয়াশক্তি উভয়ই অবগত আছেন; আমাদের বিশ্ব-অস্তিত্বও তিনি জানেন, তাকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করে' আছেন, নিগূঢ় থেকে তাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, সর্বশক্তিমানরূপে তাকে শাসন করছেন। তিনিই ঈশোপনিষদের ঈশ্বর, তাঁর শক্তির সমস্ত সৃষ্টিতে, "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ",* চিরচঞ্চল জগতীতত্ত্বের সমস্ত গতিতে, তিনিই বাস করেন। তিনিই ব্রহ্ম, আমাদের আত্মা এবং আমরা--আমাদের সত্তা, ক্রিয়া সব--গঠিত যে উপাদানে এবং যাঁর দ্বারা। মর্ত্যজীবন সেই তৎ-স্বরূপেরই দ্বিদল প্রতিকৃতি, তাঁরই ভাব-ও অভাবাত্মক দুই বিরোধী প্রত্যবয়ব। তাঁর ভাবাত্মক অবয়ব যা এখনও অর্জন করতে পারে নি সে-সবকে কাল ছায়ামূর্তির আবরণে ঢেকে তাদের পুষ্টির সহায়তা করছে মৃত্যু-দুঃখ-অক্ষমতা, বিভাজন-সীমাবন্ধন প্রভৃতি তাঁর অভাবাত্মক অবয়ব: জীবনের কাছ থেকে অমরত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে মৃত্যুরূপে, ভোগ-সুখের কাছ থেকে আনন্দ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দুঃখ-বেদনারূপে, সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র প্রয়াসের কাছ থেকে অসীমশক্তি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে অক্ষমতারূপে, বাসনার কাছ থেকে প্রেমের একান্ত মিলন নিজেকে লুকিয়ে

* ঈশোপনিষদ, ১

রেখেছে বিরোধ-রূপে, অর্জনের কাছ থেকে একাত্মত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বিভাজনরূপে, পুষ্টির কাছ থেকে আনন্ত্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সীমাবন্ধন-রূপে। ভাবাত্মক অবয়বগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্রহ্ম কি, যদিও ব্রহ্ম যা তারা তা কখনই নয়; তথাপি তাদের জয়ে—দেবতাদের জয়ে—ব্রহ্মের জয় হয় তাঁরই অভাবাত্মক প্রতিষেধের বিরুদ্ধে, ভূমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় স্বল্পে অবরুদ্ধ তমসাচ্ছন্ন স্থূলরূপের দ্বারা তার প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে। তবু, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এই ভূমামাত্রই নন, তিনি নির্বিশেষ কেবল আনন্ত্য। আর সেই জন্যই, এই দ্বৈতময় স্থূলরূপের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মাতে, আমাদের ঊর্ধ্বতম সত্তাতে, অধিরোহণ করতে পারি না; তাকে পেতে হলে এসব ছাড়িয়ে যেতে হবে। এই দ্বৈত অস্তিত্বের ভাবাত্মক অবয়বগুলি অনুসরণ করে', দেহ-প্রাণ-মনের দেবতাদের পূজা করে' আমরা আমাদের আত্মার প্রকৃত সাধনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি মাত্র; যদি আমরা আমাদের প্রকৃত সার্থকতা চাই তাহলে এই নিম্নতর ব্রহ্মকে বর্জন করে' ঊর্ধ্বতর ব্রহ্মকে জানতে হবে। যেমন, মনকে পরিপুষ্ট করে' আমরা মনোময় জীবে পরিণত হই, "ধীরাঃ"—ধীশক্তি ও ধী-সম্পদে সমৃদ্ধ হই, যাতে মনের চিন্তার দ্বারা মনকেই অতিক্রম করে' আমরা পরম শাশ্বতে যেতে পারি। কারণ, ইন্দ্রিয় ও মনের জীবন চিরকাল মৃত্যু ও সীমাবন্ধনের অধিকারে থাকবে, অমৃতত্ব আছে তার ওপারে।

সুতরাং বিজ্ঞব্যক্তিরা, ভাস্বর ধীশক্তিতে অধিষ্ঠিত কৃতবিদ্য জীবেরা, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বৈত পরিহার করে' এই বিশ্ব ছেড়ে অগ্রসর হন, ওপারে একত্ব ও অমৃতত্বে গমন করেন তাঁরা। এখানে অগ্রসর হওয়া অর্থে যে-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে মৃত্যুপ্রয়াণও বোঝায়; সেই শব্দই আবার এই উপনিষদে অন্যত্র ('প্রাণঃ প্রৈতি যুক্তঃ' এই বাক্যে) ব্যবহৃত হয়েছে দেহাশ্রিত মনের রথে যোজিত প্রাণশক্তির জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার অর্থে। এই সমার্থকতা থেকে দুটি অতি সারগর্ভ নির্দেশ পাওয়া যায়।

অস্তিত্বের অপর কোন অনুকূলতর লোকে গিয়ে অমৃতত্ব সন্ধান করবার উদ্দেশ্যে এই পার্থিব জীবন পরিহার করে' সেই মহৎ সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হবে না। 'ইহৈব', এখানেই, এই মর্ত্য জীবনে ও দেহে সেই অমৃতত্ব অর্জন করতে হবে, এই দেহাশ্রিত জীবের দ্বারাই সেই ঊর্ধ্বতর ব্রহ্মকে জানতে ও পেতে হবে। 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ', এখানে যদি

তাঁকে না জানা যায় তবে মহা সর্বনাশ। আমাদের মধ্যে এই প্রাণশক্তি পরম জীবনের আকর্ষণে অগ্রে নীত হয়ে তার অবিরাম অর্জনের পথ বেয়ে ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে ক্রমে এমন এক বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয় যেখানে তাকে একেবারে এগিয়ে যেতে হবে, এই মর্ত্যজীবন––বিশ্ব-বস্তুর এই মৃত্যুগ্রস্ত প্রতীতি––অতিক্রম করে' সবের অতীত কিছুর দিকে সর্বতোভাবে প্রয়াণ করতে হবে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করা পর্যন্ত এই প্রয়াণকে বর্ণনা করা হয় মৃত্যু নামে এবং মৃত্যুহীন পরলোকে গমন বলে'; এখানে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অমৃতত্বের যে-রূপ উপলব্ধি করা হয়েছে তারই অনুরূপ ভাবের অমৃতত্ব সে-সব লোকে আস্বাদন করা যায়, কিন্তু তাতে মৃত্যুর ও সীমাবন্ধনের আকর্ষণ অতিক্রম করা হয় না; কারণ, তার আবরণে অমৃতত্ব-অসীমত্বের কিছু না কিছু ঢাকা থাকে যা এখানে আমাদের পাওয়া হয় নি, সুতরাং প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতাও থাকে, মর্ত্যদেহে পুনর্জন্মের সনির্বন্ধ প্রয়োজন থাকে আর তাকে জয় করা যায় না যতক্ষণ না ব্রহ্মের সব প্রতিরূপ অতিক্রম করে' সেই অসীম অদ্বিতীয় অমৃতের পরম স্ব-রূপে অধিরোহণ করা হয়।

এ উপনিষদে যে-সব লোকের কথা বলা হয়েছে তত্ত্বতঃ সেসব হল বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা, বিশ্বের দেশগত বিভাগ নয়। এই জড়বিশ্বও ত অস্তিত্বেরই একটা বিশেষ রূপ, যে-রূপে আমরা অস্তিত্বকে দেখি যখন আমাদের জীব জড়ীয় গতিবৃত্তি ও জড়ীয় অনুভবের ভূমিতে অবস্থান করে, যখন আত্মা আকারে অভিনিবিষ্ট হয়ে যায় আর সেই কারণেই সে তার জীবনের সাহায্যে যে পরিধির মধ্যে চলাফেরা করে এবং তার চেতনা দিয়ে যে উপাধি অবলম্বন করে সে-সবই নির্ণীত হয় অন্তহীন বিভাজন-সংযোজন তত্ত্বের দ্বারা, অর্থাৎ জড়ের, সাকার পদার্থের স্বধর্মের দ্বারা। সে-ই তখন হয় তার জগৎ, তার বিষয়দর্শন। এবং আত্মার যে অবস্থাতে, যে-লোকেই, জীব অধিরোহণ করে তার বিষয়দর্শনও পরিবর্তিত হয়ে সেই অবস্থা বা লোকের অনুরূপ হয়, এবং সেই পরিধির মধ্যে তার জীবনের গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকে, তার চেতনা সেই উপাধিকেই অবলম্বন করে। এই হল প্রাচীন ঐতিহ্যের সব লোক।

কিন্তু যে-জীব অমৃতত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন এ-সব লোক তিনি অতিক্রম করে' চলে যান, সব উপাধি থেকে তিনি মুক্ত হন। তিনি পরমেশ্বরের সত্তাতে প্রবেশ করেন এবং সেই অতিচেতন আত্মন্ ও ব্রহ্মের

মতই জীবন মরণের বশীভূত হন না। তিনি জন্মান্তর চক্রে প্রবেশের প্রয়োজনের অধীন নন, নিয়ত জন্মমৃত্যু ও ভাবাভাবের দ্বৈতবন্ধনের মধ্যে যাতায়াত করতে বাধ্য নন, কারণ নামরূপ তিনি অতিক্রম করেছেন। এই বিজয়, এই পরম অমৃতত্ব তাঁকে এখানেই, মর্ত্য স্থূল পরিবেশে দেহ-ধারী জীবের অবস্থাতেই অর্জন করতে হবে। পরে, ব্রহ্মেরই মত বিশ্ব অস্তিত্ব অতিক্রম করে' এবং তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে', তার অধীন না হয়ে তিনি তাকে স্বীকার করতে পারেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সার্থকতা অধিগত হবে জীবের এই বিকারী ব্যক্তিরূপের বন্ধন থেকে মুক্তির দ্বারা, সেই এক সর্বময়ে আত্ম-উন্নয়নের দ্বারা। পরে যদি কখনও তিনি মর্ত দেহে জন্মগ্রহণ করেন তাতে সে বিগ্রহ ধারণ করা হয় মাত্র, তার অধীনতা স্বীকার করা হয় না; তাতে বিশ্বকে সাহায্য করা হয়, বিশ্ব থেকে কোন সাহায্য নেওয়া হয় না; অতিচেতন সত্তার জীবে অবতরণ হয় তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়, বিশ্বপ্রয়াসের সার্বজনীন প্রয়োজনে---যারা এখনও অমুক্ত, অকৃতার্থ তাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করে' সাহায্য করতে, যে-শক্তি নিজের অভিজ্ঞতার ফলে প্রগতির পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম করে চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে এবং সেই একই অবস্থার মধ্যে এ পরমব্রত উদ্‌যাপন করেছে এবং এ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছে।

১২

আমরা কি এবং ব্রহ্মই বা কি, এই স্বরূপগত পার্থক্য বিবেচনা করে', মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের ভাব থেকে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর পরাচেতনার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে রূপান্তর সাধনের কি উপায়——সে-প্রশ্ন বিচার করবার পূর্বে আর একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে। পরিষ্কার করে' উত্থাপন করা না হলেও এ উপনিষদে সে-প্রশ্ন ধরে' নিয়ে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, তার সমাধানের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে এবং তাতে যে আপাত-বিরোধ রয়েছে সূক্ষ্মতম প্রভেদ দেখিয়ে তার পুনরুক্তি করা হয়েছে।

ব্রহ্মের ঐশী চেতনা পেতে হলে আমাদের এই বিশ্বে প্রকৃতির ক্রিয়ার অধীন সৃষ্টজীবের ক্ষুদ্রতর ভাব সব বর্জন করতে হবে; কিন্তু সে ঐশী চেতনা যতই উচ্চ বা বিরাট হোক না কেন, এই বিশ্বের সঙ্গে, জগতের গতির সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ তার অবশ্যই আছে; সব সম্বন্ধের অতীত অব্যবহার্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম তা হতে পারে না। যে চিন্ময় সত্তা আমাদের মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের শাস্তা-ভর্তা-স্রষ্টা তিনি মহেশ্বর; কিন্তু যেখানে সাপেক্ষ কোন বিশ্ব নাই সেখানে কোন মহেশ্বর থাকাও সম্ভব নয়, কারণ যেখানে কোন গতি বা ক্রিয়াই নাই সেখানে শাসন বা অতিক্রম করবার কথাই ওঠে না। তাহলে কি মহেশ্বর (পরবর্ত্তী যুগের ভাষায়) মায়ার স্রষ্টা না হয়ে বরং মায়ারই সৃষ্ট হন না? সকল বিশ্বই অতিক্রম করে' গেলে বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরও কি বিলুপ্ত হন না? পরম সদ্বস্তু কি সব বিশ্বের ওপারে অবস্থিত নন? তবে, যা আমাদের জানতে হবে, পেতে হবে সে কি আমাদের মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, প্রাণের প্রাণ, বাক্যের পশ্চাতে বাক্ না হয়ে সেই একমাত্র বিশ্বাতীত সদ্বস্তুই হয় না? আমাদের যেমন সব কার্যের পশ্চাতে পরম কারণে যেতে হবে, তেমনই কি পরম কারণকেও অতিক্রম করে' যাতে কার্যকারণ কিছুই নাই তাতে যেতে হবে না? বেদে উপনিষদে যে অমৃতত্বের কথা বলা হয়েছে তাও কি একটা ক্ষুদ্র বস্তুমাত্র নয়? আর তাকেও কি অতিক্রম করতে, বর্জন করতে হবে না? এবং যেখানে মরত্ব-অমরত্বের অর্থ লোপ পায় সেই চরম অনির্বচনীয়কে পেতে চেষ্টা করতে হবে না?

অবশ্য, এ-ভাবে বা এ ভাষাতে উপনিষদের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়

নি; বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবে আমাদের চিন্তার পুরাতন রূপ লোপ পেয়ে দার্শনিক সংজ্ঞা ও ভাষা পরিবর্তিত হবার পূর্বে তা সম্ভবপর ছিল না। বিশ্বেশ্বর যেমন বিশ্বে যা-কিছু আছে সে-সবের চরম নিরপেক্ষ সত্য, তেমনি সেই বিশ্বেশ্বরের চরম সত্য ও অনপেক্ষ কৈবল্যরূপী অনির্বচনীয় সৎ-ও এ উপনিষদের অজ্ঞাত নয়। আর মানুষের মন একমাত্র যে-ভাবে তাঁর কথা বলতে পারে সেই ভাবেই তাঁর কথাও এখানে বলা হয়েছে।

এই সমস্যার উত্তরে এ উপনিষদে বলা হল যে, তৎস্বরূপ অবশ্যই অতর্ক্য অজ্ঞেয় অব্যবহার্য, তাঁর উপর কোন সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। তাই তাঁর বিষয়ে আমাদের মনীষা নির্বাক থাকতে বাধ্য। সে-অজ্ঞেয়কে জানবার অনুশাসনও অর্থহীন এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনশূন্য। তার কারণ এ নয় যে, তৎস্বরূপ মহাশূন্য বা অভাবাত্মক; তার কারণ, আমাদের মন বাক্য বা প্রতীতি যে-সব ভাবাত্মক সংজ্ঞা দিতে সক্ষম তার কোনটা দিয়েই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, এমন কি তার কোনটা থেকে তার কোন নির্দেশ অবধি পাওয়া যায় না। আমরা জানি অতি অল্প, আর সেই অল্পের সংজ্ঞাতেই আমাদের সব জ্ঞানের রূপ দিতে হয়। এমন কি ওপারে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত পরম স্বরূপে উপনীত হলেও আমরা তার প্রকৃত কোন বর্ণনা দিতে পারি না, ইঙ্গিতে তার নির্দেশ দিতে পারি মাত্র। সুতরাং, যদি আমরা মনে করি যে, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জেনেছি তাহলে তাতে আমাদের জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়, দেখানো হয় যে, আমরা তাঁকে অতি অল্পই জেনেছি, এমন কি আমাদের অল্প জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে তাঁর যতটার রূপ দেওয়া যায় সেটুকুও জানতে পারি নি। কারণ, এই বিশ্বই অল্প, বিভক্ত; অস্তিত্ব ও চেতনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সেই সব অংশ দিয়েই আমরা সব বস্তুর খণ্ডিতরূপ জানি ও প্রকাশ করি; আমাদের ভাষা ও বিচার বুদ্ধির গড়া সেই সব কৃত্রিম সংজ্ঞার পিঞ্জরে অনন্তের সমগ্রতাকে আবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নয়। তথাপি সে তৎস্বরূপে ত আমাদের উপনীত হতে হবে বিশ্বে অভিব্যক্ত সব তত্ত্বকেই অবলম্বন করে'—প্রাণ মন অবলম্বন করে' আর, যে-সব ভাব মনে হয় যেন ব্রহ্মকে পরিব্যক্ত করবে কিন্তু আসলে রুদ্ধদ্বারের আড়ালে তাঁকে লুকিয়ে রাখে সে-সব মৌলিক প্রত্যয় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান অবলম্বন করে'।

সুতরাং, পরব্রহ্মের বিগ্রহ যে ঐশীচেতনা তার বিষয়ে আমাদের জ্ঞানই যদি এই প্রকারের হয়, তাহলে সব জ্ঞানের অতীত পরাৎপর কেবল অনির্বচনীয় সদ্বস্তুকে জানবার সম্ভাবনা আমাদের আরও কত কম। কিন্তু এই-ই সব হলে' ত জীবের কোন আশাই থাকত না আর বিজ্ঞতার শেষ কথা হত নীরবে নিশ্চেষ্ট হয়ে অজ্ঞেয়বাদ মেনে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের ও মনোবৃত্তির অতীত হলেও পরম আমাদের জ্ঞানের কাছে এবং আমাদের মনোবৃত্তির কাছে ধরা দেন তাদের প্রত্যেকের গ্রহণ-যোগ্য বিশিষ্ট উপায়ে; আর সেই পথ ধরেই আমরা তাঁর কাছে উপনীত হতে পারি, কিন্তু একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা মন দিয়ে যে মনন করি বা উর্ধ্বতর বুদ্ধি দিয়ে যা জানি তাকে যেন আমরা পূর্ণ জ্ঞান বলে' গ্রহণ না করি বা সেই পাওয়াতেই তৃপ্ত হয়ে নিশ্চেষ্ট না থাকি।

সে পথ হল, আমাদের মনকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে' তার বিশুদ্ধতম, উর্ধ্বতম শক্তির অধিগম্য জ্ঞান অর্জন করা। যে-বিশ্বে আমরা বাস করি তা দিয়ে তার অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ তার অতিশয়ী মহেশ্বরের ঐশী চেতনাকে জানতে হবে, পরব্রহ্মের সে-ই বিগ্রহ। কিন্তু, প্রথমতঃ, বিশ্বে যা শুধু বাহ্যরূপ ও প্রতিভাস সে-সবকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে; কারণ, পরব্রহ্মের রূপের সঙ্গে বা পরমাত্মার কায়ার সঙ্গে সে-সবের কোন সম্পর্ক নাই যেহেতু সে-সব ত তাঁর বিগ্রহ নয়, তাঁর বাহ্যতম আবরণ মাত্র। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য হল, জড়-প্রাণ-মনের সব রূপের পশ্চাতে গিয়ে সে সবের যা সারস্বরূপ, যা বাস্তবতম এবং যা প্রকৃত সত্তার নিকটতম তাতে ফিরে যেতে হবে। এবং এইভাবে অবান্তর সব বর্জন করে', সব আকারকে বিশ্বের মৌলিক বস্তুতে বিশ্লেষণ করে' চললে দেখব যে, মৌলিক বস্তু রয়েছে মাত্র দুটি—আমরা ও দেবতারা।

ধরে' নেওয়া হয় যে, উপনিষদের দেবতারা ইন্দ্রিয়ের একটা প্রতীক মাত্র; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করলেও ইন্দ্রিয়গুলির চেয়ে তাঁরা অনেক বৃহত্তর। বিশ্বজগতের সব মৌলিক বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দিব্য শক্তি তাঁরা, তা সে শক্তির প্রকাশ মানুষের মধ্যেই হক বা সাধারণভাবে মন-প্রাণ-জড়ের মধ্যেই হক; এই সব ক্রিয়াবৃত্তিও তাঁরা নন, তাঁরা ভগবানেরই কিয়দংশ—যে-অংশ তাঁদের ক্রিয়ার জন্য অবশ্য-প্রয়োজন এবং যা সেই সব ক্রিয়ার অব্যবহিত অধ্যক্ষ ও হেতু। অন্য উপনিষদ

থেকেও দেখতে পাই যে, দেবতারা হলেন ব্রহ্মের যে-সব সদর্থক আত্ম-রূপায়ণ আমাদের নিয়ে যায় মঙ্গল-আনন্দ-আলোক-প্রেম-অমৃতত্বের দিকে, সে-সবের অন্ধতামস প্রতিষেধের সব বিরুদ্ধতা কাটিয়ে। আর, অবশ্যই সে-সংগ্রাম চরমে ওঠে এবং তার তাৎপর্য প্রায় পূর্ণ প্রকটিত হয় মানবের মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে ও বাক্যে। সে-সবকে দেবতারা চান মঙ্গল-আলোকের দিকে চালিয়ে নিতে আর অন্ধকারের পুত্র দানবেরা চায় অজ্ঞান-অমঙ্গলের দ্বারা বিদ্ধ করতে।* বিশ্বব্যাপারে দেবতারা যাঁর সদাত্মক রূপায়ণ সেই বিশ্বস্বামীর চেতনা রয়েছে তাঁদের পশ্চাতে।

বিশ্বে ব্রহ্মের অপর প্রতিরূপটি হল জীবিত চিন্তাশীল সৃষ্টপ্রাণীর অধ্যাত্ম সত্তা---মানবাত্মা। সে সত্তাও বাহ্য ছদ্মরূপ মাত্র নয়, দেহের প্রাণের বা মনের আকার মাত্র নয়। এসবকে সেই ধারণ করে' আছে, এসবের স্থিতি সেই সম্ভবপর করেছে। দেবতাদের মতনই সে বলতে পারে আমি সৎ, মায়া নাই। তাহলে এই দুটি সত্তাকে পরীক্ষা করে' দেখতে হবে এরা কি, এদের মধ্যে সম্পর্ক কি আর ব্রহ্মের সঙ্গেই বা এদের উভয়ের সম্পর্ক কি; অথবা, এ উপনিষদের ভাষায় 'যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু অথ নু মীমাংস্যমেব তে'---তাঁর যতটা তুমি আর তাঁর যতটা দেবতাদের মধ্যে এই বিষয় তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। বেশ, তাহলে ব্রহ্মের কতটা আমি নিজে? আর, ব্রহ্মের কি-ই বা আছে দেবতাদের মধ্যে? উত্তর সুস্পষ্ট: আমি বিশ্বে পরমাত্মার প্রতিরূপ, কিন্তু বিশ্বপ্রসঙ্গে প্রকৃত প্রতিরূপ; আর দেবতারা বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের প্রতিরূপ---তাঁরাও বাস্তব প্রতিরূপ-ই, কারণ দেবতাদের ছেড়ে বিশ্ব চলে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই সব ব্যষ্টি অস্তিত্বের সারস্বরূপ, সেই এক বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্বে দেবতাদের পরমদৈবত।

পরমাত্মা ও বিশ্বেশ্বর একই ব্রহ্ম; তাঁকে আমরা আমাদের সত্তার মধ্যেও উপলব্ধি করতে পারি, আবার জগদ্ব্যাপারের মূলগতির মধ্যেও উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সত্তা যেমন আমাদের মন-দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত, পরমাত্মার সত্তাও তেমনি নিখিল মন-দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত; সব বস্তুরই সেই প্রভব ও সারস্বরূপ। আবার আমাদের ব্যষ্টিজীবের ক্ষুদ্র বিশ্ব, আমাদের মন-প্রাণ-দেহের ক্রিয়া, যেমন দেবতারা শাসন করেন আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তেমনি

* যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১।৩; বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।২

সমগ্র বিশ্ব, সব সাকার জীব শাসন করেন মহেশ্বর——মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়রূপে——তাঁর সক্রিয় দেবত্বকে তাঁর নিস্তব্ধ স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে'। বিশ্বে রূপের এবং বিশ্বের সত্তা ও গতির সারস্বরূপে উপনীত হয়ে যেমন আমরা আমাদের আত্মার ও দেবতাদের সন্ধান পেয়েছি, তেমনি আমাদের আত্মার ও দেবতাদেরও পশ্চাতে গিয়ে এক পরমাত্মাকে, এক পরমদৈবতকে পেতে হবে। তাহলেই আমরা বলতে পাব, 'মন্যে বিদিতং', মনে হয় জেনেছি।

কিন্তু বলেই আবার সে উক্তির সীমানির্দেশ করতে হয়। আমি যে সম্পূর্ণ জেনেছি তা মনে করি না, কারণ আমাদের জ্ঞানার্জনের করণ-গুলির সংজ্ঞাতে তা অসম্ভব। মুহূর্তের তরেও মনে করি না যে, অজ্ঞেয়কে জানতে পারি; মনে করি না যে, যে-সব রূপ অবলম্বন করে' আত্মন্ বা মহেশ্বরে উপনীত হতে হয় সে-সবে দিয়ে তৎস্বরূপকে বাঁধা যায়। তবে সেই সঙ্গে বলতে হয় যে, তাঁর বিষয়ে আমি আর অজ্ঞও নই; কারণ, আমি ব্রহ্মকে জানি একমাত্র যে-ভাবে তাঁকে জানা যায়: জানি আমার মনোবৃত্তির উপলব্ধির সীমার অনতীত সংজ্ঞাতে, জানি আমার কাছে তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে, জানি আত্মা ও মহেশ্বররূপে তাঁর অভিব্যক্তিতে। এতেই, অস্তিত্বের রহস্য এই যে-ভাবে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করা হয় তাতে-ই, আমার সত্তা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; কারণ, প্রথমতঃ তাতে এইসব প্রতীকের মধ্যে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি তা বুঝতে পারি, এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, ব্রহ্মে বাস করতে পারি, ধর্ম ও সত্তাতে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, এমন কি ব্রহ্মের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করতে পারি।

যদি ভাবি যে, মন দিয়ে আমরা ব্রহ্মের মর্ম গ্রহণ করেছি, আর সেই ভ্রমের বশে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যদি আমাদের মনের দ্বারা আবিষ্কৃত সংজ্ঞার নিগড়ে বেঁধে রাখি তাহলে আমাদের জ্ঞান জ্ঞানই হল না; সে হল অল্পজ্ঞান, তা মিথ্যাতেই পরিণত হয়। তেমনি আবার, সাধারণ মানবপ্রতীতির চেয়ে ঊর্ধ্বতর চিন্তা অবলম্বন করে' যে-সব মৌলিক ভাব দিয়ে তাঁকে নির্ণয় করা যায় সেই সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণার দ্বারা যারা তাঁকে বিশেষ করে' জানতে চায়, তাদেরও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথার্থ বিশেষ জ্ঞান হয় না, কারণ তাতে ভাগবত প্রতীককেই প্রকৃত বস্তু বলে' গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, যদি এই সব মানসপ্রতীতিকে কেবলমাত্র অনু-

সন্ধানের সূত্র বলে' মেনে নিয়ে, তাদের ধরে' তাদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি; এবং যদি এই সব ভাগবত প্রতীকগুলিকে এবং আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নির্দিষ্ট সে সবের বিন্যাসকে ব্যবহার করে' সে প্রতীকগুলিকে অতিক্রম করে' পরম সদ্বস্তুতে যেতে পারি, তবেই আমাদের মন ও বিচারবুদ্ধিকে তাদের পরম প্রয়োজনে ঠিকমত ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্ম যে তাদের অতিক্রম করে' আছেন সেই বোধের দ্বারাই তাহলে আমাদের মন ও ঊর্ধ্বতর ধীশক্তি ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

আমাদের মনোবৃত্তির কাছে পরম যে-ভাবে নিজেকে বিবৃত করেন, এক রকমের পরম অনুভূতি ও পরম উদ্বোধনের অবস্থাতে আমাদের মন তাঁর একটা চিত্র বা একটা রূপ প্রতিবিম্বিত করতে পারে মাত্র। এই প্রতিবিম্ব থেকেই আমরা তাঁর সন্ধান পাই, তাঁকে জানি; জ্ঞানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কারণ আমরা অমরত্ব লাভ করি, ব্রহ্মচেতনার ধর্ম-সত্তা-আনন্দে প্রবেশ করি। আমাদের আত্মারূপে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে' পাই বল, পাই দিব্যবীর্য যা সীমা-বন্ধন দুর্বলতা অন্ধকার দুঃখ ও মরজীবনের সর্বব্যাপী মৃত্যুর ওপারে আমাদের উত্তীর্ণ করে; সব সত্তাতে, জগতের সব বহুমুখী গতিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জেনে, সে-সব অতিক্রম করে' আমরা উপনীত হই সেই দিব্য অস্তিত্বের আনন্ত্যে, সর্বশক্তিমান সত্তাতে, সর্বজ্ঞ আলোকে, কেবল পরমানন্দে।

এই মহৎ সিদ্ধি এখানে, এই মর্ত্যজগতে, এই সসীম দেহেই অর্জন করতে হবে; কারণ তা হ'লেই আমরা আমাদের সত্য অস্তিত্বে উপনীত হই, আমাদের প্রাতিভাসিক জীবনে আর আবদ্ধ থাকি না; কিন্তু এখানে তা না হলে 'মহতী বিনষ্টি', আত্যন্তিক ক্ষতি ও নিরয়, কারণ আমরা দেহমনের প্রাতিভাসিক জীবনেই অবিরাম নিমজ্জিত থাকি, তার উপরের সত্য অতিমানস অস্তিত্বে অধিরোহণ করতে পারি না। আর, এখানে যদি তা হারাই তা হলে মৃত্যুও আমাদের এমন কোন লোকে নিয়ে যাবে না যেখানে তাঁকে পাওয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য হবে। যাঁরা তাঁদের প্রবুদ্ধ প্রদীপ্ত চিন্তার সহায়ে সব অস্তিত্বের মধ্যে পৃথক করে' সেই এক অদ্বিতীয় অমর সত্তাকে, সবের প্রভব আত্মাকে, সর্বত্র অন্তরস্থ মহেশ্বরকে আবিষ্কার করেন, জন্মমৃত্যুর অতিগামী প্রকৃত উত্তরণ সম্ভব হয় তাঁদেরই, তাঁরাই এই মর্ত্য অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সবেগে সব অতিক্রম করে' ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীত অমরত্বে উপনীত হতে পারেন।

তাহলে এই অনন্য উপায় আঁকড়ে ধরতে হবে, এই অনন্যলক্ষ্যে উপস্থিত হতে হবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়", এই মহৎ যাত্রার আর কোন পথ নাই। সেই অনির্দেশ্য অজ্ঞেয় অনির্বচনীয় পরব্রহ্মই পরমাত্মা ও মহেশ্বর; এমনকি আমাদের কাছে যা অজ্ঞেয় অনির্দেশ্য তাঁর অনুসন্ধানে রত হলেও আমরা সেই পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে পাই, তবে সে প্রয়াস দেহধারী যে-জীব তার প্রকৃত অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে চায় তার জন্য অভিপ্রেত ঋজু ও সহজসাধ্য পথ নয়।* আত্ম-অভিব্যক্ত পরম সদ্বস্তু এইভাবে পরমেশ্বর ও পরমাত্মারূপে মানুষের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন তার ঊর্ধ্বতম অভীপ্সার বিষয়রূপে, তার সব ক্রিয়ার সমাপত্তিরূপে।

* গীতা, ১২, ৪-৫

১৩

এ উপনিষদে বলা হল যে, অজ্ঞেয় ব্রহ্মের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভব সুতরাং জীবের বর্তমান সামর্থ্য ও সংস্থিতির যা ওপারে তার বিষয়ে অভীপ্সা অযৌক্তিক নয়; এখন আলোচনা করা হচ্ছে কি উপায়ে সে ঊর্ধ্বপ্রসারী অভীপ্সা তার উপাস্যের সংস্পর্শে আসতে পারে, কি করে' অবগুণ্ঠন ভেদ করে' পরবশ মানবচেতনা মহেশ্বরের ঐশীচেতনাতে প্রবেশ করতে পারে, কোন্ সেতুর দ্বারা এই গভীর ব্যবধান অতিক্রম করতে পারে। পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের গ্রহণযোগ্য প্রধান উপায় হল জ্ঞান--প্রবুদ্ধ মনের বোধের দ্বারা সত্য অস্তিত্বের কোন না কোন প্রকার মনন বা পর্যালোচনা থেকে যে-জ্ঞানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু মন ত একজন দেবতা, তার পশ্চাতের আলোকই ত ইন্দ্র, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর চাই সব দেবতাদের বোধন--দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর সহায়ে তাঁদের যা সার-স্বরূপ, যে এক পরমদেবের তাঁরা প্রতিভূ, তাঁর প্রতি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের মনোবৃত্তি একবার আমাদের মনের পশ্চাতে মনের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করলে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাক্যও নিজেদের খুলে ধরবে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরম ইন্দ্রিয়ের দিকে, বাক্যের পশ্চাতে পরাবাকের দিকে; এবং প্রাণও নিজেকে খুলবে আমাদের প্রাণের প্রাণের দিকে। এবার এই উপনিষদের তার এই মূল নির্দেশের পরিণতি বিবৃত করা হয়েছে একটা হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান বা রূপক কথা দিয়ে।

মঙ্গল-আলোক, সুখ-সৌন্দর্য, বীর্য-স্বামিত্ব এসব প্রতিষ্ঠা করে যে-সব শক্তি তারাই দেবতা; সে-সব অস্বীকার করে যে-সব আসুরিক শক্তি তাদের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামে দেবতারা একবার জয়যুক্ত হলেন। ব্রহ্মই দেবতাদের পশ্চাতে থেকে তাদের হয়ে বিজয় অর্জন করেছেন, সর্বনিয়ন্তা বিশ্বস্বামী তাঁর সর্ববিধায়িনী ইচ্ছাশক্তিকে সম্ভাবনার দোলাতে নিক্ষেপ করে' এ বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন--তাঁর তমসাচ্ছন্ন সন্তানদের দমন করে' তাঁর জ্যোতির সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বিশ্বস্বামীর এই বিজয়ে দেবতারা বোধ করেছেন যে, তাঁদের বিরাট প্রসার হয়েছে, মানুষের মধ্যে তাঁদের মহিমা, তাঁদের হর্ষসুখ, তাঁদের জ্যোতি, তাঁদের প্রভাব, তাঁদের কীর্তি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি এখনও তাঁদের গভীর-

তর সত্যের বিষয়ে অন্ধ; তাঁরা নিজেদেরই জানেন ব্রহ্মকে জানেন না, দেবতাদের জানেন পরমদেবকে জানেন না। সুতরাং এ বিজয়, এ মহিমা তাঁরা নিজেদের বলেই দেখেছেন। দেবতাদের এই সমৃদ্ধ বিকাশের, তাদের জ্যোতিঃ ও মহিমার উপচয়ের অর্থ হল তার সাধারণ আদর্শের দিকে মানবের অগ্রগতি; সে আদর্শ হল——সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত মনোবৃত্তি, সবল অপ্রমত্ত জীবনীশক্তি, সুনিয়ত দেহ ও ইন্দ্রিয়, এবং সুষম সমৃদ্ধ কর্মিষ্ঠ সুখী জীবন; প্রাচীন গ্রীসের এই আদর্শ বর্তমান জগতে আমাদের অগ্রগতির চরম সম্ভাবনা বলে গৃহীত হয়েছে। কোন ব্যক্তিতে বা জাতিতে এইরূপ বিকাশ হলে মানুষের মধ্যে দেবতারা উদ্ভাসিত, বলবান ও সুখী হন, তাঁরা অনুভব করেন যে, তাঁরা জগৎ জয় করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে' তাঁরা জগৎকে ভোগ করতে যান।

কিন্তু, বিশ্বে বা জীবে ব্রহ্মের অভিপ্রায়ের এই-ই সবটা নয়। দেবতাদের মহিমাতে তাঁর নিজেরই বিজয় ও মহিমা, কিন্তু তা দেওয়া হয় শুধু যাতে মানুষ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে প্রায় এমন অবস্থায় আসতে পারে যাতে তার সব বৃত্তি নিজেদের অতিক্রম করে' বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করবার বল পায়। সুতরাং উল্লসিত দেবতাদের সম্মুখে, তাঁদের সুবিন্যস্ত জগতে ব্রহ্ম আবির্ভূত হন; তাঁদের হৃদয় কম্পিত করে', বিশ্ব কম্পিত করে', তাঁর নৈস্তব্ধ্যের দ্বারাতেই প্রশ্ন তোলেন তাঁদের কাছে, "তোমরাই যদি সব, তাহলে আমি কে? কারণ, দেখ, আমি আছি আর এখানেই আছি।" তিনি আবির্ভূত হন বটে কিন্তু নিজেকে বিবৃত করেন না, দেবতারা তাঁকে জানেন না কিন্তু দেখতে পান, অস্পষ্ট ও ভয়ানক রূপে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেন——যেন কোন যক্ষ, পূজার্হ মহাভূত বা অধ্যাত্ম পুরুষ, যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি, যেন শুভাশুভের অতীত কোন পরম ভয়ঙ্কর যাঁর কাছে শুভাশুভ দুই-ই চরম আত্ম-অভিব্যক্তির অনুকূল যন্ত্রমাত্র। তখন দেবসঙ্ঘে একটা আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা আসে, তাঁরা একটা দাবী, একটা স্পর্ধার আহ্বান, একটা আসন্ন বিপদ অনুভব করেন: অমঙ্গলের দিক থেকে আশঙ্কা করেন এখনও অজ্ঞাত ও অপরাজিত সব ভয়াবহ বিকট আসুরিক শক্তির উৎপাতের সম্ভাবনা,——দেবতাদের গড়া এই সুন্দর জগৎ তারা হয়ত ধ্বংস করে' দেবে, মনীষা সুরুচি সুনীতি জৈব-বাসনা দেহ ইন্দ্রিয়, এ সব দিয়ে যে-সুষমা তাঁরা এত পরিশ্রম করে' গড়ে তুলেছেন তা হয়ত তারা বিপর্যস্ত করে', চূর্ণবিচূর্ণ করে' দেবে;

আবার মঙ্গলের দিক থেকে অনুভব করেন অজ্ঞাতের একটা দাবী, যা এসবের অতীত সুতরাং সমানই ভয়াবহ—কারণ, উপলব্ধ হয়েছে অতি অল্পমাত্র, প্রচুর অনুপলব্ধের সামনে তা দাঁড়াতে পারে না, যে ক্ষণভঙ্গুর প্রাচীর তুলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ও সুখের অবধি নির্ণয় করে' তাদের রক্ষা করি তার উপর ভূমা ও আনন্ত্যের অবিরাম চাপ আর সে নিরোধ করতে পারে না। দেবতাদের সম্মুখে ব্রহ্ম আবির্ভূত হন অজ্ঞাত-রূপে, দেবতারা জানেন না এ যক্ষ, এ মহাভূতটি কি।

সুতরাং, তাঁর প্রকৃতি-সীমা-পরিচয় জানতে দেবতাদের আদেশে প্রথম উঠলেন অগ্নি। উপনিষদের ও ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে; কারণ ঋগ্বেদে দেবতারা পরম অদ্বিতীয়ের শক্তি মাত্র নন, তাঁদের উদ্ভব ও তাঁদের প্রকৃত স্বরূপের একত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন; তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, সেই পরমদৈবতের মধ্যে বাস করেন, সেই অতিচেতন সত্যই তাঁদের স্ব-ধাম ও স্ব-লোক। অবশ্য, মানুষের মধ্যে তাঁরা অভিব্যক্ত হন মানববৃত্তিরূপে, মানব অস্তিত্বের সব সীমা বাহ্যতঃ মেনে নিয়ে, আর এই নিম্নতর বিশ্বে তাঁরা অভিব্যক্ত হন বিশ্বব্যাপারের ছাঁচ বা সংগঠনের ধারা মেনে নিয়ে। কিন্তু এ হল তাঁদের ক্ষুদ্রতর নিম্নতর প্রকাশ, এসবের ওপারে তাঁরা নিত্যস্বরূপে সেই এক সর্বাতীত এবং অদ্ভুত শক্তি-আনন্দ-জ্ঞান-সত্তার অধীশ্বর। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মের ধারণা প্রসারিত হয়ে দেবতাদের এই প্রাধান্যের শিখর থেকে বিচ্যুত করে' দিয়েছে, তাই কেবলমাত্র মানবের ও বিশ্বের মধ্যে তাঁদের নিম্নতর ক্রিয়াতে তাঁদের আমরা দেখতে পাই। তবে, বেদোক্ত ভাবের অনেকটাই এ উপ-নিষদে বর্তমান আছে। এখানে ইন্দ্র-বায়ু-অগ্নি এই দেবতাত্রয় হলেন বিশ্বের ভূমিত্রয়ের এক একটিতে সার্বজনীন বিশ্বেশ্বরের প্রতিভূ: ইন্দ্র মনের, বায়ু প্রাণের, অগ্নি স্থূল জড়ের ভূমিতে। সুতরাং এই অনুক্রমে, জড়ভূমি থেকে আরম্ভ করে তাঁরা ব্রহ্মের সম্মুখীন হন।

জড়ে অনুস্যূত চিৎশক্তির যে উত্তাপ ও শিখা বিশ্বকে গড়ে তুলেছে সেই হল অগ্নি; জড়বিশ্বে অগ্নিই মন-প্রাণের আবির্ভাব সম্ভবপর করেছে, তাদের বৃদ্ধি সাধন করেছে, সেখানে অগ্নিই হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিশেষ করে', যে-বাক্যকে তিনি প্রথম অগ্রে প্রেরণ করেন, বায়ু তার মাধ্যম, ইন্দ্র তার অধীশ্বর। জড়ে অনুস্যূত চিৎশক্তির এই উত্তাপই অগ্নি, তিনি 'জাতবেদা', সর্বজন্মজ্ঞ: বিশ্বে জাত সব পদার্থের, বিশ্বের সব ব্যাপারের

ধর্ম ও কর্মপদ্ধতি, সবের অবধি ও অন্যোন্যসম্বন্ধ, সবই তিনি জানেন। সুতরাং তাঁদের সম্মুখে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি যদি বিশ্বে জাত কোন মহাভূত হন, যদি বিশ্বের সংঘাত বা ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে পূর্বে অনিরূপিত নূতন কিছু গড়ে উঠে থাকে, তবে জাতবেদা অগ্নি ব্যতীত কে তাকে জানবে, কে তার সীমা বল বা অব্যক্ত বিভব নির্দিষ্ট করবে?

পূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হলেন, পেলেন স্পর্ধার আহ্বান, 'কে তুমি? কি বল আছে তোমাতে?' তাঁর নাম জাতবেদা, জড়বিশ্বে সব জন্ম ও কর্মপদ্ধতির মূলে যে-শক্তি রয়েছে তার সব ক্রিয়াবৃত্তি তিনি জানেন এবং ধারণ করে আছেন, আর তাঁর মধ্যে বল রয়েছে যে, এভাবে যা-কিছু জন্মেছে সে সবই তিনি মৃত্যু ও কালের শিখারূপে গ্রাস করতে পারেন। সব বস্তুই তাঁর ভক্ষ্য, সব জীর্ণ করে' তিনি নব জন্মের, নবরূপায়ণের উপাদানে পরিবর্তিত করেন। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী তাঁর সমস্ত বল প্রয়োগ করে' একটা ক্ষীণ দুর্বাদল গ্রাস করতে পারেন না যতক্ষণ ব্রহ্মের শক্তি রয়েছে তার পশ্চাতে। অগ্নি সে যক্ষকে না জেনেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তবে একটা সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, এ মহাভূত, এ যক্ষ জড় বিশ্বের কোন জীব নয়, কালের অনল বা ফুৎ-কারের অধীন কোন নশ্বর বস্তু নয়; তিনি অগ্নির শক্তির অতীত।

দেবতাদের ডাকে আর একজন উঠলেন। তিনি বায়ু 'মাতরিশ্বা'—বৃহৎ প্রাণতত্ত্ব, আকাশ-মায়ের ক্রোড়ে তিনি বিচরণ করেন, নিঃশ্বাস নেন, অনন্তে বিসারিত হন। বিশ্বের সব বস্তুই হল এই প্রবল প্রাণ-শক্তির স্পন্দন, তিনিই অগ্নিকে এনে সববস্তুর অন্তরে স্থাপন করেছেন, তাঁর জন্যই সব জগৎ পর পর নির্মিত হয়েছে, যাতে প্রাণ সে-সবের মধ্যে বিচরণ করতে পারে, কাজ করতে পারে, যথেচ্ছ বিলাস করে' সুখ ভোগ করতে পারে। এ-যক্ষ যদি জড়ে জাত কোন বস্তু না হয়ে সত্তার গহন গভীরে বা তুঙ্গ শিখরে ক্রিয়মাণ কোন বিরাট প্রাণশক্তি হন, তবে এই বায়ু মাতরিশ্বা ব্যতীত কে তাঁকে জানবে? কে তাঁকে নিজের সার্বজনীন ব্যাপ্তিতে গ্রহণ করবে?

আবার হল ভরসা নিয়ে বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া, আবার এল স্পর্ধার সেই ভয়াবহ আহ্বান, "কে তুমি? কি বল আছে তোমাতে?" ইনি বায়ু মাতরিশ্বা, তাঁর বল হল তিনি তাঁর পদসঞ্চার ও বৃদ্ধিক্রমে সব-বস্তুই অতি সহজে গ্রহণ করতে পারেন। সব ধরে' শাসন ও ভোগ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষীণতম ক্ষুদ্রতম দ্রব্যও তিনি ধারণ করতে বা অভিভূত

করতে পারেন না যতক্ষণ তাকে সর্বশক্তিমানের শক্তি তনুত্র হয়ে তাঁর কাছ থেকে রক্ষা করে। বায়ু আবিষ্কার না করে' ফিরে আসেন। তবে, একটা সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে, বিশ্বপ্রাণের কোন শক্তি বা রূপ এ নয়, সর্বগ্রাহী জৈবপ্রেরণার সীমার মধ্যে তাঁর কোন কাজ হয় না; তিনি বায়ুর অতীত।

তারপর ওঠেন ইন্দ্র মঘবান, শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবান। ইন্দ্র মনের শক্তি; প্রাণ ভোগের জন্য যেসব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সে সবের ক্রিয়াবৃত্তি জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্নি এই বিশ্বে যা-কিছু নির্মাণ পালন বা ধ্বংস করেন সে-সবই ইন্দ্রের বিষয়, তার বৃত্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র। সুতরাং এই অজ্ঞাত সত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য কিছু হলে ইন্দ্র তাঁকে জেনে নিজের বিপুল ঐশ্বর্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। কিন্তু সে যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য কিছু নন, কারণ ইন্দ্র অগ্রসর হতেই তিনি অন্তর্ধান করলেন। মন অবধারণ করতে পারে শুধু যা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ আর এই ব্রহ্ম—ঋগ্বেদের ভাষায়—অদ্যও নন কল্য নন।* এবং যদিও সব সচেতন অস্তিত্বের চিৎ-সত্তাতে তাঁর স্পন্দন বর্তমান আছে এবং সেখানে তাঁর সান্নিধ্যে আসা যায়, তবুও মন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের মধ্যে তাঁকে সমীক্ষণ করতে গেলেই তিনি মনের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হন। সর্বব্যাপীকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, সর্বজ্ঞকে মনোবৃত্তির দ্বারা জানা যায় না।

কিন্তু অগ্নি-বায়ুর মত, ইন্দ্র অন্বেষণ থেকে বিরত হন না; বিশুদ্ধ মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বতম আকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন এবং সেখানে পরাস্ত্রী, বহুশোভমানা বহুদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হৈমবতী উমার সাক্ষাৎ পান; তাঁর কাছ থেকে শেখেন যে, এই যক্ষই ব্রহ্ম, তাঁর বলেই মন-প্রাণ-দেহের দেবতারা জয়লাভ করে' আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন, মহীয়ান হন তাঁরই আশ্রয়ে। উমা হলেন পরাপ্রকৃতি, সমস্ত বিশ্বব্যাপারের জন্ম হয় তাঁর থেকে, এবং তিনি পরম অদ্বিতীয়ের বিশুদ্ধ শিখর-চেতনা ও ঊর্ধ্বতম শক্তি আর এখানে বহুরূপে ভাস্বর। এই পরাপ্রকৃতিই পরাচেতনা; নিজেদের সত্যরূপ তাঁর কাছ থেকেই দেবতাদের শিখতে হবে। নিজেদের নিম্নতর ক্রিয়াতে আবদ্ধ না থেকে এই পরাপ্রকৃতিকে নিজেদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করেই দেবতাদের অগ্রসর হতে হবে। কারণ, একের জ্ঞান ও চেতনা পরাপ্রকৃতিরই আছে, কিন্তু মন-প্রাণ-দেহাশ্রিত নিম্নতর প্রকৃতি

* ঋগ্বেদ, ১।১৭০।১

কেবল মাত্র বহুকেই অবধারণ করতে পারে। সুতরাং, যদিও ব্রহ্মের অস্তিত্বের বিষয় প্রথম জেনে, ইন্দ্র বায়ু অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন,—অন্য দেবতারা ব্রহ্মের সান্নিধ্যজনিত স্পর্শ পেয়েছেন মাত্র,—তথাপি আমাদের মধ্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানতে ও পেতে পারেন শুধু যদি পরাচেতনার সংস্পর্শে এসে তাঁরা পরাপ্রকৃতিকে প্রতিফলিত করেন এবং জৈব মানস দৈহিক সব অহঙ্কার অপসারিত করেন, যাতে পরম অদ্বিতীয়কে প্রতিবিম্বিত করা তাদের একমাত্র চেষ্টা হয়। আমাদের দেহাশ্রিত জীবনকে পোষণ করে যে সচেতন শক্তি তাকে হতে হবে, তার ঊর্ধ্বতম সাধারণ ক্রিয়া যার গোধূলির অর্ধআলোকিত বাহ্য রূপ বই নয়, সেই পরাচেতনা ও শক্তির সরল বিশুদ্ধ বিম্বোদ্‌গ্রাহী; আমাদের জীবনকে হতে হবে, আমাদের ব্যক্ত ও সুপ্ত জীবনীশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম বৈভবের চেয়ে বৃহত্তর, পরম জীবনের—নিস্পন্দভাবে গৃহীত অথচ—বীর্যবান প্রতিবিম্ব এবং অবিকৃত প্রতিরূপ; আমাদের মনকেও সন্তুষ্ট থাকতে হবে সেই অতিচেতন অস্তিত্বের প্রতিরূপের বিশ্বস্ত দর্পণ হয়েই। এইরূপে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় তাদের ক্রিয়ার একমাত্র নিয়ন্তা, আমাদের মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের কাছে সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করলে, এইরূপে জাগতিক অস্তিত্বের মুখ ফিরিয়ে শাশ্বত অস্তিত্বকে নিষ্ক্রিয় হয়ে প্রতিবিম্বিত করলে এবং ব্রহ্মের প্রকৃতিকে বিশ্বস্তভাবে প্রতিরূপিত করলে, তবে আমরা আশা করতে পারি যে, এখন যা আমাদের চেতনার অতীত তাকে জানতে পারব এবং সেই জ্ঞান অবলম্বন করে' তাতে অধিরোহণ করতে পারব, শাশ্বত অনন্ত মুক্ত ও পূর্ণানন্দময় ক্রিয়ার অধ্যক্ষ, সেই পরম নৈঃশব্দ্যে প্রবেশ করতে পারব।

১৪

দেখেছি যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় হল, প্রথম, বিশ্বের বাহ্যরূপের পশ্চাতে গিয়ে সুবিন্যস্ত জগতের জন্য যা অপরিহার্য তাকে জানা, আর সে অপরিহার্য বস্তু দ্বিদল: প্রকৃতিতে দেবতারা আর ব্যক্তিতে জীবাত্মা, পরে, তাদেরও পশ্চাতে, তারা যাঁর প্রতিভূ সেই বিশ্বাতীতে উপনীত হওয়া। দিব্যজ্ঞানের এই ধারাতে ব্রহ্মের সঙ্গে দেবতাদের ব্যবহারিক সম্বন্ধ পূর্বেই নির্ণীত হয়েছে। যে-সব জাগতিক ক্রিয়াবৃত্তি অবলম্বন করে' দেবতাদের কাজ হয়---মন প্রাণ বাক্য ইন্দ্রিয় দেহ---তাদের প্রত্যেকেরই বোধ জাগতে হবে যে, তাদের ওপারে কেহ আছেন যিনি তাদের নিয়ন্তা, যাঁর উপর তাদের অস্তিত্ব ও তাদের গতিবৃত্তি নির্ভর করে, যাঁর শক্তিতে তাদের ক্রমপরিণতি হয়, নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি হয়, শক্তি আনন্দ ও সামর্থ্য লাভ হয়; নিজস্ব সাধারণ ক্রিয়াবৃত্তি থেকে তাঁর দিকেই তাদের ফিরতে হবে; সে-সব ছেড়ে, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অহমিকা থেকে উদ্ভূত স্বতন্ত্রক্রিয়ার ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করে' সজ্ঞানে তাদের অতিশয়ী সেই সত্তার শক্তি-আলোক-আনন্দ গ্রহণের প্রতীক্ষায় নিস্পন্দ হয়ে থাকতে হবে। তার ফলে, নামের অতীত এই দিব্য সত্তা দেবতাদের মধ্যে নিজেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত করেন। তাঁর আলোক অধিকার করে' নেয় মনের চিন্তনবৃত্তিকে, তাঁর শক্তি ও সুখ নেয় প্রাণকে, তাঁর আলোক ও হর্ষোল্লাস নেয় হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়কে। ব্রহ্মের পরম প্রতিচ্ছবির কিছু অংশ বিশ্বপ্রকৃতিতে পতিত হয়ে তাকে দিব্যপ্রকৃতিতে পরিবর্তিত করে' নেয়।

অলৌকিক উপায়ে চকিতে তা সাধিত হয় না। সে-সব আসে ক্ষণিক স্ফুরণরূপে, ঈশ্বরাদেশরূপে, আকস্মিকস্পর্শ ও দৃষ্টিনিমেষরূপে; যেন সেই স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎ-চমকের মত প্রত্যাদেশের দীপ্ত শিখা আশ্চর্যরূপে রহস্যোদ্ঘাটন করে' আবার তার গোপন উৎসে ফিরে গেল; যেন অন্তর্দৃষ্টির নয়নপল্লব নিমেষের তরে খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হল, কারণ অবিমিশ্র পরম জ্যোতির দিকে চক্ষু বেশীক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে নি। এই সব সাক্ষাৎ স্পর্শ ও দর্শন ওপার থেকে বার বার এসে দেবতা-দের দৃষ্টি এবং তাদের আশাপ্রতীক্ষা ঊর্ধ্বের উপর নিবদ্ধ করে' দেয় আর অবিরাম অভ্যাসে দেবতাদের গ্রহণনিষ্ঠা এবং নিস্পন্দতাও স্থায়ী হয়;

মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় বিশ্বের বাহ্য রূপের পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে যে সর্বাতিশয়ী মহিমাকে একমাত্র বিষয়রূপে গ্রহণ করবার সংকল্প করেছে তাঁরই স্মরণ উপলব্ধি ও আনন্দে ক্রমশঃ বেশী করে' একনিষ্ঠ হয়; বাহ্যস্পর্শে সাড়া না দিয়ে তাঁর ডাকই তারা শুনতে শেখে। যে নৈঃশব্দ্য এ সময়ে তাদের উপর অবতরণ করে' তাদের মূল ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয় পরে সে-ই হবে তাদের ব্রহ্ম-স্বরূপ, শাশ্বত নৈঃশব্দ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান। অন্য সাড়া, অন্য ভাব বা অন্য কাজ তারা জানবেই না। মন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই জানবে না বা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই চিন্তা করবে না, প্রাণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর মধ্যে সঞ্চরণ করবে না বা আর কিছু গ্রহণ বা ভোগ করবে না, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই চক্ষু দেখবে না বা কর্ণ শুনবে না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় অনুভব করবে না।

কিন্তু বাহ্যব্যাপারের সম্পূর্ণ বিস্মরণই কি তাহলে চরম লক্ষ্য? মনকে, ইন্দ্রিয়কে কি অন্তরাবৃত হয়ে অন্তহীন সমাধিতে নিমগ্ন থাকতে হবে? প্রাণকেও কি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করতে হবে? তা সম্ভবপর বটে, যদি আত্মার সেই ইচ্ছাই হয়; কিন্তু তা অনিবার্য বা অপরিহার্য নয়। মনের সত্তা জাগতিক, নিখিল বিশ্বে তা এক অবিভক্ত; প্রাণের, ইন্দ্রিয়ের, এমনকি দেহের জড় উপাদান-ও তাই; সুতরাং, যখন তারা কেবলমাত্র ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্মের জন্য বর্তমান থাকবে তখন সে জাগতিক একত্বের জ্ঞান ত তাদের হবেই, তাছাড়া সে-একত্বও তারা অনুভব করবে, প্রত্যক্ষ বোধ করবে এবং তাতেই তারা বাস করবে। সুতরাং এখন ব্যক্তিগত মন ইন্দ্রিয় বা প্রাণের কাছে যা বাহ্যবস্তু বলে প্রতীয়মান হয় তার যে-কোনটার দিকে ফিরলেই সেখানে তারা সে-সবের বাহ্য রূপ জানবে না, চিন্তা করবে না, বোধ করবে না, গ্রহণ করবে না বা ভোগ করবে না, করবে সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্মকে-ই। উপরন্তু, বাহ্য অস্তিত্ব তাদের কাছে থাকবেই না, কারণ আমাদের কাছে কোন বস্তুই আর বাহ্য বলে মনে হবে না, সবই—এমনকি সমগ্র বিশ্ব এবং তাতে বিধৃত সবই—মনে হবে অন্তরস্থ। কারণ, অহং-বোধের সীমা, ব্যষ্টিত্বের প্রাচীর ভেঙে যাবে; ব্যষ্টিমন আর নিজের ব্যষ্টিসত্তা জানবে না, জানবে সর্বত্র এক বিশ্বময় মনকে, সব ব্যষ্টিই যে অখণ্ড মনোবৃত্তির বিভিন্ন গ্রন্থি মাত্র; তেমনি ব্যষ্টিপ্রাণ তার পৃথকত্বের বোধ হারিয়ে সব ব্যষ্টিসত্তা যে-প্রাণের ক্রিয়ার অবিভাজ্য প্রবাহের আবর্ত-মাত্র সেই এক প্রাণরূপে, তারই মধ্যে বর্তমান থাকবে; এমনকি এই দেহের

ও ইন্দ্রিয়গুলিরও পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞান থাকবে না, বস্তুতঃ যে দেহে মানুষের স্থূল আত্মবোধ থাকবে তা হবে সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব,—যেখানেই অবস্থিত থাকুক না কেন—অবিভাজ্য সমগ্র বস্তু-রূপ; এবং ইন্দ্রিয়গুলিও সংবেদনের পরমতত্ত্বে রূপান্তরিত হবে আর তাতে, আমরা যাকে বাহ্য বলি তারও প্রতি দৃশ্যে চক্ষু সর্বদা ব্রহ্মকেই দেখবে, প্রতি শব্দে কর্ণ সর্বদা ব্রহ্মকেই শুনবে, প্রতি স্পর্শে আন্তর ও বাহ্য দেহ ব্রহ্মকেই অনুভব করবে আর প্রত্যেকটি স্পর্শকেও সেই বৃহত্তর দেহেরই আভ্যন্তরীণ স্পর্শ বলে অনুভব করবে। যে-জীবের দেবতারা এরূপে এই পরম তত্ত্ব ও নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছেন এই বিশ্বে সব নানাত্বের মধ্যেই সে অদ্বিতীয় অনন্য একের সত্য উপলব্ধি করবে। উপরন্তু নিরাকার অনন্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে বিশ্বকেও অতিক্রম করবে,— নিখিল বিশ্বকে নিজের সম-পরিমাণ বলেও দেখবে না, দেখবে যেন নিজের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চতর উপলব্ধিতে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ জানবে পরম মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়কে নয় বরং সে-সবের উপাদান বস্তুকে। এই পদ্ধতিতে, এইরূপ অবিরাম দর্শন, দিব্য স্পর্শ ও প্রভাবের দ্বারা মনের মন বা অতিচেতন জ্ঞান মানস অবগতির স্থান নিয়ে মনের সব দর্শন ও চিন্তনকে অতিমানস জ্যোতির ভাস্বর বস্তুতে ও স্পন্দনে পরিবর্তিত করবে। তেমনি আবার, ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরমসম্বোধের বারবার সাক্ষাৎ পেয়ে ইন্দ্রিয়ও বদলে যাবে, বিশ্বের ইন্দ্রিয়-প্রতীতিও পরিবর্তিত হবে—জৈব, মানস ও অতিমানস লোকও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে আর স্থূল প্রত্যক্ষ হবে তার সবশেষের বাহ্যতম ক্ষুদ্রতম ফল। তেমনি, প্রাণও হবে অসীম চিৎ-শক্তির সজ্ঞান সঞ্চরণ, হবে নির্ব্যক্তিক,—কোন বিশেষ কর্ম বা ভোগের সীমার দ্বারা অবরুদ্ধ হবে না বা সে-সবের ফলে আবদ্ধ থাকবে না, কোন দ্বন্দ্ববোধ বা পাপ বা বেদনার দ্বারা পীড়িত হবে না,—হবে বৃহৎ সীমাহীন মৃত্যুহীন। জড়বিশ্বও এ-সব দেবতাদের চোখে হবে অনন্ত জ্যোতির্ময় ও আনন্দময় অতিচেতনের একটা প্রতিরূপ।

এই ত হল দেবতাদের নবরূপায়ণ। আর আত্মার? দেখেছি ত, মূল সত্তা দুটি—দেবতারা ও মানবাত্মা; আর সমস্ত জাগতিক শক্তির চেয়ে আমাদের আত্মা বৃহত্তর, আমাদের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার পক্ষে এই সব ক্ষুদ্রতর দেবতাদের নবরূপায়ণের চেয়ে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আত্মার অনন্যব্রত হওয়া অনেক বেশী প্রয়োজন। সুতরাং, কেবলমাত্র দেবতাদের রূপান্তর

হলেই হবে না। এক পরমদৈবতকে লাভ করে তার স্বভাবে দেবতাদের রূপান্তরিত হতে ত হবেই, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সক্রিয় জাগতিক তত্ত্বগুলিকে সব তত্ত্বের পরমতত্ত্ব সেই এক অদ্বিতীয়ের ক্রিয়াতে পরিণত করতে হবে যাতে নানা বৈশিষ্ট্যবিকাশের লীলা সত্ত্বেও তারা সেই তৎস্বরূপের অবিভক্ত ক্রিয়া ও অখণ্ড অস্তিত্বই হয়ে যাবে; তদুপরি—আর সেই প্রয়োজনই প্রধানতর—আমাদের মধ্যে দেবতাদের ক্রিয়ার আশ্রয়, আমাদের আত্মাকেও সব ব্যষ্টি অস্তিত্বের এক পরমাত্মাকে, যাঁর দৃষ্টিতে সব ব্যষ্টি আত্মা তাঁর নিজের চেতনারই কেহ বা তমসাচ্ছন্ন, কেহ বা ভাস্বর, বিভিন্ন কেন্দ্র বই নয়, সেই অবিভাজ্য অধ্যাত্মসত্তাকে লাভ করে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

মানবাত্মা, আবার, মনোময় সত্তার আন্তরপুরুষ, সুতরাং একাজ তার করতে হবে মনের মাধ্যমে। দেবতাদের মধ্যে নবরূপায়ণ সাধন করেন অতিচেতন নিজেই—তাদের মূলবস্তুকে দেখা দিয়ে, আলোকের ঝলকে তাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করে', যতদিন তারা রূপান্তরিত না হয়; কিন্তু আর এক উপায়ে কাজ করবার ক্ষমতা মনের আছে, তবে আপাতদৃষ্টিতে মনের কাজ হলেও বস্তুতঃ তা আত্মারই নিজের প্রকৃত সত্তার অভিমুখে গমন। বোধ হয় যেন, মন ব্রহ্মের দিকে যায়, ব্রহ্মে উপনীত হয়; মনকে যেন তার নিজের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে তার অতিশয়ী কিছুতে উন্নীত করা হয়; পরে যদিও মন আবার সাধারণ ভাবের মধ্যে ফিরে আসে, তবু মননের অন্তরস্থ জ্ঞানের সংকল্প মনের দ্বারাতেই বারবার স্মরণ করে মন কোথায় প্রবেশ করেছিল; পরিশেষে সে-স্মৃতি অবিচ্ছেদে স্থায়ী হয়। তা হবার পর, জীবাত্মা মনের মাধ্যমে ব্রহ্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, বার বার ব্রহ্মে বাস করে এবং, এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে গৃহীত হয়ে, পরিশেষে সেই সর্বাতীতের মধ্যে নিরাপদে বাস করতে পারে। সে তার মনকে অতিক্রম করে, তার নিজের সত্তার যে-মনোময় ব্যষ্টি রূপায়ণকে বা যে-বিগ্রহকে সে অহং বলে জানে তাকে অতিক্রম করে, ঊর্ধ্বে আরোহণ করে' সর্বভূতের পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মার যা শ্রেষ্ঠ অভিব্যঞ্জনা সেই আত্মারাম আনন্ত্যের স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-ই হল সর্বাতিশয়ী অমরত্ব, অধ্যাত্ম জীবন; উপনিষদে একেই মানবের চরম লক্ষ্য বলে শিক্ষা দিয়েছে। এর দ্বারাই আমরা মর্ত্য অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মার স্বর্গে উপনীত হতে পারি।

তাহলে, তখন দেবতাদের কি হয়? জগতের এবং মহেশ্বর তাঁর সত্তাতে যা-কিছু বিকশিত করেছেন সে-সবের কি হয়? সে-সবই কি অন্তর্হিত হয় না? দেবতাদের এই নবরূপায়ণও কি একটা গৌণ সিদ্ধিমাত্র নয়? আমাদের চূড়ান্ত অধিগম্য, পরমনিঃশ্রেয়সের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে এও কি একটা বিশ্রামের স্থান মাত্র নয়? সেখানে উপনীত হওয়া মাত্র কি তা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় না? এবং দেবতাদের ও বিশ্বের অন্তর্ধানের সঙ্গে কি তার অধ্যক্ষ ঐশীচেতনারও বিলোপ হয় না? আর তার ফলে কি একমাত্র শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা ও নিবৃত্তিতে নিত্য আত্মানন্দে মগ্ন অনির্দেশ্য শুদ্ধ-সৎ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? এই সিদ্ধান্তে এসেছিল পরবর্তী বেদান্তের চরম অদ্বৈতবাদী শাখা, আর সে-শাখাতে উপনিষদেরও সেই অর্থ করতেই চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, যে ঈশ বা কেনোপনিষদের ভাষাতে এমন কিছুই নাই যা থেকে তার লেশমাত্র আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তা পেতে চাইলে জোর করে তাতে সে অর্থ আরোপ করতে হবে, কারণ বস্তুতঃ যে-ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বরং বেদান্তের অপর সব শাখার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় যে-সবের মতে চরম লক্ষ্য হল যে, মুক্ত আত্মা নিত্য আনন্দে ব্রহ্মলোকে বাস করবে, অনন্ত সতের সঙ্গে একাত্ম হয়েও, কোন বিশেষভাবে একত্বের মধ্যেও পৃথক্ত্বের লীলা উপভোগ করতে সমর্থ হবে।

পরের শ্লোকে পাই এই উপনিষদের শেষ কথা, যে মহৎ সর্বাতিশয়ী উত্তরণের উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল তার ফল, এবং তার পরে পাই, মর্ত্য-অবস্থা অতিক্রম করে' জ্ঞানদীপ্ত জীবাত্মা যে-অমরত্বে উপনীত হন তার বর্ণনা। উপনিষদে বলা হল যে, ব্রহ্মন্, স্বভাবতঃ 'তদ্বন', সেই আনন্দ। 'বন' একটি বৈদিক শব্দ, তার অর্থ, আনন্দ বা আনন্দময়; সুতরাং 'তদ্বন' অর্থ সর্বাতিশয়ী আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (তৃতীয় বল্লী ষষ্ঠ অনুবাকে) তার বিষয় বলা হয়েছে যে, সে-ই পরম ব্রহ্ম, যা কিছু আছে সবই তাথেকে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারাই সব জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় আর জন্মমৃত্যুর ওপারে প্রয়াণ করে' তাতেই উপনীত হয়। ব্রহ্মকে এই সর্বাতিশয়ী আনন্দরূপে উপাসনা করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে। সুতরাং, উপনিষদের অমরত্বের অর্থও এই পরমানন্দ বই নয়। আর, ব্রহ্মকে পরমানন্দরূপে পাবার ফল কি হবে? যিনি ব্রহ্মকে এইভাবে জেনেছেন তাঁর অভিমুখে সর্বজীবের অভিলাষ প্রবাহিত হয়, তাঁর সঙ্গলাভের

ইচ্ছায় সবাই তাঁর কাছে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, দিব্য আনন্দের কেন্দ্র হন তিনি, নিখিল জগতে প্রীতি বিতরণ করেন, হর্ষ-সুখ-প্রেম-আত্ম-সার্থকতার উৎসরূপে বিশ্বের সর্বজীবকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন।

এই হল এ উপনিষদের চূড়ান্ত আদেশ; উপনিষদ বা পরম সত্যের মর্মকথা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই তথ্য শিক্ষা দেওয়া হল। ব্রহ্মোপনিষদ, বা পরম সতের নিগূঢ় চরম সত্য এই উচ্চারিত হল; তার প্রথম কথা হল, মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্দ্রিয় সবের যে সাপেক্ষাতীত কেবল রূপ রয়েছে তার মধ্যে সেই মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মহেশ্বরের উপাসনা করতে হবে; আর তার শেষ কথা হল, তাঁকে সর্বাতি-শয়ী আনন্দরূপে পেতে হবে; তার ফল হবে যে, যে-জীব তাঁকে এইরূপে জেনেছে ও পেয়েছে সে সেই দিব্যানন্দের জীবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হবে, নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণীই, দিব্য রসোল্লাসের প্রস্রবণের প্রতি যেমন হয়, তাঁর প্রতি ও তেমনই আকৃষ্ট হবে।

আর দুটি শ্লোক দিয়ে এ উপনিষদের বক্তব্য শেষ করা হল, পুরাতন রীতিতে, যেন সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা করে', তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হল। বলা হল যে, এই উপনিষদ বা সব বস্তুর অন্তরতম সত্যের প্রতিষ্ঠা হল তপঃ বা আত্মসংযম অভ্যাস করা, কর্ম এবং দম বা ইন্দ্রিয়-জীবনকে আত্মশক্তির বশীভূত করা। অর্থাৎ, অজ্ঞানে আবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ পরবশতা ছেড়ে প্রভুভাব অর্জনের উপায়রূপে জীবন ও কর্মকে ব্যবহার করতে হবে, যাতে পূর্ণজ্ঞানে সমাসীন পরমাত্মার স্বপ্রতিষ্ঠ স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্যের, নিজের ও অপর সবের উপর ঈশিত্বের, নিকটতর হওয়া যায়। বেদ বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের প্রত্যাদেশ এবং সে-সবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে বলা হল তার সর্বাঙ্গ; অর্থাৎ, তার কেন্দ্রাভিমুখী সব ধারা ও সব ভাব, এই মহৎ সাধনার সব উপাদান, নিজের চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের এই গভীর শিক্ষা, এই সুগভীর আধ্যাত্মিক অভীপ্সা,—সবই পরম জ্ঞানের সুরধুনী, পরম সাধনার সব সূত্রের আকর, সেই মহৎশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সত্য তার আয়তন; তবে সে-সত্য কেবলমাত্র মানসিক বা বুদ্ধিসম্পাদ্য যাথাতথ্য নয়, বৈদিক সাহিত্যে সে অর্থে এ-শব্দ কখনই ব্যবহৃত হত না। সত্য হল প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত চেতনা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত কর্ম, অস্তিত্বের প্রকৃত আনন্দ এবং এসবের যে চরম মানবীয় ভাব মানুষের পক্ষে সম্ভব, বস্তুতঃ অহঙ্কার ও অজ্ঞানজনিত মিথ্যার যা বিপরীত সে সবই। আর এই উপায়েই—

অর্থাৎ নিজের উপর প্রভুত্ব ও আধ্যাত্মিক বীর্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান ও কর্মকে ব্যবহার করে', জ্ঞানের প্রতি অংশে গভীরভাবে প্রবেশ করে', বেদের মহর্ষিদের মহৎ উদাহরণ অনুসরণ করে' এবং পরম সত্যে বাস করে'—এই উপায়েই এ উপনিষদ আমাদের কাছে ঊর্ধ্বের যে-পথ উন্মুক্ত করেছে সে-পথে চলতে লোকে সমর্থ হয়।

এই অধিরোহণের লক্ষ্য হল সত্য ও বৃহৎ অস্তিত্বের লোক, বেদে তাকে মানবের পরমপদ ও পরমধাম বলা হয়েছে। এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হল 'জ্যেয়' বা বৃহত্তর অনন্ত স্বর্গলোক—বেদের স্বর্গ বা স্বর্লোক; পুরাণের ক্ষুদ্রতর স্বর্গ অথবা মুণ্ডকোপনিষদের ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মলোক* বা সূর্যরশ্মির জগৎ—যেখানে জীব যায় পুণ্য ধর্মকর্মের দ্বারা, সুকৃত বা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির দ্বারা, আর সে-পুণ্য ক্ষয় হলে আবার যেখান থেকে পতিত হয়,—সে-লোক এ নয়; এ হল জন্ম-মৃত্যুর প্রতীকদ্বয়ের অতীত, কঠোপনিষদের** উচ্চতর স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক অথবা মুণ্ডকোপনিষদের উচ্চতর ব্রহ্মলোক*** যেখানে জীব জ্ঞান ও ত্যাগের দ্বারা প্রবেশ করে। সুতরাং তা অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোন অবস্থা নয়, তা জ্ঞানজগতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ, সে হল সর্বানন্দময় অস্তিত্বের মধ্যে জীবের অনন্ত অস্তিত্ব, পরম-সুখ; সে সংস্থিতি আবার উচ্চতর গ্রামের : মনের ওপারে পরম-মনের আলোক, প্রাণের ওপারের পরম প্রাণের সুখ ও নিত্য ঈশিত্ব, ইন্দ্রিয়ের ওপারের পরম সম্বোধের ঐশ্বর্য। আর তাতে জীব পূর্ণ আত্মবিস্তার লাভ ত করেই, পরম অদ্বিতীয়ের আনন্ত্যকেও জানে ও পায়; সে-অমরত্বে তার স্থির প্রতিষ্ঠা হয় কারণ সেখানে পরম নৈঃশব্দ্য ও চিরশান্তিই হল নিত্য জ্ঞান ও অনন্যসাপেক্ষ পরম সুখের নিরাপদ ভিত্তি।

* মুণ্ডক ১।২।৫,৬,১০;

** কঠোপনিষদ ২।৩।১৮

*** মুণ্ডক, ৩।২।৬

১৫

এ উপনিষদের আলোচনা আমাদের এই শেষ হল; পর পর তার প্রত্যেকটি উক্তির নিহিতার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে মানুষের বাক্যে যা কখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না তার নির্দেশের মূল সূত্ররূপে যে-সব শক্তিমান বাক্য তাতে পেয়েছি সে-সবের তাৎপর্য, বুদ্ধির কাছে যতদূর সম্ভব, সুস্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। তৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, আমাদের ও দেবতাদের প্রতিপক্ষতা, অজ্ঞেয় হয়েও যা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নয়, মর্ত্যভাব অতিক্রম করা, অমৃতত্ব জয় করা—এ-সব বাক্য এ উপ-নিষদে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু ধারণা করা গেল।

মূলতঃ এ উপনিষদের শিক্ষা এই আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অস্তিত্বের তিনটি ভাব আছে: মানব মর্ত্যভাব, ব্রহ্মচেতনা বা আমাদের সব সম্বন্ধেরই পরম অনন্যসাপেক্ষ ভাব এবং অজ্ঞেয় সর্বাতীত কৈবল্য ভাব। এই হিসাবে প্রথম ভাবটি ভ্রান্তজ্ঞান ও মিথ্যার অবস্থা, কারণ যেখানে নিগূঢ় সত্য হল সব বস্তুর নিত্য ও একত্ব সেখানে আপাত প্রতীত হয় স্বল্পকালের অবধির মধ্যে সব বিরুদ্ধ অভিঘাতের অনুভব ও তাদের মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়াসের অবিরাম পুনরাবৃত্তি; এখানে দেখি একটা উজ্জ্বল সদর্থক প্রতিরূপ, সেখানে দেখি অন্ধতামস নঞর্থক প্রতিরূপ কিন্তু উভয়ই প্রতিরূপ মাত্র, সত্য কোনটাই নয়; তবুও তার মধ্যেই আমরা অবিরাম বাস করি, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে তার ওপারে। দ্বিতীয় ভাবটি হল এই দ্বৈতক্রিয়ার অধ্যক্ষ, কিন্তু এ-সবের অতীত; সে মহেশ্বর ব্রহ্মেরই সত্যরূপ, কোনক্রমেই মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক নয়, তবে ব্রহ্মের যে সত্যরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের নিত্য অতিমানস সত্তাতে, তাতেই বিধৃত রয়েছে এখানে আংশিক প্রতিরূপে আমরা যা অনুভব করি সে-সবেরই অনন্যসাপেক্ষ পরম রূপ। অজ্ঞেয় আমাদের উপলব্ধি-সীমার বাইরে, কারণ স্বরূপতঃ সেই এক বস্তু হলেও আমাদের নিত্য সত্তার উচ্চতম সংজ্ঞার চেয়েও তা বৃহত্তর, সৎ ও অসৎ দুএরই অতীত; সুতরাং ক্ষণকালের জন্য যা প্রতীয়মান হয় তা ছেড়ে চিরকাল যা আছে তাতে যদি উপনীত হতে চাই, তবে আমাদের অন্বেষণের লক্ষ্য বলে নিতে হবে সেই ব্রহ্মকে আমরা যা তার সঙ্গে যাঁর

একটা সম্বন্ধ আছে, সেই মহেশ্বরকে।

ব্রহ্মে উপনীত হওয়াই হল আমাদের মর্ত্যভাব থেকে অমরত্বে মুক্তি; এখানে অমরত্বের অর্থ মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকা নয়, তার অর্থ জন্ম-মৃত্যুর দ্বৈত প্রতীকের ওপারে আমাদের নিত্য সত্তা ও আনন্দের সত্য আত্মাকে লাভ করা। অমরত্বের অর্থ, আত্মার অনন্যসাপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি, যা জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্মের দ্বারা সেই জীবাত্মারই বিধৃত ক্ষণস্থায়ী বিকারী দেহাশ্রিত জীবনের বিপরীত এবং শুদ্ধমাত্র মনোময় যে-সত্তা এই জগতের জন্মমৃত্যুর নিয়মে হতাশভাবে আবদ্ধ হয়ে এই জগতে বাস করে অথবা অন্ততঃ অজ্ঞানের নিমিত্ত যাকে নিম্নতর প্রকৃতির এই নিয়মের ও অন্যান্য বহু নিয়মের অধীন বলে' প্রতীতি হয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জীবের পক্ষে এ সব অতিক্রম করে' যাবার উপায় হল স্বতন্ত্র ও অনপেক্ষ, নিজের এবং তার বিধৃত সব বিগ্রহের প্রভু, তার প্রকৃত স্বরূপকে জানা ও লাভ করা; আর তাকে জানা ও লাভ করা অর্থই হল ব্রহ্মকে জানা ও লাভ করা। মরলোক থেকে অমরলোকে, দাসত্ববন্ধনের জগৎ থেকে মুক্ত বিশালতার জগতে, সসীম থেকে অসীম দেশে আরোহণ করা তাতেই হয়। পার্থিব সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে' সর্বাতীত পরমানন্দে উন্নীত হওয়াও তাতেই হয়।

আর তা সাধন করতে হবে এই মরজগতের সব বিষয়ের উপর আসক্তি পরিত্যাগ করে'। একত্ব ও অমরত্ব উপলব্ধি করতে হলে মৃত্যু ও দ্বৈতবোধ অপসারিত করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, এ জগতের কোন বিষয়কেই—এমনকি তার ন্যায় আলোক বা সৌন্দর্যকেও—আমাদের অন্বেষণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা ছেড়ে দিতে হবে; এসব অতিক্রম করে' আমাদের যেতে হবে পরম-মঙ্গলের অভিমুখে, সর্বাতীত সত্য আলোক সৌন্দর্যের দিকে—যেখানে এসবের বিপরীত সব প্রতিভাস, যাকে আমরা অশুভ বলি, সে-সবই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তথাপি, এ জগতে যখন বাস করি, এ জগতেরই কোন না কোন পদার্থকে অবলম্বন করে'ই ত তাকে আমরা অতিক্রম করতে পারব, তারই সব বাহ্যরূপের মধ্য দিয়েই ত সব সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে পাব। সুতরাং, তাদের পরীক্ষা করি; দেখি যে, প্রথম রয়েছে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় এই সব সংগঠন—সবই প্রতিরূপ, ত্রুটিবহুল আভাসমাত্র; পরে দেখি, তাদের পশ্চাতে রয়েছে সব জাগতিক তত্ত্ব যার মধ্য দিয়ে পরমের কাজ হয়। এই জাগতিক তত্ত্বগুলিতে উপনীত

হয়ে, বিশ্বে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার ধারা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে তারা তাদেরই অদ্বিতীয় পরমদৈবত, মহেশ্বর ব্রহ্মের মধ্যে তাদের নিজেদের পরম উদ্দেশ্য ও অনপেক্ষ ক্রিয়ার ধারা আবিষ্কার করতে পারে; তাদের সেদিকে আকৃষ্ট করে' সাধারণ মনের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' অতিচেতন দিব্যমনের ক্রিয়া আবিষ্কারে, সাধারণ বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' অতিমানস সম্বোধ ও মৌলিক পরাবাকের আবিষ্কারে, এবং পার্থিব জীবনের বহিশ্চর ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' সর্বাতিশয়ী প্রাণের আবিষ্কারে প্রবর্তিত করতে হবে।

দেবতা ছাড়াও আছে আমাদের আত্মা, আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মসত্তা যা দেবতাদের এই সব ক্রিয়ার আশ্রয়। আমাদের অধ্যাত্মসত্তাকেও ফিরতে হবে---ব্যষ্টি দেহ-প্রাণ-মনের গতি প্রবাহে বিজড়িত ও তার অধীন নিজের যে-ছবি সে দেখে, তাতে একান্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ করে' ঊর্ধ্বপানে, এসবের অতীত ও এসবের অধ্যক্ষ, নিজেরই পরম সত্তার দিকে তার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সুতরাং মনকে দিব্য-মনের, ইন্দ্রিয়কে দিব্যসম্বোধের, প্রাণকে দিব্যপ্রাণের ক্রিয়ার প্রতীক্ষায় নিস্পন্দ থাকতে ত হবেই, যাতে ঊর্ধ্বতমের শক্তির অবিরাম সংস্পর্শ ও সন্নিকর্ষের ফলে তারা সে-সব লোকাতীত বৃত্তি প্রতিফলিত করতে পারে; তদুপরি ব্যষ্টিসত্তাকেও মনের ঊর্ধ্বাশী অভীপ্সার বলে, পার্থিব চেতনার ওপারে নিজেকে উন্নীত করতে হবে আর, সে-শুভক্ষণে যে পরম সতের মধ্যে সে অবস্থান করেছে, তাঁকে অবিরাম স্মরণে রেখে পরিশেষে সেই আনন্দ শক্তি ও আলোকে অধিরোহণ করতে হবে।

কিন্তু তার ফলে, জীবকে যে এক, নিজের নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ অস্তিত্বের সমাহিত, সর্ববিস্মৃত পরমসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত হতেই হবে তা নয়। কারণ, মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ তাদের ব্যষ্টি রূপায়ণ অতিক্রম করলে দেখে যে, তারা সব এক অখণ্ড মন-প্রাণ-বস্তুরূপের এক একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র-মাত্র; সুতরাং, শুধু ব্যষ্টির সর্বাতিশয়িত্বে নয়, তাতেও তারা ব্রহ্মকেই পায়, এবং শুধু তাদের ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়ার মধ্যেই নয়, তার মধ্যেও তারা অতিচেতনের দর্শন নামিয়ে আনে। ব্যষ্টিজীবের মন তার সীমার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরিণত হয় সেই এক বিশ্বজনীন মনে, তার জীবন সেই এক বিশ্বজনীন প্রাণে, তার দেহের বোধ সমগ্র বিশ্বের বোধে, এমন কি, তার চেয়েও বেশী, তারই নিজের অবিভাজ্য ব্রহ্মদেহে। সে তার

নিজের মধ্যেই বিশ্বকে দেখে, তার নিজের সত্তাকে অপর সব সত্তার মধ্যে দেখে; জানে যে, সে-ই অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, বহুধা-বর্তমান একক সর্বান্ত-র্যামী মহেশ্বর ও সৎ-স্বরূপ। এ উপলব্ধি না হলে অমরত্বের সাধনা তার সম্পূর্ণ হল না। তাই বলা হল যে, জ্ঞানীরা সব অস্তিত্বের মধ্যেই ব্রহ্মকে নির্ণয় করতে ও দর্শন করতে চান; সেইভাবে সর্বত্র সর্বভূতে ব্রহ্মকে আবিষ্কার করে', উপলব্ধি করে', লাভ করে' তাঁরা অমর অস্তিত্বে উপনীত হন।

তাহলেও, যদিও দেবতাদের বিজয়কে——অর্থাৎ, মঙ্গল-ন্যায়-সুখ-জ্ঞান-শক্তি এই সব সদাত্মক গুণের পূর্ণ পরিণতির দিকে দেহ-প্রাণ-মনের ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াকে——ব্রহ্মের বিজয় বলে গণনা করা হল এবং এই জগতে জীবনকে ও মানবের কর্মকে আত্মপ্রস্তুতি ও আত্মজয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার প্রয়োজন স্বীকার করা হল, তথাপি পরিশেষে অনন্ত ব্রহ্মলোকে বা ব্রহ্মচেতনার স্থিতিতে প্রয়াণকেই পরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হল। মনে হতেই পারে যে, তাতে জাগতিক জীবনের প্রত্যা-খ্যানই সূচিত হল। সুতরাং, আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে——আমরা বর্তমান যুগের মানুষ যারা ক্রমশঃ বেশী সচেতন হচ্ছি যে, আমাদের স্রষ্টা (প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলি) আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, জাতির পক্ষে ব্যক্তিগত মুক্তির চেয়ে বৃহত্তর কর্তব্য আছে, সৃষ্টিতে ভগ-বানেরও তার চেয়ে মহত্তর অভিপ্রায় আছে কারণ ব্যক্তির চেয়ে বিশ্ব বেশী বাস্তব; আমরা যারা ক্রমশঃ বেশী অনুভব করছি যে, (কোরাণের ভাষায়) মহেশ্বর পরিহাসচ্ছলে স্বর্গমর্ত্য সৃষ্টি করেন নি বা ব্রহ্ম বিকার বা বিভ্রমের ঘোরে বিশ্বস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন নি,——আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ব্যক্তিগত মুক্তির বার্তাই কি এই বিশুদ্ধতর প্রাচীনতর উদারতর বেদান্তেরও একমাত্র বাণী? তা যদি হয় তাহলে, বেদান্ত যত উত্তমই হক না কেন, তা সাধু সন্ন্যাসী তপস্বী বা নির্জন যতীর উপযোগী হতে পারে, কিন্তু আত্মপ্রসারকামী জাগতিক চেতনা তার প্রতীক্ষিত মহামন্ত্র বলে' হৃষ্টচিত্তে যা গ্রহণ করতে পারে এমন কোন বার্তা সে দেয় না। কারণ, স্পষ্টতই, অত্যাবশ্যক কিছু তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এবং অস্তিত্বের প্রহেলিকার কোন গভীর রহস্য থেকে সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তার সমাধান করতে পারেনি বা সে-কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেনি।

সব উপনিষদেই অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তির উপর, ব্যক্তির নিম্নতর জাগতিক জীবন পরিহার করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর কালে সে জোরের পরিমাণ অত্যধিকই হয়ে উঠেছে। আর, রচনার কাল যত পিছিয়ে এসেছে এ-সুরও ততই তীব্রতর হয়েছে, এবং শেষপর্যন্ত স্ফীত হয়ে সর্বপ্রকারের জাগতিক জীবন প্রত্যাখ্যান করাতে এসে দাঁড়িয়েছে; পরিশেষে, পরেকার হিন্দুধর্মে সে-ই হয়েছে প্রায় একমাত্র প্রধান সূত্র আর দৃপ্ত স্পর্ধায় অপর সব মতবাদকেই সে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছে। প্রাচীনতর বৈদিক শ্রুতিতে এ সুর নাই; সেখানে ব্যক্তিগত মুক্তিকে মহৎ জাগতিক বিজয়ের এবং তার ফলে ক্রমে অতিচেতন সত্য ও আনন্দের দ্বারা স্বর্গমর্ত্য বিজয়ের অনুকূল উপায়রূপে দেখা হত, এবং অতীতে সে-বিজয় যাঁরা অর্জন করেছেন এখনও সেই সংগ্রামে রত তাঁদের বংশধরদের তাঁরা সজ্ঞানে সাহায্য করছেন। কিন্তু উপনিষদে যদি পূর্বেকার এই সুরের অভাব থাকে, তাহলে এসব মহৎ-শাস্ত্রের সত্য-সৌন্দর্য-জ্যোতিঃ বা গভীরতা-উচ্চতা যতই অনতিক্রমণীয় হক না কেন, মূর্খ সে যে কোন একখানা পুস্তকের দাস; সুতরাং যখনই তাকে আমরা জ্ঞানের সহায়-রূপে ব্যবহার করি তখনই হারান সেই পুরাতন সুর নির্বন্ধসহকারে বার বার স্মরণ করতে হবে, প্রহেলিকার উপেক্ষিত সমস্যার সমাধান অন্যত্র সন্ধান করতে হবে। যে-সব শাস্ত্র এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মের সত্য আমাদের শিক্ষা দেয় কোন অবগুণ্ঠন না রেখে, কার্পণ্য না করে', বহু বিস্তারে এবং মহৎ উদার ভাব নিয়ে; সুতরাং মানবজাতির পক্ষে তার সাহায্য অপরিহার্য। তবে, যেখানে একান্ত সারগর্ভ কিছুর অভাব হয় সেখানে তার সন্ধানে আমাদের উপনিষদের বাইরে যেতে হবে; যেমন, উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর যে-জোর দিয়েছে তার সঙ্গে যখন আমরা যোগ করি পরবর্তী যুগের শিক্ষাতে ভাগবত প্রেমকে সানুরাগে যে অনন্য-প্রয়োজনের গৌরব দিয়েছে বা বেদে ভাগবতকর্মকে যে মহৎ মর্যাদা দিয়েছে।

বেদে স্বর্গমর্ত্যে মানবের মধ্যে ভগবানের পরম বিজয়ের বাণী, খৃষ্ট ধর্মে ভগবানের রাজত্বের ও পৃথিবীতে ভাগবতপুরীর বার্তা, পুরাণে ক্রম-প্রগতিশীল অবতারের এবং তার পরিণামে ধর্মরাজ্যস্থাপনের এবং সত্য যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণা, এ সবেরই বাহ্যরূপের পশ্চাতে একটা গভীর সত্য আছে; উপরন্তু মানুষের ধর্মভাবের পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে।

এই ভরসা না থাকলে মানবজীবনের ব্যর্থতার উপদেশ এবং হৃদয়ের তীব্র আবেগ নিয়ে তাকে পরিহার করে' বৈরাগ্য সাধনের শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে শুধু অচিরস্থায়ী বিশেষ যুগে অথবা প্রতিযুগে প্রকৃত-সন্ন্যাস-সমর্থ কতিপয় মাত্র শক্তিমান জীবের পক্ষে। অবশিষ্ট লোকেরা বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হয় প্রত্যাখ্যান করবে, আর না হয় মুখে সে উপদেশ মেনে নিয়ে কাজে তা অগ্রাহ্য করবে, আর না হয়, নিজেদের অক্ষমতার গুরুভারে এবং জীবনকে মায়ার বিভ্রম মাত্র মনে করে' বা বিশ্বকে ভগবানের দ্বারা অভিশপ্ত বোধ করে' অতলে ডুববে——মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম যেমন অজ্ঞানের অন্ধকারে ও জ্ঞানান্বেষণের বিরোধিতায় ডুবেছিল, শেষ যুগে রুদ্ধগতি জাড্যের তামসে এবং উদ্দেশ্যহীন অহংস্ফীত জীবনের ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভারত যেমন ডুবেছিল। ব্যক্তির পক্ষে আশ্বাস ভাল বটে কিন্তু জাতির পক্ষেও আশ্বাস প্রয়োজন। আমাদের পিতা স্বর্গকে মুক্তির আশা নিয়ে উজ্জ্বল থাকতে ত হবেই কিন্তু মাতা পৃথিবীকেও চির অভিশপ্ততার বোধ ত্যাগ করতে হবে।

মানুষের চিত্তে ওপারের বোধ গভীরভাবে অঙ্কিত করবার জন্য এক সময়ে আর সব বর্জন করে' ব্যক্তিগত মুক্তির উপর নির্বন্ধ সহকারে অত্যধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল, যেমন আবার এক সময়ে লোভ দেখিয়ে ধর্মাচরণ করিয়ে নেবার এবং নিরঙ্কুশ পাশবতা দমন করবার উদ্দেশ্যে পুণ্যশীল ধর্মাত্মাদের জন্য ভোগসুখময় স্বর্গের উপর জোর দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রলোভনের মতই স্বর্গের সব প্রলোভনও জয় করতে হবে। পুণ্যের পুরস্কারে আরামের স্বর্গের প্রলোভন মানুষ ত্যাগ করেছে; ভারতে বহুপূর্বেই উপনিষদ তাকে বর্জন করেছিল আর এখন লোকচিত্তে তার কোন আধিপত্য নাই, মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে লৌকিক খৃষ্ট ও ইসলাম্ ধর্মের এইরকমের প্রলোভনের আর কোনও অর্থ নাই। জন্মমৃত্যু থেকে মুক্তি ও বিশ্বপ্রয়াস থেকে অব্যাহতির প্রলোভনও তেমনি প্রত্যাখ্যান করতে হবে——নির্বাণের চেয়ে মৈত্রী ও করুণাকে মহত্তর স্থান দিয়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা যেমন করেছিল। স্বর্গে মর্তে কোন পুরস্কারের দাবী না রেখে যেমন আমাদের পুণ্যানুষ্ঠান করতে হবে, তেমনি মুক্তিও চাইতে হবে আভ্যন্তরীণ ও নৈর্ব্যক্তিক: চাইতে হবে অহংজ্ঞান থেকে মুক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন, আমাদের সার্বজনীনত্ব তথা সর্বাতীতত্ব উপলব্ধি; এবং মুক্তির কোন

মূল্যই থাকবে না যদি তা মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে ভালবাসা থেকে, যেটুকু পারি জগৎকে সাহায্য করা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আবশ্যক হলে শিক্ষা দিতে হবে যে, একলা নিজের মুক্তিলাভ করার চেয়ে যাতনাক্লিষ্ট আর সব ভাইদের সঙ্গে নরকভোগ করাও ভাল।

সৌভাগ্যক্রমে এতদূর যাবার প্রয়োজন নাই, সত্যের এক দিক স্থাপনের জন্য অন্য দিক অস্বীকার করতে হবে না। সত্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে উপনিষদে যদি কোন একদিকে অত্যধিক জোর দিয়ে থাকে তবে তাথেকে উদ্ধারের পথ তাতেই নির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ, পরব্রহ্মকে সর্বাতীত আনন্দরূপে যে জানে ও পায় সে সেই আনন্দেরই একটা কেন্দ্রে পরিণত হয় আর, তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা সব তার কাছে আসবে––কূপ থেকে কলসী ভরে জল নেবার মত––দিব্য আনন্দে আধার ভরে নেবার জন্য। এই হল, যে-সূত্র আমরা চাই। বিশ্বের সঙ্গে মুক্তজীবের সংযোগ রক্ষা করা হবে একমাত্র যথোচিত কারণে,––যারা এখনও আবদ্ধ তাদের মত ব্যক্তিগত সুখভোগের বাসনায় সে সংস্রব রাখা হবে না, হবে সর্বজীবকে সাহায্য করবার জন্য। তাহলে এই ঊর্ধ্বাশী আত্মার উদ্দেশ্য হল দুটি :–– প্রথম, পরমকে পাওয়া, পরে চিরকাল জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য বর্তমান থাকা ব্রহ্মেরই মত, তা সে এখানেই হ'ক বা অন্যত্রই হ'ক তাতে মূলতঃ কিছু এসে যায় না; তবুও সংগ্রাম যেখানে তীব্রতম সেখানেই অধ্যাত্ম-সাধনবীরের থাকা উচিত, আর অবশ্যই অমৃতের সন্তানও মহত্তম বলে সেই কর্তব্যই নির্বাচন করবে; পৃথিবীর ডাকই সবচেয়ে বেশী কারণ এইপ্রকারের সিদ্ধপুরুষের, বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম জীবের প্রয়োজন তার পক্ষেই সবচেয়ে বেশী।

এবং, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ যা সাধন করা যেতে পারে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেজন্য অপর নিম্নতর উপায়ে সাহায্য বর্জন করা হয়নি। দেবতাদের যে ক্ষুদ্রতর বিজয় ব্রহ্মের পরম বিজয়ের পথ প্রস্তুত করবে তাতে সহায় হওয়া কোন না কোন প্রকারে আমাদের কর্তব্যের অংশ হতেই পারে, হবেও; কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্য হবে এই ঃ––দিব্যসত্তার আলোক-আনন্দ-মহিমা-শক্তি-জ্ঞানের জীবন্ত মানবকেন্দ্র হওয়া, যাতে তার মধ্য দিয়ে সে দিব্যসত্তা নিজের সংবাদ অপর সব লোককে দিতে পারেন এবং আনন্দের চুম্বকের মত ঊর্ধ্বতমের দিকে সর্বজীবকে আকর্ষণ করে নিতে পারেন।

কঠোপনিষদ

কঠোপনিষদ

প্রথম বল্লী--প্রথম অধ্যায়

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

১। কাম্যলাভের অভিলাষে বাজস্রবা তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দিলেন। তাঁর এক পুত্র ছিল--নচিকেতা তার নাম।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ
সোহমন্যত ॥ ২

২। অবয়স্ক কুমার হলেও যখন যজ্ঞের দক্ষিণা বিতরণ করা হচ্ছিল তখন শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হয়ে সে ভাবতে লাগল।

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

৩। এই-যে শেষ জল পান করছে, শেষ তৃণ ভক্ষণ করছে, শেষ দুগ্ধ দান করছে এই ইন্দ্রিয়হারা গাভীদল, এদের যে দান করে তার ত গতি হয় নিরানন্দলোকে।

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যতীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

৪। তাই পিতাকে গিয়ে সে বললেঃ "আমাকে কার নিকট দান করলে?" দ্বিতীয়বার বললে সে, আবার তৃতীয়বার বললে। পিতা তখন উত্তর দিলেন, "মৃত্যুর নিকট তোমাকে দান করলেম আমি।"

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥ ৫

৫। নচিকেতা ভাবতে লাগল--বহুর মধ্যে আমি চলেছি প্রথমে, বহুর ভিতর আমি চলেছি মধ্যে; আজ যমের আমাকে দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের অভিলাষ!

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে।
শস্যমিব মর্তঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬

৬। স্মরণ করো পূর্ব্বগামীরা কিরূপ ছিলেন, আর স্মরণ করো এখন পরে অনুগামীদের কথা; মর্ত্ত্যমানুষ তৃণের মতই জীর্ণ হয়ে বিনাশ পায় আবার তৃণের মতই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে।

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭

৭। (যমের অনুচররা তাঁকে বললে)। ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির মত গৃহে গৃহে প্রবেশ করেন; মানুষ তার শান্তি বিধান করে। বিবস্বান; পাদ্যোদক আনয়ন কর।

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ ৮

৮। অল্পবুদ্ধি যে-ব্যক্তির গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত থাকে তার আশা প্রত্যাশা, সৎসঙ্গ, তার সত্য এবং প্রিয়ভাষণ, হিতকর কর্ম্ম, পুত্র-পশু সম্পদ, সবই বিফল হয়।

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেহনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেহস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেহস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ ৯

৯। (যম নচিকেতাকে)। নমস্য ব্রাহ্মণ তুমি, যেহেতু তিন রাত্রি আমার গৃহে অভুক্ত কাটিয়েছ তাই তোমাকে প্রণাম করি, আমার মঙ্গল যেন হয়; এখন তবে তুমি আমার কাছে প্রার্থনা কর তিনটি বর।

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ ১০

১০। (নচিকেতা)। গৌতম হোন দুশ্চিন্তামুক্ত প্রসন্ন; হোন তিনি ক্রোধমুক্ত; তোমার কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন আমায় চিনতে পারেন, স্বাগত করেন—হে মৃত্যু, তিনটি বরের মধ্যে এই আমি প্রথমটি বরণ করলেম।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥ ১১

১১। (যম)। আমার নিকট থেকে ফিরে গেলে ঔদ্দালকি আরুণি তোমাকে পূর্ব্বের মতই চিনতে পারবে; তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত দেখে শান্ত মনে রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাবে।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২

১২। (নচিকেতা)। স্বর্গলোকে কিছুমাত্রও ভয় নাই, সেখানে তুমি নাই, জরার আশঙ্কাও নাই। অশনা-পিপাসা উভয়কেই অতিক্রম করে, শোকের অতীত হয়ে, স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ হয়।

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩

১৩। হে মৃত্যু, তুমি স্বর্গগামী অগ্নিকে জেনেছ; আমি শ্রদ্ধাবান—আমায় বল সেই অগ্নির কথা, কি রকমে স্বর্গলোকে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ

হয়। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই।

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্॥ ১৪

১৪। (যম)। নচিকেতা, তোমায় বলছি শোন মন দিয়ে দিব্য অগ্নির কথা—তাকে আমি উত্তমরূপে জানি। জেনে রাখ—অনন্তের প্রাপ্তি এবং সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা সে, আর থাকে অন্তরের অন্তরে গুহাহিত হয়ে।

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫

১৫। মৃত্যু বললে সকল লোকের আদি উৎস অগ্নির কথা—কি প্রকার ইষ্টক, কতসংখ্যক, আর কি করেই বা তাকে স্থাপন করতে হয়। যেমন বলা হল, নচিকেতাও তেমনি পুনরুক্তি করলে। শুনে মৃত্যু তুষ্ট হয়ে আবার বললে।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

১৬। প্রীত হয়ে মহাত্মা মৃত্যু বললেঃ এইখানে আজই তোমায় এই আর একটি বরও দান করলেম—তোমার নামে এই অগ্নির নাম হবে; আর নাও এই বহুরূপ সমন্বিত সৃঙ্কা।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃত্তরতি জন্মমৃত্যু।
ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭

১৭। নচিকেতাগ্নিত্রয় প্রজ্বলিত করে, সেই ত্রয়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ত্রিকর্ম্ম করে, জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; ব্রহ্মজ বরণীয় এই দেবতাকে জেনে, বরণ করে, লাভ এই পরমা শান্তি।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ ১৮

১৮। নচিকেতাগ্নিত্রয় সম্পন্ন যে, আর ত্রয়ীকে জানে যে এবং এই জ্ঞান দিয়ে নচিকেতা-অগ্নি চয়ন করে যে সে মৃত্যুর পূর্ব্বেই মৃত্যুপাশ ছিন্ন করে, শোকের রাজ্য অতিক্রম করে স্বর্গলোকে গিয়ে আনন্দ ভোগ করে।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোযমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব॥১৯

১৯। নচিকেতা, এই তোমার সেই অগ্নি—স্বর্গে নিয়ে যায় এ, তুমি দ্বিতীয় বরে এরই প্রার্থনা করেছ। এ-অগ্নিকে লোকেরা তোমারই বলবে। এখন নচিকেতা প্রার্থনা কর তৃতীয় বর।

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০

২০। (নচিকেতা)। এই যে সংশয় মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়—কেউ যে বলে সে থাকে, কেউ বলে থাকে না,—তোমার কাছে এই বিদ্যা আমি শিক্ষা লাভ করতে চাই—বরত্রয়ের এই হল তৃতীয় বর।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মনুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥ ২১

২১। (যম)। পুরাকালের দেবতারা পর্যন্ত এ-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। একে ত সহজে জানা যায় না—সূক্ষ্ম অণুপ্রমাণ এ-জিনিষ। নচিকেতা, অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। এর জন্য উপরোধ করো না—পরিত্যাগ কর এটি।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ ২২

২২। (নচিকেতা)। দেবতারা পর্যন্ত এ-বিষয়ে সংশয় পোষণ করতেন, বলছ তুমি মৃত্যু, আর এর জ্ঞান সহজ নয়। এ-বিষয়ে বলতে পারে তোমার মত তবে এমন যোগ্য অন্য আর কাকে পাব; এই বরের তুল্য অন্য আর কোন বর নেই।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥ ২৩

২৩। (যম)। চাও শতায়ুঃ পুত্র পৌত্র, বহুল চাও পশু হস্তী হিরণ্য অশ্ব; চাও বৃহদায়তন ভূমি আর যদৃচ্ছা দীর্ঘ জীবন।

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানান্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪

২৪। যদি মনে কর এর তুল্য অন্য কোন বর আছে তবে চাও বিত্ত আর চিরজীবন। নচিকেতা, মহাভূমির অধীশ্বর হও তুমি, আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করব।

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
অভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫

২৫। মর্ত্যলোকে যে-সব কাম্যবস্তু সুদুর্লভ তাদের যা যা তুমি চাও সব বল। মানুষের অপ্রাপ্য রথ ও তূর্য্য সহ এই-যে অপরূপ রমণীরা, এদের আমি তোমায় দেব, নিজের সেবা তুমি কর এদের দিয়ে। কিন্তু মৃত্যুর প্রশ্ন আর করো না।

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬

২৬। (নচিকেতা)। অনিত্য এ-সব, হে মৃত্যু—আজ আছে মানুষের,

কিন্তু কাল নেই; সকল ইন্দ্রিয়ের উজ্জ্বল তেজকে জর্জ্জরিত করে এরা। সমস্ত জীবনেরও আয়ু অল্পই--এ-সব রথ বাহন তোমার থাক, তোমারই থাক নৃত্য আর গীত।

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।। ২৭

২৭। বিত্তে মানুষ তৃপ্তি পায় না কিন্তু যেহেতু তোমাকে দেখেছি তাই বিত্ত ত আমি পাবই, আর ততদিন আমার জীবন যতদিন জীবনের অধীশ্বর তুমি। আমি আর কোন বরই চাই না।

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।। ২৮

২৮। এই অধোলোকে জরাগ্রস্ত হয়ে চলেছে যে মর্ত্ত্যজীব সে যখন অজর অমরদের সান্নিধ্যে আসে, যখন তার জ্ঞান হয়, যখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে বাহ্য ভোগবিলাসের স্বরূপ তখন দীর্ঘ-জীবনের মোহ তার থাকে কি?

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।। ২৯

২৯। মৃত্যু, যা নিয়ে এতখানি সংশয় চলে এসেছে, আমাকে বল সেই মহৎ পরপারের কথা। জীবন-রহস্যের গূঢ়নিবিষ্ট তথ্য--এই বর ছাড়া নচিকেতা আর কোনো বরই গ্রহণ করবে না।

প্রথম বল্লী––দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥১

১। (যম)। এক আছে শ্রেয়, আর এক আছে প্রেয়। দুই-ই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষকে শৃঙ্খলিত করে। যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার কল্যাণ হয়, যে বরণ করে প্রেয়কে সে হয় পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ ২

২। শ্রেয় এবং প্রেয় দুই-ই মানুষের সমীপবর্ত্তী হয়––ধীর যে উভয়কেই সে সম্যক তুলনা করে, উভয়কে পৃথক করে দেখতে জানে। ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে না নিয়ে শ্রেয়কেই গ্রহণ করে; নির্ব্বোধ যে সে লোভ আর আসক্তির বশে বরণ করে প্রেয়কে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাম্মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩

৩। নচিকেতা, সব বিবেচনা করে তুমি কামনা ত্যাগ করেছ, ত্যাগ করেছ যা প্রিয় অথবা মনে হয় প্রিয় বলে। বিত্তের এই সৃঙ্কা তুমি গ্রহণ করনি––যার মধ্যে বহু মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে।

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥ ৪

৪। সম্পূর্ণ বিপরীত এ-দুটি, বিভিন্ন এদের গতি––একটি যদি অবিদ্যা, অপরটি হল বিদ্যা। নচিকেতাকে জেনেছি,––বিদ্যাকাঙ্ক্ষী সে; বহুল কাম্য তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫

৫। অজ্ঞানের মধ্যে বাস ক'রে যারা নিজেদের মনে করে ধীর এবং পণ্ডিত তারা মূঢ়,---চক্রবৃত্তের একই পথে ঘূর্ণায়মান তারা, অন্ধ যেন অন্ধের দ্বারা চালিত।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬

৬। ভ্রান্ত, বিত্তমোহে বিমূঢ়, অপরিণত চিত্তের কাছে উত্তরণের সত্য প্রকাশ পায় না; যার বিশ্বাস---এই লোকই সব, এর পর আর নেই, বারংবার সে আমারই কবলগত হয়।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭

৭। যাঁর কথা শোনা পর্যন্ত বহুলোকের ভাগ্যে হয় না, আবার শুনতে পায় যারা তাদের মধ্যে অল্পই যাঁকে সত্যসত্য জানতে পারে, তাঁর কথা যে বলে আশ্চর্য্য সে-জন, যে তাঁকে লাভ করে সে-ও কুশলী; আর কুশলীর কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে তাঁকে জানে যে সে-ও আশ্চর্য্যের।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ৮

৮। নিম্নস্তরের মানুষ যা বলে তা শুনে তাঁকে যথার্থরূপে জানতে পারবে না তুমি---যেহেতু তাঁকে ভাবা যায় বহু ভাবে। অন্য স্তরের কেউ যদি না বলে দেয় তাহলে তাঁকে জানবার আর কোন গতি নেই---অণু-প্রমাণ সে, তাই বিচারে সে অলভ্য।

নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যান্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯

৯। তর্কের দ্বারা লাভ হয় না এ-জ্ঞান; অপর কেউ বলে দিলে তবে পাওয়া যায় প্রকৃত এ-জ্ঞান--এই যে-জ্ঞান তুমি পেয়েছ। তুমি সত্যধৃত। নচিকেতা, আমরা যেন তোমার মত জিজ্ঞাসু আরো পাই!

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্॥১০

১০। (নচিকেতা)। আমি জানি যাকে বলা হয় সম্পদ অনিত্য তা, কারণ ধ্রুব যা অধ্রুবকে দিয়ে তো তা পাওয়া যায় না। তাই অনিত্য দ্রব্যের সহায়ে চয়ন করেছি আমি এই নচিকেতাগ্নি, পেয়েছি নিত্যকে।

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমম্মহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥১১

১১। (যম)। সকল কামনার পূর্ত্তি, জগতের পাদপীঠ, যজ্ঞের অশেষ ফল, অভয়ের পার, উপাস্য যা, বিপুল ও দূর-প্রসারিত প্রতিষ্ঠাভূমি--এ-সব দেখেছ তুমি এবং ধৃতিবলে সব বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এসেছ।

তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২

১২। যে জ্যোতিষ্মান দেবতা রয়েছেন দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে, গোপন সত্তার অন্তরতম প্রদেশে, হৃদয়ের গভীর কন্দরে যেন গহ্বরের অতলে--তাঁকে অধ্যাত্মযোগের সহায়ে জেনে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগ করেন।

এতদ্ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥ ১৩

১৩। মর্ত্ত্যমানুষ শ্রবণ করেছে যখন তার কথা, সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেছে তাকে, ধর্ম্মের আশ্রয় এই অণুকে ধরেছে পৃথক করে, পেয়েছে, তখন নন্দনীয়কে লাভ করে নন্দিত সে। আমি ত মনে করি নচিকেতার জন্য অবাধ প্রমুক্ত হয়েছে স্বর্গের দুয়ার।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪

১৪। (নচিকেতা)। যা ধর্ম্ম নয়, নয় অধর্ম্ম, এখানে যা করা হয় আর যা করা হয় না তা ছাড়াও অন্য কিছু এবং ভূত ভবিষ্যতের অতিরিক্ত যা দেখছ তুমি বল তার কথা।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫

১৫। (যম)। সকল বেদ যে-পদ ঘোষণা করেছে, সকল তপ বলেছে যার কথা, যা কামনা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সেই পদ তোমায় আমি সংক্ষেপে বলছি; তা হল—ওঁ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬

১৬। সত্যসত্যই এই অক্ষরটি হল অক্ষর-ব্রহ্ম, এই অক্ষরটিই পরম অক্ষয় বস্তু; এই অক্ষরকে জানা গেলে পূর্ণ হয় সকল অভিলাষই। যে যা চায় তার তাই হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৭

১৭। এই অবলম্বনই সকলের শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই সকলের উপরে। এই অবলম্বনকে জেনে ব্রহ্মলোকের মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১৮

১৮। এই যে জ্ঞানময়, জন্ম নেই এর, মৃত্যুও নেই; কোথাও থেকে সে আসেনি, অন্য কিছু হয়ওনি; অজাত নিত্য শাশ্বত পুরাতন এ—শরীরকে হনন করলেও একে হত্যা করা যায় না।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

১৯। যে হননকারী একে হত্যা করেছে মনে করে আর হত যে মনে করে সে হত হয়েছে তারা উভয়েই সত্য জানে না। এ হত্যাও করে না, হতও হয় না আবার।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০

২০। অণুর চেয়েও অণু, মহতের চেয়েও মহান্ এই আত্মা সকল জীবের গভীর অন্তরে রয়েছে নিহিত। কর্ম্ম-মুক্ত বীতশোক যিনি, প্রসন্ন আধার যাঁর, এই আত্মার মহিমা সাক্ষাৎ করেন তিনি।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥ ২১

২১। আসীন থেকেই দূর গতি তাঁর, শায়িত থেকেই আবার ভ্রমণ করেন সর্ব্বত্র। আমি ছাড়া কে উপযুক্ত ভগবানকে জানার—যে-ভগবান সুখ এবং দুঃখ দুই-ই।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২

২২। ধীর ব্যক্তি জানেন আত্মা শরীরের মধ্যে অশরীরী, অনবস্থিতের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ, মহান্ সে, সর্ব্বব্যাপী সে--তাই আর শোক করেন না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ২৩

২৩। এই আত্মা শাস্ত্রবচন দিয়ে পাওয়া যায় না, মেধা দিয়েও নয়, অনেক শ্রবণ করেও একে পাওয়া যায় না। যাকে বরণ করে সে-ই তাকে পায়--তার কাছেই শুধু এ নিজের তনু প্রকট করে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪

২৪। অসংযমী, দুশ্চরিত্র, অশান্ত এবং অসমাহিত অথবা অস্থিরমনা যে সে জ্ঞানের দ্বারা কখনো একে লাভ করতে পারে না।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫

২৫। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষাত্রবল উভয়েই যার অন্ন এবং তাতে মৃত্যু যার পক্ষে উপচার সেই আত্মা যথার্থ যে কোথায় কে জানে?

প্রথম বল্লী—তৃতীয় অধ্যায়

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১

১। ব্রহ্মবিদ্ যাঁরা, যাঁরা পঞ্চাগ্নিনিষ্ঠ, আর যাঁরা ত্রিনচিকেতাগ্নিনিষ্ঠ, দুটি জিনিষের কথা বলে তাঁরাঃ দুটিতেই সুকৃতির জগতে সত্যের ধারা পান করে চলে—তাদের আসন অন্তরের গূঢ়লোকে পরম পরার্দ্ধে; তারা একটি যেন ছায়া, অপরটি আতপ।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২

২। আমরা যেন সেই নচিকেতা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে পারি—যজমানদের পক্ষে সেতু যে, অক্ষর ব্রহ্ম যে, পারার্থীদের পক্ষে যে অভয় পার।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩

৩। আত্মাকে জানো রথী বলে, শরীর হল রথ; বুদ্ধিকে জানো সারথি বলে, আর মন হল বল্গা।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪

৪। ইন্দ্রিয়দল হল অশ্ব। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হল পথ। আত্মা, ইন্দ্রিয়াদি এবং মন মিলে যা মনীষীরা তাকে বলেন ভোক্তা।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫

৫। সম্যকজ্ঞান নাই যার, অসংযত মন যার, অবশীভূত তার ইন্দ্রিয় হল যেন সারথির দুষ্ট অশ্ব।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

৬। সম্যকজ্ঞান আছে যার, সর্ব্বদা সংযুক্ত যার মন, তার ইন্দ্রিয় হল সারথির শিষ্ট অশ্ব।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

৭। অবিজ্ঞানবান যে, অসংযত যার মন, সর্ব্বদা অশুচি যে, সে তৎপদবী লাভ করে না––সংসারের মধ্যে গিয়ে পড়ে সে।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

৮। যে বিজ্ঞানবান, সর্ব্বদা সংযমে আছে যার মন, সর্ব্বদা শুচি যে, সে-ই তৎ-পদবী লাভ করে––সেখান থেকে আর সে জন্ম নেয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥ ৯

৯। যে মানুষের বিজ্ঞান হল সারথি আর সংযত মন হল বল্গা সে পৌছায় পথের পারে গিয়ে––তা-ই বিষ্ণুর পরম পদবী।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০

১০। ইন্দ্রিয়ের উপরে বিষয়, বিষয়ের উপরে মন, মনের উপরে বুদ্ধি,

বুদ্ধিরও উপরে মহান্ আত্মা।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১

১১। আবার মহতের উপরে অব্যক্ত, অব্যক্তের উপরে পুরুষ—পুরুষের পরে কিছুই নেই। সে হল সর্ব্বশেষ, পরা গতি।

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াহত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২

১২। সকল জিনিষের অন্তরে গূঢ় এই আত্মা প্রকাশ পায় না—তবে সূক্ষ্মদর্শীরা একে দর্শন করেন সূক্ষ্ম ও একমুখী বুদ্ধি দিয়ে।

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩

১৩। প্রাজ্ঞ বাক্‌কে মনের মধ্যে উৎসর্গ করবে, মনকে বুদ্ধির, এবং বুদ্ধিকে আবার মহান্ আত্মার মধ্যে, একেও শেষে আবার উৎসর্গ করবে শান্ত আত্মার মধ্যে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১৪

১৪। ওঠ, জাগো, বর লাভ করে লাভ কর জ্ঞান। ক্ষুরের ধারের মত শাণিত—দুরতিক্রম্য এই দুর্গমপথ—বলেছেন দ্রষ্টা যাঁরা।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫

১৫। যাতে শব্দ নেই, স্পর্শ নেই, রূপ নেই, অক্ষয় যে, অরস যে,

যে অগন্ধ, যে নিত্য---যে অনাদি অনন্ত মহতেরও পারে, ধ্রুব যে তাকে বরণ করে নিয়ে মানুষ মুক্ত হয় মৃত্যুর মুখ থেকে।

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬

১৬। মৃত্যু-বর্ণিত নচিকেতার উপাখ্যান যে-মেধাবী শোনে ও বলে সে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি॥ ১৭

১৭। যতচিত্ত যে আবৃত্তি করে এই কাহিনী শ্রাদ্ধকালে অথবা ব্রহ্ম-সংসদে, সে অনন্তের জন্য তৈরী হয়, অনন্তের জন্য।

দ্বিতীয় বল্লী––প্রথম অধ্যায়

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১

১। স্বয়ম্ভূ বহির্ম্মুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়দের, তাই লোকে বাহিরের দিকে দেখে––ভিতরে অন্তরাত্মাকে নয়। তবে অমৃতত্ব-অভিলাষী ধীর কেউ আছে যে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখতে পায় অন্তর্ম্মুখী আত্মাকে।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২

২। বালবৎ অজ্ঞ যারা তারা করে কামবৃত্তির অনুসরণ––তারাই মৃত্যুর বিস্তৃত পাশে গিয়ে পড়ে। কিন্তু ধীর যারা, ধ্রুব অমৃতত্বকে জেনে তারা এখানে অধ্রুবের প্রার্থনা করে না।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৩

৩। কেবলমাত্র এরই সাহায্যে জানা যায় রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ মৈথুন। একে দিয়েই জ্ঞান লাভ হয়, একে ছাড়িয়ে আর কি আছে? এ-ই হল সে।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৪

৪। যার সাহায্যে সম্যক দেখা যায় দুই-ই––স্বপ্নের মধ্যে কি বস্তু আর জাগরণের মধ্যে কি, সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে মনের মধ্যে ধরে রেখে ধীর ব্যক্তি অনুশোচনা করে না।

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৫

৫। জীবের এই মধুপায়ী আত্মাকে যে নিকটে গিয়ে জেনেছে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশরূপে, তার কোন জুগুপ্সা থাকে না। এ-ই হল সে।

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ॥ ৬

৬। সে দেখে তাকে, রয়েছে পঞ্চভূতের সঙ্গে—দেখে তাকে পূর্ব্বে যে জন্মেছিল তপঃশক্তি হতে, জন্মেছিল জলধারা হতে, হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করে সেখানে আসীন যে। এ-ই হল সে।

যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ॥ ৭

৭। এই যে সর্ব্বদেবতাময়ী অদিতি—প্রাণকে আশ্রয় করে প্রকট হন যিনি, হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করে আসীন, ভূতগ্রাম আশ্রয় করে সর্ব্বত্র সঞ্জাত—এ-ই হল সে।

অরণ্যোর্নিহিত জাতবেদাগর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ॥ ৮

৮। জাতবেদা অরণির অন্তর্নিহিত—গর্ভিণীর গর্ভে ভ্রূণ যেমন সযত্নে রক্ষিত; জাগ্রত মানুষের আহুতির দ্বারা প্রতিদিন উপাস্য সে। এ-ই হল সে।

যতশ্চোদেতি সূর্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৯

৯। যার মধ্য থেকে সূর্য্য ওঠে, যারই মধ্যে সে যায় অস্ত, তারই

কাছে সকল দেবতা নিজেদের অর্পণ করেছে--তাকে অতিক্রম করে কেউ চলে যেতে পারে না। এ-ই হল সে।

যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০

১০। এখানেও যা অন্যত্রও তা; অন্যত্র যা আবার তা এখানেও। এখানে যে দেখে নানাকে, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১

১১। একে মন দিয়েও পেতে হয়--নানাত্ব কিছু নেই এখানে। এখানে যে দেখে নানাত্ব, সে মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যে চলে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১২

১২। অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সেই পুরুষ, আত্মার অন্তরে স্থিত যে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ--তার কাছে আর জুগুপ্সা থাকে না। এ-ই হল সে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩

১৩। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অধূমক জ্যোতির মত, ভূত-ভবিষ্যতের সে ঈশ। আজও সে, কালও সে। এ-ই হল সে।

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪

১৪। দুর্গম শিখরে বৃষ্টিপাত হলে তা যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে (পৃথক)

ধাবিত হয়ে চলে তেমনি ধর্ম্ম হতে ধর্ম্মকে পৃথক করে দেখে যে, সেও পৃথক পৃথক ধর্ম্মকেই অনুধাবন করে চলে।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫

১৫। শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল ঢাললে তা যেমন, তেমনি, হে গৌতম, যে মুনি জ্ঞানময় তার আত্মাও তদ্রূপ থাকে।

দ্বিতীয় বল্লী—দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১

১। অজাত যিনি, অবক্র যাঁর চেতনা, তিনি রয়েছেন একাদশ দ্বার বিশিষ্ট পুর মধ্যে। তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর শোক থাকে না, পূর্ণ মুক্ত হয়ে হয় পরম মুক্তিলাভ। এ-ই হল সে।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্‌হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২

২। হংস রূপে শুচির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বসু হয়ে প্রতিষ্ঠিত অন্তরীক্ষ-লোকে, বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হোতা অগ্নি হয়ে, পান পাত্রে অতিথি হয়ে; মানুষী বীর্যের মধ্যে, বরণীয় বস্তুর মধ্যে, ঋতের মধ্যে, ব্যোমের মধ্যে আসীন সে; জল হতে জ্যোতি হতে ঋত হতে অদ্রি হতে জাত সে, সে-ই হল ঋত আর বৃহৎ।

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩

৩। প্রাণকে সে ঊর্দ্ধে উন্নীত করে, নীচে নামিয়ে আনে অপানকে। মধ্যে যে বামন আসীন সকল দেবতা তাকে উপাসনা করে।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৪

৪। এই দেহী যখন দেহ থেকে বিস্রস্ত ও বিমুগ্ধ হয়ে চলে তখন এখানে কী অবশিষ্ট থাকে? এ-ই হল সে।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫

৫। প্রাণের দ্বারা নয়, অপানের দ্বারা নয় মর্ত্ত্যজীব বাঁচে অন্য কিছু দিয়ে; তাকেই আশ্রয় করে রয়েছে এ-দুটি।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬

৬। হে গৌতম, এখন তোমায় আমি বলব গূঢ় সনাতন ব্রহ্মের কথা,--আর মৃত্যুর পরে আত্মার কি হয় সেই কথা।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥ ৭

৭। কেহ-কেহ দেহ ধারণের জন্য গর্ভান্তরে প্রবেশ করে, অপর কেহ বা পৌছায় গিয়ে স্থাণুতে--তাদের আপন আপন জ্ঞান কর্ম্ম অনুসারে।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকা শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৮

৮। সকলের সুপ্তি যেখানে, সেখানে জেগে থাকেন যে-পুরুষ আর ইচ্ছামত সব নির্ম্মাণ করে চলেন--তিনিই শুভ্র, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই বলা হয়েছে অমৃত। সকল লোক তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে--তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না কেউ।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯

৯। অগ্নি যেমন এক হয়েও ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করে রূপে রূপে

বহুরূপ হয়ে আপনাকে ধরে দিয়েছে, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ অন্তরাত্মা এক হয়েও বাহিরে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ১০

১০। বায়ু যেমন এক হয়েও ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করে নানা রূপে আপনাকে ধরে দিয়েছে, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ অন্তরাত্মা এক হয়েও বাহিরে অবধি প্রত্যেক রূপে বিভিন্ন রূপ করেছে গ্রহণ।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১

১১। চক্ষুর বাহ্যদোষ যেমন সকল লোকের চক্ষু স্বরূপ সূর্যকে স্পর্শ করে না, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ অদ্বিতীয় আত্মায় পার্থিব দুঃখ স্পর্শ করে না—এ-সবের বাহিরে সে।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২

১২। একক নিয়ন্তা হয়েও এই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একই রূপকে বহুধা করে চলেছে; স্থিতধী যে, আপনার অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত সে সর্ব্বদা দেখে তাকে—তারই সুখ শাশ্বত, অপর কারো নয়।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩

১৩। অনিত্যের মধ্যে নিত্য যে, অচেতনার মধ্যে চেতনা যে, এক যে বহুর কাম্য বিহিত করে, তাকে আপনার আত্মায় প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বদা দেখে যে স্থিতধী—তারই জন্য শাশ্বত শান্তি, অপর কারো জন্য নয়।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্‌বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪

১৪। 'এই সে-জিনিস'--এই বলে তারা অনির্দেশ্য পরম সুখকে জানে। কি করে তাকে জানব? সে কি নিজের আলোকেই আলোকিত না অন্যের আলো তাকে আলোকিত করে?

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৫

১৫। সূর্য্য সেখানে আলো দেয় না, দেয় না চন্দ্র তারা, এই সব বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত নাই সেখানে, পার্থিব অগ্নিই বা কোথায়? সে জ্বলে, তাই সকলে জ্বলে; তারই আলোকে এই সমস্ত আলোকিত।

দ্বিতীয় বল্লী––তৃতীয় অধ্যায়

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ১

১। এই সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে আর নীচের দিকে বিস্তৃত তার শাখা। শুদ্ধ শুভ্র সে, সে ব্রহ্ম, তাকেই আবার অমৃত বলা হয়। তাতেই সকল লোক আছে আশ্রয় নিয়ে––তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না কেউ। এ-ই হল সে।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২

২। এই যা-কিছু গতিমান জগৎ তা সবই প্রাণের স্পন্দনের ফলে নিঃসৃত, মহাভয়, উদ্যতবজ্র সে––তা যে জানে অমর হয় সে।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩

৩। তার ভয়ে আগুন জ্বলে, সূর্য্য আলো দান করে, তার ভয়ে ইন্দ্র বায়ু এবং পঞ্চম দেবতা মৃত্যু ধাবিত হয়ে চলে ।

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪

৪। কেউ যদি এখানে শরীর বিযুক্ত হবার আগেই তাকে জানতে না পারে তবে মৃত্যুর পরে আবার সৃন্ট সব লোকে শরীর গ্রহণ করতে হয় তাকে।

যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥৫

৫। দর্পণে প্রতিবিম্ব যেমন আপন আত্মাতে তার প্রতিবিম্ব তেমনি, স্বপ্নে যেমন পিতৃলোকেও তেমনি, যেমন জলে তেমনি গন্ধর্ব্বলোকেও; এ যেন ছায়া আর আতপ--ব্রহ্মলোকেও তাই।

ইন্দ্রিয়াণাম্ পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬

৬। স্থিতধী যে, যে জানে ইন্দ্রিয়দের অস্তিত্ব পৃথক, রয়েছে তাদের উদয় আর অস্ত, তাদের উৎপত্তিও পৃথক--জেনে দুঃখ ভোগ করে না সে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনোমনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭

৭। ইন্দ্রিয়ের উপরে মন, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধির ঊর্দ্ধে মহান্ আত্মা, মহতের চেয়ে মহত্তর হল অব্যক্ত।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮

৮। আবার অব্যক্তেরও উপরে পরম পুরুষ--সর্ব্বব্যাপী লক্ষণহীন। তাকে জেনে জীব মুক্ত হয়।

ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯

৯। দৃষ্টির মধ্যে তার রূপকে সে ধরে দেয় নি, আর চক্ষু দিয়েও ত কেউ তাকে দেখতে পায় না, মন বুদ্ধি আর হৃদয়ের কাছে প্রকট সে-- তাকে যারা জানে তারা অমর হয়।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম॥ ১০

১০। পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্থির হয়ে থাকে যখন আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনও, বুদ্ধিও যখন হয় নিশ্চেষ্ট, মনীষীরা বলেন তখনই হল পরমা গতি।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১

১১। তারই নাম যোগ--দৃঢ়-স্থির ভাবে ইন্দ্রিয়-ধারণ; তাই হল যোগের অপ্রমত্ত অবস্থা; সেখানে সৃষ্টিও রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে লয়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২

১২। বাক্ দিয়ে নয়, মন দিয়ে নয়, চক্ষু দিয়েও তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। এক যাঁরা বলতে পারেন--"সে আছে", তাঁদের ছাড়া অন্যের এ উপলব্ধি কি রকমে হবে?

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩

১৩। অস্তি মাত্র তিনি, আবার তাঁর আছে তত্ত্বভাব--উভয় প্রকারেই তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। অস্তি বলে যখন তাঁর উপলব্ধি হয় তখন তত্ত্বভাবও ফুটে ওঠে নির্ম্মল হয়ে।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪

১৪। হৃদয় আশ্রয় করে রয়েছে যে-সব কামনা তা হতে পূর্ণ মুক্ত

যখন, তখনই মরমানুষ অমর হয়ে ওঠে---এই এখানেই ব্রহ্মকে সম্যক লাভ করে।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথঃ মর্ত্তোঽমৃতো ভবতি এতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ ১৫

১৫। হৃদয়ের সকল গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন মরমানুষ হয় অমর---এই হল অনুশাসন।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬

১৬। একশত এক নাড়ী হৃদয়ের। একটি চলে গিয়েছে মূর্দ্ধা ভেদ করে---তাকে ধরে যে উপরে চলে যায় অমৃতত্বে উপনীত হয় সে; অন্য সব মৃত্যুর সময়ে বিভিন্ন পথে নিয়ে যাবার জন্য।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭

১৭। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, অন্তরাত্মা, সর্ব্বদা সকল জীবের হৃদয়-সন্নিবিষ্ট; মুঞ্জার থেকে শীষ যেমন টেনে তোলে তেমনি করে সযত্নে দেহের থেকে তুলতে হবে তাকে। তাকে জানা চাই শুদ্ধ এবং অমৃত বলে---যথার্থই তাকে শুদ্ধ এবং অমৃত বলে জানতে হবে।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভুদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮

১৮। মৃত্যুর কাছ থেকে এই জ্ঞান পেয়ে এবং যোগ সম্বন্ধে সকল নির্দ্দেশ জেনে নচিকেতার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হল---হল সে বিরজ অমর; অন্যেরও হবে তাই, যদি এই রকমে জানে অধ্যাত্মকে।

মুণ্ডক উপনিষদ

মুণ্ডক উপনিষদ

প্রথম মুণ্ডক---প্রথম খণ্ড

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥

১। দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জন্মালেন ব্রহ্মা---বিশ্বের কর্ত্তা, জগতের ধারক; জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে তিনি বললেন সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা।

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥২॥

২। অথর্ব্বাকে ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা বললেন, অথর্ব্বা পুরাকালে তা বললেন অঙ্গিরকে। অঙ্গির আবার বললেন ভরদ্বাজপুত্র সত্যবাহকে, ভরদ্বাজপুত্র বললেন আবার অঙ্গিরসকে---পরা ও অপরা উভয় বিদ্যাই।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ।
কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥

৩। অঙ্গিরসের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হয়ে মহাগৃহস্থ শৌনক জিজ্ঞাসা করলেন---ভগবন্, কি জানলে পরে, এই সমস্তই জানা হয়?

তস্মৈ স হোবাচ---দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো
বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥

৪। অঙ্গিরস বললেন তাঁকে: দুই রকমের জ্ঞান জ্ঞাতব্য, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন---এক পরা, আর এক অপরা।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥

৫। অপরা হল ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা (আবৃত্তি), কল্প (ক্রিয়ানুষ্ঠান), ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। আর পরা হল যা দিয়ে অধিগত হয় "অক্ষর"।

যত্ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥

৬। সেই যা অদর্শনীয়, অগ্রহণীয়, গোত্রহীন, বর্ণহীন, চক্ষুহীন, শ্রোত্রহীন, সেই যে অপাণি, অপাদ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, সেই যা অব্যয়, যা সর্ব্বতত্ত্বের জঠর, তাকেই ধীমানেরা দেখেন সর্ব্বত্র।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ ৭॥

৭। ঊর্ণনাভ যেমন ছড়িয়ে ধরে আবার গুটিয়ে নেয়, পৃথিবীর উপর তৃণাদি যেমন সঞ্জাত হয়, অথবা সজীব পুরুষের দেহে কেশ ও লোম যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি অক্ষর হতেও বিশ্ববস্তু এখানে জন্মগ্রহণ করে।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥ ৮॥

৮। ব্রহ্মের উপচয় তপোবলে, তখন তাঁর থেকে জন্ম নেয় জড়, জড় হতে প্রাণ, মন, সত্য, লোকসমূহ আর কর্ম্মের মধ্যে অমৃতত্ব।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥ ৯॥

৯। যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁর তপোবল জ্ঞানময়, তাঁর হতেই জন্মেছে এই ব্রহ্ম, এই নাম, এই রূপ, এই জড়।

প্রথম মুণ্ডক—দ্বিতীয় খণ্ড

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো
যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে॥ ১॥

১। সেই বস্তুই এই, তাই সত্য—মন্ত্রদ্রষ্টারা মন্ত্রের মধ্যে যে-কর্ম্ম সব দর্শন করেছিলেন, ত্রেতাযুগে তাদের হল বহুধা বিস্তৃতি। একাগ্র হয়ে সত্যের কামনায় সে-কর্ম্ম আচরণ করে চল—সুকৃতির লোকে পৌঁছিবার এই তোমার পথ।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতোঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়াহুতম্॥ ২॥

২। প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি শিখা যখন লেলিহান হয়ে ওঠে, তখন দুই ঘৃতার্পণের অবকাশে শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে অর্পণ কর তোমার আহুতি।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥ ৩॥

৩। যার যজ্ঞানুষ্ঠানে নাই অমানিশাক্রিয়া, নাই পৌর্ণমাসীক্রিয়া, নাই চাতুর্ম্মাস্যক্রিয়া, নাই নবান্নক্রিয়া অথবা নাই অতিথি নাই আহুতি বা রয়েছে অবিহিত আহুতি, কিংবা আহুত হয়নি বিশ্বদেবতা তার সমগ্র সপ্তলোক বিনষ্ট হয়।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ॥ ৪॥

৪। কৃষ্ণবর্ণা কালী, ভীষণা করালী, মনোবেগময়ী মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গময়ী স্ফুলিঙ্গিনী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী বিশ্বরুচি—অগ্নির এই লেলিহান সপ্তজিহ্বা।

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

৫। এরা যখন দীপ্যমান তখন যথাকালে অগ্নিযোগ অনুষ্ঠান করে যে তাকে তার আহুতিরা এসে ধারণ করে—এরাই সূর্য্যের রশ্মি হয়ে তাকে নিয়ে চলে যেখানে সকল দেবতার অধিপতি ঊর্দ্ধে আসীন।

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

৬। এস, এস,—দীপ্যমান আহুতিরা বলে তাকে, সূর্য্যের রশ্মি ধরে তাকে বহন করে নিয়ে চলে, বলে তাকে মধুর বাক্য, করে অর্চ্চনা, বলে—এই ত ব্রহ্মলোক, তোমার সুকৃতির পুণ্যলোক।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

৭। কিন্তু যজ্ঞের এই সব রূপ, এই সব যজ্ঞীয় নৌকা সুদৃঢ় নয়—তাদের অষ্টাদশের প্রত্যেকটিতে বলা হয়েছে নিম্নতম কর্ম্মের কথা। শ্রেয় বলে এদের অভিনন্দন করে যারা জরামরণের মধ্যে পুনরায় তাদের আসতে হয়।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥

৮। অবিদ্যার অন্তরে বাস করেও যারা মনে করে "আমরাও জ্ঞানী, আমরাও পণ্ডিত", মূঢ় তারা,—পদে পদে আঘাত খেয়ে ঘুরে মরে তারা,—অন্ধ নিয়ে চলে যে অন্ধের দল তাদের মত।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

৯। অবিদ্যার মধ্যে বহুপ্রকারে বাস করেও যারা গর্ব্ববশে মনে করে "কৃতকৃতার্থ আমরা", বালক তারা। আসক্তিই কর্ম্মীদের জ্ঞান হতে দেয় না, দুঃখাতুর তাই তারা, কর্ম্মজনিত লোক ক্ষয় হলে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তারা।

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ ১০॥

১০। যজ্ঞাহুতি আর কূপাদি খননকেই যারা শ্রেষ্ঠ মনে করে, অন্য শ্রেয়ের জ্ঞান নাই যাদের সর্ব্বতোভাবে মূঢ় তারা। স্বর্গপৃষ্ঠে সুকৃতি ভোগ করে তারা আবার এই লোকে বা আরো হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥ ১১॥

১১। কিন্তু অরণ্যবাসী হয়ে, তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুশীলন করে যারা, শান্ত যারা, জ্ঞানী যারা, ভিক্ষাবৃত্তি যাদের, তারা আসক্তিশূন্য হয়ে যায় সূর্য্যদ্বার দিয়ে সেইখানে যেখানে রয়েছে অমৃতময় পুরুষ, অব্যয় আত্মা।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥১২

১২। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত লোক সব পর্য্যবেক্ষণ করে নির্ব্বেদ লাভ করে। কৃত দিয়ে অকৃত লাভ হয় না। সে বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে হলে সমিৎ-পাণি হয়ে শরণ গ্রহণ করবে এমন গুরুর কাছে যাঁর আছে শ্রোত্রজ্ঞান, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১৩॥

১৩। শরণাগত যে, সম্যক প্রশান্তচিত্ত যে, শমতাপূর্ণ যে তাকেই জ্ঞানী বলেন ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব--যাতে জানা যায় অক্ষরকে, পুরুষকে, সত্যবস্তুকে।

দ্বিতীয় মুণ্ডক--প্রথম খণ্ড

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥১॥

১। এই-যা তা হল সেই--তাই সত্য। সুদীপ্ত পাবক হতে তার অনুরূপ সহস্র স্ফুলিঙ্গ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি সেই অ-ক্ষর হতে নানা-বিধ ক্ষররূপ জন্মগ্রহণ করে, তারই মধ্যে আবার ফিরে যায়।

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥

২। তিনি দিব্য, তিনি অমূর্ত্ত, চিন্ময় পুরুষ, বাহিরে তিনি অন্তরে তিনি, তিনি জন্মহীন, প্রাণের অতীত, মনের অতীত, জ্যোতির্ময়, অক্ষরেরও পারে পরমতম তিনি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বমস্য ধারিণী॥ ৩॥

৩। তাঁর থেকে জন্মে প্রাণ মন সর্ব্ব ইন্দ্রিয়--আকাশ বায়ু তেজ অপ আর বিশ্বধরিত্রী পৃথিবী।

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্‌ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা॥ ৪॥

৪। অগ্নি তাঁর মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁর চক্ষুদ্বয়, দিক তাঁর শ্রবণ, জাগ্রত বেদ তাঁর কণ্ঠ--বায়ু তাঁর প্রাণ, বিশ্ব তাঁর হৃদয়, পৃথিবী পদযুগল--সকল সত্তার অন্তরাত্মা তিনি।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ।।৫

৫। তাঁর হতেই অগ্নি যার সমিধ সূর্য্য। তাঁর কল্যাণে সোম হতে বৃষ্টি, পৃথিবীর উপরে ওষধি, নারীদেহে পুরুষের রেতসিঞ্চন। চিন্ময় পুরুষ হতেই জন্মিল বহুল সন্ততি।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ঋতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ ।। ৬ ।।

৬। তাঁর হতেই ঋক্‌মন্ত্রাবলি, সাম, যজু; তাঁর হতেই দীক্ষা, সকল যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় কর্ম্ম, সকল দেয় দক্ষিণা। আর সংবৎসর আর যজমান আর সেই সব লোক যেখানে চন্দ্র, যেখানে সূর্য্য ঢালে তাদের পুণ্য-কিরণ।

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ।। ৭ ।।

৭। তাঁর থেকে নিঃসৃত বহুল দেবতা, সাধ্য, মানুষ, পশু, পক্ষী—প্রাণ আর অপান, ব্রীহি ও যব, আর শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং সদাচার-বিধি।

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ।।৮।।

৮। তাঁর থেকে উৎপন্ন সপ্ত প্রাণ সপ্ত শিখা সপ্ত সমিধ সপ্ত আহুতি, আর এই সপ্তলোক যার মধ্যে সপ্তধা স্থাপিত গুহাশ্রয়ী প্রাণ বিচরণ করে।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ।। ৯ ।।

৯। এখান থেকে উঠেছে গিরি আর সমুদ্র--এখান থেকেই প্রবাহিত সকল আকারের নদনদী, এখান থেকেই সকল ওষধি আর সেই রসধারা যাকে ধরে এই অন্তরাত্মা পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলে রয়েছে।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥ ১০॥

১০। চিন্ময় পুরুষই এই বিশ্ব, তিনিই কর্ম্ম, তিনি তপোবল, তিনি মৃত্যুর অতীত পরব্রহ্ম, হৃদয়-গুহায় নিহিত একে যে জানে এখানেই সে অবিদ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে ফেলে।

দ্বিতীয় মুণ্ডক––দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদস-
দ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১॥

১। প্রকাশ হয়ে তিনি স্থিতি নিলেন এখানে অন্তরে, হৃদয়গুহায় তাঁর বিচরণ, মহান প্রতিষ্ঠা তিনি, তাঁর মধ্যে সমর্পিত যা কিছু গতিমান প্রাণবান চক্ষুষ্মান––তাঁকে জানো, তিনি সৎ-অসৎ, বরেণ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টজীবের জ্ঞান অতিক্রম করে রয়েছেন তিনি।

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥

২। জ্বলমান তিনি, অণু হতে অণু, তাঁরই মধ্যে নিহিত লোকসমূহ আর তাদের যাবতীয় অধিবাসী। সেই হল এই––অক্ষর ব্রহ্ম সে। সে প্রাণ, সে বাক্, সে মন। সেই হল এই––সত্য সে, অমৃত সে। হে সৌম্য, তাকে বিদ্ধ করতে হবে––কর বিদ্ধ তাকে।

ধনু র্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্‌ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩॥

৩। মহাস্ত্র উপনিষদ––ধনুরূপে গ্রহণ কর। উপাসনার শাণিত শর তাতে সন্ধান কর। তদ্‌গতচিত্তে ধনু আকর্ষণ কর, হে সৌম্য, বিদ্ধ কর সেই লক্ষ্য, সেই যে অ-ক্ষর।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪॥

৪। প্রণবই ধনু, আত্মা শর আর বলা হয় ব্রহ্মই লক্ষ্য। অটলচিত্তে

লক্ষ্যভেদ করতে হবে, শরবৎ তন্ময় হতে হবে।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫ ॥

৫। যাঁর মধ্যে দ্যৌ পৃথিবী অন্তরীক্ষ আর মন আর তার সঙ্গে প্রাণ সব ওতপ্রোত গ্রথিত--জান, তিনিই অদ্বিতীয় আত্মা, অন্যবিধ বাক্ পরিত্যাগ কর, এই অমরত্বের সেতু।

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড়য়ঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

৬। রথনাভিতে অর-সমূহের মত যে স্থানে নাড়ী সব সংহত হয়েছে, সেই অন্তর্লোকে বহুধা জন্মগ্রহণ করে তিনি করেন বিচরণ। আত্মাকে ধ্যান কর ওম্-রূপে---তমোরাশির পরপারে উত্তরণ তোমাদের হোক স্বস্তিকর।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭ ॥

৭। সর্ব্বজ্ঞ যে, যে সর্ব্ববিৎ, ভুবনে এই যার মহিমা, সেই আত্মা ব্রহ্মের দিব্যলোকে---পরম ব্যোমে ---প্রতিষ্ঠিত।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি ॥ ৮ ॥

৮। প্রাণ ও শরীরের নেতা মনোময় পুরুষ সে, অন্নময়ের মধ্যে স্থাপন

করেছে হৃদয়কে, অন্নময়ে প্রতিষ্ঠিত সে——তারই জ্ঞান দিয়ে ধীমানেরা সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ করে তাকে ভাস্বর হয়ে প্রকট যে, আনন্দরূপ যে, অমৃত যে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥৯॥

৯। হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্মাবলী তার ক্ষয় পায়, যখন সে সাক্ষাৎ করে যুগপৎ যা রয়েছে ঊর্দ্ধে যা রয়েছে নিম্নে।

হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ১০॥

১০। পরমোর্দ্ধ হিরন্ময় কোষের মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছেন অমল অখণ্ড, শুভ্র তিনি জ্যোতির জ্যোতি, আত্মবিদেরা জানে তাঁকেই।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১১॥

১১। সূর্য্য যেখানে জ্বলে না, জ্বলে না চন্দ্রতারা, এই বিদ্যুৎও সেখানে জ্বলে না, এই আগুন তবে জ্বলবে কি করে? সে প্রজ্বলিত বলে তাকে ধরে সব জ্বলছে, তারই প্রজ্বালায় এই সবই উজ্জ্বল।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ১২॥

১২। এই সমস্তই ব্রহ্ম, অমৃতময়——ব্রহ্ম সম্মুখে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উত্তরেও ব্রহ্ম——অধোভাবে ঊর্দ্ধে সমান প্রসারিত ব্রহ্ম——

ব্রহ্মই এই অনুপম বিশ্ব।

তৃতীয় মুণ্ডক—প্রথম খণ্ড

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

১। দুটি বিহঙ্গ, সুন্দর পক্ষ, নিত্যসঙ্গী, সখা উভয়ে, একই বৃক্ষ আলিঙ্গন করে রয়েছে। একজন তাদের ভক্ষণ করে মিষ্ট ফল, অন্যটি আহার না করে শুধু চেয়ে দেখে।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥

২। একই বৃক্ষে অন্তঃপুরুষ রয়েছে নিমগ্ন, অনীশ সে, তাই মুহ্যমান শোকগ্রস্ত। যখন সে দেখে অন্যটিকে, ঈশ যে, প্রিয় যে, তখন সবই তাঁর মহিমা এ জ্ঞানে দূর হয় তার সব শোক।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

৩। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যে দেখে তাঁকে যিনি স্বর্ণবর্ণ, কর্তা যিনি, ঈশ যিনি, ব্রহ্মনিদান চিন্ময় পুরুষ যিনি, তখন জ্ঞানলাভ ক'রে সকল পাপ-পুণ্য দূর করে দিয়ে সে হয় নিরঞ্জন, লাভ করে পরম সাম্য।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ
ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

৪। এই ত প্রাণশক্তি, সকল বস্তুর ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জ্ঞানী যে তার জ্ঞান যখন পূর্ণ তখন আর সে অতিতার্কিক হয় না—হয় আত্মক্রীড়, আত্মরতি, কর্ম্মনিরত, ব্রহ্মজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।। ৫।।

৫। সত্যের দ্বারা তপস্যার দ্বারা, সম্যক জ্ঞানের দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই আত্মা নিত্যলভ্য, অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময় সে, শুভ্র সে, তাকে যতিরা সাক্ষাৎ করে কলুষ-নির্ম্মুক্ত হয়ে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্।। ৬।।

৬। সত্যেরই জয়, অনৃতের নয়। দেবতাদের যাত্রার পথ সত্য দিয়ে আস্তৃত—তাকে বেয়ে আপ্তকাম ঋষিরা উঠে চলে যেখানে সেই সত্যের পরম নিধান।

বৃহচ্চ তদ্ দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যতিস্বহৈব নিহিতং গুহায়াম্।। ৭।।

৭। বৃহৎ সে-বস্তু, দিব্য তা, রূপ তার অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উদ্ভাসিত সে। দূর হতে সুদূরে, আবার এখানেই অন্তিকে সে, যার দৃষ্টি আছে সে তাকে দেখে এই এখানেই, এই হৃদ্-গুহায় নিহিত।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।। ৮।।

৮। চক্ষু দিয়ে তাকে গ্রহণ করা যায় না, বাক্য দিয়ে নয়, অন্য কোন দেবশক্তি দিয়ে নয়, তপস্যা বা কর্ম্ম দিয়েও নয়। নির্ম্মল জ্ঞানে সত্তা যখন বিশুদ্ধ, তখনই ধ্যানযোগে সেই অখণ্ডের দর্শন হয়।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা॥ ৯॥

৯। এই যে অণু আত্মা তাকে জানতে হবে এমন চেতনা দিয়ে যার মধ্যে প্রাণ পঞ্চধা প্রবেশ করেছে; জীবের চিত্ত যখন সর্ব্বতোভাবে প্রাণধারায় ওতপ্রোত, যখন সে বিশুদ্ধ তখনই আত্মার পূর্ণ প্রকাশ।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ ১০॥

১০। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ যার তার মনের আলো যে-যে লোক উদ্ভাসিত করে, তার কামনা যা-যা কাম্য চেয়েছে, সে-সব লোক, সে-সব কাম্যই জয় করে সে, অভ্যুদয় কামনা করে যে সে যেন আত্মজ্ঞানীর অর্চ্চনা করে।

তৃতীয় মুণ্ডক--দ্বিতীয় খণ্ড

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ॥ ১॥

১। সে জানে এই পরম ব্রহ্মধাম, যার মধ্যে বিশ্ব নিহিত রয়েছে, জ্বলছে শুভ্ররূপে। কামনাবর্জিত প্রাজ্ঞ যারা, যারা চিন্ময় পুরুষের অর্চ্চনা করে তারা এই শুভ্রতাকেও অতিক্রম করে চলে যায়।

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ ২॥

২। কাম্য সব কামনা করে যে, কাম্য নিয়ে চিন্তামগ্ন যে, সেই কামনার বশে জন্মগ্রহণ করে সে যথা-তথা স্থানে; কিন্তু কামনা যার পূর্ণ; সে লাভ করে আত্মাকে, তার কামনা এই এখানেই সব লোপ পেয়ে যায়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ ৩॥

৩। এই আত্মা ব্যাখ্যান দিয়ে লাভ হয় না, মেধা দিয়ে হয় না, বহু শাস্ত্র অধ্যয়নেও হয় না। যাকে সে নিজে বরণ করে তারই লভ্য সে, তার কাছে সে উন্মুক্ত করে ধরে আপন তনু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪॥

৪। বলহীনে এ আত্মাকে লাভ করে না। প্রমাদের ভিতর দিয়ে একে লাভ হয় না, অর্থবিহীন তপশ্চর্য্যা দিয়েও হয় না। ঐ সব সদুপায়ে প্রচেষ্টা করে যে জ্ঞানী তারই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ ৫॥

৫। সত্যদ্রষ্টা যারা একে লাভ করেছে, জ্ঞানতৃপ্ত যারা, কৃতাত্ম বীতরাগ প্রশান্ত প্রাজ্ঞ তারা সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বদিক দিয়ে লাভ করে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করে।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥ ৬॥

৬। যতি যারা, সন্ন্যাস-যোগে শুদ্ধ যাদের আন্তর-সত্তা, সমগ্র বেদান্ত-জ্ঞানের অর্থ যাদের সুনিশ্চিত, তারা সকলে অন্তিমকালে মৃত্যুকে পার হয়ে, ব্রহ্মলোকের মধ্যে গিয়ে মুক্তিলাভ করে।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্বে প্রতিদেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি॥ ৭॥

৭। পঞ্চদশ অংশ তাদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ফিরে যায়, সকল দেবশক্তি যায় আপন আপন দেবত্বের মধ্যে––কর্ম্মরাজি আর বিজ্ঞানময় আত্মা, সবই পরম অব্যয়ের মধ্যে গিয়ে হয় একীভূত।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮॥

৮। নদীর ধারা সকলে যেমন সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে হয় অস্তমিত নামরূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি জ্ঞানবান নামরূপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎ-পর দিব্যপুরুষের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥ ৯॥

৯। যে সেই পরম ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে ওঠে। তার কুলে অব্রহ্মজ্ঞানী কেউ জন্মে না। শোক পার হয়ে, পাপ পার হয়ে, সকল হৃদ্‌গুহাগ্রন্থি হতে মুক্ত হয়ে সে হয় অমৃতময়।

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্॥ ১০॥

১০। এই হল সে—ঋকে বলে এ কথা। ক্রিয়াবান যারা, বেদজ্ঞানী যারা, ব্রহ্মনিষ্ঠ যারা—তারা শ্রদ্ধাভরে নিজেরাই আহুতিদান করে সেই একমাত্র দিব্য দ্রষ্টাকে—তাদেরই বলবে এই ব্রহ্মবিদ্যা যারা 'শিরোব্রত' (মস্তকে অগ্নি-ধারণ) যথাবিধি আচরণ করেছে।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১॥

১১। এই হল সে—ঋষি অঙ্গিরা এ সত্য বলেছিলেন পুরাকালে। ব্রত যে আচরণ করেনি সে যেন এ বিদ্যা অধ্যয়ন না করে। পরম ঋষিদের প্রণাম—প্রণাম পরম ঋষিদের।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্

ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং, ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥

১। ওম্ এই অক্ষয় পদ, ওম্ বিশ্ব, আর ওম্-এর বিশদ ব্যাখ্যা ইহা। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, যা কিছু ছিল, যা কিছু আছে, যা কিছু হবে সে সব ওম্। সেইরূপ বাকী যা সব কালের সীমা ছাড়িয়ে থাকতে পারে, "ত্রিকালাতীত" সে সবও ওম্।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

২। এই সমগ্র বিশ্ব সনাতন ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, আর আত্মা চতুষ্পাৎ।

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

৩। যাঁর স্থান জাগরিত অবস্থা, যিনি বহির্বিষয়ে প্রাজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ, উনিশ দ্বার, যাঁর বোধ ও ভোগ স্থূল বিষয়ে, যিনি বৈশ্বানর, বিশ্ব-পুরুষ তিনিই প্রথম পাদ।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয় পাদঃ ॥ ৪ ॥

৪। যাঁর স্থান স্বপ্ন, যিনি আন্তরবিষয়ে প্রাজ্ঞ, যাঁর সাত অঙ্গ, উনিশ দ্বার, যাঁর বোধ ও ভোগ সূক্ষ্ম বিষয়ে, যিনি তৈজস, ভাস্বর মনের অধিষ্ঠাতা তিনিই দ্বিতীয় পাদ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ॥ ৫॥

৫। যখন কেহ সুপ্ত থাকে ও কোন কামনা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা করে না, অথবা কোন স্বপ্ন দেখে না তখন তা সুষুপ্তি। যাঁর স্থান সুষুপ্তি, যিনি একীভূত, যিনি সমাহিত প্রজ্ঞান, যিনি শুদ্ধ আনন্দময় এবং ভোগ করেন বিষয়সম্বন্ধরহিত আনন্দ, সচেতন মন যাঁর দ্বার, যিনি প্রাজ্ঞ, জ্ঞানের অধীশ্বর তিনি তৃতীয় পাদ।

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬॥

৬। ইনি সর্বশক্তিমান্ ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তঃপুরুষ, ইনি বিশ্বের গর্ভাশয়, ইনিই সকল ভূতের উদ্ভব ও বিনাশ।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭॥

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ ও বহিঃপ্রজ্ঞ, উভয়ই নন, যিনি আত্মসমাহিত প্রজ্ঞান নন, অথবা প্রজ্ঞাবান্ নন, প্রজ্ঞা-হীনও নন, যিনি দৃষ্ট হন না ও যাঁর সহিত কোন ব্যবহার সম্ভব নয়, যাঁকে ধরা যায় না, যিনি লক্ষণহীন, অচিন্তনীয় ও অনভিধেয়, আত্মার নিজের একক অস্তিত্বের বোধই যাঁর সার, যাঁর মধ্যে প্রপঞ্চের উপশম হয়, যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি অদ্বৈত, তাঁকেই তারা মনে করে চতুর্থ পাদ; তিনি আত্মা, তিনিই জ্ঞানের বিষয়।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি॥ ৮॥

৮। এই যে আত্মা তাহাই অক্ষয় পদ সম্বন্ধে ওম্; আর বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন পাদ বিভিন্ন বর্ণ এবং বর্ণগুলি তাঁর বিভিন্ন পাদ অর্থাৎ 'অ', 'উ', 'ম'।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা, আপ্তেরাদিমত্ত্বাৎ বা,
বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯॥

৯। যিনি জাগরিত, বৈশ্বানর, বিশ্বপুরুষ তিনি 'অ', প্রথম বর্ণ, ইহার কারণ আদিত্ব ও ব্যাপ্যত্ব; যে তাঁকে এইরূপ জানে সে তার সকল কামনা ব্যেপে সে সব প্রাপ্ত হয়; সে হয় মূল ও প্রথম।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা, উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্ বা, উৎকর্ষতি
হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি; নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং
বেদ॥ ১০॥

১০। যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, তৈজস, ভাস্বরমনের অধিষ্ঠাতা তিনি 'উ', দ্বিতীয় বর্ণ; ইহার কারণ উৎকর্ষ ও মধ্যবর্তিতা; যে তাঁকে এইরূপ জানে সে তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে এবং প্রভেদের ঊর্ধ্বে ওঠে; তাঁর বংশে এমন কেউ জন্মায় না যে ব্রহ্মকে জানে না।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা, মিতেরপীতের্বা, মিনোতি হ
বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ১১॥

১১। যিনি সুষুপ্ত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানের অধীশ্বর, তিনিই 'ম', তৃতীয় বর্ণ; ইহার কারণ পরিমাপ ও সমাপ্তি; যে তাঁকে এইরূপ জানে সে বিশ্বকে পরিমাপ করে নিজের সহিত এবং তার পরিণতি হয় ব্রহ্মের মধ্যে প্রস্থান।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব,
সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ॥ ১২॥

১২। চতুর্থ পাদ অবর্ণ, অব্যবহার্য, প্রপঞ্চের উপশম, শিব, অদ্বৈত;

ওম্ এইরূপ। যে বিদ্বান্ সে আত্মা আর সে নিজের আত্মার দ্বারা প্রবিষ্ট হয় আত্মার মধ্যে, যে বিদ্বান্ সে, যে বিদ্বান্ সে।

প্রশ্ন উপনিষদ্

প্রশ্ন উপনিষদ্

(ছয়টি প্রশ্নের উপনিষদ)

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে। হরি ওঁ।। সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়নী চ গার্গ্যঃ, কৌসলশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্বং বক্ষ্যতীতি হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ।। ১ ।।

১। ওম্, পরমাত্মাকে প্রণাম। পরতমই ওম্।

ভারদ্বাজ সুকেশা ; শৈব্য সত্যকাম ; সূর্যবংশীয় গার্গ্য ; অশ্বলতনয় কৌসল ; বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ; এবং কবন্ধী কাত্যায়ন ;---ইহারা সকলেই ব্রহ্ম-বিশ্বাসী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সেজন্য ব্রহ্ম-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হ'ল। সুতরাং তারা সমিদ্‌হস্তে উপস্থিত হ'ল ভগবান পিপ্পলাদের কাছে, কারণ তারা বলল, "ইনিই আমাদের বলবেন বিশ্বাত্মক সম্বন্ধে।"

তান্ হ স ঋষিরুবাচ,---ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎসথ, যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত, যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি।। ২ ।।

২। ঋষি তাদের বললেন, "ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও তপস্যায় তোমরা আর এক বৎসর যাপন কর ; তারপর তোমাদের যা অভিলাষ তা প্রশ্ন কর, আর যদি আমি জানি আমি নিশ্চয়ই সব বলব।"

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।। ৩ ।।

৩। ইহার পর কত্যতনয় কবন্ধী তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল, "ভগবন্,

কোথা থেকে এই সব জীব জন্মেছে?”

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা, স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥ ৪॥

৪। উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন, “সনাতন পিতা সন্তান কামনা করলেন, এবং সেজন্য তাঁর শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং তাঁর শক্তির তেজ দ্বারা উৎপাদন করলেন যুগল প্রাণী, প্রাণ যা পুরুষ এবং রয়ি, জড় যা স্ত্রী। তিনি বললেন, ‘ইহারাই আমার জন্য নানাবিধ সন্তান সৃষ্টি করবে।’

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্মুর্ত্তিরেব রয়িঃ॥ ৫॥

৫। “বস্তুতঃ আদিত্যই প্রাণ ও চন্দ্র জড় ছাড়া কিছু নয়; তবু যথার্থই এই সব বিশ্ব মূর্ত ও অমূর্ত; সুতরাং মূর্তি ও জড় এক।

আদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদূর্ধ্বং যদন্তরা দিশো যৎসর্বং প্রকাশয়তি তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে॥ ৬॥

৬। “যখন আদিত্য উদিত হ’য়ে পূর্বদিকে প্রবেশ করে তখন সে পূর্বদিকস্থ সকল শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে তার রশ্মির মধ্যে। কিন্তু যখন সে দক্ষিণ ও পশ্চিম ও উত্তর এবং অধঃ ও ঊর্ধ্ব ও দিক্-কোণ সমূহ আলোকিত করে, তখন সকল শ্বাসবায়ু সে গ্রহণ করে তার রশ্মির মধ্যে।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে।
তদেতদৃচাভ্যুক্তম্॥ ৭॥

৭। “সুতরাং এই যে অগ্নি উদিত হয় তা-ই এই বিশ্বপুরুষ যার দেহ এই সব বিষয়, আর প্রাণ অস্তিত্বের প্রাণবায়ু। ঋগ্বেদে যা বলা হ'য়েছে তা এই ঃ—

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্ সহস্র-রশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

৮। “ 'অগ্নিই এই জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় সূর্য, তিনিই একমাত্র জ্যোতি এবং সর্ববিৎ আলোক, তিনিই সর্বোচ্চ পরলোক। সহস্র রশ্মি সমেত তিনি প্রদীপ্ত হন এবং অবস্থান করেন শতরূপে; দেখ এই সূর্য যা উদিত হয়, তিনিই তাঁর সকল প্রাণীর প্রাণ'।

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যায়নে দক্ষিণশ্চোত্তরং চঃ তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমাসমেব লোক-মভিজায়ন্তে, ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেব ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯ ॥

৯। “সংবৎসরও ঐ সনাতন পিতা, আর বৎসরের দুটি পথ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। যারা কূপ খনন ও আহুতিদানকেই ধর্ম মনে করে তা দিয়ে ভগবানের পূজা করে তারা জয় করে চন্দ্রলোক; তারা আবার ফিরে আসে জন্মের লোকে। সুতরাং যে ঋষিরা এখনো সন্তান কামনা ত্যাগ করেন নি তাঁরা গ্রহণ করেন দক্ষিণায়ন, ইহাই পিতৃযান। আর ইহাও জড়, যা স্ত্রী।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভি-জায়ন্তে। এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণ-মেতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

১০। “কিন্তু উত্তরায়ণের পথে তারা যায় যারা ব্রহ্মচর্য ও জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেছে; কারণ তারা জয় করে আদিত্যলোক। এখানেই সকল প্রাণবায়ুর আশ্রয়, এখানেই অমৃত ভয়

পরিত্যাগ করে, এখানেই সর্বোচ্চ পরলোক, এখান থেকে কেহ ফিরে আসে না; সুতরাং এখানেই প্রাচীর ও অবরোধ। এসম্বন্ধে শ্রুতির বচন ইহা :—

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্। অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি॥ ১১॥

১১। " 'কেহ কেহ বলে পিতা পঞ্চপর্বা ও দ্বাদশ-আকৃতিবিশিষ্ট, আর তিনি প্রবাহিত দ্যুলোকের অতীত পরার্ধে; কিন্তু অন্যেরা বলে ইনি প্রজ্ঞা, দাঁড়িয়ে আছেন ছয় শলাকা ও সাত চক্রবিশিষ্ট রথের উপর'।

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেত ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্॥ ১২॥

১২। "মাসও ঐ সনাতন পিতা যার কৃষ্ণপক্ষ হল স্ত্রী জড় এবং শুক্লপক্ষ হ'ল পুরুষ প্রাণ। সুতরাং এক প্রকার ঋষিরা যজ্ঞ নিবেদন করেন শুক্লপক্ষে এবং অন্য প্রকারের ঋষিরা কৃষ্ণপক্ষে।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে, ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্ রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩॥

১৩। "দিবা ও রাত্রিও সনাতন পিতা যার দিবা হল প্রাণ ও রাত্রি হ'ল জড়। সুতরাং যারা নারীর সহিত দিবাকালে রমণ করে তারা নিজেদের প্রাণের বিরুদ্ধাচরণ করে; আর যারা রাত্রে রমণ করে তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥ ১৪॥

১৪। "অন্ন সনাতন পিতা, কারণ ইহা থেকেই রেতঃ-র উৎপত্তি আর রেতঃ থেকেই প্রাণিবর্গের জন্ম।

তদ্ যে হ বৈ তৎপ্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্য প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

১৫। "সুতরাং যারা সনাতন পিতার ব্রত অনুষ্ঠান করে তারা যুগল প্রাণী উৎপাদন করে। কিন্তু তাদেরই ব্রহ্মলোক যাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য দৃঢ় এবং যাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং মায়া চেতি॥ ১৬॥

১৬। "তাদেরই ঐ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মলোক যাদের মধ্যে কুটিলতা, অনৃত বা ভ্রান্তি——এসব কিছু নেই।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি॥ ১॥

১। ইহার পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব প্রশ্ন করল, "ভগবন্, কতজন দেবতা এই জীব পালন করে, আর কতজনই বা ইহাকে আলোকিত করে, আবার তাদের মধ্যে কোনজনই বা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী?"

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্-মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ॥ ২॥

২। তাকে ঋষি উত্তরে বললেন, "এই এই দেবতা---আকাশ ও বায়ু ও অগ্নি ও জল ও পৃথিবী ও বাক্ ও মন ও দৃষ্টি ও শ্রবণ। এই নয়জন জীবকে আলোকিত করে: সেজন্য তারা গর্বভরে বলল, 'আমরাই ভগবানের এই বীণাকে ধারণ করি আর আমরাই রক্ষক।'

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথ অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধরয়ামীতি; তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ॥ ৩॥

৩। "তখন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যে প্রাণবায়ু সে বলল, 'তোমরা মোহগ্রস্ত হও না; আমিই নিজেকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করে ভগবানের এই বীণাকে ধারণ করি, আমিই ইহার রক্ষক।' কিন্তু তার কথা তারা বিশ্বাস করল না।

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রমত ইব; তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎ-ক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এব বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রং চ, তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ৪ ॥

৪। "সুতরাং সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উপরে উঠল, সে দেহ থেকে বাহির হ'য়ে যাচ্ছিল; কিন্তু যখন প্রাণবায়ু বাহির হয়, তখন অন্য সকলেও তার সহিত বাহির হয়, আর যখন প্রাণবায়ু সুস্থির থাকে তখন অন্য সকলেও সুস্থির থাকে; যেমন মধুমক্ষিকাদের আচরণ মক্ষিরাজের সহিত; যখন সে বাহিরে যায় তখন সকলে তার সহিত বাহিরে যায়, আর যখন সে স্থির থাকে তখন সকলে স্থির থাকে, সেই রকম হ'ল বাক্ ও মন ও দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধেও; তখন তারা অতীব প্রীত হ'য়ে প্রাণবায়ুর সম্মানে বন্দনা গাহিল।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥ ৫ ॥

৫। "'দেখ, ইনিই অগ্নি ও সূর্য যা দহন করে, ইনি বৃষ্টি ও ইন্দ্র ও পৃথিবী ও বায়ু, জড় ও দেবতা, রূপ ও অরূপ এবং অমৃত।

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

৬। "'শলাকাগুলি যেমন চক্রের নাভিতে মিলিত হয়, তেমন সকল বিষয়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে প্রাণবায়ুতে, ঋগ্বেদ ও যজুঃ, ও সাম ও যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি য প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭ ॥

৭। "'সনাতন পিতা রূপে তুমি গর্ভে বিচরণ কর এবং জন্মগ্রহণ কর মাতাপিতার অনুরূপ হ'য়ে। হে প্রাণ, তুমি বিভিন্ন শ্বাসবায়ুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাক আর তোমাকেই প্রাণিবর্গ নিবেদন করে দগ্ধ নৈবেদ্য।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি॥ ৮॥

৮। "'সকল দেবতাদের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা বলবান ও উগ্র এবং পিতৃগণের নিকট তুমি প্রথম আহুতি; তুমিই ঋষিদের সত্য ও সদাচার এবং তুমি অঙ্গিরসপুত্রগণের মধ্যে অথর্বা।

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ॥ ৯॥

৯। "'হে প্রাণবায়ু, তুমি ইন্দ্র, তোমার প্রভা ও বীর্য দ্বারা তুমি রুদ্র কারণ তুমি রক্ষা কর; তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণ কর জ্যোতি-সম্রাট সূর্যের মতো।

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি॥ ১০॥

১০। "'হে প্রাণবায়ু, যখন তুমি বর্ষণ কর, তখন তোমার প্রাণীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় কারণ শস্য হবে তাদের মনোমত।

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ॥ ১১॥

১১। "'হে প্রাণবায়ু তুমি অ-সংস্কৃত এবং তুমি অগ্নি, একমাত্র পবিত্রতা, সকলের ভক্ষক ও সর্বভূতের স্বামী; আমরা তোমার ভোজ্যদাতা; কারণ তুমি, হে মাতরিশ্বা, আমাদের পিতা।

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ॥ ১২॥

১২। "'তোমার যে দেহ বাক্, দৃষ্টি ও শ্রবণে প্রতিষ্ঠিত এবং মনে ব্যাপ্ত তাকে তুমি মঙ্গলময় কর; হে প্রাণ, তুমি আমাদের মাঝ থেকে বাহিরে চলে যেও না!

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি॥ ১৩॥

১৩। "'কারণ এইসব বিশ্ব, এমন কি যা কিছু স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত তা-ও প্রাণবায়ুর বশীভূত; মা যেমন তাঁর শিশুসন্তানদের রক্ষা করেন তেমন তুমি আমাদের রক্ষা কর; তুমি আমাদের সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য দাও, আর দাও আমাদের প্রজ্ঞা।'"

তৃতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে, আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্ম-মিতি॥ ১॥

১। ইহার পর অশ্বলতনয় কৌসল্য তাঁকে প্রশ্ন করল, "ভগবন্, কোথা থেকে এই প্রাণ জন্ম নেয়? কেমন করে ইহা দেহের মধ্যে আসে, কেমন করেই বা ইহা নিজেকে বিভক্ত ক'রে অবস্থান করে? কিসের দ্বারা ইহা প্রস্থান করে, কি প্রকারেই বা ইহা বাহ্যবিষয় ও অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক বিষয় ধারণ করে?"

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি॥ ২॥

২। তাহাকে ঋষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, "তুমি অনেকগুলি প্রশ্ন করেছ আর প্রশ্নগুলি দুরূহ: কিন্তু তুমি সাতিশয় শুদ্ধমতি হওয়ায় তোমাকে আমি বলব।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে॥ ৩॥

৩। "আত্মা থেকেই এই প্রাণের শ্বাসবায়ু জন্মায়; যেমন মানুষের ছায়া পতিত হয় তেমন এই প্রাণ বিস্তৃত হয় আত্মাতে এবং মনের ক্রিয়ার দ্বারা ইহা প্রবেশ করে এই দেহের মধ্যে।

যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্ক্তে। এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধি-তিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে॥৪॥

৪। "যেমন সম্রাট কর্মচারীদের আদেশ দেন, একজনকে বলেন,

'আমার হ'য়ে তুমি এই গ্রামগুলি শাসন কর' এবং অন্য একজনকে বলেন, 'আমার হ'য়ে তুমি এই অন্য সব গ্রাম শাসন কর', সেইরকম এই শ্বাস-বায়ু, প্রাণ অন্য শ্বাসবায়ুদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত করে।

> পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে চ সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি॥ ৫॥

৫। "পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু অবস্থিত, আর মুখ্য প্রাণ বায়ু স্বয়ং অবস্থিত চক্ষু ও কর্ণে, মুখ ও নাসিকায়; কিন্তু সমান বায়ু অবস্থিত মধ্যে। ইহা দগ্ধ অন্নাহুতিকে সমানভাবে বিতরণ করে; কারণ ইহা থেকেই সাতটি অগ্নির জন্ম।

> হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥ ৬॥

৬। "হৃদয়ে এই আত্মা অবস্থিত আর হৃদয়ে আছে একশত এক নাড়ী আর প্রতি নাড়ীর একশত শাখানাড়ী এবং প্রতি শাখানাড়ীর বাহাত্তর হাজার প্রশাখা নাড়ী; ইহাদের মধ্য দিয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে।

> অথৈকয়োর্ধ্বং উদানং পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি।
> পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্॥ ৭॥

৭। "ইহাদের মধ্যে এমন এক বায়ু আছে যা দিয়ে উদান বায়ু প্রস্থান করে আর ইহা পুণ্যের দ্বারা নিয়ে যায় পুণ্য লোকে, পাপের দ্বারা পাপের নরকে এবং মিশ্রিত পাপ ও পুণ্যের দ্বারা ফিরিয়ে নিয়ে আসে মনুষ্যলোকে।

আদিত্য হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্নানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

৮। "আদিত্যই এই শরীরের বাহিরে মুখ্য প্রাণবায়ু কারণ ইহা চক্ষুকে পালন করে তার উদয়ে। পৃথিবীতে যে দেবতা সেই দেবতা মানুষের অপান বায়ু আকর্ষণ করে আর মধ্যে অবস্থিত আকাশ হ'ল সমান বায়ু; বায়ু হ'ল ব্যানবায়ু।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্য-মানৈঃ ॥ ৯ ॥

৯। "আদি তেজ যে আলোক তা-ই উদান বায়ু; সুতরাং যখন মানুষের ভিতরের আলো ও উত্তাপ হ্রাস পায় তখন তার সব ইন্দ্রিয় চলে যায় মনের ভিতর, আর এই সব নিয়ে সে প্রস্থান করে অন্য জন্মে।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।
মহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

১০। "মানুষের মন যাই হ'ক না কেন, সেই মন নিয়েই সে মরণ-কালে আশ্রয় নেয় প্রাণবায়ুতে আর প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু তাকে তার মধ্যস্থিত আত্মা সহ তার কল্পলোকে নিয়ে যায়।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ। ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

১১। "যে বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণবায়ু সম্বন্ধে এইরূপ জানে তার সন্তান-সন্ততির হানি হয় না, আর সে হ'য়ে ওঠে অমৃত। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহা ঃ--

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বং চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥ ১২॥

১২। "'প্রাণবায়ুর উৎপত্তি, আগমন ও অবস্থান এবং পাঁচটি ক্ষেত্রে তার অবস্থান জেনে আর অনুরূপভাবে আত্মার সহিত তার সম্বন্ধ জেনে মানুষ আস্বাদন করবে অমৃত।'"

চতুর্থ প্রশ্ন

অহ হৈনং সৌর্য়ায়নী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্নেতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি? কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্তি? কস্যৈতৎসুখং ভবতি? কস্মিন্নু সর্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি॥ ১॥

১। ইহার পর সূর্যবংশীয় গার্গ্য তাঁকে প্রশ্ন করল, "ভগবন্, এই পুরুষে যারা নিদ্রা যায় তারা কারা আর কারাই বা জাগ্রত থাকে? এই যে দেবতা স্বপ্ন দেখে সে কে অথবা কার এই সুখ? কার মধ্যে তারা সকলে অন্তর্হিত হয়?"

তস্মৈ স হোবাচ। যথা গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে॥ ২॥

২। তাকে ঋষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, "হে গার্গ্য, সূর্যাস্তের সময় সূর্যের সব রশ্মি যেমন হয়, কারণ তারা ক্ষান্ত হ'য়ে ঐ জ্যোতির্মণ্ডলে একীভূত হয়, কিন্তু যখন সূর্য আবার উদিত হয় তখন সেই সব রশ্মি পুনরায় বিচরণ করে, সেইরকম সমগ্র মানুষ এক হয় শ্রেষ্ঠ দেবে যথা মনে। তখনই বাস্তবিক এই পুরুষ দেখে না, শোনে না, ঘ্রাণ নেয় না, আস্বাদন করে না, স্পর্শ করে না, সে কিছু কথাও বলে না, গ্রহণ করে না, দান করে না অথবা আসেও না বা যায়ও না; সে কোন সুখও অনুভব করে না। তখন তার সম্বন্ধে বলা হয়, 'সে নিদ্রিত।'

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো-ব্যানোঽন্বাহার্যপচনী যদ্ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ॥ ৩॥

৩। "কিন্তু প্রাণবায়ুর অগ্নিরা ঐ সুপ্ত পুরীতে পাহারা দেয়। অপান

বায়ু হ'ল গৃহস্থের অগ্নি আর ব্যানবায়ু হ'ল গৃহদেবতার অগ্নি যা জ্বলতে থাকে দক্ষিণদিকে। মুখ্য প্রাণবায়ু হ'ল যজ্ঞের পূর্বদিকের অগ্নি; আর যেমন পূর্বদিকের অগ্নি সমিদ্ নেয় পশ্চিমদিকের অগ্নি থেকে, তেমন মানুষের নিদ্রার মাঝে মুখ্য প্রাণবায়ু নেয় অপান বায়ু থেকে।

> যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি॥ ৪॥

৪। "কিন্তু সমান বায়ু হ'ল হোতা, আহুতিদাতা; কারণ সে প্রশ্বাসের নিবেদন ও নিঃশ্বাসের নিবেদনকে সমান করে। মন হল যজ্ঞদাতা যজমান এবং উদান বায়ু হ'ল যজ্ঞের ফল কারণ ইহা যজমানকে দিন দিন নিয়ে যায় ব্রহ্মের সান্নিধ্যে।

> অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং চ সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি॥ ৫॥

৫। "এই মন স্বপ্নের ভিতর তার সব কল্পনাক্রিয়ার মহিমায় যথেচ্ছ বিলাস করে। যাসব ইহা দেখেছে, মনে হয় ইহা আবার সেসব দেখে, আর যে সব বিষয় ইহা শুনেছে, সে সব ইহা আবার শোনে; হ্যাঁ, বহু দেশে ও বিভিন্ন প্রদেশে ইহা যা সব অনুভব করেছে ও চিন্তা করেছে ও জেনেছে সেই সবের অভিজ্ঞতা সে পুনরায় লাভ করে তার স্বপ্নের ভিতর। ইহা যা দেখেছে ও যা দেখেনি, ইহা যা শুনেছে ও যা শোনে নি, যা জেনেছে এবং যা জানে নি, যা আছে এবং যা নেই—সব কিছু ইহা দেখে; কারণ মন বিশ্ব।

> স যদা তেজসাভিভূতো ভবত্যত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ ন পশ্যত্যথ তদৈ-তস্মিঞ্‌শরীর এতৎসুখং ভবতি॥ ৬॥

৬। "কিন্তু যখন সে আলোকে অভিভূত হয় তখন এই দেব মন আর স্বপ্ন দেখে না; তখন এই দেহেই সে সুখের অধিকারী হয়।

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥ ৭॥

৭। "হে প্রিয়দর্শন, পাখিরা যেমন তাদের আবাসবৃক্ষের দিকে উড়ে যায়, সেই রকম এই সব প্রস্থান করে পরমাত্মার মধ্যে।

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ রসশ্চ রসয়িতব্যং চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ বাক্যং বক্তব্যং চ হস্তৌ চাদাতব্যং চোপস্থশ্চা-নন্দয়িতব্যং চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ পাদৌ চ গন্তব্যং চ মনশ্চ মন্তব্যং চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চাহংকারশ্চাহংকর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়ি-তব্যং চ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ॥ ৮॥

৮। "পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়; জল এবং জলের সব আভ্যন্তরীণ বিষয়; আলো এবং আলোর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়; বায়ু ও বায়ুর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়; আকাশ ও আকাশের সব আভ্যন্ত-রীণ বিষয়; চক্ষু ও ইহার সব দ্রষ্টব্য বিষয়; কর্ণ ও ইহার সব শ্রোতব্য বিষয়; ঘ্রাণ এবং ঘ্রাণের সব বিষয়; স্বাদ এবং স্বাদের সব বিষয়; ত্বক্ এবং স্পর্শের সব বিষয়; বাক্ এবং সব বক্তব্য বিষয়; দুই হস্ত এবং তাদের সব গ্রহণীয় বিষয়; উপস্থ ও ইহার সব ভোগ্য বস্তু; পায়ু ও ইহার সব পরিত্যক্ত বিষয়; দুই চরণ ও তাদের গমন; মন ও ইহার সব অনুভব; বুদ্ধি এবং যা সব ইহা বোঝে; অহং-বোধ এবং তা-ই যা অহং বলে অনুভূত হয়; সচেতন হৃদয় এবং যে বিষয় সম্বন্ধে ইহা সচেতন তা-ই; আলোক ও যা ইহা আলোকিত করে, প্রাণ এবং যেসব বিষয় ইহা পালন করে সেই সব বিষয়।

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠিতে॥ ৯॥

৯। "কারণ এই যা দেখেও স্পর্শ করে, শোনে, ঘ্রাণ নেয়, আস্বাদন করে, অনুভব করে, বোঝে, কাজ করে তাহ'ল বিজ্ঞান-আত্মা, ভিতরের পুরুষ। ইহাও পরতর অবিনশ্বর আত্মায় প্রস্থান করে।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য সব সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০॥

১০। "ছায়াহীন, বর্ণহীন, অশরীরী, জ্যোতির্ময় ও অবিনশ্বর পরম পুরুষকে যে জানে সে উপনীত হয় অক্ষরে, সেই সর্বোত্তমে। হে প্রিয়দর্শন, সে সর্বজ্ঞ হয় এবং সর্বও হয়। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহাঃ--

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশেতি॥ ১১॥

১১। "'হে প্রিয়দর্শন, সেই যে অক্ষর যাঁর মধ্যে বিজ্ঞান-আত্মা প্রস্থান করে এবং সকল দেবতা ও প্রাণবায়ু ও ভূতও প্রস্থান করে--তাঁকে যে জানে সে জানে বিশ্বকে....।'"

পঞ্চম প্রশ্ন

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ---স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

১। ইহার পর তাঁকে শৈব্য সত্যকাম প্রশ্ন করল, "ভগবন্, মানুষের মধ্যে যে মৃত্যু পর্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করে সে ইহার শক্তিবলে কোন লোক জয় করে?"

তস্মৈ স হোবাচ এতদ্ বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২ ॥

২। তাকে ঋষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, "হে সত্যকাম, এই যে অক্ষয় পদ ওম্ ইহাই পর ব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্মও। সুতরাং বিদ্বান্ এই পদ আশ্রয় ক'রে এই সব লোকের যে কোন একটি প্রাপ্ত হয়।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভি-সম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩ ॥

৩। "যদি সে ওম্ অক্ষরের একটি বর্ণ ধ্যান করে সে উহার দ্বারা জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে অচিরে উপনীত হয় জড় বিশ্বে আর ঋগ্বেদের সূক্তগুলি তাকে নিয়ে যায় মনুষ্যলোকে; সেখানে সে তপস্যা ও শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন হ'য়ে মহিমা অনুভব করে।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

৪। "আর যদি সে ঐ অক্ষরের দুটি বর্ণের দ্বারা মনে গমন করে, সে উন্নীত হয় অন্তরীক্ষে এবং যজুর্বেদের সূক্তগুলি তাকে নিয়ে যায় চন্দ্র-

লোকে। চন্দ্রলোকে সে অনুভব করে তার অন্তঃপুরুষের মহিমা; ইহার পর সে আবার ফিরে আসে।

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেনৌমিত্যেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মা-জ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

৫। "কিন্তু যে ব্যক্তি সব তিনটি বর্ণের দ্বারা, এই অক্ষরের দ্বারা, ওম্-এর দ্বারা সর্বোত্তম পুরুষের ধ্যান করে সে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আলোক ও তেজের সূর্যলোকে; যেমন সাপ তার খোলস ত্যাগ করে, তেমন সে ত্যাগ করে তার পাপ, আর সামবেদের সূক্তগুলি তাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মলোকে। তখন সে জীবন-ঘন অপর ব্রহ্ম থেকে সেই পরাৎপরকে দেখে যার প্রত্যেক রূপ এক একটি পুরী। এসম্বন্ধে এই দুই শ্লোক আছে ঃ—

"তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬ ॥

৬। " 'বর্ণগুলি পৃথক তিন বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হ'লে তারা মৃত্যুর সন্তান, এই বর্ণগুলি পরস্পরসংবদ্ধ ও অচ্ছেদ্য; কিন্তু প্রাজ্ঞ বিচলিত হয় না; কারণ যে ত্রিবিধ ক্রিয়া আছে—বহির্মুখী ক্রিয়া ও অন্তর্মুখী ক্রিয়া এবং এ দুয়ের মিশ্রিত অন্য এক ক্রিয়া—সেসব সে যথোচিত সম্পাদন করে নির্ভীক ও নিষ্কম্প হ'য়ে।

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভির্যত্তৎকবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি ॥ ৭ ॥

৭। " 'ঋগ্বেদ নিয়ে যায় পৃথিবীতে, যজুঃ অন্তরিক্ষে, কিন্তু সাম নিয়ে

যায় সেই 'তৎ'-এ যার কথা ঋষিরা জানেন। বিদ্বান্ সেই লোকই লাভ করে 'ওম্' এই অক্ষর আশ্রয় ক'রে, সে লোক পরম শান্ত, সেখানে জরা নেই আর ভয়ও অপনীত হ'য়েছে অমৃতত্বের দ্বারা।' "

ষষ্ঠ প্রশ্ন

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত—ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ? তমহং কুমারমব্রুবং নাহমিমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভি-বদতি। তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি ক্বাসৌ পুরুষ ইতি॥ ১॥

১। ইহার পর ভারদ্বাজ সুকেশা তাঁকে প্রশ্ন করল, "ভগবন্, কোশল-বাসী রাজপুত্র হিরণ্যনাভ আমার কাছে এসে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, 'হে ভারদ্বাজ, তুমি কি পুরুষ ও তাঁর ষোল কলার কথা জান?' আর উত্তরে আমি বালককে বললাম, 'আমি তাঁকে জানি না; কারণ যদি আমি তাঁকে জানতাম, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁর কথা তোমায় বলতাম; কিন্তু তোমায় আমি মিথ্যা বলতে পারি না; কারণ যে অনৃত বলে সে শুষ্ক হ'য়ে সমূলে ধ্বংস পায়।' কিন্তু সে নীরবে রথে আরোহণ ক'রে প্রস্থান করল। তাঁর সম্বন্ধে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই পুরুষ কে?"

তস্মৈ স হোবাচ। ইহৈবান্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি॥ ২॥

২। উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন, "হে প্রিয়দর্শন, এমন কি এখানেই, প্রতি জীবের আন্তর শরীরে এই পুরুষ অবস্থিত, কারণ তাঁতেই ষোল কলা উৎপন্ন হয়।

স ঈক্ষাংচক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি॥ ৩॥

৩। "তিনি নিজে চিন্তা করলেন, 'উহা কি হবে যার বহির্গমনে আমি দেহ থেকে বহির্গত হব আর তার স্থিতিতে আমি স্থির হ'য়ে অবস্থান করব?'

স প্রাণমসৃজত। প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনো-
হন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকা লোকেষু চ নাম চ॥ ৪॥

৪। "তখন তিনি নিজ থেকে বাহিরে আনলেন প্রাণ এবং প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা, পরে আকাশ এবং পরে বায়ু, এবং পরে আলোক ও পরে জল ও পরে পৃথিবী, ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন ও অন্ন এবং অন্ন থেকে বীর্য এবং বীর্য থেকে তপস্যা এবং তপস্যা থেকে মন্ত্রসমূহ এবং ইহাদের থেকে কর্ম এবং কর্ম থেকে বিভিন্ন লোক এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে নাম; এই ভাবে সকল কিছুই উৎপন্ন হ'ল পরম পুরুষ থেকে।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরি-দ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি; ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥ ৫॥

৫। "সুতরাং যেরূপ এই সব প্রবহমাণা নদী গমন করে সমুদ্রের অভিমুখে, কিন্তু সমুদ্রে উপনীত হ'লে তারা ইহার মধ্যে বিলীন হয়, আর তাদের থেকে নাম ও রূপ ছিন্ন হয় আর এই সবকে শুধু বলা হয় সমুদ্র, সেইরূপ নীরব দ্রষ্টা পরমপুরুষের ষোলটি কলাই চলে পুরুষের দিকে, আর পুরুষে উপনীত হ'লে তারা বিলীন হয় তাঁর মধ্যে এবং তাদের থেকে নাম ও রূপ ছিন্ন হয় আর সমগ্রকে বলা হয় শুধু পুরুষ; তখন তিনি অ-কল ও অমৃত। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহাঃ—

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ ৬॥

৬। "'চক্রের শলাকাগুলি যেমন তার নাভিতে সন্নিবিষ্ট থাকে তেমন বিভিন্ন কলাগুলি যাঁতে সন্নিবিষ্ট থাকে তাঁকেই জেন সেই পুরুষ ব'লে যিনি জ্ঞানের চরম লক্ষ্য, এইভাবেই তোমার কাছ থেকে চলে যাবে মৃত্যু ও তার ব্যথা।'"

তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি॥ ৭॥

৭। আর পিপ্পলাদ তাদের বললেন, "এই পর্যন্তই আমি জানি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে; তাঁর চেয়ে পরতর কেহ নেই।"

তে তমর্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ৮॥

৮। আর তারা তাঁকে অর্চনা করে বলল, "কারণ আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের উত্তারণ করেছেন অবিদ্যার ওপারে।" পরম ঋষিদের প্রণাম,—প্রণাম পরম ঋষিদের।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

শিক্ষাবল্লী

প্রথম অনুবাক

হরি ওঁ।। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

হরি ওম্। মিত্র যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। বরুণ যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। অর্যমা যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। বিশাল পদক্ষেপকারী বিষ্ণু যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। ব্রহ্মকে প্রণাম। প্রণাম তোমাকে, হে বায়ু। তুমি তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম আর তোমাকেই আমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করব। সদাচার কি তা আমি ব্যক্ত করব! সত্য কি তা আমি ব্যক্ত করব! উহা আমাকে রক্ষা করুক! উহা বক্তাকে রক্ষা করুক! হ্যাঁ, ইহা যেন আমাকে রক্ষা করে! ইহা যেন বক্তাকে রক্ষা করে। ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

দ্বিতীয় অনুবাক

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।।

ওম্! আমরা ব্যাখ্যা করব শিক্ষা অর্থাৎ মূল উপাদানগুলি। অক্ষর ও স্বর, মাত্রা (উচ্চারণকাল) ও প্রযত্ন, সম-উচ্চারণ ও ক্রমিকতা; এই ছয়টিতেই আমরা মূল উপাদানগুলির অধ্যায় বলেছি।

তৃতীয় অনুবাক

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে।

অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ু সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্॥

অথাধিজৌতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজৌতিষম্।

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্।

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্।

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্।

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেন লোকেন॥

আমরা যেন একত্র মহিমা লাভ করি, একত্র উপনীত হই পবিত্রতার জ্যোতিতে। এখানে আমরা ব্যাখ্যা করব সংহিতার গূঢ় অর্থ যার আছে পাঁচটি প্রধান বিষয়; বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে; বিভিন্ন দীপ্তিমান অগ্নি সম্বন্ধে; বিদ্যা সম্বন্ধে; সন্তান সম্বন্ধে; আত্মা সম্বন্ধে। এইগুলিকে বলা হয় মহাসংহিতা।

এইবার বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে। পৃথিবী প্রথম রূপ, দ্যৌ দ্বিতীয় রূপ; আকাশ সন্ধি; বায়ু এই সন্ধির গ্রন্থি। বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

ইহার পর দীপ্তিমান অগ্নি সম্বন্ধে। অগ্নি প্রথম রূপ, আদিত্য পরবর্তী রূপ; জলধারা সন্ধি; বিদ্যুৎ ঐ সন্ধির গ্রন্থি। দীপ্তিমান অগ্নি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

ইহার পর বিদ্যা সম্বন্ধে। আচার্য প্রথম রূপ, শিষ্য পরবর্তী রূপ। বিদ্যা সন্ধি। ব্যাখ্যা এই সন্ধির গ্রন্থি। বিদ্যা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

ইহার পর সন্তান সম্বন্ধে। মাতা প্রথম রূপ; পিতা পরবর্তী রূপ, সন্তান সন্ধি, প্রজনন সন্ধির গ্রন্থি। সন্তান সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে। উপরের হনু প্রথম রূপ, নিম্ন হনু পরবর্তী রূপ; বাক্ সন্ধি; জিহ্বা সন্ধির গ্রন্থি। আত্মা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত।

এইগুলি মহাসংহিতা। এই সব মহাসংহিতাকে আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, সেইভাবে যে ইহাদের জানে তাতে যুক্ত হয় সন্তান ও গোধন ও পবিত্রতার দীপ্তি এবং অন্ন ও অন্নের অন্তর্গত সব কিছু এবং স্বর্গে তার উচ্চাবস্থার লোক।

চতুর্থ অনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎসম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়সাম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণো কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়।

আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশং পশুভিঃ সহ স্বাহা।

আ মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

বি মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

প্র মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

যশো জনেঽসানি স্বাহা।

শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা।

তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা।

স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা।

তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা।

যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

প্রতিবেশোঽসি। প্র মা ভাহি। প্র মা পদ্যস্ব॥

বেদমন্ত্রের ঋষভ যার দৃশ্যমান রূপ এই সব বিশ্ব, বেদের ঊর্ধ্বে তিনি উদ্ভূত হ'য়েছিলেন তা থেকে যা মৃত্যুহীন, সেই ইন্দ্র আমার মেধা বৃদ্ধি করুন আমার পুষ্টির জন্য। হে দেব, আমি যেন হ'তে পারি অমৃতত্বের আধার। আমার দেহ যেন ক্ষিপ্র হয় সকল কর্মের প্রতি, আমার জিহ্বা যেন বর্ষণ করে শুদ্ধ মধু। আমি যেন কর্ণ দিয়ে শুনতে পাই বিশাল ও বিবিধ শিক্ষা। হে ইন্দ্র, তুমি সনাতনের কোশ, আর মস্তিষ্কের কর্ম-প্রণালী তাঁর উপর যে আবরণ টেনেছে তুমি তা-ই; যে পবিত্র শিক্ষা আমি অধ্যয়ন করেছি তা তুমি আমার কাছে সংরক্ষণ কর পূর্ণভাবে।

তিনি আমার জন্য ধন আনেন এবং তা বিস্তার করেন,হ্যাঁ তিনি আমার নিজের পরিচ্ছদ ও গবাদি পশু ও পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করেন দ্রুতগতিতে—এখন ও সর্বদা; সুতরাং তাঁর সাথে আমার কাছে নিয়ে এস প্রভূত লোমশ ধনের ও গবাদি পশুর লক্ষ্মী। স্বাহা!

আসুক ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে। স্বাহা!

সকল দিক থেকে আসুক ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে। স্বাহা!

যাত্রা করুক ব্রহ্মচারীরা আমার উদ্দেশে। স্বাহা!

ব্রহ্মচারীরা যেন আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে। স্বাহা!

ব্রহ্মচারীরা যেন উপনীত হয় অন্তঃপুরুষের শান্তিতে। স্বাহা!

আমার নাম যেন ছড়িয়ে পড়ে লোক সমাজে। স্বাহা!

আমি যেন প্রথম হই ধনবানদের মধ্যে! স্বাহা!

হে মহিমময় প্রভু, তুমি যা তার মধ্যে আমি যেন প্রবেশ করতে পারি। স্বাহা!

হে ভাস্বর ; তুমিও আমার মধ্যে প্রবেশ কর। স্বাহা!

হে করুণাময় প্রভু, শতস্রোতা নদীস্বরূপা তুমি, তোমার মধ্যে ধৌত হ'য়ে আমি যেন শুদ্ধ হই। স্বাহা!

নদীর জলধারা যেমন উচ্চস্থান বেয়ে প্রবাহিত হয় নিম্নে, বৎসরের মাসগুলি যেমন দ্রুত আসে দিবসসমূহের বার্ধক্যে, তেমন, হে পালক, ব্রহ্মচারীরা আসুক আমার কাছে সকল প্রদেশ থেকে। স্বাহা!

হে প্রভু, আমার প্রতিবেশী তুমি, তুমি আমার অতি নিকটে অবস্থান কর। এস আমার কাছে, হও আমার আলোক ও সূর্য।

পঞ্চম অনুবাক

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থী মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ।

ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুবঃ ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে।

ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে।

ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজুংষি। মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে।

ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুবঃ ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে।

তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি॥

ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ—এই তিনটি হ'ল তাঁর নামকরণের তিন পদ। বস্তুতঃ ইহাদের চতুর্থের কথা জানিয়েছিলেন ঋষি মহাচামস্য, ইহা মহঃ। ইহা ব্রহ্ম, ইহা আত্মা, অন্য দেবতারা তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ।

ভূঃ, ইহা এই লোক; ভুবঃ, ইহা অন্তরিক্ষ; সুবঃ, ইহা ঐ অন্য লোক; কিন্তু মহঃ আদিত্য। আদিত্যের দ্বারাই এই সকল লোকের বৃদ্ধি ও উন্নতি।

ভূঃ, ইহা অগ্নি; ভুবঃ, ইহা বায়ু; সুবঃ, ইহা আদিত্য; কিন্তু মহঃ চন্দ্র। চন্দ্রের দ্বারা স্বর্গের এই সব আলোর (অথবা দীপ্তিমান অগ্নির) বৃদ্ধি ও উন্নতি।

ভূঃ, ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্র; ভুবঃ, ইহা সামের মন্ত্র; সুবঃ, ইহা যজুঃর মন্ত্র; কিন্তু মহঃ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের দ্বারাই এই সকল বেদের বৃদ্ধি ও উন্নতি।

ভূঃ, ইহা মুখ্য প্রাণবায়ু; ভুবঃ, ইহা অপান বায়ু; সুবঃ, ইহা ব্যান বায়ু; কিন্তু মহঃ অন্ন। অন্নের দ্বারাই এই সব প্রাণবায়ুর বৃদ্ধি ও উন্নতি।

এই হ'ল চার ও তারা চতুর্বিধ;—তাঁর নামকরণের চার পদ, আবার প্রত্যেকটি চার। যে এইসব জানে সে সনাতনকে জানে আর তার কাছে সকল দেবতা নৈবেদ্য নিয়ে আসে।

ষষ্ঠ অনুবাক

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরন্ময়ঃ । অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে । ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে।

ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্-পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো। আকাশ শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্ব।

দেখ, এই যে আকাশের স্বর্গ অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত, সেখানে বাস করে মনোময় পুরুষ যিনি ভাস্বর ও হিরন্ময় অমৃত। তালুদ্বয়ের মধ্যে এই যা স্তনের মত লম্বমান তা ইন্দ্রের উৎস; হ্যাঁ, যেখানে কেশান্ত চারিদিকে ঘূর্ণিত হয় আবর্তের ন্যায়, সেখানে ইহা করোটি বিভক্ত ক'রে নির্গত হয় ইহার মধ্য দিয়ে।

ভূঃরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত অগ্নিতে, ভুবঃরূপে বায়ুতে, সুবঃরূপে আদিত্যে, মহঃরূপে ব্রহ্মে। তিনি প্রাপ্ত হন স্বারাজ্য, তিনি প্রাপ্ত হন মনের অধিপতি; তিনি হন বাক্‌পতি, চক্ষুষ্পতি, শ্রোত্রপতি, বিজ্ঞানপতি। ইহার পর তিনি হয়ে ওঠেন––ব্রহ্ম যাঁর শরীর হ'ল সমগ্র আকাশীয় দেশ, যাঁর অন্তঃপুরুষ হ'ল সত্য, যাঁর আনন্দ মনে, যিনি আরাম করেন প্রাণে, যিনি শান্তিতে সমৃদ্ধ, অমৃত। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, এইভাবে তুমি তাঁর উপাসনা কর।

সপ্তম অনুবাক

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্।

অথাধ্যাত্মম্। প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ।

চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্‌ত্বক্ । চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায়ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, দিকসমূহ ও অপ্রধান দিক্‌সমূহ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি; জলরাশি, বিভিন্ন ওষধি, বনের বৃক্ষসমূহ, আকাশ ও সকলের মধ্যস্থ আত্মা; এই তিন শ্রেণী বাহ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে।

ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে। মুখ্য প্রাণবায়ু, ব্যানবায়ু, অপান বায়ু, উদান বায়ু ও সমান বায়ু;

চক্ষু কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্; চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা। এই ভাবে ঋষি তাদের ভাগ করলেন, আর বললেন, "এই বিশ্ব পঞ্চশ্রেণীতে; পঞ্চ ও পঞ্চের সহিত পঞ্চ ও পঞ্চের সম্বন্ধ তিনি স্থাপন করেন।"

অষ্টম অনুবাক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বং। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবা-নীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি॥

ওম্ ব্রহ্ম, ওম্ এই সব বিশ্ব। ওম্ সম্মতিসূচক পদ। "ওম্ আমরা শুনব," এই ব'লে তারা মন্ত্রপাঠ শুরু করে। 'ওম্' ব'লে তারা সামমন্ত্র গান করে; "ওম্, শোম্ " বলে তারা শাস্ত্র উচ্চারণ করে। 'ওম্' বলে যজ্ঞের হোতা প্রত্যুত্তর দেয়। 'ওম্' বলে ব্রহ্ম সৃষ্টি আরম্ভ করেন (অথবা, মুখ্য হোতা অনুমতি দেয়)। 'ওম্' বলে দগ্ধ আহুতির অনুমতি দেওয়া হয়। বিদ্যা ব্যাখ্যার পূর্বে ব্রাহ্মণ বলে, "ওম্, আমি যেন ব্রহ্মকে লাভ করি"। প্রকৃতই সে ব্রহ্মকে লাভ করে।

নবম অনুবাক

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা

চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপো ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্‌হি তপস্তদ্‌হি তপঃ ॥

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত সদাচরণ; বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত সত্য; বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত তপস্যা; বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত আত্ম-কর্তৃত্ব। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত অন্তঃপুরুষের শান্তি। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত গৃহস্থিত অগ্নি-সমূহ। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত দগ্ধ আহুতি। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত অতিথি সৎকার। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত মানবধর্মপালন। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত সন্তান। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত শিশুর মাতার আনন্দ (অথবা প্রজনন ক্রিয়া)। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত তোমার সব সন্তানের সন্তান-- এইগুলি করণীয় কর্ম। রথীতরপুত্র সত্যবক্তা ঋষি বললেন, "সত্য প্রথম।" পুরুশিষ্টের পুত্র, ঋষি যিনি তপস্যায় অবিচল বললেন, "তপস্যাই প্রথম।" মুদ্‌গুলের পুত্র নাক বললেন, "বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই প্রথম।" কারণ ইহাও তপঃ আর ইহাও তপস্যা।

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্‌। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কো-র্বেদানুবচনম্‌॥

"যিনি বিশ্ববৃক্ষের চালক আমি তিনিই, আর উচ্চ পর্বতের স্কন্ধের মতো আমার মহিমা। বলবানের মধ্যে আমি সুমিষ্ট সুধার মতো উন্নত ও পবিত্র, আমি জগতের উজ্জ্বল সম্পদ, আমি গভীর চিন্তাবিৎ, আমি সেই মৃত্যুহীন এক যাঁর ক্ষয় নেই আদি থেকে।" ইহা ত্রিশঙ্কুর বেদ-কথন আর তার আত্মজ্ঞানের গীত।

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃ-দেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিত-ব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেয়ন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ।

এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনু-শাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্।

বেদ ব্যাখ্যার পর আচার্য তাঁর শিষ্যকে আদেশ দেন।

সত্য বল, তোমার কর্তব্যপথে চল। বেদ অধ্যয়ন অবহেলা করো না। আচার্যের নিকট তাঁর অভীষ্ট সম্পদ আনার পর, তুমি তোমার বংশের দীর্ঘসূত্র ছিন্ন করো না। সত্য সম্বন্ধে অনবহিত হ'য়ো না; কর্তব্য সম্বন্ধে অনবহিত হ'য়ো না, অনবহিত হ'য়ো না তোমার কুশল সম্বন্ধে; তোমার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ো না; অমনোযোগী হয়ো না বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে।

দেবতাদের প্রতি তোমার করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অথবা পিতৃগণের নিকট তোমার করণীয় কর্ম সম্বন্ধে তুমি অমনোযোগী হ'য়ো না। তোমার পিতাকে

তুমি মনে করো দেবতা বলে, আর তোমার মাতাকে মনে করো আরাধ্যা দেবী বলে। আচার্যকে সেবা করবে দেবতাজ্ঞানে আর তোমার বাসগৃহে অতিথিকে সেবা করবে দেবতাজ্ঞানে। যেসব কাজ লোক সমাজে অনিন্দিত সে সব কাজ তুমি করবে সযত্নে, আর অন্য কাজ তুমি করো না। যে সব শুভ ও সৎ কর্ম আমরা করেছি সে সব তুমি আচরণ করবে ধর্মের মতো, আর অন্য কর্ম তুমি ক'রো না।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা আমাদের অপেক্ষা আরো উত্তম ও মহান্ তাঁদের সম্মানের জন্য তুমি তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে আসন দিয়ে। তুমি দান করবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত; অশ্রদ্ধার সহিত দান করো না। তুমি দান করবে সলজ্জভাবে, তুমি দান করবে ভয়ের সহিত; তুমি দান করবে সমবেদনার সহিত। তাছাড়া, যদি তোমার সন্দেহ হয় কোন্ পথ নেওয়া বা কোন্ কর্ম করা তোমার কর্তব্য তাহ'লে সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ সুবিবেচক, নিষ্ঠাবান্, অপরের দ্বারা চালিত হন না ও ধর্মবৎসল, আর যাঁরা কঠোর ও নির্দয় নন, তাঁরা ঐ বিষয়ে যা করেন তুমি তা-ই ক'রো। যে সকল ব্যক্তি তাদের বন্ধুদের দ্বারা নিন্দিত ও প্রকাশ্যে অভিযুক্ত হয় তাদের প্রতি তুমি সেই মতো আচরণ করবে যেমন তাদের প্রতি সেই সকল ব্রাহ্মণ আচরণ করেন যাঁরা সুবিবেচক, নিষ্ঠাবান্, অপরের দ্বারা চালিত হন না, ধর্মবৎসল এবং যাঁরা কঠোর ও নির্দয় নন।

ইহাই বিধান ও উপদেশ। এই সবই বিভিন্ন আদেশ। এইভাবে তুমি ধর্ম আচরণ করবে, হ্যাঁ বস্তুতঃ এইভাবেই তুমি সর্বদা চলবে নিষ্ঠার সহিত।

দ্বাদশ অনুবাক

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতম-বাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তৎবক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মিত্র যেন আমাদের শান্তি স্বরূপ হন। বরুণ যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ

হন। অর্যমা যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যেন আমাদের শান্তিস্বরূপ হন। আমাদের শান্তিস্বরূপ যেন হন বিশাল-পদক্ষেপ-কারী বিষ্ণু। ব্রহ্মকে প্রণাম। প্রণাম তোমাকে, হে বায়ু। তুমি, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম এবং তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলেই আমি ঘোষণা করেছি। সদাচার কি তা আমি ব্যক্ত করেছি; সত্য কি তা আমি ব্যক্ত করেছি। উহা আমাকে রক্ষা করেছে। উহা বক্তাকে রক্ষা করেছে। হ্যাঁ, ইহা রক্ষা করেছে আমাকে; ইহা রক্ষা করেছে বক্তাকে। ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ব্রহ্মানন্দবল্লী

প্রথম অনুবাক

হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যে বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎপুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥

হরি ওম্। তিনি যেন আমাদের একত্র রক্ষা করেন, একত্র যেন তিনি আমাদের অধিগত করেন, একত্র যেন আমরা অর্জন করতে পারি বল ও বীর্য। আমাদের অধ্যয়ন যেন আমাদের কাছে পূর্ণ হয় আলোক ও শক্তিতে। আমরা যেন কখন বিদ্বেষ না করি। ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ওম্। ব্রহ্মবিদ্ লাভ করেন পরম পদ; কারণ প্রাচীন ঋকের কথা এই "ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। ব্রহ্মবিদ্ তাঁর সন্ধান পান সত্তার হৃদয়গুহায়; তাঁর প্রাণীদের সর্বোচ্চ স্বর্গে, দেখ, তিনি ভোগ করেন সকল কামনা ও অবস্থান করেন ব্রহ্মের সহিত, সর্বদাই সেই জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ পরম চিৎ-পুরুষের সহিত।"

ইহাই আত্মা, পরম চিৎ-পুরুষ আর পরম চিৎ-পুরুষ থেকে আকাশ উৎপন্ন হ'ল; আর আকাশ থেকে বায়ু; আর বায়ু থেকে অগ্নি এবং অগ্নি থেকে জলধারা; আর জলধারা থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ওষধি ও গাছপালা; এবং ওষধি ও গাছপালা থেকে অন্ন; এবং

অন্ন থেকে জন্মাল মানুষ। বস্তুতঃ মানুষ, এই মানবসত্তা গঠিত হ'য়েছে অন্নের সার ধাতু দিয়ে। আর এই যে আমরা দেখি তা তার মস্তক; এই এই তার দক্ষিণ পার্শ্ব এবং এই তার বাম পার্শ্ব; আর এই তার চিৎ-পুরুষ ও আত্মা; আর এই তার নিম্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদু চ্যত ইতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এব পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

বস্তুতঃ অন্ন থেকেই উৎপন্ন হ'য়েছে এই বিভিন্ন প্রকারের ও জাতির প্রাণী যারা পৃথিবীর উপর আশ্রয় নিয়েছে; তারপর অন্নের দ্বারাই তারা জীবন ধারণ করে আবার অন্নেই তারা ফিরে যায় অবশেষে। কারণ অন্নই সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সেজন্য ইহার নাম হ'য়েছে বিশ্বের সবুজ উপাদান। বস্তুতঃ যারা ব্রহ্মকে পূজা করে অন্নজ্ঞানে, তারা অন্নের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে প্রভূত মাত্রায়; কারণ অন্ন হ'ল সৃষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সেজন্য ইহার নাম হ'য়েছে বিশ্বের সবুজ উপাদান। অন্ন থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম এবং জন্মের পর তারা বৃদ্ধি পায় (অথবা বিস্তার লাভ করে) অন্নের দ্বারা। দেখ, ইহাকে ভক্ষণ করা হয় এবং ইহা ভক্ষণ করে; হ্যাঁ, যেসব জীব ইহাকে ভক্ষণ করে তাদের ইহা গ্রাস করে, সেজন্য এই ভক্ষণ (অদন) থেকে তাকে বলা হয় অন্ন।

এখন, এক দ্বিতীয় ও আন্তর আত্মা আছে যা অন্নের এই ধাতু থেকে ভিন্ন; আর ইহা গঠিত হ'য়েছে প্রাণ নামক প্রাণিক উপাদান দিয়ে। আর প্রাণের আত্মা পূর্ণ করে অন্নের আত্মাকে। এখন, প্রাণের আত্মা গঠিত হ'য়েছে মানুষের প্রতিরূপে। অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহা মানুষের প্রতিরূপে। মুখ্য প্রাণবায়ু তার মস্তক, ব্যান বায়ু তার দক্ষিণ পার্শ্ব এবং অপান বায়ু তার বাম পার্শ্ব; আকাশ তার চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা, পৃথিবী তার নিম্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে। সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎপ্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

দেবতারা জীবনধারণ করেন ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেন প্রাণের অধীনে এবং সকল মানুষ এবং এই সব যারা পশু তারাও; কারণ প্রাণ হ'ল সৃষ্ট বিষয়-সমূহের আয়ু এবং সেজন্য ইহার নাম হ'ল 'সর্বায়ু'। বস্তুতঃ যারা ব্রহ্মকে পূজা করে প্রাণজ্ঞানে, তারা প্রাণ পায় (অথবা ইহার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে) প্রভূতমাত্রায়; কারণ প্রাণ হ'ল সৃষ্ট বিষয়সমূহের আয়ু এবং সেজন্য ইহার নাম দেওয়া হ'ল সর্বায়ু। আর প্রাণের এই আত্মা হ'ল পূর্বের যে অন্নময় আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ।

এখন, আরো আছে এক দ্বিতীয় ও আন্তর আত্মা যা এই প্রাণের আত্মা থেকে ভিন্ন, আর ইহা গঠিত মন দিয়ে, মনোময়। আর মনের আত্মা পূর্ণ করে প্রাণের আত্মাকে। এখন, মনের আত্মা গঠিত হ'য়েছে মানুষের

প্রতিরূপে; অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহাও মানুষের প্রতি-রূপে। যজুঃ তার মস্তক আর ঋগ্বেদ তার দক্ষিণ পার্শ্ব এবং সামবেদ তার বাম পার্শ্ব; আদেশ তার চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা, অথর্বা অঙ্গিরস তার নিম্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

চতুর্থ অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এব পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধাতম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণং পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

ব্রহ্মের আনন্দ যা থেকে সব বাক্য ফিরে আসে তা না পেয়ে এবং মনও ফিরে আসে বিফল হ'য়ে—ব্রহ্মের আনন্দকে যে জানে সে এখন, কি পরে কিছুতেই ভীত হবে না। আর মনের এই আত্মা হ'ল পূর্বের যে প্রাণময় আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ।

এখন, আরো একটি দ্বিতীয় ও আন্তর আত্মা আছে যা এই মনের আত্মা থেকে ভিন্ন আর ইহা গঠিত বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানময়। আর এই বিজ্ঞান-আত্মা পূর্ণ করে মনের আত্মাকে। এখন, বিজ্ঞান-আত্মা গঠিত মানুষের প্রতিরূপে; অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহা মানুষের প্রতি-রূপে। শ্রদ্ধা তার মস্তক, ঋত তার দক্ষিণ পার্শ্ব, সত্য তার বামপার্শ্ব, যোগ তার চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা; মহঃ (অথবা জড়জগৎ) তার নিম্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহা।

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবা সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মাঽঽনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণং পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

বিজ্ঞান যজ্ঞের উৎসব বিস্তৃত করে, আর ইহা কর্মের উৎসবও বিস্তৃত করে; সকল দেবতা তার উপাসনা করে যেন তা করা হয় ব্রহ্ম ও বিশ্বের জ্যেষ্ঠকে। কারণ যদি কেউ ব্রহ্মকে পূজা করে বিজ্ঞানরূপে আর যদি সে তা থেকে বিচ্যুত না হয়, বিচলিতও না হয়, তাহ'লে এই দেহেই সে পাপ পরিত্যাগ ক'রে আস্বাদন করে সকল কাম্যবস্তু। আর এই বিজ্ঞান-আত্মা হ'ল পূর্বের যে মনোময় আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ।

এখন, আরো একটি দ্বিতীয় ও আন্তর আত্মা আছে যা এই বিজ্ঞানের আত্মা থেকে ভিন্ন আর ইহা গঠিত আনন্দ থেকে, আনন্দময়। আর আনন্দের আত্মা পূর্ণ করে বিজ্ঞানের আত্মাকে। এখন আনন্দের আত্মা গঠিত মানুষের প্রতিরূপে; অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহা গঠিত মানুষের প্রতিরূপে। প্রেম ('প্রিয়') তার মস্তক; হর্ষ ('মোদ') তার দক্ষিণ পার্শ্ব; সুখ ('প্রমোদ') তার বাম পার্শ্ব; আনন্দ হ'ল তার চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা; ব্রহ্ম তার নিম্ন অঙ্গ যাতে সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুরিতি॥ তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য।

অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ। উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎসমশ্নুতা উ।

সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

অসৎসমই সে হ'য়ে ওঠে যদি কেউ ব্রহ্মকে জানে অসৎ বলে; কিন্তু যদি কেউ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানে যে তিনি আছেন, "অস্তি", তাহ'লে সকলে তাকে জানে সাধু ও একমাত্র সদ্‌বস্তু ব'লে। আর এই আনন্দের আত্মা হ'ল পূর্বের যে বিজ্ঞান-আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ। এখন এই প্রশ্ন-গুলি ওঠে। "জ্ঞান লাভ করেনি এমন ব্যক্তি, অর্থাৎ অবিদ্বান্ যখন পর-লোকে যায় তখন সে কি অন্য আরো লোকে যায়? অথবা যখন বিদ্বান্ পরলোকে যায় তখন সে কি পাওয়া-কিছু ভোগ করে?"

পূর্বে পরমচিৎপুরুষ কামনা করলেন। "প্রজাজন্মের জন্য আমি বহুধা হব।" সেজন্য তিনি নিজেকে পুরোপুরি (অথবা বীর্যকে) একাগ্র করলেন ভাবনায় এবং তাঁর নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা তিনি সৃষ্টি করলেন এই সব বিশ্ব, হ্যাঁ যা কিছু আছে সে সব। এখন এই সব সৃষ্টি করার পর, যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হ'লেন। প্রবিষ্ট হ'য়ে তিনি হ'লেন 'সৎ' (এখানে আছে) এবং 'ত্যৎ' (ওখানে থাকতে পারে); তিনি হ'লেন তা-ই যা নির্ণীত এবং তা-ই যার কোন লক্ষণ নেই; তিনি হ'লেন এই আশ্রিত বিষয় এবং ঐ অনাশ্রিত বিষয়; তিনি হ'লেন বিজ্ঞান আর তিনি হ'লেন অবিজ্ঞান; তিনি হ'লেন সত্য এবং তিনি হ'লেন অনৃত। বস্তুতঃ তিনি হ'লেন সর্বসত্য, যা কিছু এখানে আছে সে সব। সেজন্য তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি সত্য। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

সপ্তম অনুবাক

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ম-

কুরুত। তস্মাৎ তৎসুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্ বৈ তৎ সুকৃতম্।
রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ
কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।
যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং
বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদর-
মন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো
মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

আদিতে এই সব বিশ্ব ছিল অসৎ ও অব্যক্ত; আর তা থেকেই জন্মেছে এই সৎ ব্যক্ত অস্তিত্ব। ইহা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে; অন্য কেউ ইহা সৃষ্টি করেনি। সেজন্য, ইহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্মিত। দেখ, এই যা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্মিত হ'য়েছে, ইহা অস্তিত্বের পিছনকার আনন্দ বৈ আর কিছু নয়। যখন তিনি নিজে এই আনন্দ লাভ করেছেন, তখন ইহা সত্য যে এই সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে আনন্দের বিষয়; কারণ কে প্রশ্বাস নেবার পরিশ্রম করতে পারত, অথবা কার শক্তি থাকত নিঃশ্বাস ফেলার যদি ঐ আনন্দ না থাকত তার হৃদ্-স্বর্গে, তার সত্তার আকাশে? তিনিই আনন্দের প্রস্রবণ; কারণ যখন আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ উপলব্ধি করে যে অদৃশ্য, অশরীরী, অনির্বাচ্য ও নিরাধার ব্রহ্ম তার আশ্রয় ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, তখন সে প্রস্থান করেছে ভয়ের সীমার ওপারে কিন্তু যখন আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ ব্রহ্মের মধ্যে এতটুকুও ভেদজ্ঞান করে, তখন তার ভয় থাকে, হ্যাঁ ব্রহ্ম নিজেই অমনস্বী বিদ্বানের কাছে ভীতিস্বরূপ হ'য়ে ওঠেন। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহা।

অষ্টম অনুবাক

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষাদেতি সূর্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ।
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি। সৈষাঽনন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ
সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা
বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দো। তে যে শতং মানুষা
আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-

হতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক অজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজনজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একং কর্মদেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিয়ন্তি। শ্রোত্রিস্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ। স এক দেবানামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। এতং মনোময়াত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। এতমানন্দময়াত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥

তাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন; তাঁর ভয়ে উদিত হন সূর্য; তাঁর ভয়েই ইন্দ্র ও অগ্নি ও মৃত্যু ধাবিত হন নিজ নিজ কর্মে। এই যে আনন্দের ব্যাখ্যা তা তোমরা শোন। যদি কোন যুবক তারুণ্যে শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় হয় ও বিশিষ্ট বিদ্যার্থী হয়, আর হয় সৎস্বভাবযুক্ত ও অতীব দৃঢ়চেতা ও প্রভূত দৈহিক বলশালী আর বিত্তে পরিপূর্ণ এই বিশাল পৃথ্বী যদি তার ভোগায়ও হয়, তাহ'লে সেই আনন্দ হ'ল একটি মানুষের আনন্দের মাত্রা। কিন্তু আনন্দের এই মানুষী মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব মানুষের আনন্দের এক মাত্রা যারা স্বর্গে গন্ধর্ব হ'য়েছে। আর ইহা সেই-সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। এই মনুষ্য গন্ধর্বের আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব দেবতাদের আনন্দের এক মাত্রা যারা স্বর্গের গন্ধর্ব। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা ব্যাধি

স্পর্শ করে না। এই দেবগন্ধর্বের আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই পিতৃগণের আনন্দের এক মাত্রা যাদের স্বর্গলোক তাদের চির-লোক। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। এই চিরলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব দেবতাদের আনন্দের এক মাত্রা যারা স্বর্গে জন্মলাভ করেছে। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা-ব্যাধি স্পর্শ করে না। স্বর্গে প্রথম-জাত দেবগণের এই আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব কর্মদেবতার আনন্দের এক মাত্রা যারা দেবতা এই কারণে যে তারা কর্মবলে প্রস্থান করে স্বর্গে দেবতা হ'য়েছে। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা-ব্যাধি স্পর্শ করে না। কর্ম-দেবতাদের এই আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব মহান্ দেবতাদের আনন্দের একমাত্রা যারা চিরদিনই দেবতা রয়েছে। এই দিব্য আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের আনন্দের একমাত্রা। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। ইন্দ্রের এই আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল স্বর্গস্থ দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির আনন্দের এক মাত্রা। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃ-পুরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। বৃহস্পতির আনন্দের মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সবশক্তিমান পিতা প্রজাপতির আনন্দের এক মাত্রা। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা ব্যাধি স্পর্শ করে না। প্রজাপতির আনন্দের এই মাত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সনাতন ব্রহ্মের আনন্দের একমাত্রা। আর ইহা সেই সব বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না।

এখানে মানুষের মধ্যে যে পরম চিৎপুরুষ আর ওখানে আদিত্যের মধ্যে যে পরম চিৎ-পুরুষ, ইহা একই চিৎ-পুরুষ, আর অন্য কেউ নেই। যে ইহা জানে সে যখন এই লোক থেকে প্রস্থান করে তখন সে সংক্রমণ করে অন্নময় আত্মায়; সে সংক্রমণ করে প্রাণময় আত্মায়; সে সংক্রমণ করে মনোময় আত্মায়; সে সংক্রমণ করে বিজ্ঞানময় আত্মায়; সে সংক্রমণ করে আনন্দময় আত্মায়। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন।

নবম অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এব বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ব্রহ্মের আনন্দ যেখান থেকে সব বাক্য ফিরে আসে তা না পেয়ে এবং মনও ফিরে আসে বিফল হ'য়ে; ব্রহ্মের আনন্দ যে জানে সে এই জগতে বা অন্যত্র কিছুতেই ভীত হয় না। বাস্তবিকই তার এই অনুশোচনা ও তার যন্ত্রণা আসে না, "কেন আমি সাধু কর্ম করিনি, আর কেন আমি পাপ কর্ম করেছি"। কারণ যে ব্রহ্মকে জানে সে ইহাদের জানে (অথবা জানে যে ইহারা একই রকমের), আর সে তার চিৎ-পুরুষকে মুক্ত করে এইসব থেকে; হ্যাঁ, সে পাপ ও সাধুকর্ম, উভয়কেই জানে তাদের স্বরূপে এবং চিৎ-পুরুষকে মুক্ত করে--যে ব্রহ্মকে জানে। আর ইহাই উপনিষদ্, বেদের রহস্য।

একত্র আমাদের তিনি যেন রক্ষা করেন, একত্র যেন তিনি আমাদের অধিগত করেন, একত্র যেন আমরা অর্জন করতে পারি শক্তি ও বীর্য। আমাদের অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শক্তিতে। আমরা যেন কখন বিদ্বেষ না করি ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

ভৃগুবল্লী

হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

হরি ওম্। একত্র আমাদের তিনি যেন রক্ষা করেন, একত্র যেন তিনি আমাদের অধিগত করেন, একত্র যেন আমরা অর্জন করতে পারি শক্তি ও বীর্য। আমাদের অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শক্তিতে। আমরা যেন কখন বিদ্বেষ না করি। ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

প্রথম অনুবাক

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোহ-তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥

ভৃগু বরুণের পুত্র, সে তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" তার পিতা তাকে এই কথা বললেন, "অন্ন ও প্রাণ ও চক্ষু ও কর্ণ ও মন,---এইসব।" বস্তুতঃ তিনি তাকে বললেন, "যা থেকে এই সব প্রাণী জন্মেছে, যার দ্বারা তারা জন্মের পর জীবনধারণ করে এবং যার ভিতর তারা এখান থেকে যায় এবং আবার প্রবেশ করে; সেই তত্ত্ব তুমি জানতে প্রয়াস কর; কারণ তা-ই ব্রহ্ম।" আর ভৃগু নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার নিবিষ্টতার তপস্যার দ্বারা।

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেবং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত॥ স তপস্তপ্‌ত্বা॥

সে জানল যে অন্ন ব্রহ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু অন্ন থেকেই এই সব সৃষ্ট বিষয়, (ভূত) জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে অন্নের দ্বারাই, আর প্রস্থান করে অন্নের ভিতরেই তারা আবার প্রবেশ করে। আর ইহা জানার পর সে পুনর্বার তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, "ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" আর তার পিতা তাকে বললেন, "তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা কর কারণ তপস্যাই (অথবা ভাবনার একাগ্রতাই) ব্রহ্ম।" সে নিজেকে ভাবনায় একাগ্র করল এবং তার নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেবং বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽ-তপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা॥

সে জানল যে প্রাণ ব্রহ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু প্রাণ থেকেই এই সব ভূত জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে এই প্রাণের দ্বারাই এবং প্রাণেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান ক'রে। আর ইহা জানার পর সে তার পিতা বরুণের কাছে পুনর্বার এসে বলল, "ভগবন্, আপনি আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, "তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর, কারণ ভাবনায় তপস্যাই ব্রহ্ম।" সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা।

চতুর্থ অনুবাক

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽ-তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥

সে জানল যে মন ব্রহ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু মন থেকেই এই সব ভূত জন্মায় এবং জন্মের পর তারা জীবনধারণ করে মনের দ্বারাই এবং মনেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান ক'রে। আর একথা জানার পর সে আবার তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, "তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানতে প্রয়াস কর, কারণ ভাবনায় একাগ্রতাই (অথবা শক্তির সংহতিই) ব্রহ্ম।" সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেবং বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽ-তপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা॥

সে জানল যে বিজ্ঞান ব্রহ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু বিজ্ঞান থেকেই এই সব ভূত জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে বিজ্ঞানের দ্বারা এবং বিজ্ঞানের মধ্যেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান ক'রে। আর ওই কথা জানার পর সে আবার তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, "ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।" কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, "তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানবার প্রয়াস কর

কারণ শক্তির সংহতিই ব্রহ্ম।" সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা

ষষ্ঠ অনুবাক

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥ সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি-র্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥

সে জানল যে আনন্দ ব্রহ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু আনন্দ থেকেই এই সব ভূত জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে আনন্দের দ্বারা এবং আনন্দেই তারা ফিরে ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান ক'রে। ইহা ভৃগুর বিদ্যা, ইহা সেই বরুণের বিদ্যা যার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হ'ল পরম ব্যোমে। যে তা জানে সে তার দৃঢ় ভিত্তি পায়, অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা হয় আর সমৃদ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে ও পশুধনে, মহান্ হয় ব্রহ্মচর্যের দ্যুতিতে, মহান্ হয় কীর্তিতে।

সপ্তম অনুবাক

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্ন-বাদন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥

অন্নকে নিন্দা করো না; কারণ শ্রম করাই তোমার আদিষ্ট কর্তব্য। বস্তুতঃ প্রাণও অন্ন আর শরীর ইহার ভক্ষক। শরীর প্রতিষ্ঠিত প্রাণের উপর এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠিত শরীরের উপর। সুতরাং এখানে অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নের উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ়

ভিত্তি পায়, সে হয় অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা, সমৃদ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে ও পশুধনে, মহীয়ান হয় ব্রহ্মচর্যের জ্যোতিতে, মহীয়ান্ হয় কীর্তিতে।

অষ্টম অনুবাক

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্ন-বানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥

অন্নকে পরিত্যাগ করো না; কারণ উহাও তোমার শ্রমের ব্রত। বস্তুতঃ জলধারাও অন্ন এবং ভাস্বর অগ্নি ভক্ষক। অগ্নি প্রতিষ্ঠিত জলধারার উপর এবং জলধারা প্রতিষ্ঠিত অগ্নিসমূহের উপর। এখানেও অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নের উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ় ভিত্তি পায়, সে হয় অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা, সমৃদ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে ও পশুধনে, মহীয়ান্ হয় ব্রহ্মচর্যের দ্যুতিতে, মহীয়ান্ হয় কীর্তিতে।

নবম অনুবাক

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্ন-মন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।

অন্নবৃদ্ধি ও সঞ্চয় করবে; কারণ উহাও তোমার শ্রমের ব্রত। বস্তুতঃ পৃথিবীও অন্ন এবং আকাশ ভক্ষক। আকাশ প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আকাশের উপর। এখানেও অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নের উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ় ভিত্তি পায়। সে হয় অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা, সমৃদ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে ও

পশুধনে, আর মহীয়ান্ হয় ব্রহ্মচর্যের জ্যোতিতে, মহীয়ান্ হয় কীর্তিতে।

দশম অনুবাক

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্ বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্ বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপনয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ॥ অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎপ্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা বু হা বু হা বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদো ঽহমন্নাদো ঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা স্য। পূর্ব দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মা বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা স্মি। অহং বিশ্বং ভবনমভ্যভবা ম্। সুবর্ণং জ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

তোমার বাসস্থানে কোন ব্যক্তিকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো না, কারণ উহার তোমার শ্রমের ব্রত। সুতরাং যে ভাবেই হ'ক তোমার জন্য তুমি প্রভূত অন্ন সংগ্রহ কর। বাসগৃহে আগত অতিথিকে বলা হয়, "উঠুন, অন্ন প্রস্তুত।" অন্ন কি আদিতেই প্রস্তুত করা হ'য়েছিল? তাকেও অন্ন প্রস্তুত করে দেওয়া হয় আদিতে। অন্ন কি মধ্যভাগে প্রস্তুত হ'য়েছিল? তাকেও অন্ন প্রস্তুত করে দেওয়া হয় মধ্যভাগে। অন্ন কি প্রস্তুত করা হ'য়েছিল শেষে ও অন্তিমে? তাকেও অন্ন প্রস্তুত করে দেওয়া হয় শেষে ও অন্তিমে, যার এই জ্ঞান আছে। বাক্যে অভ্যুদয়রূপে, মুখ্য প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুতে প্রাপ্তি ও রক্ষণরূপে, হস্তে কর্মরূপে চরণে গতিরূপে, পায়ুতে নির্গমনরূপে---এই সব হ'ল মানুষের মাঝে বিভিন্ন সংবিৎ। তারপর দৈবীভাবে---বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুতে দ্যুতিরূপে, তারকামণ্ডলীর মাঝে জ্যোতিরূপে, উপস্থে প্রজনন ও আনন্দ ও পরাভূত মৃত্যুরূপে, আকাশে সর্বরূপে। যদি তুমি তাঁকে অন্বেষণ কর বিষয়সমূহের দৃঢ় প্রতিষ্ঠারূপে, তাহ'লে তুমি নিজেও পাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। যদি তুমি তাঁকে অন্বেষণ কর মহঃরূপে, তাহ'লে তুমি মহান্ হবে; তাঁকে অন্বেষণ কর মনরূপে, তুমি হবে মনোপূর্ণ; তাঁকে অন্বেষণ কর নমরূপে, তোমার কামনার সকল বিষয় তোমার কাছে নত হবে; তাঁকে অন্বেষণ কর ব্রহ্ম-রূপে, তুমি পূর্ণ হবে ব্রহ্মে। যদি তুমি তাঁকে অন্বেষণ কর সর্বগ ব্রহ্মের সংহাররূপে, তাহ'লে তোমার সব প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদ্বেষকারী তোমার চারি-দিকে সমূহে বিনষ্ট হবে, আর বিনষ্ট হবে সেই সব আত্মীয় জনও যারা তোমায় ভালবাসত না। এখানে মানুষের মাঝে যে পরম চিৎ-পুরুষ আর ওখানে আদিত্যে যে পরম চিৎ-পুরুষ, দেখ, ইহা একই অদ্বয় পরম চিৎ-পুরুষ, আর অন্য কেউ নেই। যিনি এই জ্ঞানের অধিকারী, তিনি যখন এই জগৎ থেকে প্রয়াণ করেন তখন তিনি অন্নময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে; প্রাণময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে; মনোময় আত্মায় সংক্র-মণ ক'রে; বিজ্ঞানময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে; আনন্দময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে সঞ্চরণ করেন চারিদিকে বিভিন্ন লোকে; ভক্ষণ করেন ইচ্ছামতো আর সর্বদাই তিনি গান করেন তেজোময় সাম। "আহা! আহা! আহা! আমি অন্ন! আমি অন্ন! আমি অন্ন! আমি অন্নভোক্তা! আমি অন্নভোক্তা! আমি অন্নভোক্তা! আমি শ্লোককার! আমি শ্লোককার! আমি শ্লোককার! আমি ঋতের প্রথমজাত! দেবতাদের পূর্বেই আমি আছি অমৃতত্বের হৃদ্দেশে।

যে আমাকে কিছু দান করে, বস্তুতঃ সে আমাকে রক্ষণ করে; কারণ আমি অন্ন হওয়ায়, যে আমাকে ভক্ষণ করে আমি তাকে ভক্ষণ করি। আমি সর্বলোক পরাভূত ক'রে তা অধিগত করেছি, মহিমামণ্ডিত সূর্যেরই মতো আমার জ্যোতি।" যিনি বিদ্বান্ তিনি এইরূপই গান করেন। বস্তুতঃ ইহাই উপনিষদ্, বেদের রহস্য।

তিনি যেন আমাদের একত্র রক্ষা করেন, একত্র যেন তিনি আমাদের অধিগত করেন, একত্র যেন আমরা অর্জন করি শক্তি ও বীর্য! আমাদের অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শক্তিতে! আমরা যেন কখন বিদ্বেষ না করি! ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি!

তৈত্তিরীয় উপনিষদের
এক অনুচ্ছেদের আলোচনা

ব্রহ্মজ্ঞান

"ব্রহ্মবিদ্ অপ্নোতি পরং। তদেষাঽভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্। সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

"ব্রহ্মবিৎ পরাৎপরকে লাভ করেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। যিনি হৃদয়গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, জীবের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আকাশে তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু উপভোগ করেন, সর্বজ্ঞানের আধার ব্রহ্মের সাহচর্যে।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রহ্মবল্লীর এই হ'ল প্রথম বাক্য, পরম সত্যের বিশদ বর্ণনার আরম্ভ।

কিন্তু ব্রহ্ম কি?

অস্তিত্বের মধ্যে সদ্বস্তু যা আছে, যাকে অবলম্বন ক'রে আর সব বর্তমান থাকতে পারে——সেই ব্রহ্ম। সব অনিত্যের পশ্চাতে যা নিত্য বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও সর্বত্র সূচিত হয় যে স্থির সত্য, সব বিকারের আশ্রয় হয়েও যে অব্যয়ের কোন হ্রাসবৃদ্ধি বিলোপ হয় না, আছে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু। আর সেই জন্যই অস্তিত্ব হয় একটা সমস্যা, আমাদের আত্মা হয় রহস্যাবৃত, বিশ্ব হয় একটা হেঁয়ালি। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মজ্ঞানে মনে হয় আমরা যা, আমরা যদি শুদ্ধমাত্র তাই হতাম তা হলে কোন রহস্য থাকত না; ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা এবং তার উপর নির্ভর ক'রে বিচারবুদ্ধির কঠোর বিশ্লেষণের ফলে যা জানা যায় বিশ্ব যদি শুধু তাই হত, তাহলে কোন হেঁয়ালি থাকত না; এখনকার মত জীবনযাপন করা এবং আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে যতটা প্রকাশিত হয়েছে তাকেই বিশ্বের স্বরূপ বলে গ্রহণ করাই যদি আমাদের জ্ঞান ও কর্মের বিকাশের চরম সীমা হত, তা হলে কোন সমস্যা থাকত না। আর থাকলেও, সে রহস্য গভীর হত না, সে হেঁয়ালির সমাধান সহজ হত, সে সমস্যা হত বালোচিত। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু আছে আর সেই হল অনন্তের

প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা, শাশ্বতের গোপন হৃদয়। সে-ই পরাৎপর এবং সেই পরাৎ-পরই সর্বময়, তাঁর উপরেও কেহ নাই, তা থেকে বিবিক্তও কিছু নাই। তাঁকে জানাই হল পরাৎপরকে জানা এবং সেই পরাৎপরের জ্ঞানে বিশ্বকে জানা। কারণ, সবের আদি ও উদ্ভব সেই, আর সবই তার পরিণাম; সবের আধার ও উপাদান সেই, সুতরাং তার রহস্য জানলেই অপর সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়; সবের অন্ত ও সমষ্টি সেই, অতএব তাতে নিজেকে আহুতি দিয়েই এবং তার মধ্যে প্রত্যেক অস্তিত্ব নিজের সার্থকতা লাভ করে।

এই হ'ল ব্রহ্ম।

এই অজ্ঞাত যদি শুধু নির্বিশেষ অনির্বচনীয়ই হতেন, তাকে যদি কখনই জানা না যেত, আবরণ ছেড়ে পর্দার বাইরে যদি তিনি কখনই পা না দিতেন, সে গোপন তত্ত্ব কখনই যদি আমাদের কাছে প্রকাশিত না হত, তাহলে আমাদের রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকত, আমাদের হেঁয়ালির উত্তর কখনই মিলত না, আমাদের সমস্যা গণনার মধ্যে আসত না। আমরা যা হই, যা জানি ও যা করি, সে সবই তাঁর দ্বারাই নির্ধারিত হয়, সত্য, তথাপি তাঁর অস্তিত্বে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিছু এসে যেত না। কারণ, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হত অন্ধ অসহায়-ভাবে তাঁর শাসন মেনে নেওয়া, আর সেই সম্বন্ধই অজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে চিরদিন আমাদের আবদ্ধ করে রাখত এবং সেই অজ্ঞানের জন্যই সে সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারত। অপরপক্ষে আবার, কোন উপায়ে তাঁকে জানা গেলেও সে জ্ঞানের একমাত্র ফল যদি হত আমাদের সত্তার অবসান বা বিলয়, তাহলে আমাদের সত্তাতে তার কোন ক্রিয়া হতে পারত না; সে-জানার ব্যাপারে ও পরিণতিতেই সাধিত হত এখন আমরা যা, তার বিলয় বা অবসান, পূর্ণতা বা সার্থকতা নয়। আমাদের রহস্য, হেঁয়ালি বা সমস্যাটি সমাধান করা হত না, রহিত করা হত; কারণ তার কোন উপাত্ত (data) থাকত না, বিচারের পূর্ব-পক্ষের লোপ হত। ফলতঃ মানতে হত যে, আমরা এখন যা তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ মীমাংসা করা অসম্ভব---অর্থাৎ, পরম কারণ ও তার কার্যের মধ্যে, আদিমূল ও তা থেকে জাত সব পদার্থের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। আর মনে করতে হত যে, ব্রহ্ম যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নিচ্ছেন, সে সবই তাঁর সত্তার একান্ত বিরোধী ও বিপরীত,

এবং একমাত্র যাঁর অস্তিত্ব আছে, স্বরূপে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিরেকী হয়েও, কোন-না-কোন রকমে সে সবের একটা ইতিমূলক অস্তিত্ব এসেছে। তা হলে চেতনাতে এ দুইয়ের একত্র অবস্থান সম্ভবপর হত না, তাঁকে জানবার অবকাশ তিনি যদি জগৎকে দিতেন তা হলে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত।

কিন্তু ব্রহ্মকে জানা যায়। সীমার দ্বারা তিনি নিজেকে নিরূপিত করেন যাতে আমরা তাঁকে ধারণায় গ্রহণ করতে পারি, মানুষ যাতে মানুষ থেকেই এই বিশ্বে এবং এই দেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়াহীন আলোকমাত্র নয় যে, শুধু বুদ্ধির কাছেই তার সংবাদ আসবে কিন্তু ব্যষ্টির আত্মা বা জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সে জ্ঞানের স্বরূপ হল শক্তি, ভগবানের একটা নির্বন্ধ, পরিবর্তিত হতে বাধ্য করা। তা থেকে মানবজীবনে এমন একটা কিছু লাভ হয় চেতনাতে আগে যা ছিল না। কি সে লাভ? মানুষ এখন জানে কেবল-মাত্র তার সত্তার নিম্নতর স্তর, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সে পায় তার ঊর্ধ্বতম সত্তাকে।

আর আমাদের সত্তার ঊর্ধ্বতম রূপ আমরা এখন যা তার ব্যতিরেক, বৈপরীত্য বা বিলোপ নয়। সে হ'ল আমাদের বর্তমান জীবনের যা তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সে সকলের চরম সার্থকতা—তবে সে সবের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় অনুসারে এবং চিরন্তন শ্রেয়ের মানদণ্ডে।

আত্মসংবিতের বর্তমান অবস্থাতে আমরা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করি, অজ্ঞানে কাজ করি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞান, কারণ এখন অবধি আমরা জানি শুধু আমাদের মধ্যে যা পরিবর্তনশীল,—ক্ষণে ক্ষণে, প্রহরে প্রহরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জন্মজন্মান্তরে অবিরাম যার বদল হচ্ছে; আমাদের মধ্যে যা নিত্য তাকে আমরা জানি না। বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞান, কারণ ঈশ্বরকে আমরা জানি না, সন্ধান রাখি বাহ্য প্রপঞ্চের সব নিয়মের, প্রকৃত অস্তিত্বের ধর্ম বা সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিবেচনায়, সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ও নির্ভুল বিজ্ঞানে, বিদ্যার সবচেয়ে বেশী সমর্থ প্রয়োগে অজ্ঞানের আবরণ বড়জোর একটু পাতলা হয়। কিন্তু অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করা যাবে না—যতদিন আমরা মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভ না করব এবং সে জ্ঞান যে-চেতনার প্রকৃতিগত তাতে উপনীত হতে না পারব। বাকী যা, তার উপযোগিতা আছে শুধু সাময়িক প্রয়োজনে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবই নিষ্ফল, কারণ

সে সমুদয়ের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা যায় না বা অস্তিত্বের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় না।

যে অজ্ঞানের মধ্যে আমরা বাস করি তা একেবারেই ভিত্তিহীন বা সর্বাঙ্গীণ মিথ্যা নয়। নিম্নতম অবস্থায় সে হল কোন না কোন সত্যের বিকৃতি আর ঊর্ধ্বতম অবস্থায় হল ক্ষুদ্রতর---এবং সেই পরিমাণে ভ্রান্তি-জনক---পুরুষার্থের প্রয়োজনে বৃহত্তর সত্যকে খণ্ডিতরূপে প্রতিবিম্বিত করা বা পরিবর্তিত করা। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ, অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বের সন্ধান সে দেয় না, অথচ বাহ্যস্তরের সব প্রয়াসের উৎস হ'ল অন্তরে। সে জ্ঞান শুধু সসীম আপাত-দৃশ্যই জানে কিন্তু সসীম যাঁর প্রতীক, আপাত যাঁর অভ্যাস তাঁর সংবাদ সে আনে না। সে শুধু অস্তিত্বের নিম্নতর আকারের জ্ঞান, কিন্তু এই নিম্নতর সত্তা ও জীবনের উপরে যিনি আছেন এবং নিজের মহত্তম সম্ভাবনা বাস্তবে সাধন করতে হলে যাঁর অভিমুখে অভীপ্সা অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে তা পায় না। পরাৎপরের জ্ঞান, অন্তরতমের জ্ঞান, অনন্তের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞ নিম্নতর বিশ্বকে দেখেন সেই পরাৎপরের আলোকে, বাহ্য উপরিচর পদার্থকে দেখেন আন্তর স্বরূপ-সত্যের রূপায়ণ বলে, সসীমকে দেখেন অসীমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অস্তিত্বকে তিনি দেখতে ও জানতে শেখেন---যেভাবে মননক্ষম প্রাণী দেখে ও জানে সে ভাব ছেড়ে, যেভাবে নিত্যব্রহ্ম দেখেন ও জানেন সেইভাবে। সুতরাং তাঁর সত্তা হয় প্রফুল্ল, সমৃদ্ধ ও সুখোজ্জ্বল, জীবনে তিনি হন আপ্তকাম।

জ্ঞানেই জ্ঞানের শেষ নয়, শুধু জানবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অনুসন্ধান ও অর্জন করা হয় না। জ্ঞানের উপযোগিতা পূর্ণ হয় যখন সে শুধু জানার চেয়ে বেশী কোন লাভের দিশা দিতে পারে, সত্তার কোন সম্পদ অর্জনের প্রেরণা জাগায়। ব্রহ্মকে জেনেও যদি বর্তমান জীবনধারার স্বভাবগত দুঃখ-বিরোধ-ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বাস করতে হয় তা হলে সে পঙ্গু নিঃস্ব জ্ঞানে লাভ কি?

বৃহত্তর জ্ঞানে সত্তার বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় আর সে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অধিগত হলে, সে সব সম্ভাবনা বাস্তবে সিদ্ধ হয়। প্রথম ক্রিয়া হল 'হওয়া', প্রথম ধাতু 'ভূ'; তার মধ্যেই আর সব ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত---জ্ঞান-কর্ম সৃষ্টি-উপভোগ সবই হওয়ার পরিপূর্ণতা বৈ নয়। আমাদের হওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই পুষ্টি আমরা চাই। সব রকমের জ্ঞান-কর্ম-

সৃষ্টি-উপভোগের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হ'ল সেই জ্ঞান কর্ম সৃষ্টি বা উপভোগ যা আমাদের সত্তার প্রসার ও পুষ্টিবৃদ্ধি করতে এবং আমাদের সত্তাকে অনুভব করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।

শুধু থাকাই সত্তার সবটা নয়। সত্তা নিজেকে জানে শক্তি চেতনা-আনন্দরূপে। মহত্তর সত্তা অর্থে মহত্তর শক্তি-চেতনা-আনন্দ।

মহত্তর সত্তার ফলে যদি আমরা শুধু আরও বেশী দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতাম তা হ'লে সে লাভ নেবার মত হত না। তাকে নেবার যোগ্য বললে তার অর্থ হয় যে, সত্তার প্রসার হ'লে আত্মসার্থকতার বোধ বৃদ্ধি পায়, আর তা থেকেই স্বতঃই অস্তিত্বের শক্তির বেশী তৃপ্তি আসে; আর এই প্রসার-উচ্চতা-শক্তির উপচয়বোধের মূল্য হিসাবে কিছু দুঃখের বৃদ্ধি বা সুখের হানি আমাদের কাছে অনুচিত মনে হয় না। তবে সত্তার পরিপূর্ণতার বা আত্মসার্থকতার পরাকাষ্ঠা এ হতেই পাবে না, কারণ দুঃখই হ'ল নিম্নতর সংস্থিতির অব্যভিচারী লক্ষণ। অস্তিত্বের প্রসার ও শক্তিতে সমগ্র সংসিদ্ধি লাভ হলে উর্ধ্বতম চেতনার সার্থকতা আসে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণতার জন্য আনন্দের সমগ্র সংসিদ্ধি চাই।

ব্রহ্মজ্ঞ শুধু যে আলোর আনন্দেই তুষ্ট থাকেন তা নয়, সে জ্ঞানের ফলে তাঁর আর একটা বিরাট লাভ হয়। 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি'।

তিনি যা পান সে হ'ল সবের উপরে, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ—তিনি লাভ করেন উর্ধ্বতম সত্তা ও চেতনা, সত্তার প্রসারের ও শক্তির পরাকাষ্ঠা, চরম আনন্দ। 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরং।'

পরম সত্তা সকল সম্বন্ধের অতীত নন বা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। তিনি শুধু অনির্বচনীয় নন বা নিজের নির্বিশেষ-কৈবল্যের দ্বারা এমন একান্তভাবে সীমাবদ্ধ নন যে, বিচিত্ররূপে নিজেকে সংজ্ঞা দিতে, সৃষ্টি করতে বা জানতে অপারগ হবেন। আত্মলীন সুষুপ্তি বা সমাধিতেও তিনি চিরকাল নিমগ্ন থাকেন না। পরাৎপরই অনন্তপুরুষ, এবং সর্বময় বিরাট সে আনন্ত্যের অন্তর্ভুক্ত। পরাচেতনাতে যিনি উপনীত হন, তিনি সত্তাতে অনন্ত হন এবং নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন।

একথা পরিষ্কার বোঝাবার জন্য—উপনিষদে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এবং তাঁকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্তরের গোপনকক্ষে, হৃদয়গুহাতে; আর সেই পরম ব্যোমে ব্রহ্মকে জানবার ফল বলা হয়েছে—ব্যষ্টিজীবের উর্ধ্বতম সত্তার উপলব্ধির দ্বারা

সকল কামনার পরিতৃপ্তি।

নিত্যতাতে ও আনন্ত্যে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা আমাদের সত্তার ঊর্ধ্বতম অবস্থা ত বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও আছে আত্মসংসিদ্ধির আনন্দে ব্রহ্মের সাহচর্য বা সাযুজ্য--'অশ্নুতে সহ ব্রহ্মণা'। এবং ব্রহ্মের যে তত্ত্ব অবলম্বন করে এ সাযুজ্য সম্ভবপর হয় তা হ'ল তাঁর জ্ঞানের তত্ত্ব--যে-প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সর্বলোকের, সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে সম্যক্‌রূপে জানেন, 'ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'।

বহুবিধ কামনার আকারে জীবনে আমরা যা এখন অনুসন্ধান করি সেই সকল অল্পতর পুরুষার্থের পূর্ণসংসিদ্ধির আধার হ'ল সত্তার আনন্দ। সে আনন্দের জন্য কি প্রয়োজন তা জানবার এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণরূপে সে আনন্দ নেবার অনন্ত সামর্থ্য একমাত্র শাশ্বত পরম প্রজ্ঞারই আছে।

ঐতরেয় উপনিষদ্

ঐতরেয় উপনিষদ্

প্রথম অধ্যায়——প্রথম খণ্ড

হরিঃ ওঁ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎকিঞ্চন মিষৎ; স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ ১॥

১। হরি ওম্। আদিতে আত্মা এক ছিলেন এবং এই সব (বিশ্ব) ছিল আত্মা; গতিশীল (অথবা দর্শনরত) অন্য কিছু ছিল না। আত্মা, পরমচিৎ-পুরুষ চিন্তা করলেন, "আচ্ছা, আমার সত্তা থেকেই আমি নিজেকে বিভিন্ন লোক করব।"

স ইমাঁল্লোকানসৃজত——অম্ভো মরীচীর্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ॥ ২॥

২। এই লোকগুলি তিনি সৃজন করলেন; "অম্ভঃ", আকাশীয় জলধারার লোক; "মরীচীঃ", আলোকের লোক; "মর", মৃত্যু ও মর বিষয়সমূহের লোক; "আপঃ", নিম্ন জলধারার লোক। আকাশীয় জলধারা অবস্থিত ভাস্বর নভোমণ্ডলের উজানে আর নভোমণ্ডল হ'ল তার ভিত্তি ও বিশ্রামস্থল; অন্তরিক্ষ হ'ল আলোকের জগৎ; পৃথিবী হ'ল মরলোক; আর পৃথিবীর নিম্নে আছে নিম্নজলধারা।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ॥ ৩॥

৩। পরম চিৎ-পুরুষ চিন্তা করলেন, "আচ্ছা, এইসব হ'ল বিভিন্ন লোক; আর এই সব লোকের জন্য আমি নিজেকেই করব বিভিন্ন লোকপাল।" সেজন্য তিনি জলধারার মধ্য থেকে পুরুষকে একত্র ক'রে তাকে আকার ও ধাতু দিলেন।

তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত, যথাণ্ডং; মুখাদ্বাগ্‌বা-চোঽগ্নি র্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ। প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বঙ্‌ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি লোমভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্না-দ্রেতো রেতস আপঃ ॥ ৪ ॥

৪। পরম চিৎ-পুরুষ তাঁর উপর নিবিষ্ট হ'লেন এবং যাঁর উপর তিনি নিবিষ্ট হ'লেন তাঁর থেকে ফুটে উঠল মুখ, যেমন ডিম ফুটে ওঠে ডিমের উপর তা দেওয়া হ'লে; মুখ থেকে ফুটে উঠল বাক্‌ আর বাক্‌ থেকে জন্মাল অগ্নি; দুই নাসারন্ধ্র ফুটে উঠল এবং নাসারন্ধ্র থেকে বাহির হ'ল প্রশ্বাস এবং প্রশ্বাস থেকে জন্মাল বায়ু। দুই চক্ষু ফুটে উঠল এবং চক্ষু থেকে বাহির হ'ল দৃষ্টি এবং দৃষ্টি থেকে জন্মাল সূর্য। দুই কর্ণ ফুটে উঠল এবং কর্ণ থেকে বাহির হ'ল শ্রবণ এবং শ্রবণ থেকে উৎপন্ন হ'ল বিভিন্ন দিক্‌। ত্বক্‌ ফুটে উঠল এবং ত্বক্‌ থেকে বাহির হ'ল লোম এবং লোম থেকে জন্মাল বিভিন্ন ওষধি ও সকল বৃক্ষ ও গাছপালা। হৃদয় ফুটে উঠল এবং হৃদয় থেকে বাহির হ'ল মন এবং মন থেকে জন্মাল চন্দ্র। নাভি ফুটে উঠল এবং নাভি থেকে উৎপন্ন হ'ল অপান বায়ু এবং অপান বায়ু থেকে মৃত্যু। শিশ্ন ফুটে উঠল এবং শিশ্ন থেকে উৎপন্ন হ'ল রেতঃ এবং রেতঃ থেকে জলধারা।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যর্ণবে প্রাপতংস্তমশনাপিপাসাভ্যা-মন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১ ॥

১। ইহারাই সেই সব দেবতা যাদের তিনি সৃষ্টি করলেন; তারা পতিত হ'ল মহান্‌ অর্ণবে, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাদের উপর বসল লাফ দিয়ে। তখন তারা তাঁকে বললেন, "আমাদের জন্য আশ্রয় বিধান করুন

যাতে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অন্ন ভক্ষণ করতে পারি।"

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি॥ ২॥

২। তাদের কাছে তিনি গাভী আনলেন, কিন্তু তারা বলল, "সত্যই, ইহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।" তিনি তাদের কাছে অশ্ব আনলেন, কিন্তু তারা বলল, "সত্যই, ইহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।"

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি; পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি॥ ৩॥

৩। তিনি তাদের কাছে মানব আনলেন, আর তারা বলল, "বাঃ, বাস্তবিকই সুগঠিত ইহা! যথার্থই, মানব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্মিত হ'য়েছে।" তখন চিৎ-পুরুষ তাদের বললেন, "নিজ নিজ বাসস্থান অনুযায়ী তোমরা এখানে প্রবেশ কর।"

অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্য-শ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্প-তয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশ-ন্মৃত্যুপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্॥ ৪॥

৪। অগ্নি বাক্ হ'য়ে প্রবেশ করল মুখের ভিতর; বায়ু প্রশ্বাস হ'য়ে প্রবেশ করল দুই নাসারন্ধ্রের ভিতর; সূর্য দৃষ্টি হ'য়ে প্রবেশ করল দুই চক্ষুর ভিতর; দিক্‌সমূহ শ্রবণ হ'য়ে প্রবেশ করল দুই কর্ণের ভিতর; ওষধি ও বিভিন্ন গাছপালা ও বৃক্ষ লোম হ'য়ে প্রবেশ করল ত্বকের ভিতর; চন্দ্র মন হ'য়ে প্রবেশ করল হৃদয়ের ভিতর; মৃত্যু অপান অর্থাৎ নিম্ন-শ্বাসক্রিয়া হ'য়ে প্রবেশ করল নাভিতে; জলধারা রেতঃ হ'য়ে প্রবেশ করল শিশ্নের ভিতর।

তমশনপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। তে অব্রবীদেতাস্বেব

বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্যস্যৈকস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫ ॥

৫। তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পরম চিৎ-পুরুষকে বলল, "আমাদের জন্যও বাসস্থান বিধান করুন।" কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "এই সকল দেবতা-দের মধ্যেই আমি তোমাদের ভাগ করে দেব; দেখ, আমি তোমাদের করেছি তাদের দিব্যস্বভাবের অংশভাক্।" সেজন্য যে কোন দেবতাকেই আহুতি নিবেদন করা হ'ক না কেন, সেই নিবেদনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অংশ থাকেই।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি॥ ১॥

১। পরম চিৎ-পুরুষ চিন্তা করলেন, "বস্তুতঃ, এই সব আমারই বিভিন্ন লোক ও তাদের লোকপাল; এখন আমি ইহাদের জন্য নিজেকে অন্ন করব।"

সোঽপোঽভ্যতপৎ; তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ॥ ২॥

২। পরম চিৎ-পুরুষ জলধারার উপর গভীরভাবে নিবিষ্ট হ'লেন এবং এই যে জলধারার উপর তিনি গভীরভাবে নিবিষ্ট হ'লেন তা থেকে মূর্তি জন্মাল। দেখ, এই যা সব মূর্তিরূপে জন্মাল তা অন্ন বৈ অন্য কিছু নয়।

তদেনদভিসৃষ্টং পরাঙ্ত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৩॥

৩। অন্ন সৃষ্ট হ'য়ে তাঁর মুষ্টি থেকে পালিয়ে গেল পিছন দিকে। বাক্ দিয়ে তিনি ইহাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাক্ দিয়ে তিনি ইহাকে

ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে বাক্ দিয়ে ধরতেন, তাহ'লে মানুষ শুধু অন্নের কথা ব'লেই তৃপ্ত হ'ত।

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪ ॥

৪। প্রশ্বাস দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রশ্বাস দিয়ে তিনি তাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে প্রশ্বাস দিয়ে ধরতেন, তাহ'লে মানুষ শুধু অন্ন আঘ্রাণ ক'রেই তৃপ্ত হ'ত।

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষা-গ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫ ॥

৫। চক্ষু দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চক্ষু দিয়ে তিনি ইহাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে চক্ষু দিয়ে ধরতেন, তা হ'লে মানুষ শুধু অন্ন দেখেই তৃপ্ত হ'ত।

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণা-গ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬ ॥

৬। কর্ণ দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে ধরতে পারলেন না কর্ণ দিয়ে। যদি তিনি ইহাকে কর্ণ দিয়ে ধরতেন তা'হলে মানুষ শুধু অন্নের কথা শুনেই তৃপ্ত হ'ত।

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোত্ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনত্ত্বচাগ্রহৈষ্যৎস্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭ ॥

৭। ত্বক্ দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাকে ধরতে পারলেন না ত্বক্ দিয়ে। যদি তিনি ইহাকে ত্বক্ দিয়ে ধরতেন তাহ'লে মানুষ শুধু অন্ন স্পর্শ ক'রেই তৃপ্ত হ'ত।

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎমনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈ-ষ্যৎ, ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৮॥

৮। মন দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মন দিয়ে তিনি তাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি তাকে মন দিয়ে ধরতেন, তাহ'লে মানুষ শুধু অন্নের কথা চিন্তা ক'রেই তৃপ্ত হ'ত।

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনা-গ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ॥ ৯॥

৯। শিশ্ন দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিশ্ন দিয়ে তিনি ধরতে পারলেন না। যদি তিনি তাকে শিশ্ন দিয়ে ধরতেন, তা হ'লে মানুষ শুধু অন্ন নিঃসরণ ক'রেই তৃপ্ত হ'ত।

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ॥ ১০॥

১০। অপান দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন আর ইহাকে ধরা হ'ল। দেখ, ইহাই অন্নের গ্রাহক যা আবার প্রাণের শ্বাসবায়ু এবং সেজন্য যা সব শ্বাসবায়ু তার প্রাণ থাকে অন্নে।

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং, যদি চক্ষুষা দৃষ্টং, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং, যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টমথ কোঽহমিতি॥ ১১॥

১১। পরম চিৎ-পুরুষ চিন্তা করলেন, "কি করে এই সব আমি বিনা থাকবে?" আর তিনি চিন্তা করলেন, "কোন পথেই বা আমি ভিতরে প্রবেশ করব?" তিনি আরো ভাবলেন, "যদি শব্দ-উচ্চারণ হয় বাক্-এর দ্বারা, যদি শ্বাস-ক্রিয়া হয় প্রাণবায়ুর দ্বারা, যদি দর্শন হয় চক্ষুর দ্বারা, যদি শ্রবণ হয় কর্ণ দ্বারা, যদি চিন্তা হয় মনের দ্বারা, যদি নিম্নক্রিয়াগুলি

হয় 'অপান' দ্বারা যদি নিঃসরণ হয় শিশ্নের দ্বারা, তাহ'লে আমি কে?"

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽযমাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥১২॥

১২। এই সীমাই তিনি বিদীর্ণ করলেন, এই দ্বার দিয়েই তিনি প্রবেশ করলেন ভিতরে। ইহাই তা যার নাম বিদৃতি (বিদীর্ণ করার দ্বার); ইহাই তাঁর আগমনের দ্বার আর এখানেই তাঁর আনন্দের স্থান। তাঁর পুরীতে তাঁর তিনটি আবাস আছে, তিনটি স্বপ্ন আছে যার মধ্যে তিনি বাস করেন, আর প্রত্যেকটির বেলায় তিনি পালাক্রমে বলেন, "দেখ, ইহা আমার বাসস্থান," আর "ইহা আমার বাসস্থান", আর "ইহা আমার বাসস্থান।"

স জাতো ভূতান্যভিবৈখ্যৎ, কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যাদিদমদর্শমিতি ॥ ১৩ ॥

১৩। যখন তিনি জন্মালেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন, ও বললেন শুধু প্রকৃতি ও তার সব সৃষ্টির কথা; এই জড়লোকে অন্য কিসের কথাই বা তিনি বলবেন বা যুক্তিবিচার করবেন? ইহার পর তিনি সেই পুরুষকে দেখলেন যিনি ব্রহ্ম এবং সর্বশেষ সার। তিনি বললেন, "আহা, ইহাই তিনি, বস্তুতঃ আমি তাঁকে দেখেছি"।

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। সেজন্য তিনি ইদন্দ্র; কারণ ইদন্দ্র তাঁর সত্যকার নাম। কিন্তু যদিও তিনি ইদন্দ্র, তবু অপ্রকাশের অবগুণ্ঠনের জন্য তাঁকে বলা হয় ইন্দ্র; কারণ দেবতারা অপ্রকাশের অবগুণ্ঠন ভালবাসে; হ্যাঁ, বাস্তবিকই দেবতারা অপ্রকাশের অবগুণ্ঠন ভালবাসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতঃ তদেতৎ সর্বে-
ভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি; তদ্ যদা স্ত্রিয়াং
সিঞ্চত্যথৈজ্জনয়তি; তদস্য প্রথমং জন্ম॥ ১॥

১। পুরুষেই প্রথম অজাত শিশু সম্ভূত হয়। এই যা রেতঃ তা তার শক্তি ও তেজ যা সম্ভূতির জন্য একত্র আকৃষ্ট হয় জীবের সর্বাঙ্গ থেকে; সুতরাং সে নিজেকে ভরণ করে নিজের মধ্যে, আর যখন সে তা সিঞ্চন করে স্ত্রীর মধ্যে তখন সে উৎপাদন করে নিজেকেই; আর ইহাই চিৎ-পুরুষের প্রথম জন্ম।

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা; তস্মাদেনাং ন
হিনস্তি; সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি॥ ২॥

২। ইহা স্ত্রীর সহিত একাত্ম হ'য়ে ওঠে, যেমন নিজ অঙ্গ তেমন; সেজন্য ইহা স্ত্রীকে কোন পীড়া দেয় না; আর এই যে আত্মা তার গর্ভে প্রবেশ করেছে তাকে সে পোষণ করে।

সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি। তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি; সোঽগ্র
এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽ-
গ্রেঽধিভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ ভাবয়তি, এষাং লোকানাং সন্তত্যা।
এবং সন্ততা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম॥ ৩॥

৩। এই পোষণকারিণী স্ত্রীকে পোষণ করা কর্তব্য। এইভাবে স্ত্রী অজাত শিশুকে ভরণ করে এবং পুরুষ শুরু থেকেই কুমারকে তার জন্মের আগেই পোষণ করে। আর সে যে কুমারকে জন্মের আগেই পোষণ করে, তাতে সে বস্তুতঃ নিজেকেই পোষণ করে এই সব লোক ও তাদের জন-গণের অবিচ্ছেদের জন্য; কারণ এইরূপেই এই সব লোকের সূত্র দীর্ঘায়িত হয় ছিন্ন না হ'য়ে। আর ইহাই চিৎ-পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম।

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে; তদস্য তৃতীয়ং জন্ম॥ ৪॥

৪। দেখ, ইহাই তার চিৎ-পুরুষ ও আত্মা আর ইহাকে সে তার প্রতি-নিধি করে তার পুণ্যকর্মের জন্য। আর এই যে তার অপর আত্মা সে যখন তার সেই কর্মগুলি সমাপ্ত করে যা সে করতে এসেছিল এবং বয়ো-প্রাপ্ত হয়, তখন, দেখ, সে এখান থেকে চলে যায় এবং যেমন সে প্রস্থান করে তেমন সে জন্ম নেয়। আর ইহাই চিৎ-পুরুষের তৃতীয় জন্ম।

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি; গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ॥ ৫॥

৫। সেজন্য ঋষি বামদেব বলেছেন, "আমি গর্ভের মধ্য থেকেই এই সব দেবতাদের বিভিন্ন জন্ম ও তাদের বিভিন্ন কারণের কথা জেনে-ছিলাম। শত লৌহপুরীতে তারা আমায় নিম্নে আবদ্ধ রেখেছিল; সবেগে (অথবা বীর্যসহকারে) ও সবলে আমি সে সব ভেঙে ঊর্ধ্বে আমার গগনে উঠে এসেছি শ্যেন পক্ষীর মতো।" গর্ভে অবস্থান কালেই বামদেব এরূপ বলেছিলেন।

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবদমৃতঃ সমভবৎ॥ ৬॥

৬। আর যেহেতু তিনি ইহা জেনেছিলেন, সেহেতু যখন দেহের বন্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন হ'ল, তখন, দেখ, তিনি উৎক্রান্ত হ'লেন ঐ স্বর্গলোকে আর সেখানে সকল কাম্যবস্তু লাভ করে তিনি মৃত্যু অতিক্রম করলেন, হ্যাঁ তিনি মৃত্যু অতিক্রম করলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা যেন বা পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি॥ ১॥

১। কে এই পরম চিৎ-পুরুষ যাতে আমরা তাঁকে উপাসনা করতে পারি? আর এই সকলের মধ্যে কেই বা পরম চিৎ-পুরুষ? যাঁর দ্বারা লোকে দেখে, অথবা যাঁর দ্বারা লোকে শোনে, অথবা যাঁর দ্বারা লোকে সকল প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করে অথবা যাঁর দ্বারা লোকে বাক্যের সু-স্পষ্টতা প্রকাশ করে অথবা যাঁর দ্বারা লোকে মিষ্ট ও তিক্ত অবগত হয়।

যদেতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি॥ ২॥

২। এই যে হৃদয় ইহাই আবার মন। প্রত্যয় ও দৃঢ় অভিলাষ ও বিশ্লেষণ ও প্রজ্ঞান, ও মেধা ও দর্শন ও ধৃতি ও মতি ও মনীষা, যন্ত্রণা-বোধ ও স্মৃতি ও সংকল্প ও মননের নিষ্ঠা (অথবা ক্রিয়া) এবং প্রাণবত্তা ও কামনা ও উচ্চণ্ড ভাব, এইসব, হ্যাঁ এইসব হ'ল শুধু শাশ্বত প্রজ্ঞানের বিভিন্ন নাম।

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহা-ভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ, স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং; সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥ ৩॥

৩। এই সৃজনকারী ব্রহ্মা; এই অধিপতি ইন্দ্র; এই প্রজাপতি, যিনি

তাঁর প্রজাবর্গের পিতা; এই সব দেবতা এবং এই পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিষ্মান্ তত্ত্বসমূহ, এবং এই সব বৃহৎ প্রাণী এবং ঐসব ক্ষুদ্র প্রাণী; উভয়প্রকারের বীজসমূহ; আর অণ্ডজ ও স্বেদজ ও জরায়ুজ এবং গাছপালা যা মাটি ভেদ করে ওঠে, এবং অশ্ব ও গবাদিপশু ও মনুষ্য ও হস্তী; অর্থাৎ যা কিছু এখানে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় এবং যা সব সচল এবং যারা পক্ষযুক্ত এবং যা কিছু স্থাবর প্রজ্ঞার দ্বারাই এই সব চালিত হয় এবং প্রজ্ঞানেই তাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কারণ প্রজ্ঞাই জগতের নেত্র, প্রজ্ঞাই ধ্রুব প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানই সনাতন ব্রহ্ম।

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবদমৃতঃ সমভবৎ ॥ ৪ ॥

৪। প্রাজ্ঞ ও দ্রষ্টা আত্মার বলে ঋষি এই জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আরোহণ করলেন এই অন্য স্বর্গলোকে, আর সেখানে সকল কাম্যবস্তু লাভ করে তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন, হ্যাঁ তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

থেকে
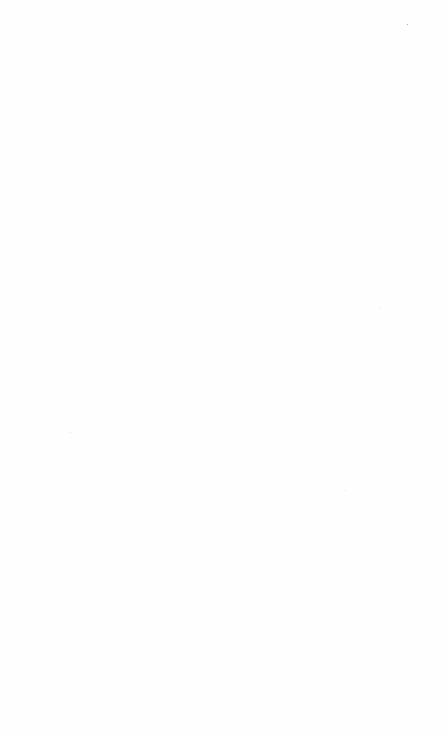
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

১। পরম এক ছিলেন বর্ণহীন ও রূপহীন; আর তিনি বহুবিধ হ'লেন আত্মশক্তির যোগবলে; নানা রূপ ও রঙ্ তিনি ধারণ করেন, কিন্তু এই সবে তাঁর কোন স্বার্থ বা আসক্তি নেই ; এই যে পরমদেব যাঁর মধ্যে সকল বিশ্ব অন্তিমে ধ্বংস হ'য়ে প্রয়াণ করে শুধু তিনিই ছিলেন আদিতে। তিনি যেন আমাদের সংযুক্ত করেন দীপ্ত ও শুভ বুদ্ধির সহিত।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥

২। পরম দেবই দাহক অগ্নি ও গগনস্থ আদিত্য ও প্রবহমাণ বায়ু; তিনিই আবার চন্দ্র। তাঁরই শুক্র ও ব্রহ্ম ও জলরাশি এবং তিনি প্রজাপতি, তাঁর প্রজাবর্গের পিতা।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩॥

৩। তুমি স্ত্রী আবার পুরুষও তুমি; তুমি বালক, আর না হয় কুমারী বালিকা, আবার ঐ যে জীর্ণ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি দণ্ডের উপর ভর কর নত হ'য়ে যাচ্ছে তা-ও তুমি। দেখ, তুমি জন্ম লও আর বিশ্ব উদ্ভূত হয় তোমারই বিভিন্ন মুখে পূর্ণ হ'য়ে।

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ৪॥

৪। তুমি নীল পক্ষী, আবার হরিদ্বর্ণ ও লোহিতাক্ষও তুমি; তুমি বিদ্যুতের গর্ভাশয় এবং তুমি বিভিন্ন ঋতু ও সমুদ্র। হে অনাদি চিৎ-পুরুষ, তুমি নিজেকে বহুভাবে সকল রূপের মধ্যে ঢেলে দিয়েছ এবং সেজন্যই সৃষ্ট হ'য়েছে বিভিন্ন ভুবন।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫ ॥

৫। এক অজাতা মাতা আছে; সে শুক্লবর্ণা, সে কৃষ্ণবর্ণা, সে লোহিত-বর্ণা; আকার ধারণ করার পর, দেখ, কি ভাবে সে বহুবিধ প্রাণীর জন্ম দিয়েছে; দুই অজাতের মধ্যে একটি তাকে ভোগ ক'রে তার সহিত শয়ান থাকে কিন্তু অন্যটি তাকে ত্যাগ করেছে তার সকল মাধুর্য নিঃশেষ করে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥

৬। ইহারা এমন দুই পক্ষী যারা একই সমান বৃক্ষ আশ্রয় করে থাকে,---সুন্দর পালকযুক্ত, সহচর ও চিরন্তন সখা; ইহাদের একজন বৃক্ষের সুস্বাদু ফল খায়, কিন্তু অন্যজন কিছু খায় না, সে শুধু দেখে তার সঙ্গীর আচরণ।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭ ॥

৭। জীব সেই পক্ষী যে ভগবানের সহিত এক সমান বৃক্ষে বাস করে, কিন্তু সে ইহার মাধুর্যে মগ্ন হ'য়ে মাধুর্যের দাস হ'য়ে ভগবানকে হারায়; সেজন্য সে শোকগ্রস্ত ও বিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে অন্যটিকে অর্থাৎ ভগবানকে দেখে তখন সে জানে ভগবানের মহিমা ছাড়া অন্য কিছু নেই, আর তার শোক দূর হয়।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৮॥

৮। ঐ যে সর্বোচ্চ ও অমর্ত্য স্বর্গ যেখানে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন সেখানে আছে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি; কিন্তু যে তার আশ্রয় জানে না, তাকে ঋগ্বেদ সাহায্য করবে কি ভাবে? যারা তা জানে, দেখ, তারা এখানে আছে, তারা দৃঢ় আসন পায় চিরকাল ধরে।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ঋতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥ ৯॥

৯। পবিত্রতা ও বিভিন্ন যজ্ঞ ও ব্রত ও সকল নৈবেদ্য এবং যা ছিল ও যা হবে এবং যার কথা বেদ বলে——এ সবই হ'ল সেই উপাদান যা থেকে মায়াধীশ তাঁর নিজের জন্য নির্মাণ করেন এই বিচিত্র বিশ্ব এবং তাদের মধ্যে ঐ অন্য যেন দেওয়াল দিয়ে আবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত রয়েছেন তাঁর মায়ার দ্বারা।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ১০॥

১০। প্রকৃতিকে জেন মায়া ব'লে, আর সর্বশক্তিমান মহেশ্বরকে মায়াধীশ বলে। তাঁরই অবয়বরূপী বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয়ে পূর্ণ এই সমগ্র সচল জগৎ।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

১১। তিনি এক অথচ প্রতি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট, তাঁরই মধ্যে এই সকল ব্যক্ত জগৎ সমবেত হ'য়ে আবার খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যায়, দেখ তিনিই ঈশ্বর, দাতা, পূজনীয় প্রভু, তাঁকেই নিজের মধ্যে বর্ধিত করে মানুষ পায় অনির্বচনীয় শান্তি।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রঃ মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১২॥

১২। তিনি দেবতাদের উৎপত্তি এবং তিনিই তাদের প্রয়াণ, বিশ্বের অধিপতি, রুদ্র, মহর্ষি তিনি হিরণ্যগর্ভকে দেখলেন আকার নিতে: তিনি যেন আমাদের সংযুক্ত করেন দীপ্ত ও শুভ বুদ্ধির সহিত।

যো দেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১৩॥

১৩। এই যে দেবতাদের প্রভু ও রাজা, তাঁর মধ্যেই সকল লোকের আশ্রয়; তিনিই প্রভুত্ব করেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের উপর। কোন দেবতার জন্য আমরা নৈবেদ্য আয়োজন করব?

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৪॥

১৪। সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন এই বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে, তিনি নানা রূপ গ্রহণ ক'রে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং অদ্বয়রূপে তিনি ইহার চতুর্দিক ব্যেপে ইহাকে পরিবেষ্টন করেন (অথবা, বিশ্বের পরিবেষ্টিতা তিনি, এক ও অদ্বয়); মঙ্গলময় শিবকে জানার পর মানুষ পায় অনির্বচনীয় শান্তি।

স এব কালে ভুবনস্যাস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥১৫॥

১৫। তিনি তাঁর ভুবনকে রক্ষা করেন যথাকালে, সত্যই বিশ্বাধিপ তিনি জাগ্রত থাকেন সকল ভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে; তাঁরই মধ্যে ব্রহ্মর্ষি ও দেবতারা যোগের দ্বারা জ্ঞানলাভ ক'রে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন মৃত্যু ও ইহার সব বন্ধন।

ঘৃতাৎপরং মণ্ডবিমাতিসূক্ষ্মম্ জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। ঘৃতে যেমন অতি সূক্ষ্ম সর থাকে আর ইহা মাখন অপেক্ষা আরো উৎকৃষ্ট, তেমন মঙ্গলময় শিব নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন প্রতি সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে; কিন্তু অদ্বয়রূপে তিনি এই সমগ্র জগৎ ব্যেপে ইহাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। পরম দেবকে জানলেই তুমি মুক্ত হবে সকল পাশ থেকে।

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

১৭। এই যে পরম দেব মহাত্মা, বিশ্বনির্মাতা, তিনি সর্বদাই সমাসীন তাঁর জনগণের হৃদয়ে; হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অন্তঃপুরুষ তাঁকে জানে। ইহা যারা জানে তারাই অমর।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮ ॥

১৮। যখন অন্ধকার থাকে না, দিন প্রভাত হয় না, রাত্রিও আসে না, সৎ থাকে না, অসৎও থাকে না তখন সবই শুধু মঙ্গলময় শিব যিনি শুদ্ধ ও কেবল, তিনিই বস্তুতঃ অক্ষয় এবং সূর্য যা সবিতা অপেক্ষা আরো মহিমময় এবং তাঁর থেকেই পুরাণী দেবী প্রজ্ঞা নিঃসারিত হ'য়েছিল আদিতে।

অথবা

যখন অন্ধকার দূরীভূত অথচ তখন দিনও নয়, রাত্রিও নয়, আর সৎ নেই, অসৎ নেই কিন্তু সকলই কেবল মঙ্গলময় শিব, তখনই বস্তুতঃ ইহা ভগবানের অক্ষয়ত্ব এবং সবিতা অপেক্ষা আরো মহিমময় সূর্য; ইহা থেকেই নিঃসারিত হ'য়েছিল প্রজ্ঞা যা বিশ্বের পুরাণী।

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯॥

১৯। ঊর্ধ্বে তাঁকে কেউ স্পর্শ করে নি, সমতলেও তুমি তাকে পাবে না বা ধরবেও না; কিন্তু, দেখ, তাঁর কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, বস্তুতঃ মহান্ তাঁর যশ বিভিন্ন জাতির মধ্যে।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০॥

২০। সনাতনের কোন রূপ নেই যা চক্ষুর গোচর হয়, দৃষ্টির দ্বারাও তাঁকে কেউ দেখে না, কিন্তু হৃদয় ও মন দিয়ে যারা এই হৃদিস্থিতকে প্রকৃতই জানে তারা মৃত্যুহীন হয়।

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ ২১॥

২১। তোমাকে অজাত জেনে কেহ তোমার কাছে আসে আর তার চিত্ত ভয়ব্যাকুল হয়। হে রুদ্র, হে ভীষণ, তোমার সেই যে অন্য প্রসন্ন হাস্যময় মুখমণ্ডল, তার মধুর হাসি দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা কর সর্বদা।

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে॥ ২২॥

২২। হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, আমাদের শিশুসন্তান, আমাদের জীবন, আমাদের অশ্ব, গবাদি পশু—এসব কিছু তুমি নিধন করো না; হে ভীষণ, তোমার ক্রোধে তুমি আমাদের বীরপুরুষদের বধ করো না; দেখ, আমরা এসেছি হস্তে নৈবেদ্য নিয়ে এবং তোমাকে আহবান করি জনসংসদে।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১ ॥

১। পরব্রহ্মের, বিশ্বাতীতের মধ্যে এই বিদ্যা ও অবিদ্যা—এই উভয়েরই প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে ব্রহ্ম ও অনন্তের মধ্যে আর তথায় তারা নিহিত আছে চিরকাল ধরে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা বিনষ্ট হয় আর বিদ্যা চিরন্তন বর্তমান থাকে, আর যিনি এই উভয়ের অধীশ্বর তিনি এই উভয় ব্যতীত ভিন্ন।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ ॥ ২ ॥

২। এক তিনি প্রতি গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট, বস্তুতঃ তিনি আছেন সকল বিষয়ের রূপের মধ্যে এবং সকল জীবের গর্ভাশয়ের মধ্যে; আদিতে তিনি প্রাচীন ঋষি কপিলকে তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার সময় পূর্ণ করেছিলেন সকল প্রকার জ্ঞান দিয়ে, হ্যাঁ তিনি কপিলকে দেখেছিলেন আকার নিতে (অথবা, তিনিই পুরাকালে ঋষি কপিলকে পূর্ণ করেছিলেন সকল প্রকার জ্ঞান দিয়ে যখন তাঁর মাতা তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন; বস্তুতঃ, তিনি কপিলকে দেখেছিলেন আকার নিতে)।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥

৩। পরম দেব নিজেকে বুনে এক জাল করেন অথবা তিনি নিজেকে বুনে অন্য এক জাল করেন এবং তা থেকে নির্মাণ করেন বিবিধ পাশ এবং ইহাকে বিস্তার করেন বাহিরে দেহের ক্ষেত্রের মধ্যে; পরে আবার তিনি ইহাকে প্রত্যাহার করেন। উপরন্তু তিনি যতিদেরও, মহান্ সাধক-দেরও সৃষ্টি করেছিলেন এবং এইরূপে মহাত্মা চালনা করেন তাঁর বিশ্ব-ব্যাপী আধিপত্যের দণ্ড (অথবা এইরূপে মহাত্মা, ঈশ্বর আধিপত্য করেন

এই সকল সৃষ্টির উপর)।

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্‌প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড়্‌বান্।
এবং স দেবো ভগবান্বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৪॥

৪। দেখ, সূর্য উদিত হ'য়ে চালনা করে জগতের শকট এবং তারপর দীপ্তি পায় সকল দিক উদ্ভাসিত ক'রে এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ ও সমতল হ'য়ে ওঠে এক প্রভামণ্ডল, তেমন এই মহিমময় ভাস্বর পরমদেব এক হ'য়ে প্রবিষ্ট হন বিভিন্ন প্রকারের গর্ভাশয়ের মধ্যে এবং আধিপত্য করেন তাদের উপর।

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্বান্বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥ ৫॥

৫। কারণ যিনি জগতের গর্ভাশয় তিনি প্রতি স্বভাবকে নিয়ে যান তার পূর্ণতায়, এবং যে সব এখনো পূর্ণতা পায় নি তাদেরও তিনি পরিপক্ করেন। তিনি তাঁর এই সমগ্র জগতের অন্তর্বাসী ও নিয়ন্তা, আর প্রকৃতির সকল গুণকে নিযুক্ত করেন তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ায়।

তদ্বেদগুহ্যোহপনিষৎসু গূঢ় তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভুবুঃ॥ ৬॥

৬। ইহাই সেই গূঢ় রহস্য যা প্রচ্ছন্ন আছে সব উপনিষদে, কারণ উপনিষদ হ'ল বেদের রহস্য; ব্রহ্মা যাঁকে ব্রহ্মের গর্ভাশয় বলে জানে তা ইহাই। আর যে পূর্বতন দেবতারা ও ঋষিরা এই 'তৎ'কে জেনেছিলেন তাঁরা এই 'তৎ' হ'লেন এবং অমৃত হ'লেন।

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপমোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥ ৭॥

৭। এই যে পরম এক তিনি বিভিন্ন কর্ম ও ফলের কারক কারণ

প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ তাঁতেই অব্যক্ত থাকে, তিনি তাঁর সকল কৃতকর্মের ফল ভোগ করেন এবং এই জগৎ তাঁরই রূপ, আর তাঁর ক্রিয়ার উপাদান ত্রিবিধ আর তার যাত্রাপথও তিনটি (অথবা, এক পরম এক আছেন যিনি সকল কর্ম ও তাদের ফল সম্পাদন করেন, কারণ প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ তাঁতেই আসক্ত থাকে; ইহাই তিনি যিনি তাঁর কৃতকর্ম উপভোগ করেন; এই জগৎ তাঁর শরীর আর তাঁর প্রকৃতির তিনটি বিভিন্ন গুণ বর্তমান এবং সেইরূপ তাঁর যাত্রার পথও তিনটি)। দেখ, প্রাণের অধিপতি তিনি তাঁর নিজের বিভিন্ন কর্মের বেগের দ্বারা সঞ্চরণ করেন সকল যুগের মধ্যে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্পাহংকারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ৮॥

৮। মানুষের অঙ্গুষ্ঠের মতো তাঁর আয়তন, কিন্তু জ্যোতির্ময় সূর্যের মতো তাঁর বিভাব, তিনি সংকল্প ও ব্যক্তিসত্ত্ববিশিষ্ট। কিন্তু অন্য একজন আছেন যাঁকে আমরা দেখি বুদ্ধি বলে ও চিৎ-পুরুষের শক্তিতে কারণ চর্মভেদিকার অগ্রভাগ ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম নয়।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯॥

৯। কেশাগ্রের শতাংশ লও, ইহাকে আবার শতভাগ কর; এই শতাংশের শতাংশ যেরূপ, সেইরূপ জানবে মানুষের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ, যদি তুমি তাঁকে পৃথক করতে চাও; অথচ তোমার মধ্যে ইহাই আনন্ত্য-প্রাপ্তির যোগ্য।

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ১০॥

১০। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ কি নপুংসকও তিনি নন, কিন্তু যে শরীরই তিনি গ্রহণ করেন তাহাই তাঁকে আবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে।

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥ ১১॥

১১। দৃষ্টির প্রলোভন দ্বারা, স্পর্শের মায়ার দ্বারা, সংকল্পের যাদুর দ্বারা যেমন শরীর জন্মায় এবং খাদ্য, পানীয় ও প্রাচুর্যের সাহায্যে বৃদ্ধি লাভ করে, তেমন দেহস্থ চিৎ-পুরুষও ঐ সব প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা উত্তরোত্তর ক্রমানুয়ী রূপলাভ করেন তাদের উপযুক্ত স্থানে; তাঁর কর্মানু-যায়ী তাঁর অগ্রগতি হয় আর তাঁর বিভিন্ন রূপ ও আকার গড়ে ওঠে তাঁর কর্মানুযায়ী।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়া গুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ১২॥

১২। স্থূলরূপ, সূক্ষ্মরূপ, নানাবিধরূপ——এই সবকে দেহমধ্যস্থ চিৎ-পুরুষ বিকশিত করেন তাঁরই নিজের প্রকৃতির দ্বারা ইহার বিভিন্ন কর্ম-ধারায়; তিনি এই সব বিকশিত করেন তাঁর সব কর্মের ক্রিয়াধর্মের এবং মানবস্থ চিৎ-পুরুষের ক্রিয়াধর্মের দ্বারা। কিন্তু অন্য একজন আছেন যাঁর মধ্যে আমরা সেই পরমকারণ দেখি যাঁর দ্বারা এই সকল একত্র হয়। (অথবা, আরো একজন আছেন, যাঁর মধ্যে আমরা সেই কারণ দেখি যেজন্য এই সব পরিপূর্ণ এক হ'য়ে অবস্থিত এবং একত্র মিলিত হ'য়েছে)।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩॥

১৩। আদি-অন্তহীন যিনি নৈর্ঋতি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বহু রূপ নিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি এক অথচ ইহাকে পরিবেষ্টন ক'রে সর্বত্র বিরাজিত, তিনি ঈশ্বর এবং যদি তুমি তাঁকে জান তাহ'লে তুমি মুক্ত হবে সকল প্রকার বন্ধন থেকে।

ভাবগ্রাহ্যমনীড্যাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ ১৪॥

১৪। যে শিব সকল সম্ভূতি ও অসম্ভূতির প্রভু তাঁর থেকেই প্রবাহিত এই সমগ্র সৃষ্টি, আর ইহা শিবের একাংশ মাত্র; কিন্তু পক্ষযুক্ত চিৎ-পুরুষের কোন নীড় অনুযায়ী তাঁকে অভিহিত করা হয় না, আর শুধু হৃদয়ই সক্ষম তাঁকে প্রণিধান করতে। যারা মঙ্গলময় শিবকে জানে তারা দেহত্যাগ করে চিরকালের জন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ ১॥

১। "ইহা প্রকৃতি ও আত্ম-অস্তিত্ব"---এই কথা কোন কোন তত্ত্ব-দর্শীরা বলেন। আবার অন্য কেউ বলেন, "না, ইহা কাল।" উভয়ই বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়। সৃষ্ট বিষয়সমূহের জগতে পরমদেবের মহিমার দ্বারাই ব্রহ্মের চক্র নিরন্তর আবর্তিত হয়।

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হিসর্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথ্ব্যপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥ ২॥

২। এই সমগ্র বিশ্বকে তিনি আবৃত করেন নিত্যকাল ধরে, তিনি সর্বজ্ঞ, কালের স্রষ্টা এবং তাঁতেই অবস্থিত প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ; বস্তুতঃ সকল বিষয়ই তিনি বিবেচনা করেন। আর তাঁর শাসনে কর্মের বিধান আবর্তিত হয় ইহার চক্রে; পৃথ্বী, অপ্, অগ্নি, অনিল ও আকাশ---এই সবকে তুমি মনে করবে (সেই ধাতু বলে যাতে ঐ চক্র আবর্তন করে)।

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥ ৩॥

৩। ঈশ্বর কর্ম করেন, আবার কর্ম থেকে বিশ্রামও নেন, তিনি নিজেকে যুক্ত করেন বিষয়সমূহের তত্ত্বের সহিত তাদের সারে, তা সে তত্ত্ব এক বা দুই বা তিন বা আট হ'ক, আর তিনি নিজেকে যুক্ত করেন কালের সহিত এবং আত্মার সহিত তার বিভিন্ন সূক্ষ্ম ক্রিয়ায়।

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্বিনিয়োজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি চ তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪॥

৪। এই ভাবে তিনি আরম্ভ করেন সেই সব কর্ম যা সব প্রকৃতির

গুণের অধীন এবং তিনি সকল অস্তিত্বকে নিয়োগ করেন তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ায়; আর এই সব যখন থাকে না তখন এই ভাবে আসে কৃতকর্মের নাশ আর কর্মের ক্ষয় হ'লে তিনি প্রস্থান করেন সে সব থেকে, কারণ তাঁর অন্তিম সত্যে তিনি সে সব থেকে ভিন্ন।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্॥ ৫॥

৫। আমরা দেখি তিনি আদি এবং তিনি অনুস্যূত কারণ যার দ্বারা সকল কিছু একত্র থাকে; ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালের অতীতে তিনি অবস্থিত, কালের কোন ক্রিয়া নেই তাঁর মধ্যে। তোমরা পূজা কর সেই আরাধ্যকে এই সমগ্র বিশ্ব যাঁর রূপ, আর যিনি এই বিশ্বের মধ্যে আকার পরিগ্রহ করেছেন, তোমরা পূজা কর ঈশ্বরকে, তোমাদের চিত্তে অধিষ্ঠিত প্রাচীন দেবকে।

অথবা

আমরা তাঁকে দেখেছি আর তিনি আদি ও সেই সকল কারণের কারণ যাদের দ্বারা এই সব ভূত একত্র হয় ও রূপের উদ্ভব হয়; ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তাঁর এই দিক, কালের কোন ক্রিয়া নেই তাঁর মধ্যে।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥ ৬॥

৬। কাল ও রূপ ও সংসার বৃক্ষ থেকে ভিন্ন তিনি, আর সে সব থেকে মহত্তর তিনি যাঁর মধ্য থেকে এই প্রপঞ্চ উদ্ভূত হ'য়ে আবর্তন করে। যিনি পুণ্য আনেন ও পাপ দূর করেন সেই কৃপাময় প্রভুকে তোমরা জান। তিনি মানবের চিৎ-পুরুষে অবস্থিত, তিনি অমৃত এবং তাঁর মধ্যেই সকল বিষয়ের আবাস।

অথবা

কাল এবং রূপ এবং সকল বিষয়ের বৃক্ষ—এই সব কিছুই তিনি নন, কারণ তিনি এ সব থেকে মহত্তর এবং তাঁর থেকেই উদ্ভূত হয় এই বিশ্ব।

কৃপাময় ও মহিমময় এই ঈশ্বরকে আমরা জানব, হস্তে ধর্ম বহন ক'রে তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং পাপ দূর করেন সকল দৃঢ় আশ্রয় থেকে। আমরা তাঁকে জানব কারণ তিনি আমাদের আত্মা ও অমৃত ও জগতের প্রতিষ্ঠা।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাম্ পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভবুনেশীমভ্যম্॥ ৭॥

৭। তাঁকে আমরা যেন জানি যিনি অধীশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজার রাজা, দেবতাদের শীর্ষ ও পরম দেবতা। সকল উৎকর্ষের ঊর্ধ্বে সকল অধিপতির অধিপতি তিনি; তিনি লোকসমূহের ঈশ্বর, আমাদের কর্তব্য তাঁকে পূজা করা।

অথবা

সকল শক্তিশালীর মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালীকে আমরা জানব, তিনি সকল দেবতার শীর্ষ ও পরম দেবতা, রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু, যিনি সকল শিখর ও মহত্ত্বের অতি ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত। পরম প্রভুর কাছে আমরা জ্ঞান লাভ করব কারণ তিনি জগতের অধীশ্বর ও সকলের পূজনীয়।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যশ্চধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮॥

৮। তাঁর করণীয় কিছু নেই, কোন কর্মেন্দ্রিয়ও তাঁর নেই, তাঁর সমান এমন কেউ দেখা যায় না, তাঁর মহত্তরও কেউ নেই। সকলেরই উপর তাঁর শক্তি বিস্তৃত আর আমরা তা শুনি বিবিধ প্রকারে (অথবা, ভগবানের করা প্রয়োজন এমন কিছু নেই, কোন কর্মেন্দ্রিয়ও তাঁর নেই; তাঁর চেয়ে মহত্তর কেউ নেই আর এমন কিছু দেখি না যা তাঁর সমান-- কারণ তাঁর শক্তি বিস্তৃত সকলের উপর, শুধু লোকে ইহার কথা শোনে সহস্র নামে ও বিবিধ প্রকারে)। দেখ, তাঁর বল ও ক্রিয়া ও জ্ঞান-- এই সব স্বয়ং-প্রযোজক ও তাদের আপন কারণ ও প্রকৃতি।

ন তস্য কশ্চিৎপতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব ন তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

৯। এই সারা জগতে তাঁর কোন প্রভু নেই, তাঁর নিয়ন্তাও কেউ নেই। বস্তুতঃ তাঁর কোন লক্ষণ বা অবয়ব নেই (অথবা কোন অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য তাঁর নেই) কারণ তিনিই এই সব স্বাভাবিক করণের অধিপতিদের উৎপাদক কারণ ও অধীশ্বর, কিন্তু তাঁর কোন জনয়িতা বা অধীশ্বর নেই (অথবা, এমন কেউ নেই যে তাঁর জনক বা অধীশ্বর)।

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০ ॥

১০। মাকড়সা যেমন তার জাল বোনে আর সূতাগুলি বাহির হয় তারই নিজ দেহ থেকে, সেইরূপ একই পরমদেব যিনি ব্যতীত অন্য কিছু নেই নিজেকে দৃষ্টি থেকে আবৃত করলেন নিত্য জড় থেকে উদ্ভূত জালের মধ্যে। তিনি যেন আমাদের জন্য বিধান করেন ব্রহ্মের মধ্যে প্রয়াণ।

অথবা

মাকড়সার মতো যেমন তিনি নিজের মধ্য থেকে নির্মাণ করেন নিজের জাল, সেই রকম আবার ভগবান এক এবং তিনি ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাববশে নিজেকে আবৃত করেন আদি জড় থেকে তাঁর নিজের বোনা সব সুতা দিয়ে। সেই এক ভগবান যেন আমাদের জন্য বিধান করেন তাঁর সনাতনের মধ্যে প্রয়াণ।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১ ॥

১১। শুধু একই পরমদেব সর্বভূতের মধ্যে গূঢ়; কারণ তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, তাদের সব কর্মের অধ্যক্ষ এবং সকল প্রাণীর আবাস, মহান্ সাক্ষী, সচেতন জীবনের প্রস্রবণ কেবল, নির্গুণ।

অথবা

শুধু এক পরমদেবই বিরাজিত, এবং তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন সর্বভূতের

মধ্যে কারণ তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

আর তিনি সকল কর্মের অধ্যক্ষ এবং সকল প্রাণীর আবাস। তিনি শক্তিমান্ সাক্ষী যিনি মননের সহিত মননের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, আবার তিনি অনপেক্ষ যাঁর মধ্যে কোন বিভাব বা কোন গুণ নেই।

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম॥ ১২॥

১২। একই পরম দেব আর শুধু তিনিই এই বহুকে নিয়ন্ত্রণ করেন যাদের নিজেদের পৃথক কোন ক্রিয়া বা উদ্দেশ্য নেই; আর তিনি একটি মাত্র বীজকে পরিণত করেন নানা প্রকারের সৃষ্ট বিষয়ে; সুতরাং যে ধীরগণ নিজেদের আত্মায় আসীন রয়েছেন এমন তাঁকে দেখে তাদের জন্যই আছে শাশ্বত সুখ, অন্যদের জন্য নয় (অথবা দৃঢ়চেতা পুরুষরা পরমদেবকে দেখে নিজেদের আত্মার মধ্যে, সেজন্য তাদের জন্যই থাকে শাশ্বত সুখ, অন্যদের জন্য নয়)।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩॥

১৩। সকল অনিত্যের মধ্যে যিনি একমাত্র নিত্য, সকল চেতনার মধ্যে যিনি একমাত্র চেতনা, তিনি এক অথচ বিধান করেন বহুর বিভিন্ন সব কামনা; একমাত্র তিনিই প্রধান উৎস যেখানে সাংখ্য ও যোগ আমাদের নিয়ে যায়, যদি তুমি সেই পরম দেবকে জান, তুমি মুক্ত হবে সকল প্রকার বন্ধন থেকে।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪॥

১৪। সেখানে সূর্য কিরণ দিতে অক্ষম, আর চন্দ্রেরও দীপ্তি থাকে না; তারকারাজি নিষ্প্রভ; আমাদের বিদ্যুৎও সেখানে ঝলক দেয় না, কোন পার্থিব অগ্নিও নেই। যা কিছু ভাস্বর তা শুধু তাঁরই আভার ছায়া

এবং তাঁরই দীপ্তিতে এই সব দীপ্তিমান্।

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ সলিলে সংনিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥ ১৫॥

১৫। সত্তার এক হংস এই সমগ্র ভুবনের অন্তরে অবস্থিত আর তিনিই অগ্নি যা সলিলের অভ্যন্তরে গভীরভাবে নিবিষ্ট। এই বিদ্যার দ্বারাই অন্তঃপুরুষ অতিক্রম করে মৃত্যুর রাজ্য, আর অন্য কোন পথ নেই এই মহাযাত্রার জন্য।

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ১৬॥

১৬। তিনি সব কিছু নির্মাণ করেছেন এবং জানেনও সব কিছু, কারণ তিনিই সেই গর্ভাশয় যা থেকে আত্মা জন্মায়, এবং প্রকৃতিগুণসম্পন্ন হ'য়ে তিনি হ'য়ে ওঠেন কাল। নিত্য জড় আছে আর ইহার মধ্যে বর্তমান পরম চিৎ-পুরুষ যিনি তাঁর জড়স্থিত ক্ষেত্রকে জানেন; তিনি উভয়েরই অধিপতি, প্রকৃতির গুণসমূহের ঈশ্বর। সংসার ও সংসার থেকে মোক্ষ এবং বিষয়সমূহের স্থিতি ও তাদের সব স্থিতির বন্ধন—এই সকলেরই একমাত্র কারণ বা হেতু তিনি (অথবা, জড় তাঁর অধীন এবং মানবের অন্তঃস্থ যে চিৎ-পুরুষ তাঁর জড়ের ক্ষেত্রকে জানে সে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ তাঁর দাস। তিনি প্রকৃতি ও ইহার ক্রিয়ার শাসক, সুতরাং প্রতিভাস-সমূহের আবির্ভাবের এবং সেসব থেকে মোক্ষেরও কারণ তিনি আর তাঁর জন্যই তাদের স্থিতি এবং তাঁর জন্যই তাদের বন্ধন।)

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়॥ ১৭॥

১৭। তিনি শুধুই নিজ, কারণ তিনি হ'লেন ঈশ্বরে ব্যক্ত অমৃত, সেই জ্ঞাতা যিনি সর্বত্র গমন করেন এবং রক্ষা করেন এই ভুবনকে (অথবা, দেখ, তিনি অমৃত, কারণ তিনি নিছক অস্তিত্ব; কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে তিনি

নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন এবং হ'য়ে ওঠেন জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী যিনি রক্ষা করেন এই ভুবনকে); বস্তুতঃ তিনি এই গতিশীল জগৎকে শাসন করেন নিত্যকাল ধরে এবং মহত্ত্ব ও আধিপত্যের অন্য কোন উৎস নেই।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চপ্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

১৮। তিনি স্রষ্টা ব্রহ্মাকে নিয়োগ করেছিলেন পূর্ব থেকেই এবং বেদ পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে; সেই যে পরমদেব যিনি চিৎ-পুরুষে ও বুদ্ধিতে আত্ম-প্রকাশিত তাঁর কাছে আমি দ্রুত যাব এবং আমার মুক্তির জন্য শরণ নেব প্রভুত্বেই।

অথবা

যিনি ব্রহ্মাকে নিয়োগ করেছিলেন পূর্ব থেকেই এবং বেদ পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে, সেই যে পরমদেব যাঁর মধ্যে আত্মার বুদ্ধি দীপ্তি পায় তাতেই আমি মোক্ষকামী অচিরে শরণ লই।

নিষ্ফলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। অংশহীন, কর্মহীন, একান্তই শান্ত ও নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক তিনি, সুতরাং তিনিই একমাত্র পরম সেতু যা আমাদের নিয়ে যায় ওপারে অমৃতে, যেমন হয় যখন অগ্নি দগ্ধ করে ফেলে তার ইন্ধনকে।

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যন্তি ॥ ২০ ॥

২০। যখন মানুষরা আকাশকে গুটিয়ে ফেলবে চর্মের মতো আর গগনকে জড়িয়ে নেবে তাদের চারিদিকে পোষাকের মতো, শুধু তখনই পরমদেব ঈশ্বরের জ্ঞান বিনা জগতের দুঃখের অবসান হবে।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্॥ ২১॥

২১। তার ভক্তির বলে ও পরমদেবের প্রসাদে, তার সত্তার বীর্যের দ্বারা শ্বেতাশ্বতর ইহার পর ব্রহ্মকে জেনেছিল এবং জগজ্জীবন বর্জনকারীদের কাছে এসে সে তাদের কাছে ব্যক্ত করল সেই সর্বোত্তম ও পবিত্র পরম-দেবের কথা যাঁর আশ্রয় ঋষিকুল নেয় চিরকালধরে।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥ ২২॥

২২। ইহাই সেই বেদান্তর পরম গুহ্য কথা যা পুরাকালে প্রচারিত হ'য়েছিল; এই কথা যেন না দেওয়া হয় অশান্তচিত্ত মানবকে অথবা অনভীপুত্রকে বা শিষ্যহীনকেও যেন ইহা না দেওয়া হয়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩॥

২৩। কিন্তু পরমদেবের প্রতি যার পরম প্রেম ও ভক্তি আছে এবং যেমন পরমদেবের প্রতি তেমন গুরুর প্রতিও তা থাকে তার কাছে এই মহৎ বিষয়গুলি বলা হ'লে আপনা আপনিও তারা বিশদ হয়, বস্তুতঃ তারা ব্যক্ত হয় তার মহান আত্মার কাছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

প্রথম অধ্যায়—প্রথম খণ্ড

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত। ওমিতি ইত্যুদ্‌গায়তি তস্যোপ-
ব্যাখ্যানম্॥ ১॥

১। ওম্, এই সনাতন অক্ষরকে উপাসনা কর, ওম্ উদ্‌গীথ, সাম-বেদের গীত; কারণ 'ওম্' উচ্চারণ করেই তারা সামগান শুরু করে। আর 'ওম্'-এর ব্যাখ্যা ইহা।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ। অপামোষধয়ো
রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্রসো বাচ্ ঋগ্রস্ ঋচঃ সাম
রসঃ সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ॥ ২॥

২। এই সব ভূতের সার হ'ল পৃথিবী, আর পৃথিবীর সার হ'ল জল-রাশি; জলরাশির সার ক্ষেত্রের সব ওষধি, আর ওষধিদের সার মানুষ। মানুষের সার বাক্, বাক্-এর সার ঋগ্বেদ আর ঋকের সার সাম। সামের সার ওম্।

স এষ রসানাংরসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোহষ্টমো যদুদ্‌গীথঃ॥ ৩॥

৩। ইহা সারসমূহের অষ্টম সার আর বস্তুতঃ মৌলিক, পরতম ও বিষয়সমূহের পরার্ধের অন্তর্গত ইহা।

কতমা কতমর্ক কতমৎ কতমৎসাম কতমঃ কতম উদ্‌গীথ ইতি
বিমৃষ্টং ভবতি॥ ৪॥

৪। বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি, আর কোনটি আবার ঋক্; বিষয়-

সমূহের মধ্যে কোনটি আর কোনটি আবার সাম; বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি আর কোনটি আবার উদ্‌গীথের ওম্‌--ইহাই এখন বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাগেবর্ক্‌ প্রাণঃ সামোতিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্‌চ প্রাণশ্চর্ক্‌ চ সাম চ॥ ৫॥

৫। বাক্‌ই ঋক্‌, প্রাণবায়ু সাম; যা অক্ষয় তা-ই উদগীথের ওম্‌ দিব্য প্রেমিক ইহারা--বাক্‌ ও প্রাণবায়ু, ঋক্‌ ও সাম।

তদেতন্মিথনমোতিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্‌॥ ৬॥

৬। ইহারা প্রেমিকযুগলের মতো, আর এই সনাতন অক্ষরে তারা সংশ্লিষ্ট থাকে; কিন্তু যখন প্রেমাস্পদ ও তার প্রেমিক মিলিত হয় তখন তারা প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত করে অন্যের কামনা।

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি চ এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে॥ ৭॥

৭। সে-ই বিভিন্ন ব্যক্তির সব কামনার পরিতৃপ্তিকারী হয় যে এই জ্ঞান নিয়ে সনাতন অক্ষর ওম্‌-এর উপাসনা করে।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিং চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ এষা এব সমৃদ্ধির্যদদনুজ্ঞা। সমর্ধয়িতা হ বৈ কামানং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে॥ ৮॥

৮। এখন, এই ওম্‌ হ'ল সম্মতিসূচক অক্ষর; কারণ যে কিছুতেই কেহ সম্মতি জানালে, সে বলে ওম্‌; আর সম্মতি হ'ল সমৃদ্ধির আশীর্বচন। বস্তুতঃ সেই বিভিন্ন ব্যক্তির সব কামনার আশীর্বাদক ও সমৃদ্ধিকারক হয় যে এই জ্ঞান নিয়ে সনাতন অক্ষর ওম্‌-এর উপাসনা করে।

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্তত ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্-
গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন॥ ৯॥

৯। ওম্-এর দ্বারাই ত্রয়ী বিদ্যা প্রবর্তিত হয়, ওম্ উচ্চারণ করেই হোতা ঋক্ আবৃত্তি করে, ওম্ উচ্চারণ করেই সে যজুঃ পাঠ করে, ওম্ উচ্চারণ করেই সে সামগান করে। আর এই সবই হয় অক্ষয়ের উপচয়ের জন্য ও তাঁর মহিমা ও আনন্দময়তার দ্বারা।

তেনাভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু চাবিদ্যা
চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি
খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি॥ ১০॥

১০। যার জ্ঞান আছে সে কর্ম করে ওম্-এর দ্বারা আর সে-ও করে যার জ্ঞান নেই; কিন্তু এই দুটি, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন। যে কোন কর্মই কেহ করে বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, বেদের রহস্যের সহিত, সে কর্ম তার কাছে হ'য়ে ওঠে আরো বীর্যবান্ ও শক্তিমান্। ইহাই সনাতন অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমা-
জহ্লুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি॥ ১॥

১। দেবতারা ও অসুররা একত্র প্রতিযোগিতা করেছিল আর উভয়েই ছিল সর্বশক্তিমান্ পিতার সন্তান। ইহার পর দেবতারা উদ্গীথের ওম্‌কে নিল অস্ত্র হিসাবে, কারণ তারা বলল, "ইহার দ্বারাই আমরা অসুরদের অভিভূত করব।"

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাংচক্রিরে। তংহাসুরাঃ পাপ্মনা
বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ
বিদ্ধঃ॥ ২॥

২। নাসারন্ধ্রের প্রাণবায়ুরূপে দেবতারা ওম্-এর উপাসনা করল; কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে, সেজন্য লোকে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ উভয়ই সমানভাবে আঘ্রাণ করে। কারণ ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ পাপের দ্বারা।

অথ হৈ বাচমুদগীথমুপাসাংচক্রিরে। তাংহাসুরা পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তোভয়ং বদতি সত্যং চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা॥ ৩॥

৩। ইহার পর দেবতারা বাক্-রূপে ওম্-এর উপাসনা করল; কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে; সেজন্য লোকে সত্য ও অনৃত উভয়ই সমানভাবে বলে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ।

অথ হ চক্ষুরুদ্‌গীথমুপাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয় চাদার্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম॥ ৪॥

৪। ইহার পর দেবতারা চক্ষুরূপে ওম্-এর উপাসনা করল; কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে; সেজন্য লোকে সুদৃশ্য ও কুদৃশ্য উভয়ই সমানভাবে দেখে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ।

অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্॥ ৫॥

৫। ইহার পর দেবতারা ওম্-এর উপাসনা করল কর্ণরূপে; কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে; সেজন্য লোকে সুশ্রাব্য এবং কর্কশ ও অপ্রিয় উভয়ই সমানভাবে শোনে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ।

অথ হ মন উদ্‌গীথমুপাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবি-ধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সংকল্পয়তি সংকল্পনীয়ং চাসংকল্পনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্‌বিদ্ধম্‌॥ ৬॥

৬। ইহার পর দেবতারা উদ্‌গীথের উপাসনা করল মনরূপে কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে; সেজন্য লোকে উচিত ভাবনা ও অযথা কল্পনা উভয়ই চিন্তা করে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাংচক্রিরে। তংহাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মনমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত॥ ৭॥

৭। ইহার পর দেবতারা ওম্‌-এর উপাসনা করল মুখস্থিত প্রাণবায়ু-রূপে আর অসুররা ইহাকে সজোরে আঘাত হেনে নিজেরাই বিধ্বস্ত হ'ল; যেমন হয় যখন কোন বস্তু আঘাত দেয় সুদৃঢ় ও কঠিন প্রস্তরে আর বিধ্বস্ত হয় প্রস্তরের উপর।

এবং যথাশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাপতি স এষোঽশ্মাখণঃ॥ ৮॥

৮। আর যেমন কোন বস্তু সুদৃঢ় ও কঠিন প্রস্তরে আঘাত ক'রে নিজেই বিধ্বস্ত হয় তেমন সে-ও নিজেকে বিধ্বস্ত করে যে জ্ঞানীর অশুভ কামনা করে বা তার ক্ষতি করে; কারণ জ্ঞানী হ'ল ঐ সুদৃঢ় ও কঠিন প্রস্তর।

নৈবৈতেন সুরভি চ দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্‌প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাবদাত্যেবান্তর ইতি॥ ৯॥

৯। এই (মুখস্থিত) প্রাণবায়ুর দ্বারা কেহ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ জানে না কারণ ইহা বিগতপাপ। ইহার দ্বারা লোকে যা আহার করে বা পান

করে, তার দ্বারাই ইহা অন্য প্রাণবায়ুদের পালন করে। অন্তিমে প্রাণবায়ু না পেয়ে চিৎ-পুরুষ দেহ থেকে বাহিরে যায়; বস্তুতঃ প্রস্থানের সময় সে মুখব্যাদন করে।

তংহাঙ্গিরা উদগীথমুপাসাংচক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১০ ॥

১০। অঙ্গিরা উদ্‌গীথ ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন মুখস্থিত প্রাণ-বায়ুরূপে, কারণ লোকে মুখস্থিত প্রাণবায়ুকে মনে করে অঙ্গিরা ব'লে কারণ ইহা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রস।

তেন তংহ বৃহস্পতিরুদ্‌গীথমুপাসাংচক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্‌ধি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১ ॥

১১। অঙ্গিরার বীর্যের দ্বারা বৃহস্পতি ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন মুখস্থিত প্রাণবায়ুরূপে আর লোকে এই প্রাণবায়ুকে মনে করে বৃহস্পতি ব'লে কারণ বাক্ হ'ল বৃহতী দেবী আর প্রাণবায়ু হ'ল বাক্‌পতি।

তেন তংহায়াস্য উদ্‌গীথমুপাংসাংচক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাহ্যদয়তে ॥ ১২ ॥

১২। বৃহস্পতির বীর্যের দ্বারা আয়াস্য ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন মুখস্থিত প্রাণবায়ুরূপে আর লোকে এই প্রাণবায়ুকে মনে করে আয়াস্য বলে কারণ ইহা আসে আস্য (মুখ) থেকে।

তেন তংহ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাংচকার। স হ নৈমিশীয়ানামুদ্‌গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩ ॥

১৩। আয়াস্যের বীর্যের দ্বারা দল্‌ভপুত্র বক মুখ্য প্রাণবায়ুকে জেনে-ছিলেন। আর তিনি নৈমিশীয়াদের মধ্যে সামের উদ্‌গাতা হ'য়েছিলেন এবং তিনি তাদের জন্য তাদের সব কামনার গান করেন সে সবের পূরণ

না হওয়া পর্যন্ত।

আগাতা হ বৈ কামান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্॥ ১৪॥

১৪। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তি লোকের কামনাপূরণের গায়ক হয় যে এই জ্ঞান নিয়ে সনাতন অক্ষর উদ্গীথের ওম্-এর উপাসনা করে। আত্মা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এই পর্যন্ত।

ছান্দোগ্য প্রসঙ্গে

"ওঁমিত্যেদক্ষরং উদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং।"

"ওঁ এই অক্ষর (অক্ষর পুরুষ); তার উপাসনা করবে তাকে ঊর্ধ্বাশী সঙ্গীত (গতি) মনে ক'রে। কারণ ওঁ অবলম্বন ক'রে তাদের গান (গতি) ওঠে ঊর্ধ্বমুখে; এই তার বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই হল প্রথম বাক্য। আক্ষরিক অনুবাদে তার দুই অর্থ দেখান হলঃ বাহ্য অর্থে স্থূল রূপক এবং তার গূঢ় তাৎপর্য—যে পরম সদ্বস্তুকে রূপক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপনিষদ মাত্রেরই প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত মূল্যবান। তা এমন কৌশলে রচিত হয় যে, পরে যা বলা হবে তার সবটা না হোক, অন্ততঃ মূল প্রতিপাদ্য ও সাধারণ ভাবের একটা আভাস বা চুম্বক তাতে পাওয়া যায়। যেমন, বাজসেনীয় উপনিষদের 'ঈশাবাস্যং', তলবকারের 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ', বৃহদারণ্যকের যজ্ঞীয় অশ্ব, ঐতরেয়ের একক আত্মা ও ভবিষ্য সৃষ্টির আভাস। ছান্দোগ্যের এই আরম্ভ থেকে বোঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের জন্য সমগ্র আত্মনিয়োগ করবার যথাযথ ও সম্পূর্ণ পথ নির্দেশ করা এবং তার উপযোগী সব মনোভাব ও তার সব উপায় স্পষ্ট ক'রে বলা। বিষয়বস্তু ব্রহ্ম, কিন্তু বেদের পুণ্য অক্ষর ওঁ যাঁর প্রতীক, সেই ব্রহ্ম। সুতরাং তার প্রতিপাদ্য কেবলমাত্র সর্বময় শুদ্ধসৎ নয়, আত্মার সব অংশ বা কলা—ভূর্ভুবঃস্বঃ, জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তি, ব্যক্ত-অর্ধব্যক্ত-নিগূঢ়, সব বিভাবই তার বর্ণনীয়; সে সব লোক অধিকার করা, ভোগ করা এবং অতিক্রম করে যাবার ঠিক পথ নির্দেশ করাও ছান্দোগ্যের উদ্দেশ্য। প্রতীক হল 'অক্ষর'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের
টীকা

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

ভূমিকা

উপনিষদসমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যক যেমন ভাবের গভীরতায় শ্রেষ্ঠ তেমনি দুর্বোধ্য। বিশেষ করে, বর্তমান মনোবৃত্তি নিয়ে তার অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত দুরূহ। একে ত ভাবে ও চিন্তার ধারাতে উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে আমাদের বিস্তর ব্যবধান আছেই, তার উপর ভাষার ব্যবধান হয়েছে আরও অনেক বেশী। ভাবের গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়, দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিতে ও মনোবৃত্তির নিপুণ অনুভূতিতে এ উপনিষদ নিরতিশয় সমৃদ্ধ আর সে ভাব-প্রকাশের ভাষাও অতিমাত্রায় রূপক ও উপমাবহুল। সে সময়কার পাঠকেরা এরূপ ধ্বনি-লক্ষণাপূর্ণ ভাষাতে অভ্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদের কাছে অবশ্য এ ভাষা ভাবসম্পদের উপযুক্ত বাহন বলেই সমাদৃত হত; কিন্তু এখন তা ভাবার্থের আবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আবরণ উন্মোচন ক'রে পুরাতন বৈদিক ভাষার সরলার্থ ও তার সব ধ্বনি ও রূপকের মর্মার্থ আধুনিক যুগের পরিচিত চিন্তার সংজ্ঞাতে ভাষান্তর করাই হল এ ব্যাখ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কাজে অবশ্য বিপদ আছে। শঙ্করের ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে তার ভাব বর্তমান যুগের বোধগম্য আকারে প্রকাশ করা সহজ হত। তা ভ্রমাত্মক হলেও এত বড় বিশ্বমান্য পণ্ডিত সাথী বলে সে-ভুলে কিছু এসে যেত না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ যুগের মানবের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এবং সত্যের অনুরোধে পুরাতন বেদান্তের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে হবে, মধ্যযুগের এই মনীষীর প্রবর্তিত সে-জ্ঞানের একদেশদর্শী সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে জীয়িয়ে রাখলে চলবে না। এযুগের প্রশংসায় পৃথুকীর্তি শঙ্করাচার্যের মর্যাদা বাড়বে না বা এ-যুগের মতদ্বৈধে তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মধ্যে সহজেই তাঁর স্থান সর্বাগ্রে, দর্শনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী তিনি; তাঁর ব্যাখ্যাতে উপনিষদের ঋষিদের চিন্তার ধারার সঙ্গে আমাদের সংযোগের উপায় ক'রে দিয়ে তিনি জাতির অভাবনীয় উপকার করেছেন। অজ্ঞান ও তামসিকতার বশে বেদকে আমরা বহুশতাব্দী ধরে কার্যতঃ বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়ে রেখেছিলাম—এখন দুঃসাহসী অনুমানদক্ষ পাশ্চাত্য

পণ্ডিতেরা রূঢ় হস্তে তাকে উদ্ধার করেছে। শঙ্করের ব্যাখ্যাই সেরূপ বিস্মৃতির হাত থেকে উপনিষদগুলিকে রক্ষা করেছে। তাতে প্রাচীন কালের এই সব সুমহান ভাব ও মহার্ঘ আধ্যাত্মিক রত্নের মণিকোষ অদ্বৈতবাদের মন্দিরে সুরক্ষিত হয়েছে; তা অবশ্য পিছনে সরে গেছে, বেশ একটু অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়েছে কিন্তু তাকে বর্তমান পাণ্ডিত্যের অব্যবস্থিত উদ্ভাবন-চাতুর্য ও কালাপাহাড়ীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য, শঙ্করের ব্যাখ্যা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে উপনিষদের তত্ত্বের উপর আলোকপাত করে বলে ততটা নয় যতটা মূল বিষয় ছেড়ে তাঁর নিজের দার্শনিক মত আলোচনার জন্য। শঙ্করের বিচারবুদ্ধি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ কিন্তু তার্কিকসুলভ প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিযুক্ততার প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী; এদিকে সব উপনিষদেরই বৈশিষ্ট্য হল গুহ্যতত্ত্বের অনুভবমূলক, প্রতীক এবং লক্ষণাবহুল, অস্ফুটার্থ ও সাবলীল ভাবপ্রবাহ—আর তা চরমে উঠেছে বৃহদারণ্যকে। কাজেই শঙ্কর তার মধ্যে বেশী দূর প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি অনেক করেছেন, এমন ভিন্নশ্রেণীর মেধার পক্ষে আশ্চর্য নিপুণতা ও তৎপরতা দেখিয়েছেন; কিন্তু আরও বেশী করা এখন সম্ভব ও প্রয়োজন। অতি সত্বর এমন দিন আসবে যখন মানুষের বুদ্ধি বিশ্বের বিরাট জটিলতা অনুধাবন করবে, বুঝবে তাতে সরু মোটা কত তারে জড়িয়ে আছে; এবং শিক্ষা নিতে বেশী উৎসুক হবে, তর্ক করতে বা বিধান দিতে কম চাইবে। তখন আমরা প্রাচীন জ্ঞানের আকর এই সব পুস্তক অধ্যয়ন ক'রে, তাতে কি আছে শ্রদ্ধাভরে তা-ই জানতে চাইব, আমাদের বিদ্যা তাদের উপর আরোপ করব না বা দার্শনিক বিতণ্ডা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার করব না। নিস্পন্দ হয়ে প্রাচীন ঋষিদের সব ভাবের মধ্যে প্রবেশ করা, তাঁদের সব বাণী সত্তার অন্তরে নিমজ্জিত হতে দেওয়া, আমাদের অন্তরাত্মাকে সেই ছাঁচে ঢেলে নিজেকে গড়ে নিতে দেওয়া, যাতে অনুকূল সুবেদী উপাদানে সে-সব তাদের প্রতিস্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে,—এক কথায় শ্রুতির অনুগত হওয়া,—প্রাচীন মতে এই ছিল বেদবিদ্যা-লাভের উপায়। "গিরামুপশ্রুতিং চর স্তোমমভিস্বর অভিগৃণীহি আরুব।"* আত্মার গহনে সব পুরাতন ধ্বনি শোনা, আত্মার অন্তরের শ্রুতিকে তাতে

*সত্যবাণীসমূহের অন্তরঙ্গ শ্রোতা হও, উচ্চারিত মন্ত্রের (উত্তর দাও) প্রতিধ্বনি কর, ব্যক্ত কর, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর। ঋগ্বেদ ১।১০।৩৪।

সাড়া দিতে দেওয়া, সে ছন্দে স্পন্দিত হওয়া——প্রথম, অস্পষ্টভাবে বেদান্ত জ্ঞানের বাচক সব শ্লোকের শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি ও প্রতিস্পন্দন জাগিয়ে তোলা এবং পরে, সে-প্রতিস্পন্দনের স্পষ্টতা তীব্রতা ও পরিপূর্ণতা বাড়তে দেওয়া,——ব্যাখ্যার জন্য এই পথ আমি অনুসরণ করেছি। হয়ত মর-মিয়ার অনুভবের এই পথ রহস্যাবৃত কিন্তু তা ব'লে পণ্ডিত বা তর্ক-বাগীশের সমানভাবেই ব্যক্তিগত সব দৃঢ়সংস্কারের চেয়ে তা কোনক্রমে কম গ্রহণযোগ্য নয়। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে, সত্যের কোন আন্তর অনুভূতি যেখানে মূলের উপর আলোকপাত করে না, সেখানে উপনিষদের শব্দ অবিকৃতভাবে গ্রহণ ক'রে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও সহজবুদ্ধির উপর নির্ভর করেছি। যেহেতু উপনিষদের ব্যাখ্যাতে, বেদান্তের উপর ভাবক বা রহস্য-বাদ আরোপ করবার অপবাদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, সহজবুদ্ধির উপর নির্ভর করাই সমীচীন মনে করি; কারণ, প্রাচীন বৈদান্তিকদের আমি রহস্যবাদী মিস্‌টিকই বলি। অবশ্য, তাঁদের চিন্তা অনিশ্চিত, সংহতিহীন বা কল্পনা-বিলাসী ছিল না কিন্তু বোধিলব্ধ সত্যকে তাঁরা রূপক চিত্রে প্রকাশ করতেন, বিশ্বজগতে তাঁরা দেখতেন চেতনার প্রকাশ, জড়পদার্থে ও শক্তিতে দেখতেন ক্রমশঃ গভীরতর সদ্বস্তুর প্রতীক ও ছায়া। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব সবিস্তারে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় আর অল্প পরিসরের মধ্যে তা সম্ভবপরও নয়। আমার ইচ্ছা, তার ভাষাতে অনুস্যূত এবং তার উপমা-রূপকে অবগুণ্ঠিত রয়েছে যে-সব ভাব সে-সব সম্পূর্ণ বিশদ-ভাবে বুঝবার জন্য যতটা অবশ্যপ্রয়োজন সেই পরিমাণে তাদের বিস্তার করা। আমার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ভিত্তি স্থাপন করা মাত্র, ভবিষ্যতের সুধীরা তার উপর হর্ম্য নির্মাণ করবেন।

কোন ভণিতা না করে' এ উপনিষদের আরম্ভ হল অশ্বমেধের অশ্বের প্রচণ্ড রূপক দিয়ে।

ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নি-র্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষম্ উদরং পৃথিবী পাজস্যং দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবঃ অঙ্গানি মাসাশ্চার্ধ-মাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমানি উদ্যন্ পূর্বার্ধো নিম্লোচং জঘনার্ধো যদ্বিজৃম্ভতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধূনুতে- তৎ স্তনয়তি যন্ মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্। ১

অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমানুজায়ত তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমানুজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সম্বভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্‌বাজী গন্ধর্বানর্বাহসুরানশ্বো মনুষ্যান্। সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ। ২

"উষা এই যজ্ঞীয় অশ্বের শির। সূর্য তার চক্ষু, বায়ু তার প্রাণ (নিঃশ্বাস), বৈশ্বানর অগ্নি বা সার্বজনীন প্রৈতির তেজ তার বিবৃত মুখ, আবর্তনশীল কাল-চক্র বা সম্বৎসর যজ্ঞীয় অশ্বের আত্মা। স্বর্গ তার পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ তার উদর, পৃথিবী তার পদচতুষ্টয়, চতুর্দিক তার পার্শ্বদেশ, অপর অবান্তরদিক সব তার পঞ্জরাস্থি; ঋতুসব তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাস ও পক্ষ তার দেহসন্ধি, অহোরাত্র তার প্রতিষ্ঠা বা পাদপীঠ, সব নক্ষত্র তার অস্থি, নভঃস্থল তার দেহের মাংস। সৈকত তার উদরস্থ (অর্ধজীর্ণ) অন্ন, নদীসব তার শিরা, পর্বতসব তার যকৃৎ ও শ্বাসযন্ত্র, ওষধি ও বনস্পতি তার দেহের রোমরাজি; উদীয়মান দিবাকর তার পূর্বার্ধ এবং অস্তগামী দিবাকর তার পশ্চার্ধ। তার বিজৃম্ভনে বা দেহবিস্তারে হয় বিদ্যুৎস্ফুরণ, তার দেহসঞ্চালনে হয় মেঘগর্জ্জন, তার মূত্রত্যাগে হয় বৃষ্টি। বাক্য ত তারই ধ্বনি।

"ধাবমান এই অশ্বের সম্মুখে যে মহিমা জন্মেছিল সেই দিবা, তার জন্মস্থান পূর্ব-সমুদ্র; তার পশ্চাতে যে মহিমা জন্মেছিল সেই রাত্রি, তার জন্মস্থান পশ্চিমসমুদ্র। এই দুই মহিমা তার দুই পার্শ্বে সম্ভূত হয়েছিল। সে-ই হয় হয়ে দেবতাদের বহন করেছিল, বাজী হয়ে গন্ধর্বদের, অর্বা হয়ে অসুরদের আর অশ্ব হয়ে মানবদের বহন করেছিল। সমুদ্রই তার বন্ধু বা সহোদর, সমুদ্রই তার জন্মস্থান।"

কি বিরাট রূপকে পূর্ণ এই বাক্য; এই হল এ উপনিষদের মূল সূত্র আর এ রূপকের অর্থভেদ করতে না পারলে আমরা তার বহুপ্রাসাদে সমৃদ্ধ বৈদান্তিক চিন্তার পুরীতে প্রবেশের অধিকার পাব না। উপনিষদের ভাষাতে শুদ্ধমাত্র অলঙ্কার বা কবিত্ব বলে কিছু নাই। এই বাক্যকে প্রথম দৃষ্টিতে উপমা-রূপকে পূর্ণ মনে হলেও তার প্রত্যেক চিত্রনির্বাচনেই একটা বিশেষ মর্মজ্ঞ দৃষ্টির ও নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের প্রমাণ রয়েছে। লেখকের অবাধ কল্পনার উপর তা নির্ভর করে না, বেদান্তের প্রথম যুগের ব্রহ্ম-বিদ্যার সব সাধারণ ভাব থেকেই তার রূপ এসেছে। সৌভাগ্যবশতঃ বৈদিক যজ্ঞ-সম্বন্ধে এই উপনিষদের অভিমতও তার এই প্রথম উক্তি

থেকেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার বোঝা যায়। এ অভিযোগ কেহ আর করতে পারবে না যে, আমরা আদিম যুগের চিন্তার উপর বর্তমান যুগের সব সূক্ষ্মভাব আরোপ করেছি বা বর্বরোচিত কুসংস্কারের স্থলে সুসভ্য ভাবুকতা বসিয়েছি। দেখব যে, অশ্বমেধযজ্ঞকে একটা মহৎ আধ্যাত্মিক প্রগতির, বা ক্রমবিবর্তনের ধারাতে প্রায় যেন স্থূলশক্তির অধীনতা থেকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যে উন্নতির, প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে। লেখকের কাছে অশ্বমেধের অশ্ব, বীজগণিতের চিহ্নের মতই, অজ্ঞাত কোন বল এবং বেগের সংকেত বই নয়। রূপক চিত্র যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই মনে হয় যে, সে-বল সে-বেগ বিশ্বব্যাপী কিছু, সার্বজনীন কোন বস্তু; তার সত্তা দিয়ে সে সমস্ত দিগন্ত পূর্ণ করে, কাল ব্যাপ্ত করে, মহাকাশের মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়ে তার গতিভরে দেব-মানব-অসুরদের নিয়ে চলে। নিখিল-বিশ্বরূপী সে অশ্ব, সেই আবার যজ্ঞীয় অশ্ব।

অশ্ব শব্দটি প্রথম নেওয়া যাক, দেখা যাক তার অর্থ বিচার ক'রে এ রূপকের রহস্যভেদের কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না। কারণ, আমরা জানি যে, প্রথম যুগের বৈদান্তিকেরা শব্দের ব্যক্ত ও নিহিত অর্থ, বাচ্যার্থ ও ধ্বন্যর্থ, দুইয়ের উপরই অত্যন্ত জোর দিতেন এবং এই পথ অনুসরণ না করলে তাঁদের মনে আনুষঙ্গিক যে-সব ভাব ছিল তাতে প্রবেশ করবার আশা করা বৃথা। তথাপি, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসাভাসা জ্ঞানও যাদের আছে তারা বেশ জানে যে, আমাদের চিন্তা—এমন কি, যেসব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা আমরা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে করতে চেষ্টা করি সে-সবও আনুষঙ্গিক সংস্কারের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়, এমনকি কত সময় নিরূপিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ বেদ ব্যাখ্যা করতে যে-প্রথা অবলম্বন করেছেন তার প্রয়োগ অবশ্য একটু অতিমাত্রায় হয়েছে এবং প্রাচীন আর্য-ঋষিদের মনোবৃত্তি পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা না ক'রে অনেক সময় আধুনিক ভারতের মনীষীদের মনোবৃত্তি তাতে আরোপ করা হয়েছে; তথাপি উপ-নিষদের ব্যাখ্যাতে এই প্রথমযুগের বৈদান্তিকেরা সেই প্রথাই মূলতঃ অনু-মোদন করতেন। এখন, ঘোটক অর্থে ব্যবহৃত হবার পূর্বে অবশ্যই অশ্ব শব্দের দ্বারা সামর্থ্য বা দ্রুতগতি, হয়ত দুই-ই, সূচিত হত। তার আদিম বা ধাতুগত অর্থ হল ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করা, আর তা থেকে এল অধিকার করা, লাভ করা, পাওয়া, ভোগ করা। এ হল গ্রীক ভাষার echo (পুরাতন রীতিতে asha), 'আমার আছে' এই অর্থে অতি সাধারণ কথা। আহার

করা এবং ভোগ করা অর্থও তার হয় এবং তা আরও বেশী প্রচলিত। ধাতুগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত এই সাধারণ মূল অর্থ ছাড়াও, অশ্ব শব্দের একটা নিজস্ব অর্থ আছে——সবলে অবস্থিতি, সামর্থ্য, দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণধার, দ্রুতগতি, যেমন অশন, অশ্ম (প্রস্তর), অশনি (বজ্র), অশ্রি (তীক্ষ্ণধার বা কোণ, লাটিন ভাষায় acer, acris ধারাল, acus সূক্ষ্মাগ্র); পরিশেষে, অশ্ব, বলবান দ্রুতগামী ঘোটক। সুতরাং ব্যাপিত্ব, ভোগ, বল, দৃঢ়তা, দ্রুতগতি এইসব হল তার মৌলিক অর্থ। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, ঋষিদের কাছে অশ্ব শব্দের অর্থ ছিল বল-বীর্য-দৃঢ়তা-দ্রুতগতি-ভোগ দিয়ে গড়া যে-অজ্ঞাত শক্তি জড়জগৎ ব্যেপে, তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এবং তার উপাদানরূপে অবস্থিত রয়েছে?

কিন্তু একটা বিপদ আছে——কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি আমাদের বিপথে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সব পরীক্ষা করে নিতে হবে এই রূপক-ব্যাখ্যানের চিত্রগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে। সে-অনুসন্ধান আরম্ভ করবার পূর্বে একটা কথা স্মরণ রাখা ভাল যে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভেই উপনিষদের ঋষি অশ্ব থেকে একেবারে 'অশনায়া মৃত্যু', মৃত্যুরূপী ক্ষুধাতে চলে গেছেন আর এই মৃত্যুরূপী ক্ষুধাকেই যে-শক্তি এই স্থূল বিশ্বের বিন্যাস ও পরিণতি——আধুনিক ভাষায়, ক্রম-বিবর্তন——সাধন করেছে তার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম, এমন কি, প্রকৃতি বলে নির্দেশ করেছেন।

ঊষা এই যজ্ঞীয় অশ্বের শির, বলছেন ঋষি। এখন শির হল সামনের দিক আমাদের যে-অঙ্গ বিশ্বের অভিমুখী হয়, তার উপর দৃষ্টিপাত করে; আর বিশ্বরূপী অশ্বের সেই অঙ্গ হল ঊষা। সুতরাং এদেবী নিশ্চয়ই পরমপুরুষের দৃষ্টিতে বিশ্বের প্রথম উন্মীলনের প্রতীক; কারণ, দিবা যেমন প্রবৃত্তির বা কর্মের কালের আর রাত্রি নিবৃত্তি বা নিষ্ক্রিয়তার কালের প্রতীক তেমনি ঊষার তাৎপর্য হল নিয়মিত বিশ্বক্রিয়ার প্রথম সূত্রপাত, তা অপূর্ণ হলেও সবসৃষ্টির বীজ তার আছে গর্ভে। এ হল পরমপুরুষের সম্মুখে আগমন, সুতরাং যে-বিশ্বে তিনি অবস্থিত তাকে নিরীক্ষণের ইচ্ছা, এবং নিদ্রাভঙ্গে সে-বিশ্বের জন্য উতলা হওয়া, তার উপর দৃষ্টি প্রসারিত করা এবং সে দৃষ্টির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল জগতের অধিকার লাভ করবার বাসনা জাগা। 'উষস্' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল অভিব্যক্ত সত্তাতে পরিণত হওয়া; অভিলাষ বা উতলা হওয়া অর্থও তার হতে পারে।

প্রাচীন মনীষীদের কাছে 'উষস্' বা গোধূলি ছিল অস্তিত্বের অভিব্যক্তির প্রবেগ, যা আর অব্যক্তের গভীরে একটা অস্পষ্ট স্পন্দন মাত্র নাই, যা ব্যঞ্জনোন্মুখ হয়েছে বা বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে এবং যা অভিব্যক্তিসাধনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের বিচার্য গ্রন্থ ভাবকের রহস্যচিত্রে পূর্ণ, স্থূলতম জড় পদার্থের মধ্যেও চেতসিক ও তাত্ত্বিক সব সত্যদর্শন নিয়ে সে পুস্তকের আরম্ভ; সুতরাং তার ব্যাখ্যা করতে বসে আমরা যদি ভাবকতাকে ভয় করি তাহলে তার সব অর্থ হারিয়ে ফেলব।

সূর্য এই বৃহৎ শক্তির চক্ষু, বায়ু তার নিঃশ্বাস বা প্রাণশক্তি, অগ্নি তার বিবৃত আনন। এসব আমাদের অতি পরিচিত চিত্র। এসবে আবার ফিরে আসতে হবে বটে কিন্তু এদের বাহ্যপ্রয়োগ বিশদ ও সহজবোধ্য। এই একটি চিত্রই এ রূপকের রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট, তবে সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র এই চিত্রটিকে নিলে আমাদের ভ্রম আসতে পারে যে, বিশ্বরূপী অশ্ব জড়বিশ্বের প্রতিরূপ, জড়ের এবং জড়ক্ষেত্রে যে-সব গতি বা সঞ্চলন নিয়ে বর্তমান জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত কেবলমাত্র তারই প্রতীক। কিন্তু তার পরের চিত্রই এ উপপথ দিয়ে জড়বাদে উপস্থিত হবার সম্ভাবনা থেকে আমাদের রক্ষা করে। আবর্তনশীল কাল এই যজ্ঞীয় অশ্বের আত্মা। আত্মা শব্দের দেহ বা উপাদান অর্থও প্রচলিত আছে, পরের অধ্যায়েই সে অর্থে এশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আমার মনে হয় যে, এখানেও এশব্দ সেই অর্থে নেওয়া উচিত। এই বাক্যাংশ ত অমনই প্রণিধানযোগ্য আর এঅর্থ নিলে তার তাৎপর্য আরও আশ্চর্য ও গভীর ভাবদীপ্ত হয়। সুতরাং, স্থূল জগতে যে-শক্তির চক্ষু হল সূর্য আর নিঃশ্বাস হল বায়ু, তার দেহ কোন জড় পদার্থ নয়, তা হল কাল, একটা মানসিক ব্যাপার। তাহলে কি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, ঋষি জড়পদার্থের স্বরূপ-জড়ত্ব অস্বীকার করছেন? হাক্স্লী যেমন মেনে নিয়েছেন যে, জড় চেতনার একটা অবস্থা—এ ঋষিও কি তাই বলছেন? দেখব পরে। তবে, ইতিমধ্যেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আমরা পূর্বেই যেমন মনে করেছিলাম, এই অশ্ব হল যে-শক্তি জড় জগতে অভিব্যাপ্ত হয়ে তার উপাদানরূপে অবস্থিত তার প্রতিরূপ, শুদ্ধমাত্র জড় পদার্থ বা জড়ীয় শক্তির প্রতীক নয়। আর এই চিত্র থেকে প্রকৃত কালের একটা ধারণা করতে পারি, বুঝি যে, সে-ও একটা অজ্ঞাত শক্তি, কারণ কাল সে অশ্বের দেহ বা আত্মা আর

সে বস্তুও অজ্ঞাত। যে-সদ্বস্তু তার দেহস্বরূপ কালের মধ্য দিয়ে নিজেকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করেও জ্ঞানের অতীত থাকে, সে-ই অবশ্য অজ্ঞাত ভগবান; মানুষ চিরকাল তা-ই অনুভব করে এসেছে।

এর ঠিক পরেই যেসব চিত্র এসেছে তাতে দেখি কালের ধারণার উপর দেশের ধারণা যোগ করা হয়েছে, এ অশ্বের সত্তার উপাদানরূপে দেশকাল উভয়কেই পাশাপাশি ধরা হয়েছে। কারণ, 'নভঃস্থল তার দেহের মাংস, দিক সব তার পার্শ্ব আর অবান্তর দিক তার পঞ্জরের অস্থি'। নভস্ হল ঊর্ধ্বের আকাশ যেখানে সব নক্ষত্র স্থাপিত হয়েছে আর সেই সব নক্ষত্রই, দৃঢ়-সংহত ঘনীভূত সেই মণ্ডলই, তার অস্থি, তার মাংসের অবলম্বন, তার সাহায্যেই প্রাণ এই অনন্ত দেশে জড়ের মধ্যে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত করেছে। কিন্তু দেশের ছবির পাশেই আবার রয়েছে ঋতুর উল্লেখ, যাতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্বোধ থেকে দেশকালের অবিচ্ছেদ্যতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে। আমাদের কাছে সূর্য ও নক্ষত্রের গতির দ্বারা নিয়মিত ঋতু হল তার পার্শ্বদেশ আর সে অশ্ব দাঁড়ায় কালের চান্দ্রবিভাগ, মাস অর্ধমাসের উপর।

সুতরাং বিশ্বরূপ অশ্বের ঋষিনির্দিষ্ট কালময় দেহকে স্থূলে আকার দেবার মাংস হল দেশ, দেশে গতির দ্বারাই কালের আবর্তনচক্র নিরূপিত ও নির্ধারিত হয়। সুতরাং বারবার আমরা এ অশ্বের সমগ্র ধারণাতে ফিরে আসছিঃ জড়ের প্রতিরূপ সে নয়, জড়াতীত অজ্ঞাত শক্তির জড়াতীত প্রকৃত-স্বরূপের প্রতীকও সে নয়, সে হল সেই শক্তিরই স্থূলভাবে ক্রিয়ার, প্রায় যেন বিশ্ব ব্যেপে তার উপাদানস্বরূপ হয়ে জড়ে আত্মপ্রকাশের প্রতীক। কাল তার দেহ, তবে সে হল সম্বৎসর কাল, দেশে গতির দ্বারা নিরূপিত কালের আবর্তনচক্র, স্বরূপ কাল নয়।

উপরন্তু, সুবিন্যস্ত বিশ্বে সে-শক্তি যে নিজেকে প্রতিরূপিত করে এ হল সেই চিত্র; এ অশ্ব বিশ্বরূপী। কারণ, পাই, 'স্বর্গ তার পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ তার উদর, পৃথিবী তার চতুষ্পদ', পাজস্যং---যে চারপায়ের উপর সে দাঁড়ায়। বিশ্বসম্বন্ধে প্রাচীন ঋষির ধারণার সঙ্গে যেন আমাদের বর্তমান ধারণাকে গুলিয়ে না ফেলি সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের কাছে স্থূল জড়বিশ্ব ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই; আমরা জানি শুধু অন্নময় জগৎ---এই পৃথিবী, এই চন্দ্র, এই সূর্য ও তার সব গ্রহ, এই অসংখ্য তারকা যার প্রত্যেকটাই এক একটা সূর্য, আর তাদের প্রত্যেকটির নিজস্ব

মণ্ডল। কিন্তু বৈদান্তিক মনীষীদের কাছে বিশ্ব বা ব্যক্তব্রহ্ম ছিল নানা জগতের মধ্যে জগতের সুসঙ্গত সন্নিবেশ; তাঁরা আমাদের আকাশের মধ্যে তারই সঙ্গে শৃঙ্খলিত আর এক আকাশ দেখতেন, আমাদের কালের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু পৃথক আর এক কালের কথা তাঁরা জানতেন। এই পৃথিবী ছিল 'ভূর্'। আধ্যাত্মিক সত্তাতে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আকাশে বা অন্তরীক্ষে আরোহণ ক'রে তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরা অপর এক সপ্তপর্ব ভূমির সংস্পর্শে এসেছেন। আর এখানে যেমন প্রধান তত্ত্ব হল স্থূল জড় বা ক্ষিতিতত্ত্ব, সেখানে তেমনি প্রধান তত্ত্ব হল স্নায়বিক বা জীবনীশক্তি, না হয়, মনস্, তবে এখানেও তা জড় ও জীবনীশক্তির উপর আশ্রিত; সে-সর্ব লোককে তাঁরা বলতেন 'ভুবঃ'। আর, এই বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে, ব্যোম-শূন্যে উঠে তাঁরা মনে করতেন যে, আরো সব লোক অবগত হলেন; সেসবকে তাঁরা 'স্বর্' বা স্বর্গলোক বলতেন। সেখানে আবার অস্তিত্বের মাধ্যম ও নিয়ন্ত্রী শক্তি হল মন; আর সেখানে মন স্বাধীন, প্রফুল্ল,—জড় ও স্নায়ুচালিত যে-জগৎ তার নিজস্ব নয় তার উপর নিজের প্রভুত্বস্থাপনের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। এই সব ধারণা স্মরণ রাখলে উপরে উদ্ধৃত বাক্যের সব প্রতীকের সন্নিবেশপারম্পর্যের হেতু আমরা সহজেই বুঝতে পারব। স্বর্গ এ অশ্বের পৃষ্ঠ, কারণ আমরা মনের উপরেই অবস্থিত, মনই দেবতা গন্ধ অসুর ও মানুষকে ধারণ করে। অন্তরীক্ষ তার উদর, কারণ জীবনীশক্তিই ক্ষুধিত হয়, গ্রাস করে, চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়ে সব দ্রব্য গ্রহণ ক'রে নিজের ভক্ষ্যে পরিণত করে। পৃথিবী পাজস্যং বা পদচতুষ্টয়, কারণ জড় বা বাহ্য বিগ্রহই হল প্রাণ মন ও অপর সব ঊর্ধ্বতর শক্তির অভিব্যক্তির মূল আধার। জড়তত্ত্বের উপরেই আমাদের স্থিতি, আমাদের দৃঢ় আসন, জড় থেকেই আমরা সার্থকতার সন্ধানে অধ্যাত্মসত্তাতে অধিরোহণ করি।

তারপর আবার অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বের ও দূরের এই সব নির্দেশের সাথে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, এ অশ্ব জড়ে অভিব্যজ্যমান শক্তির প্রতীক, এ রূপকের সার মর্মই হল জড়ে তার অভিব্যক্তি। ব্যবহৃত উপমার বস্তু সবই প্রায় অতিস্থূল জড়ীয় পদার্থ। তার মধ্যে কতকগুলি আবার সাধকের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ সে-সবের মধ্যে যোগের কতকগুলি অস্ফুট কিন্তু অতিসাধারণ ব্যাপারের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। নদীসৈকতকে বলা হয়েছে অশ্বের জঠরে অজীর্ণ অন্ন—সে মৃত্তিকা

পাকক্রিয়ার ফলে এখনও দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় নাই বা প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্টরূপে সংহত হয় নাই। পৃথিবীর সব কাজের জন্য জল বা জীবনশোণিত সর্বত্র পরিবেশন করে নদী, সে তার ধমনী। পর্বত তার তুঙ্গ শিখরে বিরল বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে আমাদের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং জলপ্রবাহ উৎপাদন ক'রে জীবনযাত্রার সব ক্রিয়ার আশ্রয় দেয়, সে-সব তার শ্বাসযন্ত্র ও যকৃৎ। ওষধি ও বনস্পতি মাটির রস থেকে উদ্ভূত হয়, সে-সব তার রোমরাজি––দেহের আবরণ ও পরিচ্ছদ। এ-সবই বেশ স্পষ্ট, নিছক বাইরের কথা বলাই এখানে অভিপ্রেত। কিন্তু তারপর ঋষি বাইরের ব্যাপার ছেড়ে অশ্বের শক্তির বিষয় অবতারণা করলেন। তার কতকগুলি আবার জড়ীয় শক্তি–– মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি। 'তার বিজৃম্ভনে বা দেহ প্রসারিত করাতে হয় বিদ্যুৎস্ফুরণ, তার দেহসঞ্চালনে হয় মেঘগর্জন, তার মূত্রত্যাগে হয় বৃষ্টি।' 'বিজৃম্ভতে', আতিশয্যে নিজেকে প্রসারিত করে, দৈহিক বল ও আয়তনের প্রকৃষ্টতম প্রয়োগ করে; 'বিধূনুতে', শক্তির প্রবাহে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করে, তার সমগ্র দেহকে বল ও বেগে রূপান্তরিত করে; এই শব্দদুটিই প্রচণ্ডবিক্রম ও তীব্রবেগ সূচনা করে আর এই রূপকের সহযোগে তাদের অতি গভীর অর্থ এসেছে। যোগের সাধক মাত্রেই অবিলম্বে বুঝতে পারবে যে, জাগ্রত অবস্থাতে একাগ্রতা, গভীর মনন ও অপর সব আন্তর ক্রিয়ার প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির সঙ্গে যে-সব বৈদ্যুতিক বাহ্য ব্যাপার দৃষ্ট বা অনুভূত হয় এখানে তার উল্লেখ করা হল। বিদ্যুৎ হল জ্ঞানের সব ক্রিয়ার স্থূল-প্রতীক, মাধ্যম ও আশ্রয়––'সর্বাণি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি',* সবই বিজ্ঞানের দ্বারা বিজৃম্ভিত। মেঘধ্বনিও যোগীর পরিচিত, যোগে একাগ্রতার ফলে যে বিশেষ ধ্বনি শোনা যায়, ক্ষাত্রতেজের তা প্রতীক এবং স্থূলতঃ এ হল কর্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্যে শক্তির সমাহৃতির লক্ষণ। সুতরাং প্রথমটি হল জ্ঞানের জড়ে আত্মপ্রকাশের চিত্র, দ্বিতীয়টি হল শক্তির জড়ে আত্মপ্রকাশের চিত্র। তারপর, বৃষ্টির চিত্রের দ্বারা আভাস দেওয়া হল যে, তার দেহের জীর্ণশেষ মূত্রপুরীষ থেকেই এই বিরাট শক্তি জগৎকে ফলপ্রসূ ক'রে তার সৃষ্ট সংখ্যাতীত জীবজাতির ভরণপোষণের সংস্থান করতে পারে। বাক্ ত তারই ধ্বনি––'বাগেবাস্যবাক্'; নির্দিষ্ট ভাব ও অর্থযুক্ত বাক্য সেই

* বিষ্ণুপুরাণ

বহুবিচিত্রবলশালী যজ্ঞীয় অশ্বেরই হ্রেষারব, তার দ্বারাই জড়ে অধিষ্ঠিত এই বিরাট শক্তি তার সব চিন্তা-আবেগ-আকুলতার স্পন্দন স্থূলভাবে প্রকাশ করে, সে-সবই তার অন্তরস্থ, গুহাহিত, নিগূঢ় সার্বজনীন অগ্নির দর্শন-গ্রাহ্য স্ফুলিঙ্গ।

কিন্তু ঋষি চান যেন আমরা স্মরণে রাখি যে, এ অশ্বের প্রকৃত সব শক্তি, অদ্ভুত সব মৌলিক মাহাত্ম্য, স্থূল বা জড়ীয় নয়। তাহলে কি সে-সব? তাদের প্রতীক হল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, দিবারাত্রি,—দেশের মান নয় কালের মান। কাল হল সার্বজনীন মনের একটা রহস্যপূর্ণ বিশেষ অবস্থা কেবলমাত্র যার দ্বারাই জগৎকে দেশে সুবিন্যস্ত করা সম্ভবপর হয়েছে, যদিও জড়ের সঙ্গে তার বিশিষ্ট সম্বন্ধ জড়ীয় ব্যাপার ও ঘটনার দ্বারাই নির্ণীত হয়; কারণ স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম ও অনন্ত বলে তাকে স্থূলতঃ পরিমাপ করবার কোন নিজস্ব উপায় পাওয়া যায় না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু, সম্মুখ ও পশ্চাৎ, হল অশ্বদেহের অঙ্গ বা স্থূলজড়ে প্রকাশিত কালের দেহাংশ। কিন্তু ঋষি দিবারাত্রির গভীরতর অর্থ করেছেন। দিবা হল সৃষ্টির, স্থূল বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির, ব্যক্ত অথবা মূলতঃ সৎ বা অনন্ত সত্তাতে অস্তিত্বের প্রতীক; রাত্রি হল প্রলয়ের, সে-সবের অব্যক্তে নিত্য বিলুপ্তির অথবা পরিশেষে অসৎ বা সত্তার অত্যন্তাভাবের আনন্ত্যের মধ্যে অবলুপ্তির প্রতীক। সে-সবের আবির্ভাব হয় এই বিশ্বরূপী অশ্বের প্রবল গতিবেগ অনুসারে—'অনুজায়ত'। অথবা উপনিষদের আক্ষরিক অনুবাদ না ক'রে তার ভাব ও ভাষার রীতি অনুসরণ ক'রে বলা যেতে পারে—সে-অশ্ব যখন বল্গিত গতিতে দ্রুত ধাবিত হয় তখন অশ্বের সম্মুখে যে-মহিমা আবির্ভূত হয় সেই দিবা, তার পশ্চাতে রাত্রি; এই কালপুরুষ, Zeit Geist, এই প্রকাশাত্মক মহিমা যার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরান বা যার কাছে উপস্থিত হন তারই অভিব্যক্তি হয়—অথবা, আমরা যেমন বলি, উদ্ভব হয়; আর যার কাছে থেকেই তিনি সরে যান বা যাকে তিনি পরিত্যাগ করেন তারই অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়—বা, আমরা যেমন বলি, বিনাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুই বিনষ্ট হয় না, কারণ 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ',* যা আছে তার বিনাশ হতে পারে না; কিন্তু সে-সবের আর আবির্ভাব হয় না, তাঁর চেতনা থেকে প্রত্যাখ্যানের অন্ধকারে সে-সব

* গীতা, ২।১৬

লুপ্ত হয়ে যায়, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চের পক্ষে সে-সবের কোন অস্তিত্ব থাকে না। পরব্রহ্মে সব পদার্থ আদি থেকেই বর্তমান আছে, কিন্তু সব এখানে প্রকাশিত হয় নাই, স্বরূপে সে-সব আদি থেকেই বর্তমান আছে, কালে বর্তমান নাই। বিশ্ব-ধী কালরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে সে-সবের কাছে উপস্থিত হন আর মনে হয় যেন সে-সবের উদ্ভব হল; তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান আর মনে হয় যেন তাদের বিনাশ হল, অবশ্য সে-সবই স্বরূপে তখনও বর্তমান রইল তবে কালে নয়। এই মহিমাদ্বয়——সববস্তুর দেশ-কালে আবির্ভাব হওয়া এবং দেশ-কালে অবলুপ্তি হওয়া——সর্বদা অবিচ্ছেদে বর্তমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এ অশ্ব ধাবমান থাকে; এই দুটিই তার নিজস্ব মহিমা। 'এতৌ বা মহিমানৌ'। একের জন্ম পূর্বসমুদ্রে, আর অপরের জন্ম পশ্চিম সমুদ্রে, অর্থাৎ সৎ-এ এবং অসৎ-এ, সত্তার সমুদ্রে এবং সত্তার অস্বীকৃতির সমুদ্রে অথবা ব্যাকৃত প্রকৃতি এবং অব্যাকৃত প্রকৃতিতে, প্রাক্‌সৃষ্টির অসংহত অবস্থার অপ্রকট সমুদ্রে ও সুব্যবস্থিত বিশ্বের প্রকটিত সমুদ্রে।

আর স্বাভাবিক যে-সব বিভিন্ন সত্তার শ্রেণী মনে হয় যেন বিশ্ব অধিকার ক'রে আছে তাদের সঙ্গে অশ্বের সম্বন্ধ ঋষি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন, নিঃশেষে নয় শুদ্ধমাত্র জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রে। কারণ, তাদের সবারই বাহন এই বিশ্বরূপী অশ্ব, তাঁর অন্তহীন বল বেগ ও গতিতে তাদের সবকে বহন করে নিয়ে যায়। তিনি তাদের বহন করেন, 'সমভাবেন'——পার্থক্য বিচার না ক'রে, 'সমম্ হি ব্রহ্ম'——ভাগবত নিরপেক্ষতা ও সাম্য সহকারে। বিশ্বজনীন শক্তি নিজেকে প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার জাতিরূপের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী ক'রে নেন, যেন নিজের উপর প্রত্যেকের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন। দেবতাদের পক্ষে তিনি হয়, অসুরদের পক্ষে অর্বন্, গন্ধর্বদের পক্ষে বাজিন্ এবং মানবদের পক্ষে অশ্ব। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।'* প্রকৃতপক্ষে তারা সব তাঁরই প্রতিরূপে গঠিত, তিনি তাদের প্রতিরূপে গঠিত নন; এবং যদিও মনে হয় যেন তিনি তাদের আদেশপালন করেন, তাদের প্রয়োজন ও প্রবৃত্তি সব অনুসরণ করেন, কশা-বল্‌গা তাদের হাতে, তথাপি তাঁর অন্তর্গূঢ় আত্মা তাঁর জন্য যে-সব যুগ নির্দিষ্ট করেছে সেইসব যুগ যাত্রার পথ ধরেই

* গীতা, ৪।১১

তিনি তাদের সবাকেই বহন ক'রে নিয়ে যান; তিনি স্বাধীন, তাঁর প্লব-গতির তীব্রবেগের হর্ষে তিনি উল্লসিত।

কিন্তু হয়, বাজিন্, অর্বন্, অশ্ব,—এসব নাম কি? অবশ্যই যেসব গুণ এ অশ্বকে তার প্রত্যেক আরোহীর জাতিরূপগত বৈশিষ্ট্যের উপযোগী করেছে এইসব নামের মধ্যে তার নির্দেশ রয়েছে; কিন্তু সে অর্থ যে-ব্যুৎপত্তি ও যে-সব অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে, বর্তমান সংস্কৃত ভাষাতে সে-সব চাপা পড়ে গেছে, সে-সব আর সহজে ধরা যায় না। বিশেষ করে হয়-শব্দই দুরূহ। এই কারণেই সহজ বোধির আশ্রয় না নিয়ে, পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির উপর বেশী ভরসা ক'রে শঙ্কর এ বাক্যের ব্যাখ্যাতে স্পষ্টই দিশাহারা হয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, হি-ধাতুর, মূল গতি-অর্থ থেকেই অশ্ব অর্থে হয় শব্দের প্রয়োগ এসেছে; কিন্তু গতি ত প্রত্যেক অশ্বেরই জাতিগত ক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শুধু হয়ের নয়, বাজিন্ অর্বন্ সবেরই। তাহলে হয় কেন দেবতাদের আর অর্বন্ কেন অসুরদের বাহনের উপযোগী হবে? মনে হয়, বোধির কাছ থেকে প্রকৃত নির্দেশ পেয়েই তিনি বলেছেন যে, বিশিষ্টগতি, নিজস্ব কোন উৎকৃষ্ট প্রকারের গতি, হল হয়ের বিশেষত্ব। কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্য যে কি তা তিনি নির্ধারণ করতে পারেন নি। পরে যে-সব নাম আছে সে-সবেরও কোন বিশেষ অর্থের সন্ধান পান নি। কাজেই তাঁর বোধির ইঙ্গিত থেকে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলছেন যে, এ সবই হয়তঃ বিভিন্ন জাতির আরোহীর জন্য পুরাণনির্দিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় অশ্বের নাম বই নয়। কিন্তু একথা বললে ত এ বাক্য কেবল পৌরাণিক গল্প হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উপনিষদের দৃষ্টি সর্বদা তার গভীরতর উদ্দেশ্যের উপর অভিনিবিষ্ট, পুরাণের গল্প মাত্র হলে এ উপনিষদে তার উপর এত সময় নষ্ট করা হত না। সুতরাং শঙ্করের চেয়ে গভীরতর স্তরে গিয়ে, তিনি বোধির যে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

এ বাক্যের প্রাসঙ্গিক মূল্যের অনুপাতে অনেক বেশী সবিস্তারে তার আলোচনা করা হল। তার কারণ শুধু এ নয় যে, তার ব্যাখ্যা করতে শঙ্করের অক্ষমতা থেকে বোঝা যায় যে উপনিষদের সংস্পর্শে এসে বোধির নির্দ্দেশ মেনে নেওয়া কত প্রয়োজন, কত ফলপ্রসূ। এ বাক্য থেকে আরও দুটি অত্যাবশ্যক জ্ঞান লাভ হয়। প্রথমতঃ, এ থেকে বেদান্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যবহারের প্রথা বিশদভাবে বোঝা যায়; আর, দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর

বাইরের বিশ্ব যে সব সত্তা শ্রেণী দিয়ে পূর্ণ আছে বলে প্রাচীন হিন্দুরা মনে করতেন তাদের বিষয়ে এই প্রাচীন মনীষীদের ঠিক কি ধারণা ছিল তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অবিরাম দেখি যে, বেদান্তের ঋষিরা শব্দের নিগূঢ় সহজাত অর্থ কি আশ্চর্য গভীরভাবে প্রয়োগ করতেন। ব্যাকরণকে ত সর্বদাই বেদব্যাখ্যার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন বলে মনে করা হত; কিন্তু তাঁরা তাকে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতেন না, করতেন প্রধানতঃ বোধিপ্রদীপ্ত মনীষা থেকে প্রেরণা লাভের জন্য। কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত বা প্রচলিত অর্থই তাঁরা গ্রহণ করতেন না, সব-শব্দের ধ্বনির ও অভিব্যঞ্জনার এবং তার প্রত্যেক অক্ষরের গভীর ইশারা তাঁদের আকর্ষণ করত; কারণ তাঁরা দেখেছিলেন যে, সে-সবের উপর মনোনিবেশ ক'রে তাঁদের বোধের কাছে গভীর সব নূতন নূতন তাৎপর্য জেগে উঠত। দেখা যাক যজ্ঞীয় অশ্ব যে-সব নামে অভিহিত সে সব নির্বাচন করতে তাঁরা কি ভাবে এই রীতি প্রয়োগ করেছেন।

এখানে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান থেকে আমরা সাহায্য পাই; তার সূত্র ধরে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিরুক্তের তত্ত্ব পুনরাবিষ্কার করতে পারি এবং তা থেকে অনুমান ও অনুগমের সাহায্যে এসব বৈদিক শব্দের প্রাচীন অর্থ নির্ধারণ করতে পারি। আপাততঃ হয়-শব্দ ছেড়ে যাওয়া যাক, কারণ এ শব্দ যে কি-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ঋষিদের মনে তা কোন বিশিষ্ট গতির ভাব জাগিয়ে তুলত, কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব থেকে তা বুঝবার বিশেষ সাহায্য পাই না। কিন্তু 'বাজিন্' ও 'অর্বন্' বেশ আলোকপ্রদ। 'বাজ' ও 'বাজিন্' দুই-ই সাধারণ বৈদিক শব্দ, ঋগ্বেদে বারবার তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মূলতঃ বাজ শব্দের অর্থ সত্তার প্রাচুর্যসংযুক্ত সারবত্তা, তাথেকে অর্থ এসেছে পূর্ণশক্তি, অজস্র প্রাচুর্য, বল এবং, অতিসহজ যোগবাহের দ্বারা, ঋদ্ধি এবং ধনসম্পত্তির প্রাচুর্য। বাজিন্ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকতে পারে না। তবে অর্বন্ শব্দের অর্থ এভাবে নির্ণয় করবার পথে পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্য গোল বাধিয়েছে। 'অর্' একটা সাধারণ সংস্কৃত ধাতু, 'অরি' 'আর্য' 'অর্যমা' ইত্যাদি বহু প্রচলিত শব্দ এই ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, এ ধাতুর অর্থ চাষ করা, হলচালনা করা; আর আর্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, যাযাবর বা শিকারী ছিলেন না বলে নিজেদের এই নাম দিয়েছিলেন। এই সংস্কার নিয়ে বিচার আরম্ভ করলে বলা যেতে পারে যে, অর্বন্ হল

কৃষিকার্যের অশ্ব, শকটবাহী বা সামরিক অশ্ব নয়; আর এ ব্যুৎপত্তি সমর্থনের জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে লাটিন arvum, চষা ক্ষেত। কিন্তু আর্যেরা কৃষী হলেও অসুরেরা ত নিশ্চয়ই কৃষী ছিল না——হিরণ্য-কশিপু বা প্রহ্লাদ কখনই গলদ্ঘর্ম হয়ে ক্ষেত্রকর্ষণ-পরিশ্রমের গৌরব দাবী করে নি। সুতরাং অর্বন্ শব্দে এরকম কোন অনুষঙ্গের লেশমাত্র এখানে আসে না কিংবা বেদে অন্য কোথায়ও আছে বলে জানি না। বাস্তবিকই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্য কল্পনার দৌড়ে সংস্কৃত ভাষার স্কন্ধে বহু কিম্ভূতকিমাকার সৃষ্টি চেপেছে, আর তার সবচেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টির মধ্যে একটা হল আর্যদের কৃষিজীবীরূপে কল্পনা। প্রাচীন কালের কোন জাতির পক্ষে এভাবে নিজেদের নামকরণ করা সম্ভবপর নয়। 'অর্' ধাতুর মর্মার্থ হল যেকোন প্রকারের ব্যবহারিক উৎকর্ষ বা কর্মবল। সুতরাং তার অর্থ হল কর্মে শক্তিমান উন্নত বা ক্ষিপ্রহস্ত হওয়া, অগ্রগণ্য মহৎ উৎকৃষ্ট হওয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া, উন্নীত করা, আরম্ভ বা শাসন করা; আরও অর্থ হয়ঃ——যুদ্ধ করা, সংগ্রাম করা, প্রণোদিত করা, নেতৃত্ব করা, পরিশ্রম করা, হলচালনা করা। সংগ্রাম ও যুদ্ধ অর্থ পাই অরি শব্দে। গ্রীকে 'Ares' যুদ্ধদেবতা 'arete' গুণ (প্রথমতঃ লাটিন virtus এর মত তার সাহস অর্থই ছিল), লাটিন arma যুদ্ধাস্ত্র। "আর্য" শব্দের অর্থ বলবান উন্নত মহৎ বা উৎকৃষ্ট; সাহিত্যে অবিরত এ অর্থে এ শব্দের ব্যবহার পাই। (তামিল) 'আরুসু' শব্দের অর্থও প্রবল বা বলবান জীব। এখন আমরা অর্বন শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারি ঃ——মহাবল বৃষ বা নরর্ষভ, দলের অধ্যক্ষ, পরিচালক, নেতা, যোদ্ধা। যে ত্বরিতবেগে এ বর্ণনা চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে এখানে সংক্ষেপে গন্ধর্বদের নাম করা হয়েছে গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণীর সব সত্ত্বের প্রতিনিধিরূপে। তাদের সাধারণ গুণ হল স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি, সুন্দর ও সুখের বিলাসে বিঘ্নহীন আত্মতৃপ্তিসাধন; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কলাসৌন্দর্য ও বিলাস-প্রমোদের দেবযোনি তারা। তাদের জন্য এ অশ্বকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ হতে হয়, এই সব গুণের আধাররূপে গন্ধর্বদের বাহন হতে হয়। তেমনি আবার অসুরেরা প্রতাপ ও বলের এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের বিগ্রহ, জেদ ও স্বৈরাচার তাদের বিশেষত্ব, যেমন কামনার চরিতার্থতাতে প্রচণ্ড অসংযম হল তাদের সগোত্র রাক্ষসদের বিশেষত্ব। অসুরদের স্বৈরিতা সংযত করা সম্ভব, কিন্তু তা সর্বদাই প্রচণ্ড ও উদ্দাম, এমন কি তাদের সংযমও বিরাট অহংভাবের

উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের পরিবেশের উপর সে অহংভাব আরোপ করতে তারা ভীমপরাক্রমে সংগ্রাম করে। এ-অশ্ব নিজেকে এই পরাক্রমী কিন্তু অপূর্ণ সত্তাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে নেয়, শক্তি ও বিক্রমে পূর্ণ হয়ে তাদের ঘোর সংগ্রাম ও ক্রমবর্ধমান প্রয়াসের বাহন হয়।

আর হয়? এই সব উদাহরণ দেখে একটা প্রকল্প উত্থাপন করা যেতে পারে। এ-শব্দের ধাত্বর্থ গতি; কিন্তু সগোত্র আরও কতকগুলি শব্দ পাই--'হিল্' দোলা, 'হিন্দ্' দোলা, 'হিণ্ড' স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা; আবার, 'হি' ধাতুর আর একটা অর্থ হয় উল্লসিত করা, হৃষ্ট করা। এই সব দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ঋষিদের কাছে হয় শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হত দ্রুত স্বচ্ছন্দ হৃষ্ট প্লবগতি--দেবতাদের বাহনের উপযুক্ত চলন। কারণ আর্যদের দেবতারা (দিব্‌ধাতু) ছিলেন হর্ষ ও দীপ্তির বিগ্রহ, তাদের সত্তাতে পরিপূর্ণতা নিত্য উপলব্ধ ছিল, তাদের ক্রিয়াবৃত্তিও ছিল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত, অসুরদের মত অপূর্ণ স্বত্বভ্রষ্ট সংগ্রামরত তাঁরা নন। বিশ্বরূপী অশ্বপৃষ্ঠে প্লবগতির হর্ষে সুখাসীন তাঁরা, পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁরা সে-অশ্বের দ্রুত গতির উল্লাসে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। 'বাজিন্' বা 'অর্বন্'-এর মত এ শব্দের অর্থ নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু দেবতাদের বাহন হতে হলে দেবতাদের সঙ্গে হয়ের স্বভাবগত সাদৃশ্য অবশ্যই প্রয়োজন; আমার আরোপিত অর্থ এশব্দে নিশ্চয়ই আছে এবং বেদপুরাণের প্রত্যেক পাঠকই অনুভব করবে, স্বীকার করবে যে, দীপ্তি এবং হর্ষ আর্য দেবতাদের স্বভাবগত আর সে-অর্থ হয় শব্দের ধাতুর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়।

পরিশেষে, মানবের জন্য তিনি হন অশ্ব। কিন্তু সবার জন্যই কি তা নয়? বিশেষ করে মানুষের জন্য কেন? উত্তর হল যে, এ উপনিষদের এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে ঋষি যে 'অশনায়া মৃত্যু'র কথা বলেছেন ইতিমধ্যে তিনি মনে মনে সে-ভাবের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবের মধ্যে জাতিরূপে একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল মানুষ আর সে-ই জরা-মৃত্যুর রহস্যের অধীন সবচেয়ে বেশী; অসুরেরা বহুক্লেশে তা সহ্য করে, দেবতা-গন্ধর্বেরা তা সম্পূর্ণ জয় করেছে। কারণ, ভোগের একটা বিশেষরূপ আছে--ভোগের দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে, এবং সেই সঙ্গে নিজেকে, গ্রাস করা, ক্ষয় করা। আর মানুষের মধ্যেই বিশেষ ক'রে ভোগের এ রূপ প্রাদুর্ভূত হয়েছে; সুতরাং 'অশনায়া মৃত্যু'-র চাপ তার

উপরই বেশী পড়ে, আর সে ভারের হ্রাস বা নিরসন হতে পারে কেবলমাত্র যদি সত্তার ক্রমপর্যায়ে আমরা ঊর্ধ্বে ব্রহ্মের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", অমরত্বের সন্তান হতে পারি।

উপসংহারে এল এ রূপক আখ্যানের শেষ পরিণতি, তাতে এ উপনিষদের চরম উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত হল; যজ্ঞীয় অশ্বের রূপক তার প্রতিষ্ঠা বা ভূমিকা মাত্র, উদ্দেশ্য হল 'অশনায়া মৃত্যু' থেকে মুক্তি। বিশ্বরূপী যে-অশ্ব সর্বজীবের বাহন, সমুদ্র তার বন্ধু বা সহোদর, সমুদ্র তার যোনি বা উদ্ভবস্থল। এ প্রতীকের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই হল বেদের ঊর্ধ্বতর সমুদ্র, শ্রেষ্ঠতর দিব্য অস্তিত্বের প্রতীক, জড়াতীত কারণবারি। তাথেকেই আসে আমাদের অভিব্যক্তির নিম্নতর সমুদ্রের বারিরাশি, তার প্রৈতির সব প্রবাহ, 'অপস্'; তা থেকেই 'বৃত্রেরা" নিহত হয়ে নভোমণ্ডল আবরণমুক্ত হল, তা থেকেই সে নিম্নতর সমুদ্র নিত্যকাল পূর্ণ হয়, "প্রতি সমুদ্রং স্যন্দমানাঃ"।* আর সে তারই ছায়া, তারই প্রতিবিম্ব, তবে মৃত্যু ও সীমাবন্ধনের জননী, অবিদ্যা বা মানস মায়ার ক্ষেত্রে। এই চিত্র দিয়ে এবাক্যের উপসংহার করা হল এবং তদুপরি, পরে যা আসছে তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় নির্দেশ করা হল। 'অশনায়া মৃত্যু'-র কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এই কারণে যে, এই দিব্যসত্তার ঊর্ধ্বতর সমুদ্র হল এ অশ্বের বন্ধু বা সগোত্র। অপরার্ধ ও পরার্ধ, দেখা গেল মূল স্ব-ভাবে অভিন্ন; আমাদের মর্ত্য অংশ স্বরূপতঃ আমাদের সীমাহীন ও অমর অংশের সগোত্র এবং তার প্রকৃতির ভাগীদার। বিশ্বরূপী এ অশ্বও ত সেই দিব্য উৎস থেকে আমাদের কাছে এসেছে; জড়ধর্মী অথচ জড়াতীত এই অশ্ব সেই ঊর্ধ্বতর অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোথা থেকে জন্মলাভ করতে পারে? আবদ্ধ, মর্ত্য ও সীমাবদ্ধ বলে প্রতীয়মান হলেও আমরা এক মুক্ত অনন্ত সদ্বস্তুরই অভিব্যক্তি। আর আমরা যা থেকে জন্মেছি, তার কাছ থেকেই আসছে আমরা যা আছি তা থেকে আমরা যা হব, সেই পরিণতির মৈত্রী ও সহায়। স্বর্লোক আমাদের সগোত্র বলে সেখান থেকে দিব্য প্রেম সর্বদা অবতরণ ক'রে তারই সহোদর, নিম্নতর অভিব্যক্তিকে ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়াস করে।

* ঋগ্বেদ ১।৩২।২
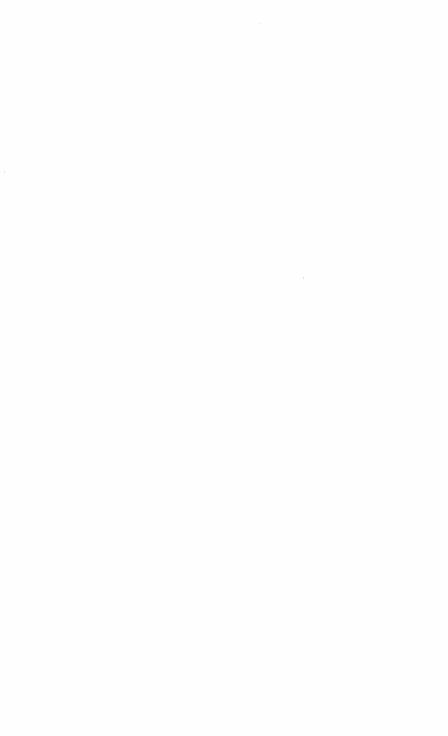
কৈবল্য উপনিষদ্

প্রথম মন্ত্র

কৈবল্য উপনিষদ্

ওঁ অথাশ্বলয়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনমুপসমেত্যোবাচ। অধীহি ভগ-
বন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদা সদ্‌ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্। যথাহ-
চিরাৎ সর্বপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্॥ ১॥

ওঁ। অশ্বলায়ন ভগবান্ পরমেষ্ঠির কাছে এসে বলল, "ভগবন্, আমাকে
শিক্ষা দিন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যা, সেই গূঢ় বিদ্যা যা সাধুসন্তেরা সর্বদাই অনু-
সরণ করে, শিক্ষা দিন কেমন করে বিদ্বান্ তার কাছ থেকে অচিরে সকল
পাপ দূর ক'রে গমন করে পরাৎপর পুরুষের কাছে।"

টীকা

ভগবান পরমেষ্ঠি হ'লেন ব্রহ্মা—স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ নয়, কিন্তু সেই পুরুষ যিনি এই কল্পে ঊর্ধ্বে উঠে সৃষ্টির যন্ত্র হ'য়েছেন, তিনি দেবতাদের মধ্যে কালের হিসাবে প্রথম, তিনি পিতামহ অর্থাৎ আদি ও সর্বজনীন প্রজাপতি; তাঁকে পিতামহ বলা হয় কারণ অন্য সকল পিতারা, অর্থাৎ বিশেষ প্রজাপতিরা, দক্ষ ও অন্যান্যেরা তাঁর মানসপুত্র। স্রষ্টাকেও ব্রহ্মা বলা হয়; আর পিতামহ ব্রহ্মা ও স্রষ্টা ব্রহ্মার মধ্যে প্রায়ই বিভ্রান্তি আসে, কিন্তু ইহাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যেমন মুণ্ডক উপনিষদের, "ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ বভূব", ইহা দেবতাদের মধ্যে প্রথম, কালের আদিতম জন্ম, অথর্বার পিতা, ইহা অজাত সনাতন হিরণ্যগর্ভ নয়। পুরাণে ব্রহ্মার বর্ণনাতে পাই যে তিনি মধু ও কৈটভের জন্য প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত, তিনি নির্ভীক অমর হিরণ্যগর্ভ হ'তে পারেন না। আর ইহাও সম্ভব নয় যে অশ্বলায়ন হিরণ্য-গর্ভের কাছে এসে বলবে, "ভগবন্, আমায় শিক্ষা দিন।" কারণ হিরণ্য-গর্ভের আকার নেই, তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, আর শিব ও বিষ্ণু যেমন মানুষের কাছে নিজেদের ব্যক্ত করেন, হিরণ্যগর্ভ তেমন নিজেকে ব্যক্ত করেন না। তিনি লক্ষ রকমের, বহুরূপী, তাঁকে ধরা যায় না, এবং সেজন্য তিনি প্রতি কল্পে একজন ব্রহ্মা বা দিব্য মানব স্থাপন করেন তাঁর ও মানবদ্বারা অন্বেষণ ও আরাধনার মধ্যে। এই ব্রহ্মা বা দিব্য মানবকে বলা হয় পরমেষ্ঠি অর্থাৎ এমন একজন যিনি "পরমেষ্ঠম্-"এ পূর্ণ; 'পরমেষ্ঠম্'-এর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মার মধ্যে হিরণ্যগর্ভের শক্তি থাকে আর ইহাই তাঁর মাধ্যমে এই কল্পে বিষয়-সমূহের নাম ও রূপ সৃষ্টি করেছে।

যেমন গুরুর কাছে শিষ্য আসে, তেমনভাবে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার কাছে অশ্বলায়ন এসে বলল, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিন।" কি জ্ঞান তার প্রয়োজন তা সে নির্দিষ্ট করে বলে। ইহা "বরিষ্ঠ", সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ ত্রয়ী ব্রহ্মা ছাড়িয়ে ইহা যায় পুরুষোত্তমে অর্থাৎ পরতম দেবে; ইহা গূঢ়, যেহেতু বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্রের সাধারণ শিক্ষাতেও ইহা ব্যক্ত হয় না, ইহাকে সর্বদাই অনুসরণ করে সাধুসন্তেরা, দীক্ষিত

শিষ্যেরা। তাদেরই সন্ত বলা হয় যারা কামনাশুদ্ধ ও জ্ঞানপূর্ণ, আর তাদের গূঢ় বিদ্যা হয় "সদা", অর্থাৎ শুরু থেকেই। সে তার কথা আরো স্পষ্ট ক'রে বলে যে সে চায় জ্ঞানের সার--"যথা" কেমন ক'রে বা কি উপায়ে জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া গেলে "বিদ্বান্" তার পাপ দ্রুত ক্ষালন করে উপনীত হয় পুরুষোত্তমে।

কৈবল্য মার্গের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ--প্রথম অর্থাৎ সাধনার গোড়ার কথা হ'ল বিদ্যা, যথার্থ জ্ঞান আর তাতে বোঝায় অবিদ্যা থেকে, জ্ঞানহীনতা ও মিথ্যা জ্ঞান থেকে নিস্তার; ইহার পরের অঙ্গ হ'ল পদ্ধতি বা উপায়, 'সর্বপাপম্' সকল অশুভ অর্থাৎ পাপ, দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে নিস্তার; শেষ অঙ্গ হ'ল লক্ষ্য, পুরুষোত্তম অর্থাৎ সেই পুরুষ যিনি পরতমেরও অতীত, অর্থাৎ 'তুরীয়ের' উজানে, 'তুরীয়' হল পরতম। পাপ, দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে সাধক লাভ করে কেবল 'আনন্দ', অস্তিত্বের শেষ সংজ্ঞা, আমরা তাতে উপনীত হই যার মধ্যে আনন্দ অবস্থিত। উহা কি? ইহা "তুরীয়" নয়, তুরীয় হল 'শিবম্', 'শান্তম্' 'অদ্বৈতম্', 'সচ্চিদানন্দম্', ইহা তা-ই যা 'শিবম্' ও 'অশিবম্', শুভ ও অশুভের, 'শান্তম্' ও 'কলিলম্', স্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার, 'দ্বৈতম্ ও অদ্বৈতম্', দ্বৈত ও ঐক্যের অতীত। সৎ, চিৎ ও আনন্দ থাকে তাদের পরতমে, কিন্তু তিনি সৎ নন, চিৎ-ও নন, আনন্দও নন, অথবা এ সবের কোন মিশ্রণও নন। তিনি সব অথচ তিনি 'নেতি', 'নেতি'। তিনি এক অথচ বহু, তিনি পর-ব্রহ্ম আবার তিনি পরমেশ্বর। তিনি পুরুষ, আবার তিনি স্ত্রী, তিনি 'তৎ' আবার তিনি "স" ইহা পরতম অপেক্ষাও পরতর। তিনি পরমপুরুষ যাঁর সাদৃশ্যে জগৎ ও সকল জীব সৃষ্ট, তিনিই প্রকৃতির সকল কর্মপ্রণালী ব্যেপে ও তাদের মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে বিরাজিত তার সদ্‌বস্তু ও আত্মা-রূপে। এই পুরুষকেই অশ্বলায়ন জানতে চায়।

নীলরুদ্র উপনিষদ্

নীলরুদ্র উপনিষদ্

ওঁ অপশ্যম্ ত্বাহবরোহন্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ।
অপশ্যমস্যন্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম্॥ ১॥

১। ওঁ। তোমায় আমি দেখেছিলাম যখন তুমি নামছিলে আকাশ থেকে পৃথিবীতে, আমি দেখেছিলাম নীলগ্রীব শিখিপর্ণশোভিত ভীষণ রুদ্রকে যখন তিনি নিক্ষেপ করছিলেন।

দিব উগ্রোহবারুক্ষৎ প্রত্যষ্ঠাৎ ভূম্যামধি।
জনাসঃ পশ্যতেমাং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্॥ ২॥

২। উগ্র তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন, আমার সম্মুখে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন পৃথিবীর উপর ইহার অধিপতিরূপে; জনগণ দেখে এক শক্তিপুঞ্জ,--নীলগ্রীব, লোহিতবর্ণ।

এষ এত্যবীরহা রুদ্রো জলাসভেষজীঃ।
বি তেহক্ষেমমনীনশদ্বাতীকারোহপ্যেতু তে॥ ৩॥

৩। এই যিনি আসেন তিনি অশুভনাশক ভীষণ রুদ্র, যিনি জলাধিষ্ঠিত বৃক্ষ থেকে জাত; সেই বাত্যার বর্তুলও আসুক যা তোমার জন্য বিনাশ করে সকল অশুভসূচক বিষয়।

নমস্তে ভব ভামায় নমস্তে ভব মন্যবে।
নমস্তে অস্তু বাহূভ্যামুতোত ইষবে নমঃ॥ ৪॥

৪। তুমি জগৎপ্রভব, তোমাকে প্রণাম; প্রচণ্ডরোষাকুল তুমি, তোমাকে প্রণাম; প্রণাম তোমার শক্তিশালী বাহুদ্বয়কে, প্রণাম তোমার ক্রুদ্ধ শরকে।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কৃণু মা হিংসীঃ পুরুষান্মম॥ ৫॥

৫। হে গিরিশ, নিক্ষেপ করার জন্য তুমি যে শর হস্তে ধারণ কর তাকে তুমি পরিণত কর আশিষ-শরে, হে গিরিরক্ষক, ইহা যেন নিধন না করে আমার শস্ত্রধারীদের।

শিবেন বচসাত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি।
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদয়ক্ষ্মং সুমনা অসৎ॥ ৬॥

৬। মঙ্গল বচন দিয়ে, হে গিরিশ, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি জনসংসদে যেন সর্বজগৎ আমাদের কাছে হয় মিত্রভাবাপন্ন ও নিষ্পাপ স্থান।

যা ত ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ।
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নো মৃড জীবসে॥ ৭॥

৭। তোমার যে শর সর্বাপেক্ষা করুণাময় আর তোমার যে ধনু সুলক্ষণযুক্ত আর তোমার যে তূণীর আশীর্বাহক, তার দ্বারা তুমি জীবিত থাক, হে সংহারকর্তা।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপনাশিনী।
তয়া নস্তন্বা শংতময়া গিরিশন্তাভিচাকশৎ॥ ৮॥

৮। হে রুদ্র, তোমার যে দেহ সৌম্য, করুণাময় ও পাপনাশক সেই শান্তিময় দেহে,—তোমার রুদ্র আকারে নয়—হে গিরিশ, তোমায় দেখা যায় আমাদের জনগণের মাঝে।

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুবিলোহিতঃ।
যে চেমে অভিতো রুদ্রা দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড ঈমহে॥৯॥

৯। উষার এই অরুণ যা পিঙ্গলবর্ণ ও তাম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ আর চতুর্দিকে এই সব তোমার উগ্রজন যারা সকল দিকে বাস করে সহস্রে সহস্রে, বস্তুতঃ ইহাদেরই আমরা কামনা করি।

টীকা

১। 'অপশ্যম্', আমি দেখেছিলাম। বক্তা হ'লেন উপনিষদ্ প্রণেতা; পঞ্চম শ্লোক থেকে দেখা যায় যে তিনি আর্যদের এক রাজপুত্র ছিলেন। আকাশ থেকে পৃথিবীতে রুদ্রের অবতরণের দৃশ্য তিনি এখানে বলেছেন।

'অবঃ', নিম্নে, সুস্পষ্ট করার জন্য দুবার বলা হল। যে মূর্তিতে তিনি দিব্য প্রকাশ দেখেছিলেন তারই বর্ণনা দেওয়া হ'ল শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে; এই বর্ণনা হ'ল শরনিক্ষেপরত রুদ্রের যিনি বীর্য ও ক্রোধের দেবতা, যার কণ্ঠ ও গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তকে শিখিচূড়া।

২। তিনি অবতরণের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি নেমেছিলেন উগ্রভাবে অর্থাৎ তাঁর মুখ, আকার ও গতি রোষাকুল; আর দাঁড়িয়েছিলেন ঋষির সম্মুখে, 'প্রত্যষ্ঠাৎ', পৃথিবীর উপর ও ইহার উর্ধ্বে, 'অধি', এমন ভাবে যাতে আদেশ বা নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। দিব্যশক্তির এই যে অবতরণ রাজপুত্র যোগে দেখেছিলেন তা সাধারণ লোকের কাছে দেখা যায় শক্তিপুঞ্জরূপে, 'মহ', লোহিতবর্ণ, নীলকণ্ঠ, নীলগ্রীবরূপে। 'মহ'র অর্থ শক্তি, বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব। যে প্রকাশ হ'ল তা ক্রোধ ও বীর্যের। লোকেরা রুদ্রকে দেখে এমন এক জ্যোতিপুঞ্জরূপে যার চতুর্দিকে লোহিত আভা ও উর্ধ্বে নীল আভা; যোগে লোহিত হ'ল ক্রোধ বা কামনার প্রচণ্ড ভাবের লক্ষণ; নীল হল শ্রদ্ধার, ভক্তির লক্ষণ।

৩। যে রুদ্রকে আমরা জানি অশুভহন্তা বলে তিনি আসেন। রাজর্ষি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি জলরাশির মধ্যে বৃক্ষজাত। ভাষাবিজ্ঞানে 'ভেষ' ও লাতিন ' ficus ' (অর্থাৎ ইংরাজী ' fig-tree ' বা অশ্বত্থ) একই। অশ্বত্থ হ'ল ব্যক্ত জগতের যৌগিক চিহ্ন যেমন গীতায় বলা হ'য়েছে, আর বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুই পক্ষীর বৃক্ষের কথায়, মুক্তির গীতিতে নীল আকাশের মধ্যে বৃক্ষের কথায়। 'জল' হল 'আপঃ' অর্থাৎ সেই জলরাশি যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়। ইহার পর ঋষি প্রার্থনা করেন যে, রুদ্র যে 'বাতী'র, বাত্যার অধিপতি সেই বাত্যা যা তার

গতিপথের ঝন্ঝায় মহামারী প্রভৃতি সকল বিপদ উড়িয়ে নিয়ে যায় যেন আসে তার সহিত।

৪। চতুর্থ শ্লোকে, তিনি ঐ দেবতাকে প্রণাম করছেন। রুদ্র পরমেশ্বর, জগৎস্রষ্টা, তিনি ভীতিজনক, ক্রোধপূর্ণ, বিধ্বংসী প্রভু যিনি নিধন ও শাস্তিদানে ক্ষিপ্র। 'ভাম-'র অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ, আর 'মন্যু' শব্দের অর্থ মনের এক প্রচণ্ড অস্থির অবস্থা, দুঃখ বা শোকের উচ্চণ্ড ভাব। সুতরাং 'ভামায়মন্যবে'-র অর্থ এমন কেউ যে প্রচণ্ডরূপে ক্রোধাকুল। বীর্য ও ক্রোধের দেবতারূপে রুদ্রকে প্রণাম করা হ'ল, সেজন্য শক্তি্র আসন বাহুদ্বয়কে ও সংহারের অস্ত্র শরকে প্রণাম করা হ'ল।

৫। ক্রোধ ও সংহারের এমন এক নূতন রূপে রুদ্র আসছেন যা আর্যরা সচরাচর দেখে না। এই দর্শনের তাৎপর্য সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে রাজা তাঁর প্রজাদের আহ্বান করেন এবং সকলে সমবেত হ'লে, রুদ্রকে প্রার্থনা করা হয় যেন সম্ভাব্য বিপদ না আসে। ধনু থেকে নিক্ষেপ করার জন্য শর উঠান হ'ল, প্রার্থনা করা হয় যেন ইহা পরিণত হয় আশিষ-শরে, ক্রোধের শরে নয়। এই শ্লোকে রাজপুত্র দেবতার কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তিনি তাঁর লোকদের না নিধন করেন, স্পষ্টতঃই তিনি তাঁর কুলের শস্ত্রধারী যোদ্ধাদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

কতিপয় বেদান্তগ্রন্থের প্রথমকালীন অনুবাদ

গৌড়পাদের কারিকাচয়

গৌড়পাদের কারিকাগুলি কতকগুলি প্রামাণিক শ্লোকসূত্রের ও যুক্তির সমষ্টি যাতে বেদান্তদর্শনের চরম অদ্বৈতসম্প্রদায়ের বক্তব্য চুম্বক-যুক্তি-সমেত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে। বেদান্তসূত্রের বিস্ময়কর সূত্রগুলি বিদ্যার্থী অপেক্ষা বরং গুরুর পক্ষেই বেশী উপযোগী। গৌড়পাদের স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও প্রসঙ্গানুকুল শ্লোকগুলির উপকারিতা আরো বেশী লোকের জন্য; এগুলির অর্থ বোঝবার জন্য প্রথমে দরকার শুধু দার্শনিক সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে এবং অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের আলোচনার সাধারণ গতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান---এই প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে বিদ্যার্থী এই শ্লোকগুলি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এমন এক চমৎকার বিশদ অর্থ-গর্ভ যুক্তিধারা পায় যাতে সে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতচিন্তাধারা বুঝতে এবং ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলি স্মরণে রাখতে সক্ষম হয়। ইহার আবার এই সুবিধা আছে---অবশ্য এই সুবিধার কারণ তার পরম উৎকর্ষ। ইহার প্রামাণ্যের দীর্ঘকালব্যাপী স্বীকৃতি ও সর্বসাধারণ ব্যবহার---যে স্বয়ং মহান্ আচার্য কর্তৃক ইহার এক পূর্ণ ও জোরালো টীকা আছে আর আছে আচার্য্যের শিষ্য স্বচ্ছমনা ও প্রায়ই অর্থব্যঞ্জক আনন্দগিরির আরো এক ব্যাখ্যা। আধুনিক ছাত্রের পক্ষে---উপনিষদের অর্থ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করার পর---একদিকে দয়সেনের (Deussen) বেদান্ত গ্রন্থ ও অন্য-দিকে ষড়দর্শনের যে কোন সংক্ষিপ্ত ও জনপ্রিয় ব্যাখ্যা সমেত গৌড়পাদের কারিকাচয় ও শঙ্করের ভাষ্য অধ্যয়ন অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনের আর কোন উত্তম উপক্রমণিকা হ'তে পারে না। অদ্বৈতবাদটি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করার পরই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং মধ্যবর্তী অন্যান্য অনুরূপ মতগুলি পাঠ করা সুবিধাজনক। বেদান্তমতটি পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা হ'লে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক মতগুলি পর পর আয়ত্ত করা সহজ হয় তবে তার সহিত থাকা চাই বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থ আর এই সমগ্র পাঠের সমাপ্তিসূচক শ্রেষ্ঠ সমন্বয়মূলক গ্রন্থমুকুট ভগবদ্গীতা। তখন দার্শনিক ভিত্তিটি সঠিকভাবে স্থাপিত হ'বে আর উপনিষদগুলি অধ্যয়ন করা যেতে

পারে নূতন আগ্রহ নিয়ে আর সে সময় পবিত্র গ্রন্থগুলির আদি ব্যাখ্যা যাচাই বা পরিবর্তন করাও যায়। এইভাবে জ্ঞানকাণ্ডের বুদ্ধিসম্বন্ধীয় দিকের অবসান হয়ঃ ইহার আরো মূল্যবান যে সাধনার দিক তা আয়ত্ত করা যায় শুধু যোগের পথে ও সদ্‌গুরুর পরিচালনায়।

গৌড়পাদের গ্রন্থের আরম্ভ হ'ল উপনিষদগুলির কবিত্বপূর্ণ ও ছন্দোবদ্ধ পদগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট দার্শনিক সংজ্ঞায় এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে। প্রথমেই আছে বিশ্ব ও বিশ্বরূপী ব্যষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত আত্মার যে ত্রয়াত্মক প্রকৃতি অর্থাৎ জাগরিত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পাদ যেগুলি মিলিত হ'য়ে বিলীন হয় পরব্রহ্মে তার স্বরূপগত লক্ষণের সঠিক নির্ধারণ।

বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ॥ ১॥

১। বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক যে প্রভু বিশ্ব আন্তরবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন যিনি 'তৈজস' চেতনা ঘনীভূত ও নিজের মধ্যে সংবৃত্ত করেছেন যিনি 'প্রাজ্ঞ', সেই আত্মা নিজেকে স্মৃতির কাছে উপস্থাপিত করেন তিন অবস্থায় অবস্থিত এক রূপে।

অত্র এতস্মিন্যথোক্তেঽর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি—বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি। পর্যায়েণ ত্রিস্থানত্বাৎ সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বং চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্ত শ্রুতেঃ॥

শঙ্করঃ উক্তি করা হ'চ্ছে যে, যেহেতু জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা পর পর তিনটি অবস্থায় অবস্থান করে, আর তা একসাথে হয় না, এবং উপরন্তু সকল তিনটিতেই এমন স্মৃতির দ্বারা সংযুক্ত থাকে যা বরাবর অনুভব করে "ইহা আমি" "ইহা আমি" "ইহা আমি", সেহেতু ইহা সুস্পষ্ট যে এই সত্তা তিনটি অবস্থার অতীত ও ঊর্ধ্বে অতিরিক্ত কিছু এবং সেজন্য ইহা এক, অনপেক্ষ ও ইহার বিভিন্ন অবস্থায় অনাসক্ত। আর ইহার সমর্থনে আছে শ্রুতিতে দেওয়া মহামৎস্যের মত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ॥ ২॥

২। দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারে বিশ্ব, মনের মধ্যে তৈজস, আকাশে, হৃদয়ে প্রাজ্ঞ, ইহাই তার ত্রিধা স্থান দেহের মধ্যে।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ত্রয়াণামনুভবপ্রদর্শনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখম্, তস্মিন্প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বঃ অনুভূয়তে, 'ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্পুরুষঃ' ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টৈকঃ। নন্বন্যো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো দক্ষিণেঽক্ষিণ্যক্ষ্ণোর্নিয়ন্তা দ্রষ্টা চান্যো দেহস্বামী; ন স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ; 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' ইতি শ্রুতেঃ 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত', 'অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্' ইতি স্মৃতেশ্চ; সর্বেষু করণেষ্ববিশেষেঽপি দক্ষিণাক্ষিণ্যুপলব্ধিপাটবদর্শনাৎ তত্র বিশেষেণ নির্দেশোঽস্য বিশ্বস্য। দক্ষিণাক্ষিগতো দৃষ্ট্বা রূপং নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র তথা স্বপ্নে; অতঃ মনসি অন্তস্তু তৈজসোঽপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হৃদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শনস্মরণে এব হি মনঃস্পন্দিতম্। তদভাবে হৃদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্ 'প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসঃ হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। 'লিঙ্গং মনঃ' 'মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ননু, ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তি; কথমব্যাকৃততা? নৈষ দোষঃ অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্য, তথাপি পিণ্ডপরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত এব প্রাণঃ সুষুপ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। তথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং প্রাণোঽব্যাকৃতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোঽপ্যবিশেষাপত্তাব্যাকৃততা সমানা, প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ; তদধ্যক্ষশ্চৈকোঽব্যাকৃতাবস্থঃ। পরিচ্ছিন্নাভিমানিনামধ্যক্ষাণাঞ্চ তৈনৈকত্বমিতি পূর্বোক্তং বিশেষণমেকীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদ্যুপপন্নম্। তস্মিন্নেতস্মিন উক্তহেতুসত্ত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দতমব্যাকৃতস্য? 'প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ' ইতি শ্রুতেঃ। ননু তত্র 'সদেব সৌম্য' ইতি

প্রকৃতং সদ্ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্। নৈষ দোষঃ, বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ। যদি হি নির্বীজরূপং বিবক্ষিতং ব্রহ্ম অভাবষ্যৎ, 'নেতি, নেতি', 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' 'অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাধি' ইত্যবক্ষ্যৎ। 'ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে' ইতি স্মৃতেঃ। নির্বীজতয়ৈব চেৎ, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ; মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ বীজাভাবাবিশেষাৎ, জ্ঞানদাহ্য বীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ; তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ। অত্র এব 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' 'সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ', 'যতো বাচে নিবর্তন্তে', 'নেতি নেতি' ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং প্রাজ্ঞশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন দেহাদিসম্বন্ধ জাগ্রদাদিরহিতাং পারমার্থিকীং পৃথগ্বক্ষ্যতি। বীজাবস্থাপি 'ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যুত্থিতসস্য প্রত্যয়দর্শানদ্দেহে অনুভূয়ত এবেতি ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে॥

শঙ্কর: ১। এমন কি জাগরিত অবস্থাতেও যে এই তিনটির—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের অনুভব হয় তা দেখানই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। দক্ষিণচক্ষু হ'ল দ্বার, 'করণ' যার মধ্য দিয়েই বিশেষ করে স্থূলবিষয়সমূহের দ্রষ্টা বিশ্ব অনুভবগম্য হয়। শ্রুতি বলে, "বস্তুতঃ এবং এক সত্যের ইন্ধ সে এমন কি তার পুরুষ যখন সে এখানে দক্ষিণ চক্ষুতে দাঁড়িয়ে থাকে।" বৈশ্বানর ইন্ধ কারণ তার স্বরূপগততত্ত্ব হ'ল দীপ্তি, আর ইহা যুগপৎ আদিত্যের মধ্যস্থ বিশ্বাত্মা এবং চক্ষুস্থিত দ্রষ্টা।

২। এই ব'লে আপত্তি হবে যে, "হিরণ্যগর্ভ এক এবং জড়ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আর দক্ষিণ চক্ষুস্থ নিয়ন্তা ও দ্রষ্টা সম্পূর্ণ অন্য এক, ইহা দেহস্বামী"। ইহা তা নয়; কারণ যদি আমরা আমাদের সব প্রতীতির প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে নিরীক্ষণ করি তাহ'লে স্বতঃই আমরা তাদের মধ্যে কোন ভেদ উপলব্ধি করি না। আর শ্রুতি বলে, "এক দেব গূঢ় রয়েছেন সর্বভূতের মধ্যে।" আর স্মৃতিও বলে, "হে ভরততনয়, আমাকে জেন সকল দেহের মধ্যে দেহের জ্ঞাতা ব'লে। সকল ভূতের মধ্যে আমি অবিভক্ত থাকি, শুধু মনে হয় আমি বিভক্ত।"

৩। লক্ষ্য করো যে যদিও বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব সকল ইন্দ্রিয়স্থানেই

পার্থক্য না ক'রে কাজ করে তবু দক্ষিণ চক্ষুর প্রতীতিগুলি তীক্ষ্ণতায় ও স্পষ্টতায় শ্রেষ্ঠ দেখা যায় ব'লে ইহাকে সেই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হ'য়েছে তার স্থায়ী স্থান ব'লে। সেই সময় দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত এই বিশ্ব কোন আকার বা মূর্তি দেখার পর যদি সে নিমীলিত চক্ষে তা স্মরণ করে সে তখনো তার মনের ভিতর যেন স্বপ্নের মধ্যে সেই একই আকার বা মূর্ত্তি দেখে যেমন ইহা ব্যক্ত হয় ভাবনার রূপে বা ইহা যে সংস্কার রেখে গেছে তার রূপে। আর স্বপ্নেও ঠিক তাই-ই হয়, স্মৃতির দ্বারা সংরক্ষিত সংস্কার বা ভাবনা নিদ্রার মধ্যে সেই একই আকার বা প্রতিভাস পুনরুৎপাদন করে যা জাগ্রত অবস্থাতে দেখা হ'য়েছিল। সুতরাং মনের অন্তরে এই যে তৈজস সে স্বয়ং বিশ্ব বৈ অন্য কিছু নয়।

৪। তারপর যে ব্যাপারকে স্মৃতি আখ্যা দেওয়া হয় তার উপশমে আকাশস্থিত বা হৃদিস্থিত প্রাজ্ঞ একীভূত হয় অর্থাৎ যেমন বলা হয় ঘনী-ভূত চেতনা নিজের মধ্যে সংবৃত্ত হয়। আর এই যে হয় তার কারণ মনের ব্যাপারসমূহের অভাব; কারণ দৃষ্টি ও স্মরণ মনের স্পন্দন আর তাদের অভাবে আত্মা প্রাণরূপে আকাশে বা হৃদয়ে এমনভাবে অবস্থান করে যে কোন বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্যের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ শ্রুতি বলে, "প্রাণই এই সকলকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে।" হিরণ্যগর্ভ যা তৈজসও সেই একই কারণ তৈজসের অবস্থান মনে আর মন যে দেহের সূক্ষ্ম অংশ তা স্পষ্ট এই শ্রুতির বচন থেকে "এই পুরুষ মনোময়" এবং শ্রুতির অন্যান্য অনুরূপ অনেক বচন থেকে।

৫। আপত্তি করা যেতে পারে যে সুষুপ্তির সময় প্রাণ সত্যই ভেদযুক্ত ও ব্যক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি এক হয় প্রাণের সহিত, সুতরাং তুমি কেমন ক'রে ইহা এক হয় বলে, ইহার সম্বন্ধে অভিব্যক্তি ও ভেদের অভাবসূচক বিশেষণ প্রয়োগ কর? কিন্তু যুক্তিতে কোন দোষ নেই; যেহেতু অ-ভেদ-যুক্ত্তে দেশ ও কালের বিশেষীকরণের অবস্থাগুলি থাকে না আর সুষুপ্তির সময় প্রাণের বেলাতেও সেই একই অবস্থা। যদিও অবশ্য প্রাণ এক অর্থে ভেদযুক্ত কারণ প্রাণরূপে ইহার পৃথক অস্তিত্বের ভাবনা বর্তমান থাকে, তথাপি দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে পৃথক অস্তিত্বের আরো যে বিশেষ অর্থ তা নিরুদ্ধ হয় এবং সেজন্য সুষুপ্তিতে প্রাণ অ-ভেদযুক্ত ও অনভিব্যক্ত অন্ততঃ এই সীমাবদ্ধ অহমিকার অধিকারী ব্যক্তিদের সর্ম্পকে। এবং ঠিক যেমন সীমাবদ্ধ দৈহিক অহমিকাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাণ জগতের

সমাপ্তিতে তাতে লীন হ'য়ে অ-ভেদযুক্ত হয়, ঠিক তা-ই সেই ব্যক্তির বেলায় হয় যার শুধু সুষুপ্তির অবস্থাতেই প্রাণ হিসাবে অস্তিত্বের বোধ থাকে কারণ জগতের সমাপ্তিতে প্রতিভাসসমূহের সাময়িক তিরোধানও যা সুষুপ্তিও বস্তুতঃ ঠিক তা-ই; দুটি অবস্থাই সমানভাবে ভেদ ও অভি-ব্যক্তিশূন্য এবং দুটিই সমানভাবে ভবিষ্য জন্মের বীজসমূহে পূর্ণ। দুটি অবস্থার অধ্যক্ষ আত্মা একই, ইহা অভেদযুক্ত ও অনভিব্যক্ত অবস্থায় স্থিত আত্মা। এই থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে প্রতিটি ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ আত্মা এবং সীমাবদ্ধ দৈহিক অহমিকার সব অনুভূতি এক ও একই; সুতরাং প্রাজ্ঞ সম্বন্ধে পূর্বে যে সব বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে যে ইহা একীভূত অথবা ঘনীভূত ও আত্ম-সমাহিত চেতনাময় ইত্যাদি সেগুলি সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য; আর যে যুক্তিগুলি পূর্বেই দেওয়া হ'য়েছে সেগুলির দ্বারা ঐ একই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

৬। তুমি বলবে, "কিন্তু, অ-ভেদযুক্ততে প্রাণ নাম দেওয়া হয় কেন?" তার কারণ শ্রুতির বচন, "হে সৌম্য, ইহার কারণ এই যে মনের রজ্জু ও বন্ধন হ'ল প্রাণ।" তুমি উত্তর দেবে, "কিন্তু, এই যে কথা, সৌম্য সন্মাত্র নিজেই প্রাণ তা প্রমাণ করে যে শ্লোকগুলির বিষয় যে সদ্‌ব্রহ্ম তার কথাই বলা হচ্ছে প্রাণশব্দের দ্বারা। যাই হ'ক, আমার যুক্তি কিন্তু ইহার দ্বারা দূষিত হয় না কারণ আমরা সকলেই বুঝি যে সত্তা ভবিষ্য জন্মের বীজে পূর্ণ। তাহ'লে, যদিও প্রাণশব্দের দ্বারা সদ্‌ব্রহ্মকেই বোঝাচ্ছে, তাহ'লেও প্রাণ এই নাম সত্তাকেও দেওয়া হয় কারণ যে বীজ থেকে জীব অথবা প্রাণবদ্ধ চিৎপুরুষের জন্ম হবে তার দ্বারা গর্ভপূর্ণতার ভাবনা তা থেকে নিরাকৃত হয়নি এবং বস্তুতঃ যখন এই ভাবনা ব্রহ্মের ভাবনা থেকে নিরাকৃত হয় না, কেবল তখনই তাঁকে বলা যায় সদ্‌ব্রহ্ম। কারণ যদি অনপেক্ষ নির্বীজ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা শ্রুতির অভিপ্রায় ছিল, তাহ'লে এই সব উক্তি ব্যবহার করা হ'ত যেমন, "তিনি ইহা নন, উহা নন, তাঁকে বলা যায় এমন কিছুই তিনি নন"; "যাঁর কাছ থেকে সব বাক্য ফিরে আসে বিফল হয়ে," "বিদিত থেকে অন্য তিনি, এবং তিনি অবিদিত থেকেও ভিন্ন"। স্মৃতিও বলে, "তাঁকে (পরমার্থসৎকে) সত্তাও বলা হয় না, অসত্তাও বলা হয় না।" তাছাড়া যদি সত্তা নির্বীজ হ'তেন, তাহ'লে এই যে কথা যে যারা সত্তার অথবা সুষুপ্তির অথবা জগৎ প্রলয়ের মধ্যে মিশে লীন হয়েছে তারা এই সবের যে কোন একটি থেকে আবার জেগে

উঠতে পারে তা মনে করার কোন যুক্তি থাকত না। অথবা যদি তারা জেগে উঠতে পারে, তাহ'লে আমাদের তখনই স্বীকার করতে হবে যে মুক্ত পুরুষরাও আবার প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের মধ্যে আসেন; কারণ এই প্রকল্প অনুসারে, পরমার্থসৎ-এর মধ্যে মুক্ত পুরুষদের অবস্থা এবং সত্তার মধ্যে লীন পুরুষদের অবস্থা সমানই হবে, দুজনের কারোরই ভবিষ্য প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের বীজ বা কারণ থাকবে না। আর যদি এই আপত্তি দূর করার জন্য তুমি বল যে জ্ঞানের অগ্নিতে অবিদ্যার যে বীজকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে হবে তা মুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকে না আর অপর ক্ষেত্রে বিষয়ের অন্য কোন বীজ থাকে না, তাহ'লে তোমার কথায় এই প্রমাণ হবার আশঙ্কা থাকে যে (ব্রহ্মের) জ্ঞান মোক্ষসাধনের উপায় হিসাবে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয়।

৭। তাহ'লে ইহা স্পষ্ট যে সত্তা প্রাতিভাসিক জীবনের বীজে পূর্ণ এই জ্ঞানেই সকল শ্রুতিতে ইহাকে বর্ণনা করা হয় প্রাণরূপে ও সকল বিষয়ের কারণ রূপে। অতএব বীজের এই ভাবনা বিসর্জন দিয়েই ইহাকে অভিহিত করা হয় এই সব উক্তির দ্বারা, "তিনি অজ যাঁর মধ্যে বাহ্য ও অভ্যন্তর এক", "যাঁর কাছ থেকে সকল বাক্য ফিরে আসে বিফল হ'য়ে", "তিনি ইহা নন বা উহা নন অথবা তাঁকে বলা যায় এমন কিছুই তিনি নন" ইত্যাদি। একই আত্মার এই নির্বীজ অবস্থার কথা আমাদের গ্রন্থকার পৃথকভাবে বলবেন; ইহাকে প্রাজ্ঞ শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হ'য়েছে, এই অবস্থা তুরীয় অথবা পরমার্থসৎ হওয়ায় ইহা দেহ প্রাণ ইত্যাদি সকল সম্বন্ধরহিত এবং শুধু নিজে চূড়ান্তভাবে ও অতিস্থিতভাবে সত্য। এখন অ-ভেদযুক্ত সবীজত্বের অবস্থাকেও অন্য দুটির মত এই দেহেই অনুভব করা হয় নিদ্রা থেকে জাগরিত ব্যক্তির সেই ভাবনার রূপে যা তাকে বলে, "এতক্ষণ ধ'রে আমি কিছুই অনুভব করি নি ও জানতে পারি নি।" তাহ'লে এইজন্যই আত্মা সম্বন্ধে বলা হয় যে দেহের মধ্যে ইহার ত্রিধা স্থান আছে।

বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্।
আনন্দভুক্তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত॥ ৩॥

৩। বিশ্ব স্থূল বিষয়সমূহের ভোক্তা, তৈজস সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের এবং

প্রাজ্ঞ শুদ্ধ (অসম্বন্ধ) সুখকর বিষয়ের ভোক্তা; দেহের মধ্যে আত্মার ত্রিধা ভোগের কথা তুমি এই প্রকার বুঝবে।

স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তং তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত॥ ৪॥

৪। স্থূল বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ তৃপ্ত করে বিশ্বকে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয় তৈজসকে এবং শুদ্ধ সুখ তৃপ্ত করে প্রাজ্ঞকে, দেহের মধ্যে আত্মার ত্রিধা তৃপ্তির কথা তুমি এই প্রকার বুঝবে।

উক্তার্থৌ হি শ্লোকৌ॥

শঙ্কর: এই দুটি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে॥ ৫॥

৫। এই তিন অবস্থায় (পাদে) যা ভোগ করা হয় এবং যা ভোক্তা— এই উভয়কে যে এক বলে জানে সে ভোগ করে ও কোন কলুষ পায় না।

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্ভোজ্যমেকং ত্রিধাভূতম্; যশ্চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ 'সোঽহম্' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্তিতঃ, যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নম্ স ভুঞ্জানঃ ন লিপ্যতে, ভোজ্যস্য সর্বস্যৈকভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি, তদ্বৎ॥

শঙ্কর: জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন পাদে স্থূল বিষয়, সূক্ষ্মবিষয় ও শুদ্ধসুখ নামে যা ভোগ করা হয় তা একই সমান বিষয়, যদিও ইহা ত্রিধা বিভাব গ্রহণ করেছে। আর বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই বিভিন্ন নামে যা ভোগ করে তাকে বলা হয়েছে এক, কারণ ইহারা সেই একত্ববোধের দ্বারা

সংযুক্ত থাকে যা "ইহা আমি" "ইহা আমি" এই নিরন্তর অনুভবের দ্বারা প্রকাশিত হয়; আরো এই কারণে যে জ্ঞানের প্রকৃতি বরাবরই এক ও অভিন্ন। যে এই দুটিকে এক বলে জানে যদিও তা ভোক্তা বা ভোজ্য বোধে বহুভাবে বিভক্ত হ'য়েছে সে ভোগ থেকে কোন কলুষ পায় না কারণ ভোগের কর্তা সেই বিশ্বাত্মক এক এবং ভোক্তাও ভোজ্য থেকে ভিন্ন নয়। কারণ লক্ষ্য করো যে-ই ভোক্তা হ'ক অথবা যা কিছুই ভোগের বিষয় হ'ক, সে ইহার সহিত বৃদ্ধিও পায় না অথবা ক্ষীণও হয় না, যেমন অগ্নির বেলায়, যখন ইহা কাঠ বা অন্য ইন্ধন আকারে তার বিষয়কে দগ্ধ করে ফেলে; ইহা থেকেই যায়, পূর্বাপেক্ষা ছোটও হয়না, অথবা বড়ও হয় না।

প্রভবঃ সর্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ
সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্॥ ৬॥

৬। জন্ম নেয় এমন সকল ভাবই যে ইতি পূর্বেই সত্তায় অবস্থিত–– ইহা এক নিশ্চিত সিদ্ধান্ত; সর্বকে প্রাতিভাসিক সত্তায় নিয়ে আসে প্রাণ, এই প্রাণ বা পুরুষই তার চেতনার পৃথক রশ্মিগুলি নির্গত করে চতুর্দিকে।

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াস্বরূপেণ সর্বভাবানাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভেদানাং প্রভবঃ উৎপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ––'বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে' ইতি। যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণোহ-ববহার্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টং চ রজ্জুসর্পাদীনামবিদ্যাকৃত-মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্ত্বম্, ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প-মৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কৃচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎ-পত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ, এবং সর্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাণবীজাত্মে-নৈব সত্ত্বমিতি। শ্রুতিরপি বক্তি 'ব্রহ্মৈবেদম্', 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ' ইতি। অতঃ সর্বং জনয়তি প্রাণঃ চেতোংশূন্, অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বভেদেন দেবমনুষ্যতির্যগাদি-দেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোংশবো যে, তান্ পুরুষঃ পৃথক্ সৃজতি বিষয়-ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবসলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্ত্বিতরান্সর্ব-ভাবান্ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, 'যথোর্ণনাভিঃ', 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥

শঙ্কর ঃ (বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে বিভক্ত) সকল ভাব পূর্বথেকেই সত্তাবান্ অর্থাৎ ইহারা পূর্বে ছিল এবং শুধু তাদের আপন জাতি ও প্রকৃতির এবং অবিদ্যাকৃত নাম ও রূপের মায়ার দ্বারা তারা জন্ম নেয় অথবা অন্য কথায়, তারা প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের মধ্যে নির্গত হয়। বস্তুতঃ যেমন লেখক পরে বলেন, "বন্ধ্যা রমণী থেকে কোন পুত্র সত্যভাবেই হ'ক বা মায়ার দ্বারা হ'ক জন্মায় না।" কারণ যদি অসত্তা থেকে জন্ম—অর্থাৎ শূন্য থেকে কিছু বিষয়ের উৎপত্তি—সম্ভব হ'ত, তাহ'লে ব্যবহার ও অনুভূতির এই জগৎকে আয়ত্ত করার কোন কারণ থাকত না এবং ব্রহ্ম স্বয়ং অসদ্‌বস্তু হ'য়ে উঠতেন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে অবিদ্যাকৃত মায়ার বীজ হ'তে উৎপন্ন রজ্জুতে সর্প ও অন্যান্য মূর্তি সত্যই বিদ্যমান থাকে রজ্জুর আত্মারূপে—অথবা সেক্ষেত্রে অন্য আশ্রয় হিসাবে। কারণ আশ্রয় না থাকলে কেহ কখন রজ্জুতে সর্প, মরীচিকা ও এই প্রকারের অন্যান্য মতিবিভ্রম অনুভব করে না। যেমন রজ্জুতে সর্পের উৎপত্তির পূর্বেই ইহা রজ্জুতে রজ্জুর আত্মারূপে বিদ্যমান ছিল, তেমন সকল প্রাতিভাসিক ভাবের উৎপত্তির পূর্বেই তারা বিদ্যমান থাকত বিষয়সমূহের বীজের আত্মা রূপে যাকে বলা হ'ত প্রাণ। আর শ্রুতিও বলে, "এই বিশ্ব ব্রহ্ম", "আদিতে এই সকল কিছু ছিল পরম চিৎ-পুরুষ।" প্রাণই সর্ব উৎপাদন করে চেতনার পৃথক সব রশ্মি হিসাবে;—সূর্যের রশ্মিগুলি যেমন, এই যে পুরুষ চিৎ অর্থাৎ সচেতন সৎ তাঁর এইসব চেতনা-রশ্মিও ঠিক তেমন, এবং এই সবের পার্থক্য স্পষ্টভাবে জানা যায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ভেদে তিনটি বিভিন্ন আলোকের অধীনে দেবতা, প্রাণী, প্রভৃতির বিভিন্ন দেহে—ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিম্বগুলি স্পষ্ট দেখা যায় পৃথক পৃথক জলখণ্ডে; তারা নিক্ষিপ্ত হয় পুরুষ থেকে এবং যদিও তারা তাদের ক্রিয়া ও ভোগের ক্ষেত্রস্বরূপ পৃথক অস্তিত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন, তবু অগ্নির সব স্ফুলিঙ্গের মত তারা সকলেই সদৃশ এই কারণে যে তারা জীব অথবা সোপাধিক আত্মা। এইরূপে প্রাজ্ঞ বা কারণ আত্মা অন্য সকল ভাবের প্রাতিভাসিক জন্ম দেয় যেমন উর্ণনাভ উৎপাদন করে তার সূত্রকে। শ্রুতির এই বচন তুলনা কর, "যেমন অগ্নি নির্গত করে স্ফুলিঙ্গসমূহ।"

বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা ॥ ৭ ॥

৭। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল কেহ কেহ মনে করে যে সর্বক্ষম শক্তিই সকল বিষয়ের উৎস আর অন্যেরা মনে করে সৃষ্টি এক মায়া বা স্বপ্ন।

বিভূতিবিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে; ন তু পরমার্থ-চিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরূরূপ ঈয়তে' ইতি শ্রুতেঃ। ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গো-চরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতং চ পশ্যতাং তৎকৃত-মায়াদিসতত্ত্বচিন্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ সুষুপ্তস্বপ্নাদিবিকাসঃ; তদারূঢ় মায়াবিসমশ্চ তৎস্থপ্রাজ্ঞতৈজসাদিঃ; সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নঃ অদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থতত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামে-বাদরো মুমুক্ষূণামার্যাণাম্, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইত্যতঃ সৃষ্টি-চিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ—স্বপ্নমায়াসরূপেতি। স্বপ্নসরূপা মায়া-সরূপা চেতি॥

শঙ্কর: সৃষ্টিসম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করে যে সৃষ্টি হ'ল ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শক্তি, বলা যেতে পারে ঈশ্বরের বিস্তার; কিন্তু ইহাতে এই অর্থ সূচিত হয় যে যারা চূড়ান্ত ও পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে ব্যগ্র তাদের সৃষ্টি-সম্বন্ধে কোন আগ্রহ থাকে না। কারণ, যখন দেখা যায় যে ঐন্দ্রজালিক আকাশে রজ্জু নিক্ষেপ করে সশস্ত্র ও সজ্জিত হ'য়ে তাতে আরোহণ করে এবং পরে আরো উঠে দৃষ্টির বাহিরে যায় এবং যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হ'য়ে পড়ে যায় এবং আবার সমস্ত শরীর নিয়ে উত্থান করে তখন তার তৈরী এই মায়া ও ইহার বিভিন্ন গুণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে কেহ আগ্রহী হয় না। ঠিক সেইরূপ সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার বিকাশও ঐন্দ্রজালিকের রজ্জুর আত্ম-প্রসরণেরই সদৃশ, আর এই তিন অবস্থায় স্থিত প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব আত্মা রজ্জু-আরোহণরত ঐন্দ্রজালিকের সদৃশ, কিন্তু প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক রজ্জু অথবা আরোহণকারী নয়, সে অন্য। ঠিক সে যেমন অদৃশ্য ও মায়াচ্ছন্ন হ'য়ে মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনই হয় তুরীয়-অভিহিত প্রকৃত ও পারমার্থিক তত্ত্বের বেলায়। সুতরাং তাঁর জন্যই মমুক্ষু আর্যচিত্তবান ব্যক্তিদের আগ্রহ, সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন

কল্পনায় তাদের আগ্রহ থাকে না, এসব কল্পনা তাদের কাছে অর্থহীন। এই কারণে লেখক বলতে চান যে এই সব তথ্য সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শুধু কল্পনা আর ইহার পর তিনি আরো বলেন যে অন্যেরা মনে করে যে সৃষ্টি মায়াতুল্য অথবা স্বপ্নতুল্য।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎপ্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ॥ ৮॥

৮। যারা সৃষ্টিবিষয়ে কৃতনিশ্চয় তারা বলে যে ইহা শুধু প্রভুর ইচ্ছা; যারা কাল সম্বন্ধে চিন্তাশীল তারা মনে করে যে কাল থেকেই প্রাণীদের জন্ম।

ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সত্যসংকল্পত্বাৎ সৃষ্টিঃ ঘটাদীনাং সঙ্কল্পনামাত্রং, ন সংকল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃষ্টিরিতি কেচিৎ॥

শঙ্কর ঃ সৃষ্টি হ'ল প্রভুর সংকল্প কারণ দিব্য ভাবনাগুলি সত্য তথ্য হ'তে বাধ্য––ঘট প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু ভাবনা, ইহার ভাবনার বেশী কিছু নয়। কেহ কেহ বলে যে সৃষ্টি কালের ফল।

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ ৯॥ ইতি।

৯। অন্যেরা বলে যে সৃষ্টি ভোগের জন্য, আবার অপর ব্যক্তিরা বলে যে ইহা ক্রীড়ার জন্য। বাস্তবিকই ঈশ্বরের স্বভাবই ইহা; অন্য সব মত সম্বন্ধে––বলা যায় যে তিনি আপ্তকাম, তাঁর আর কোন বিষয়ের জন্য স্পৃহা থাকবে কেন?

ভোগার্থম্ ক্রীড়ার্থমিতি চ অন্যে সৃষ্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়োর্দূষণং দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মিতি দেবস্য স্বভাবপক্ষমাশ্রিত্য, সর্বেষাং বা পক্ষাণাম্––আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। ন হি রজ্জ্বাদীনামবিদ্যাস্বভাবব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তুম্॥

শঙ্কর ঃ অন্যেরা মনে করে যে সৃষ্টি করা হ'য়েছিল ভোগের জন্য অথবা ক্রীড়ার জন্য। এই দুই মতের সমালোচনা করা হ'ল এই বলে যে "ঈশ্বরের স্বভাবই ইহা।" অথবা ইহাও সম্ভব যে দিব্য স্বভাবের আশ্রয় নেওয়া হ'ল এই কারণে যে তাহ'লে অন্য সব মতের সমালোচনা করা যাবে এই যুক্তি দিয়ে যে তিনি আপ্তকাম এবং কোন বিষয়ের জন্য তাঁর স্পৃহা থাকবে কেন? কারণ, রজ্জুতে ও অন্য আশ্রয়ে সর্পাদির প্রতিভাসের জন্য অবিদ্যার স্বভাব ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণ বলা সম্ভব নয়।

নিবৃত্তেঃ সর্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্যো বিভুঃ স্মৃতঃ॥ ১০॥

১০। যাঁকে তুরীয় বলা হয় তিনি সকল দুঃখের নিবৃত্তির ঈশ্বর, প্রবল প্রভু ও অব্যয়, সকল ভাবের দ্বৈতশূন্য এক, ব্যেপে থাকেন এমন ভাস্বর এক।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি। প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বলক্ষণানাং সর্বদুঃখানাম্ নিবৃত্তেঃ ঈশানঃ তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি; দুঃখ-নিবৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যর্থঃ, তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাদ্ দুঃখনিবৃত্তেঃ। অব্যয়ঃ ন ব্যেতি, স্বরূপান্ন ব্যভিচরতি ন চ্যবত ইত্যেতৎ। কুতঃ? যস্মাৎ অদ্বৈতঃ, সর্বভাবানাম্—সর্পাদীনাং রজ্জুরদ্বয়া সত্যা চ; এবং তুরীয়ং, 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' ইতি শ্রুতেঃ—অতো রজ্জুসর্পবৎ-মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবঃ দ্যোতনাৎ তুর্যঃ চতুর্থঃ বিভুঃ ব্যাপী স্মৃতঃ॥

শঙ্কর ঃ আত্মা, তুরীয় অথবা পারমার্থিকতত্ত্ব সকল দুঃখের নিবৃত্তির ঈশ্বর, ইহারা সব প্রাজ্ঞ, তৈজ ও বিশ্ব পাদের অন্তর্গত। 'প্রভু' কথাটি 'ঈশান' পদেরই ব্যাখ্যা; ইহার অর্থ এই যে তাঁর যে শক্তি ও প্রভুত্ব তা দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে, কারণ সকল দুঃখের নিবৃত্তি আসে তাঁর জ্ঞান থেকে। অব্যয়, কেননা তিনি চলে যাননা, বিচলিত হন না অথবা প্রস্থান করেন না, অর্থাৎ তাঁর মূল স্বভাব থেকে। ইহা কেমন? কারণ সকল প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের অসারত্ব (মিথ্যাত্ব) হেতু তিনি দ্বৈতহীন এক। তাঁকে দেব, ভাস্বর একও বলা হয় দ্যুতির কারণে, তিনি তুরীয় এবং বিভু (যিনি

ব্যেপে থাকেন তিনি), সর্বত্র অবস্থিত।

কার্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতেজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১॥

১১। বিশ্ব ও তৈজস কারণ ও কার্য দ্বারা বদ্ধ ব'লে স্বীকৃত। প্রাজ্ঞ বদ্ধ থাকে শুধু কারণের দ্বারা; এই দুটিই যে তুরীয়ে থাকে না তা সিদ্ধ।

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্যযাথাত্ম্যাবধারণার্থম্—কার্য ক্রিয়ত ইতিফলভাবঃ কারণং করোতীতি বীজভাবঃ। তত্ত্বাগ্রহণান্যথা-গ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্বতেজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ ইষ্যেতে। প্রাজ্ঞস্তু বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্রমেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বে নিমিত্তম্। ততঃ দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ, ন বিদ্যেতে, সম্ভবত ইত্যর্থঃ॥

শঙ্করঃ তুরীয়ের যথার্থ আত্মা যাতে স্পষ্ট হয় সেজন্য বিশ্ব ও অন্য দুটির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণগুলি এখন নিরূপণ করা হ'চ্ছে। কার্য, যা তৈরী হয় বা সাধিত হয় তা, হ'ল ফল হিসাবে ভাব। কারণ, যা তৈরী করে বা সাধন করে তা বীজ হিসাবে ভাব। সত্য সম্বন্ধে বোধ না থাকায় বা মিথ্যা বোধ থাকায়, উপরি-উক্ত বিশ্ব ও তৈজস যে ফল ও বীজ হিসাবে ভাবের দ্বারা বদ্ধ বা কারারুদ্ধ থাকে তা স্বীকৃত। কিন্তু প্রাজ্ঞ বদ্ধ থাকে শুধু বীজ হিসাবে ভাবের দ্বারা। কারণ বীজাবস্থার অর্থ শুধু সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব (তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা নয়) আর ইহাই প্রাজ্ঞপাদের হেতু। সুতরাং এই দুটিই, বীজ হিসাবে ভাব ও ফল হিসাবে ভাব, সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব এবং মিথ্যা বোধ, তুরীয়ে প্রযোজ্য নয় ব'লে স্বীকৃত, অর্থাৎ ইহারা তাঁর মধ্যে থাকে না ও ঘটতে পারে না।

নাত্মানং ন পরং চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চিন সংবেত্তি তুর্যং তৎসর্বদৃক্সদা॥ ১২॥

১২। প্রাজ্ঞ কিছুই জানে না, নিজেকেও নয়, অপরকেও, সত্যও নয়,

মিথ্যা নয়; তুরীয় সকল কিছু দেখে সর্বদা।

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্য তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণ-লক্ষণৌ বন্ধৌ ন সিধ্যত ইতি? যস্মাৎ––আত্মবিলক্ষণম্, অবিদ্যাবীজ-প্রসূতং বেদ্যং বাহ্যং দ্বৈতম্––প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি, যথা বিশ্বতে-জসৌ; ততশ্চাসৌ তত্ত্বাগ্রণণেন তমসা অনথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি। যস্মাৎ তুর্য তৎসর্বদৃক্ সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সর্বদা সদৈব ভবতি, সর্বং চ তদ্ দৃক্চেতি সর্বদৃক্; তস্মান্ন তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্। তত্র তৎপ্রসূতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপ্যতত্রবাভাবঃ। ন হি সবিতরি সদাপ্রকাশাত্মকে তদ্‌বিরুদ্ধমপ্রকাশনমন্যথাপ্রকাশনং বা সংভবতি, 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরি-লোপে বিদ্যতে' ইতি শ্রুতেঃ। অথবা জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ সর্বভূতাবস্থঃ সর্ব-বস্তুদৃগাভাসস্তুরীয় এবেতি সর্বদৃক্‌সদা, 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥

শঙ্করঃ কিন্তু তাহ'লে ইহা কেমন যে প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ অথচ বলা হ'চ্ছে যে তুরীয়ে সত্যের বোধের অভাবের দ্বারা ও মিথ্যাবোধের দ্বারা উদ্ভুত দুইরকম বন্ধন অসম্ভব? এই জন্য যে এক বহির্বিশ্বের এই যে সব দ্বৈতভাব তাকে প্রাজ্ঞ এমন কি অবিদ্যা থেকে ও সীমাবদ্ধভাবে আত্মা থেকে পৃথকভাবে মোটেই উপলব্ধি করে না, যার ফলে সে-ও বিশ্ব ও তৈজসের মত বদ্ধ হয় সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাবের দ্বারা, সেই অন্ধকারের দ্বারা যা মিথ্যাবোধের বীজ হ'য়ে ওঠে; আরো এই কারণ যে তুরীয় সকল বিষয়কে অন্ধকারে ঢেকে রাখে চিরকালের জন্য। অর্থাৎ যেহেতু তুরীয় ছাড়া অন্য কিছু সত্যসত্যই থাকে না, সেহেতু তিনি যা সব আছে সে সবের দেখায় সর্বদর্শী এবং সকল সময় ও চিরকাল সর্বজ্ঞ; সুতরাং বীজাবস্থা যার সীমাজনক লক্ষণ হ'ল সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই মিথ্যা বোধও থাকে না কারণ তা আসে বোধের অভাব থেকে। সূর্য স্বভাবতঃই চিরদিন প্রকাশমান আর অপ্রকাশ বা মিথ্যাপ্রকাশ যা তার স্বভাববিরুদ্ধ তা তাতে ঘটতে পারে না; আর এই একই যুক্তি প্রযোজ্য (দ্রষ্টার) সর্বদর্শিতার ক্ষেত্রে। শ্রুতিও বলে, "কারণ দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ নেই।" অথবা বাস্তবিকই, যেহেতু ইহাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নপাদে সর্বভূতে অবস্থিত হ'য়ে তাদের মধ্যে আলো বা প্রতিফলন যাতে সকল বিষয় দৃশ্য, জ্ঞেয় বিষয়রূপে উপস্থিত হয়, সেহেতু,

ইহা এই প্রকারেও চিরকালের জন্য সকল বিষয়ের দ্রষ্টা। শ্রুতি বলে, "দ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছু নেই।"

সদানন্দকৃত 'বেদান্তসার'

প্রার্থনা

পরমার্থসৎ-এর উদ্দেশে

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম্ অবাঙ্মনসোগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারম্ আশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে॥ ১॥

১। যিনি শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও আনন্দ, অখণ্ড, বাক্ ও মনের অগোচর অখিলবিশ্বের আধারস্বরূপ আত্মা তাঁর আশ্রয় আমি লই—আমার কামনা ও উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়।

গুরুদের উদ্দেশে

অর্থতোঽপ্যদ্বয়ানন্দান্ অতীতদ্বৈতভানতঃ।
গুরূনারাধ্য বেদান্তসারং বক্ষ্যে যথামতি॥ ২॥

২। যে গুরুগণ কথায় ও কাজে অদ্বয় একে আনন্দ পান এবং যাঁদের কাছ থেকে তিরোহিত হ'য়েছে দ্বৈতের সকল প্রতিভাস সেই গুরুদের আরাধনা ক'রে আমি বেদান্তসার ব্যক্ত করব আমার বুদ্ধির সামর্থ্য অনু-যায়ী।

প্রস্তাবনা

বেদান্তীর শিক্ষা

বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরিক-সূত্রাদীনি চ॥ ৩॥

৩। বেদান্তর অর্থ উপনিষদ্ যা দর্শনের প্রমাণ হিসাবে এবং উপকারী

পরিপূরক জিজ্ঞাসা হিসাবে শরীরধারী অন্তঃপুরুষ সম্বন্ধে সূত্রাবলী।

অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়ৈরেবানুবন্ধৈস্তদ্বত্তাসিদ্ধের্ন তে পৃথগালোচনীয়াঃ ॥ ৪ ॥

৪। যেহেতু বেদান্তই এই গ্রন্থের বিষয় আর উভয়েতেই প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সদৃশ, সেহেতু এই গ্রন্থের বর্ণিত অনুবন্ধ বেদান্তর অনুবন্ধেরই সমান এবং পৃথকভাবে তাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অত্র অনুবন্ধো নাম অধিকারিবিষয়সম্বন্ধপ্রয়োজনানি ॥ ৫ ॥

৫। অনুবন্ধের অন্তর্ভূক্ত চারিটি বিষয় হ'ল অধিকারী (যোগ্য শ্রোতা), বিষয়, সম্বন্ধের ন্যায়বত্তা, গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মলস্বান্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥ ৬ ॥

৬। বেদান্তের অধিকারী শুধু সে-ই যে ইহার সম্বন্ধে যথার্থ অবধারণায় উপনীত হবার উপযুক্ত। সুতরাং সে এমন হবে যে পূর্বেই বেদ ও বেদাঙ্গ সঠিকভাবে অধ্যয়ন ক'রে বেদের সমগ্র অর্থ আয়ত্ত করেছে, যে প্রথমে এই জন্মে বা অন্য জন্মে নিষিদ্ধ কর্ম ও কামনা-চালিত বর্জন ক'রে ও পরে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান ক'রে নিজেকে সকল পাপ ও কলুষ থেকে মুক্ত করেছে এবং মন ও হৃদয়ের একান্ত বিশুদ্ধতা লাভ করেছে; আবার তার সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নও হওয়া চাই।

কাম্যানি স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ॥ ৭ ॥

৭। কাম্য কর্মের অর্থ সেই সব সাধন যাদের দ্বারা আমরা অন্বেষণ

করি ঊর্ধ্বে স্বর্গ সুখ থেকে শুরু করে নিম্নে সকল প্রকার সুখ, যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ।

নিষিদ্ধানি নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রহ্ম-হননাদীনি॥ ৮॥

৮। নিষিদ্ধ কর্মের অর্থ সেই সব সাধন যাদের দ্বারা আমরা লাভ করি নিম্নের নরকযন্ত্রণা থেকে আরম্ভ করে আমাদের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট,—যেমন ব্রহ্ম-হত্যা, ও অন্যান্য পাপ ও ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ।

নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি॥ ৯॥

৯। নিত্য কর্মের অর্থ সন্ধ্যাবন্দনাদি সেই সব অনুষ্ঠান যা সব না করা হ'লে সে সব দোষ ও বাধা হয়ে ওঠে।

নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টচাদীনি॥ ১০॥

১০। নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ সেই সব অনুষ্ঠান যা কোন বিশেষ উপলক্ষে করণীয়, যেমন পুত্রজন্মের পর নবজাতককে আশীর্বাদ।

প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি॥ ১১॥

১১। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ আত্ম-সংযমের ব্রত ও অনুষ্ঠান, যেমন চান্দ্রায়ণ ব্রত; ইহারা শুধু পাপক্ষয়ের সাধন।

উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি॥১২॥

১২। উপাসনার অর্থ সেই সব বিবিধ মানসব্যাপার যাদের সমগ্র বিষয় ও উদ্দেশ্য হ'ল পুরুষবিধ দেবতারূপে ব্রহ্ম—যেমন শাণ্ডিল্যের ভগবৎ-প্রেম কলা।

এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্, উপাসনানান্তু

চিত্তৈকাগ্র্যম্। তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিশ্রুতেঃ, তপসা কল্মষং হন্তি ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ॥ ১৩॥

১৩। প্রথম তিনটির অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের ও প্রায়শ্চিত্তের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বুদ্ধির শুদ্ধিকরণ; কিন্তু উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল একটি মাত্র বিষয়ে হৃদয় ও মনের একাগ্রতা। একথার প্রমাণ হ'ল শ্রুতির এই সব উক্তি, "ইহাই সেই আত্মা যার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণরা জানতে চাইবে বেদের ব্যাখ্যার দ্বারা এবং তাকে জানবার সাধনা করবে যজ্ঞের দ্বারা।" স্মৃতিরও অনেক বচন থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়, যেমন "তপস্যার (সংকল্পের অভিনিবিশের) দ্বারা পাপের নিধন হয়।"

নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাঞ্চ অবান্তরফলং পিতৃলোকসত্যলোক-প্রাপ্তিঃ। কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যতে দেবলোকঃ ইত্যাদিশ্রুতেঃ॥ ১৪॥

১৪। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের এবং উপাসনা ও আরাধনার এক গৌণ ফল হ'ল পিতৃলোকপ্রাপ্তি ও সত্যলোকপ্রাপ্তি। কারণ শ্রুতি বলে, "কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় পিতৃলোক এবং দেবলোকও।"

সাধনানি নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিসম্পত্তি-মুমুক্ষুত্বানি॥ ১৫॥

১৫। সাধনের অর্থ অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য বস্তুর বিবেকজ্ঞান; এই জগতে বা অন্য জগতে ভোগে বিরাগ; মনের স্থিরতা, আত্ম-দমন ও অন্যান্য নৈতিক উৎকর্ষ; মোক্ষকামনা।

নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকস্তাবৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলম-নিত্যমিতি বিবেচনম্॥ ১৬॥

১৬। অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য বস্তুর বিবেকজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি ব্রহ্মকেই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য সব কিছুকে অনিত্য ও নশ্বর বিবেচনা করা।

পরিশিষ্ট

ঈশাবাস্য উপনিষদ্

টীকা

ঈশ্বরের দ্বারাই এই সকল কিছুকে বস্ত্রাবৃত করতে হবে---এই গতিশীল বিশ্বের মধ্যে যা কিছু জগৎ সে সবকে; সুতরাং কামনা ত্যাগ ক'রে ভোগ করো, আর কোন লোকের ধন লোভ করো না।

গুরু

উপনিষদে ঈশ্বরের বিশ্বাত্মক প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হ'চ্ছে এই ব'লে যে ইহা তার বিভিন্ন প্রকাশের অপরিহার্য ভিত্তি। সনাতন ব্রহ্মের এই বিশ্বাত্মক প্রকৃতিই বেদান্তর আদি ও অন্ত; আর ইহা স্বীকার না করা হ'লে বেদান্তর কোন কথারই কোন মূল্য থাকে না, কারণ ইহার সকল বক্তব্যই হয় ঐ তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত, নয় অন্ততঃ ঐ তত্ত্বস্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল; এই কেন্দ্রীয় ও শ্রেষ্ঠ সত্য স্বীকৃত না হ'লে উপনিষদগুলি তা-ই হ'য়ে পড়ে যা ম্লেচ্ছ পণ্ডিত ও দার্শনিকরা তাদের মনে করে---এক রাশ অসংলগ্ন কল্পনা যদিও তার অনেকগুলি মহান্। এই সত্য গ্রহণ করলে ইহা প্রদীপের মত শ্রুতির সর্বাপেক্ষা দুর্বোধ্য উক্তির উপর আলোকপাত করবে আর তুমি শীঘ্রই উপলব্ধি করবে যে উপনিষদগুলি এক মহান্ সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ জ্ঞানদীপ্ত সমগ্র, সে সবে ব্যক্ত হ'য়েছে সেই একটিমাত্র সার্বিক সত্য ইহার বিভিন্ন দিকে ; কারণ প্রপঞ্চের অগণিত বিরোধের নিম্নে বিরাজ করে এক সত্য আর একটিমাত্রই সত্য ইহা। সকল স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌরদের রচনা আবার সেই রকম সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ও ইহার বিভিন্ন শাস্ত্র---এ সবই বিভিন্ন কোণ থেকে শুধু সেই এক ও একমাত্র সত্যের বিবিধ দিকের ব্যাখ্যা, টীকা ও অর্থপ্রকাশ। এই সত্যই একমাত্র ভিত্তি যার উপর সকল ধর্ম দাঁড়াতে পারে যেন এক স্থির ও অভেদ্য পাহাড়ের উপর---আর পাহাড় অপেক্ষাও দৃঢ় ইহা, কারণ পাহাড় ধ্বংস হ'তে পারে কিন্তু এই সত্য চিরস্থায়ী। সেজন্যই আর্যদের ধর্মকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। আর হিন্দুরা যে বলে যে শ্রুতি অনাদি ও চিরন্তন আর মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিরা সত্যদ্রষ্টা মাত্র, তাঁরা শুধু সত্য প্রকাশ করেছিলেন মানুষী ভাষায় সে কথা ভুল নয়; কারণ এই দৃষ্টি মানসিক

দৃষ্টি নয়, ইহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি। সেজন্য বেদকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা হয় শ্রুতি বা অলৌকিক প্রকাশ। ইহাদের মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব হ'ল উর্বরকারী বৃষ্টি যা সত্যের ছোটগাছকে পুষ্টি দিয়ে বড় করেছিল, ব্রাহ্মণগুলি সেই অরণ্য যার মধ্যে এই গাছ পাওয়া যায়, আরণ্যক সেই মাটি যাতে ইহা বৃদ্ধি পায় আর উপনিষদগুলিই সেই গাছ, ইহার মূল, কাণ্ড, কুণ্ড ও পাপড়ি সমেত আর ইহার যে কুসুম নিজেকে একবার ও চিরতরে ব্যক্ত করেছে তা হ'ল সেই মহাবাক্য "সোহহম্", "আমিই তিনি" যা উপনিষদগুলির চূড়ান্ত কথা। "সোহহম্"কে নমস্কার। প্রণাম ব্রহ্মকে যিনি দেশ, কাল, কারণ বা সীমার অতীত। প্রণাম আমার আত্মাকে যা ব্রহ্ম।

শিষ্য

ব্রহ্মকে ও আমার আত্মা যা ব্রহ্ম তাকে আমি প্রণাম করি। স্বাহা।

গুরু

সুতরাং এই উপনিষদের শুরু এই ব'লে যে এই সবকে আচ্ছাদিত বা বস্ত্রাবৃত করতে হবে ঈশ্বর দিয়ে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে মোক্ষ পেতে হ'লে ব্যষ্টি জীবাত্মার বা মানুষী অন্তঃপুরুষের কর্তব্য হ'ল এই সকল বিশ্বকে ঈশ্বর দিয়ে আবৃত করা, যেমন লোকে তার শরীর আবৃত করে পোষাক দিয়ে। ঈশ্বর বলতে আমরা স্পষ্টতঃই অজ্ঞেয় পরব্রহ্মকে বুঝি না কারণ অজ্ঞেয় সম্বন্ধে আমরা দেশ, কাল বা ভেদের সংজ্ঞা দিয়ে কিছু বলতে পারি না; ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি ব্রহ্ম যাঁকে জানা যায় যোগের দ্বারা, যিনি একম্-এর শক্তির দ্বারা সৃষ্ট একম্-এরই জ্যোতির্ময় ছায়া, যিনি নিজেকে পুরুষ ও প্রকৃতিতে ভাগ ক'রে অসংখ্য নাম ও রূপের এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মকে বলা হ'চ্ছে ঈশ (অর্থাৎ ঈশ্বর) বলে; অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধারণা হ'ল যে তিনি বিশ্বের শাসক ও অধিপতি। কিন্তু তবু তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির মহাসমুদ্র যা শুধু নিজের সান্নিধ্যের দ্বারাই সক্রিয় ক'রে তোলে সনাতন পরব্রহ্মের সৃজনশীল, রক্ষণশীল ও সংহারশীল শক্তি বা সংকল্প আর ইহারই রূপ হ'ল প্রকৃতি, সক্রিয়শক্তির গতিশীল মহাসমুদ্র, "কারণ জলঃ"। এই যে দুটি আধ্যাত্মিক শক্তির মহাসমুদ্র ও জড়রূপের মহাসমুদ্র ইহাদের

মধ্যে শেষেরটি অপরটির মধ্যে আশ্রিত আর অপরটি ব্যতিরেকে ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। বলা যায় যে জড়সমুদ্র আধ্যাত্মিক সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত বা আচ্ছাদিত। ঈশ্বর স্বয়ং মহাসমুদ্রের উপর বিরাজিত নানা রূপে––প্রাজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট রূপে অর্থাৎ বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বর রূপে। ইহাই পুরাণের সেই চিত্র যাতে বিষ্ণু শয়ান আছেন মহাসাগরে দেশ ও কালের সর্পের উপর আর ব্রহ্মা বাহির হ'চ্ছেন তাঁর নাভিস্থ পদ্ম থেকে। ইহাই ঈশ্বর, রাজা ও শাসক। সুতরাং আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য যে এই বিশ্বের সকল কিছুই ব্রহ্মের সেই মহাসমুদ্রের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি যা তাদের বেষ্টন করে থাকে যেমন পরিচ্ছদ বেষ্টন করে পরিচ্ছদধারীকে।

শিষ্য

বুঝলাম না। ইহা নিশ্চিত যে সকল বিষয়ই স্বয়ং ব্রহ্ম; তাহ'লে একথা কেন বলা হ'বে যে তিনি সকল কিছুকে ঘিরে আছেন, যেন তিনি সে সব থেকে ভিন্ন?

গুরু

এই কথার অর্থ এই যে যেসব সীমিত ব্যষ্টি চেতনা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় বিষয়-আকারে সে সবই সেই সার্বিক ও অবিভক্ত চেতনার দ্বারা বেষ্টিত ও তার অন্তর্গত যাকে আমরা ব্রহ্ম বলি।

শিষ্য

এখনও আমি বুঝলাম না। এক অবিভাজ্য চেতনাকে ভাগ করা যায় কি ভাবে, অথবা যদি ইহা বিভক্ত হয় তাহ'লে কেমন ক'রে ইহা সম্ভব যে ইহা এক থাকবে আবার সেই সঙ্গে তার নিজের বিভিন্ন অংশকে বেষ্টন করবে? ইহা সম্ভব নয় যে কোন বিষয় একই সঙ্গে এক ও অবি-ভাজ্য আবার তবু বিভাজ্য ও বহুবিধ।

গুরু

বরং চেতনার ইহাই স্বভাব যে ইহা চিরন্তনভাবে এক ও অবিভাজ্য আবার সর্বদাই ইচ্ছামত বিভাজ্য; কারণ মানুষের চেতনা প্রায়ই দুটি

অবস্থায় বিভক্ত হয় আর প্রতিটির নিজ নিজ ইতিহাস ও স্মৃতি থাকে, ফলে যখন সে এক অবস্থায় থাকে তখন সে অন্য অবস্থায় যা ভাবছে ও করছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। এই ঘটনা থেকে সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে মানুষের চেতনা এক ও সম প্রকারের হ'তে পারে না, ইহা বিভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্বের এক সমষ্টি। সাংখ্য দার্শনিকরা ও অন্যেরা মনে করে একটিমাত্র পুরুষ থাকতে পারে না, অসংখ্য পুরুষ থাকা চাই কেননা অন্যথায়, তাদের মতে, সকলে একই জ্ঞান পাবে, একই সুখদুঃখ ইত্যাদি ভোগ করবে। কিন্তু ইহা অবিদ্যামাত্র, আর যখন আপাতপ্রতীয়মান ব্যষ্টি পুরুষ নিজেকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ যোগাবস্থার মধ্যে স্থাপন করে তখন সে দেখতে পায় যে সকল সময়ে একটি মাত্র পুরুষই বর্তমান ছিল যে অন্যদের সম্বন্ধে জানত ও নিজের মধ্যে তাদের ধারণ করত এই অর্থে যে তারা ছিল শুধু তার থেকে বিভিন্ন সৃষ্টি। বিভক্ত চেতনার এই অবস্থা-গুলি শুধু একই ব্যক্তিসত্ত্বের বিভিন্ন অবস্থা, ইহারা পৃথক ব্যক্তিসত্ত্ব নয়। এই কথা তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হবে যদি লোকটিকে কোন কুশল ও সাবধানী সম্মোহনকারী নিদ্রার সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে; কারণ তখন প্রায়শঃই ব্যক্তিসত্ত্বের এক তৃতীয় অবস্থা বিকশিত হবে যা বরাবরই জানত অন্য দুটি যা করছিল ও বলছিল। এই একটি ঘটনাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হয় যে বরাবরই চেতনার ঐক্য বর্তমান ছিল, অবশ্য মগ্ন অবস্থায় কিন্তু নিরন্তর বর্তমান ও অধিচেতনভাবে সক্রিয়। এই যে এক চেতনার দুই পৃথক অবস্থায় বিভাগ তা অবিদ্যার এক বিশেষ ও-অসাধারণ ক্রিয়ার ফল, আর এই অবিদ্যা সেই একই বিশ্বব্যাপী নির্জ্ঞান যার সর্বজনীন ও সাধারণ ক্রিয়ায় লোকে মনে করে যে তারা বিশ্বজনীন চেতনা থেকে ভিন্ন আত্মা, কেবলমাত্র ঐ চেতনার সৃষ্ট অবস্থা বা বৃত্তি নয়। তাহ'লে আমরা এখানে এমন এক দৃষ্টান্ত পেলাম যাতে প্রমাণিত হয় যে এক ও অবিভাজ্য চেতনা বিভক্ত ও বহুবিধ হচ্ছে আবার তবু সর্বদাই এক ও অবিভাজ্য রয়েছে। এই যে একক অবিভাজ্য চেতনা অর্থাৎ জাগ্রত মানুষের "আমি", তা নিজে এক আরো বৃহত্তর চেতনার এক বিভাগমাত্র অথবা বরং এক অবস্থামাত্র; এই বৃহত্তর চেতনা স্থূল জড়ের আরো বেশী অনধীন আর ইহার সক্রিয়তা কিছু প্রকাশ পায় স্বপ্নাবস্থায়; স্বপ্ন-সম্মোহন শুধু ইহার এক বিশেষ ও খেয়ালী রূপ; কিন্তু এই চেতনা আরো স্থায়ী ও সংলগ্নভাবে অবশেষে মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পর স্থূল শরীর থেকে মুক্ত হয়। এই বৃত্তর

চেতনাকে বলা হয় স্বপ্নাবস্থা আর যে শরীর বা উপাধিতে ইহা কাজ করে তাকে বলা হয় সূক্ষ্মশরীর। বলা যেতে পারে যে পরিচ্ছদ যেমন তার পরিধানকারীকে ঘিরে রাখে স্বপ্ন চেতনাও তেমন ঘিরে রাখে জাগ্রত চেতনা ও ইহার দেহকে, কারণ ইহার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিতে ইহা আরো বিশাল ও কম আবদ্ধ; ইহা এক নির্বাচনকারী মাধ্যম যা থেকে ও যার সাহায্যে এক আরো বৃহত্তর চেতনা এক অংশকে নির্বাচন করে জড় জীবনে সব জাগ্রত উদ্দেশ্যের জন্য; এই আরো বৃহত্তর চেতনাকে আমরা বলি সুষুপ্তি অবস্থা বা কারণ শরীর আর ইহা থেকেই বা ইহার দ্বারাই স্বপ্নচেতনা জীবনের জন্য নির্বাচিত হয় জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে। এই সুষুপ্তি অবস্থাকে আবার ঘিরে আছে ব্রহ্ম যা থেকে ও যার দ্বারা ইহা সব কারণিক উদ্দেশ্যের জন্য নির্বাচিত হয়,--ঠিক যেমন পরিচ্ছদ ঘিরে থাকে তার পরিধানকারীকে।

অতএব, তুমি উপলব্ধি করবে যে ব্রহ্ম হ'ল এক বিশাল, শাশ্বতভাবে এক ও অবিভাজ্য চেতনা যা তবু নিজেকে সীমিত করে, অথচ আবার অপরিসীম রয়ে যায় আর ইহা পরিচ্ছদের মত ঘিরে থাকে সকল বিবিধ অবস্থা বা ভ্রান্তিপূর্ণ সীমা।

শিষ্য

সত্য, কিন্তু পরিচ্ছদ তার পরিধানকারী থেকে ভিন্ন।

গুরু

আচ্ছা, ভিতরে শাঁস সমেত এক বাদামের কথা বিবেচনা করা যাক, আমরা দেখি যে বাদামের রূপে বা উপাধিতে যে আকাশ তা শাঁসের উপাধিতে আকাশকে ঘিরে থাকে, যেমন পরিচ্ছদ ঘিরে থাকে তার পরিধান-কারীকে; কিন্তু দুটি একই; একটি আকাশই আছে, দুটি নয়।

শিষ্য

এখন আমি বুঝলাম।

গুরু

এইবার বিবেচনা কর, যে বিষয়টি আচ্ছাদিত বা বস্ত্রাবৃত করতে হবে

তার সম্বন্ধে উপনিষদ্ আরো নির্দিষ্টভাবে কি বলছে---যা কিছু 'জগৎ' বা "জগতী" অথবা আক্ষরিক অর্থে সচলার মধ্যে যা কিছু চলন্ত বিষয়। এখন "জগতী" (সচলা) হ'ল পৃথিবীর এক পুরণো নাম আর পরে ইহার অর্থ হ'ল সমগ্র বিশাল বিশ্ব যার এক জাতিরূপ হ'ল পৃথিবী আর শুধু ইহার সহিতই বর্তমানে আমাদের মানুষদের সংশ্রব। তাহ'লে "জগতী" (সচলা) নামক এই বিশ্বের কথা বলা হ'ল কেন? কারণ ইহা সেই প্রকৃতির এক রূপ যার স্বরূপগত লক্ষণ হ'ল গতি; কারণ গতির দ্বারাই সে এই জড়জগৎ সৃষ্টি করে, আর বাস্তবিকই সকল জড়বস্তু শুধু এক রূপ অর্থাৎ গতির এক ফল যা দেখা যায়, শোনা যায় বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়; প্রতি জড়বস্তুই "জগৎ"---অসীম গতিতে পূর্ণ---এমন কি পাথর ও মাটির তালও। আমাদের সব ইন্দ্রিয় বলে যে এই জড় জগতই একমাত্র সদ্বস্তু; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই মিথ্যা সাক্ষ্য সম্বন্ধে সতর্ক করে উপনিষদ আমাদের দেয় আদেশ যেন আমরা আমাদের হৃদয় ও মনে উপলব্ধি করি আধ্যাত্মিক শক্তির মহাসমুদ্র ব্রহ্মকে, আর আমরা তাঁকে আমাদের কল্পনায় নিয়ে আসি প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের চারিদিকে পরিচ্ছদের মত।

শিষ্য

কিন্তু জড় জগৎ যে নিজেই ব্রহ্ম সে কথা তো উপনিষদ বলে না।

গুরু

একথা ইহা পরে বলবে। এইবার ইহা আমাদের বলে যেন আমরা ভোগ করি তার (জগতে যা সব আছে সে সবের) ত্যাগের দ্বারা, আর যেন লোভ না করি কোন লোকের ধন। সমস্ত জগৎকে আমরা ভোগ করব কিন্তু অন্যের সম্পত্তি আমরা লোভ করব না। কিন্তু ইহা কেমন করে সম্ভব? আমি দেবদত্ত, আমাকে যদি বলা হয় জগতে যা সব আছে সে সব ভোগ কর কিন্তু আমি দেখি যে ভোগ করার মত আমার তেমন কিছু নেই অথচ আমার প্রতিবেশী হরিশচন্দ্রের প্রচুর ধন তাহ'লে তার ধনের হিংসা না করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব আর কেনই বা আমি আমার নিজের ভোগের জন্য তার ধন পেতে চেষ্টা করব না, অবশ্য যদি আমি নিরাপদে তা করতে পারি? আমি চেষ্টা করব না, কারণ আমি পারি

না, কারণ আমি উপলব্ধি করেছি যে এই জগতে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, তিনিই তাঁর শক্তির দ্বারা বিশ্ব ব্যক্ত করেন, কোন দেবদত্ত নেই, কোন হরিশ্চন্দ্র নেই, আছেন শুধু ব্রহ্ম চেতনার বিভিন্ন অবস্থায় যেগুলিকে এইসব নাম দেওয়া হয়। সুতরাং যদি হরিশ্চন্দ্র তার ধন ভোগ করে তাহ'লে আমিই সেই ধন ভোগ করছি কারণ আমিই হরিশ্চন্দ্র---তবে এ আমি আমার শরীর নয় যার মধ্যে আমি কারাবদ্ধ আছি, ইহা আমার কামনা-রাজিও নয় যার দ্বারা আমার শরীর দুর্দশাগ্রস্ত হয়, পরন্তু ইহা আমার সত্যকার আত্মা, আমার অন্তঃপুরুষ যা তার আনন্দের জন্য প্রকৃতির রচিত এই সব মধুর, তিক্ত, কোমল, মহান্, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, সুখকর, বিকট ও পুরোপুরি বিস্ময়কর ও উপভোগ্য জগৎনাটকের দ্রষ্টা ও ভোক্তা। তবে, যদি সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শনের এবং খৃষ্টীয় ও অন্যান্য ধর্মের কথানুযায়ী একটি মাত্র নয়, অগণিত পুরুষ থাকে তাহ'লে খৃষ্টীয় ধর্মের যে আদেশে বলা হয় যে অন্যকে নিজের মত ভালোবাস অথবা শ্রুতি ও স্মৃতিতে সিদ্ধ মুনির যে বর্ণনা দেওয়া হয় যে তিনি "সর্বভূতেহিতে রতঃ", সকল প্রাণীর মঙ্গলে ব্যাপৃত থাকেন ও আনন্দ পান তার কোন যুক্তি থাকে না; কারণ তাহ'লে হরিশ্চন্দ্র কোন প্রকারেই আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হবে না আর আমাদের মধ্যে জড়ীয় সংস্পর্শ ছাড়া অন্য কোন সংস্পর্শের ক্ষেত্র থাকবে না, কিন্তু এই জড়ীয় সংস্পর্শ থেকে ভালোবাসা ও সমবেদনা অপেক্ষা ঘৃণা ও হিংসা আসাই খুব বেশী সম্ভব। তাহ'লে আমি কেমন করে আমার চেয়ে তাকেই বেশী প্রাধান্য দেব? কিন্তু বেদান্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ প্রাধান্যদান স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত ও পরিণামে অবশ্যম্ভাবী। ইহা অপরিহার্য কেননা যেমন আমি পশু থেকে মানুষে আরোহণ করেছি তেমন আমাকে আরোহণ করতে হবে মানুষ থেকে ভগবানে। এই প্রাধান্যদানই চিরন্তন উৎস ও প্রস্রবণ; বিবর্তনের অর্থ শুধু ব্রহ্মের, বিশ্বাত্মক চিৎ-পুরুষের বৃহত্তর ও আরো বৃহত্তর প্রকাশ, জড়ের মিথ্যা থেকে চিৎ-পুরুষের সত্যে অগ্রগতি; আর এই অগ্রগতি যতই মন্থর হ'ক, ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমার চেয়ে অপরকে প্রাধান্য দান কেমন করে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত? ইহা স্বাভাবিক এই জন্য যে প্রকৃতপক্ষে আমি নিজ অপেক্ষা অপরকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি না, আমি প্রাধান্য দিচ্ছি আমার সত্যকার আত্মাকে আমার মিথ্যা আত্মা অপেক্ষা, প্রাধান্য দিচ্ছি সর্বভূতস্থিত ভগ-বানকে আমার একক দেহ ও মন, দেবদত্ত ও হরিশ্চন্দ্রের মধ্যস্থ আমি,

শুধু দেবদত্তের মধ্যস্থ আমি অপেক্ষা। ইহা ন্যায়সঙ্গত ও অবশ্যম্ভাবী কেননা আমার নিজের ভোগ উপভোগ করা অপেক্ষা হরিশ্চন্দ্রের ভোগ উপভোগ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ এই ভাবেই আমি আমার ব্রহ্মবিদ্যাকে সদ্‌বস্তু করে তুলব, ইহা শুধু এক বুদ্ধিগত প্রত্যয় বা স্বীকৃতি হবে না; আমি ইহাকে পরিণত করব এক অনুভবে, আর স্মৃতি বলে যে অনুভবই প্রকৃত জ্ঞানের সার। এই কারণে উৎকৃষ্ট প্রেম যার অর্থ নারীর প্রতি নরের ইন্দ্রিয়জ সংবেগ মাত্র নয় এক পরম ও মহত্ত্বসাধক বিষয়, কারণ ইহার দ্বারা বিশ্বব্যাপী চেতনার দুই পৃথক অবস্থা একত্র এসে এক হয়। ইহার চেয়ে আরো মহৎ ও আরো মহত্ত্বসাধক হ'ল সেই দেশভক্তের প্রেম যে তার দেশের জন্য জীবনধারণ ও জীবনপাত করে কারণ এইভাবে সে লক্ষ লক্ষ দিব্য এককের সহিত এক হয়, আবার আরো উন্নত, আরো মহৎ ও আরো গৌরবময় হ'ল মানবপ্রেমীর অন্তঃপুরুষ যে নিজের পরিবারবর্গ বা দেশের কথা না ভুলেও জীবনধারণ ও জীবনপাত করে মানবগোষ্ঠীর জন্য বা সকল প্রাণীর জন্য। সে-ই প্রাজ্ঞতম মুনি, মহত্তম যোগী; সে যে শুধু জ্ঞানের পথে ব্রহ্মে উপনীত হয় তা নয়, সে যে শুধু ভক্তির পাখার উপর ভর করে তাঁর কাছে ঊর্ধ্বে গমন করে তা নয়, বরং সে হ'য়ে ওঠে তিনিই ভগবদ্‌নিষ্ঠ কর্মের মাধ্যমে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের জন্য, তার দেশের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য, জগতের জন্য, আর হ্যাঁ, সমর্থ হলে সৌরজগতের জন্য, এইরূপ অন্যান্য জগতেরও জন্য––সমগ্র বিশ্বের জন্য।

সেজন্য উপনিষদ আমাদের বলে যে আমাদের কর্তব্য হ'ল ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা। ইহা এক অদ্ভুত বচন––"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"; মানুষকে ত্যাগ করতে হবে আর যা সে ত্যাগ করেছে তাকে তা ভোগ করতে হবে ঐ ত্যাগেরই দ্বারা––এই কথা তাকে বলা অদ্ভুত। প্রাকৃত মানুষ একথায় পিছিয়ে আসে, ইহা যেন এক বিপজ্জনক বিপরীতার্থক হেঁয়ালি। তবু উপনিষদের ঋষি আমাদের অপেক্ষা বেশী প্রাজ্ঞ কারণ তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ইহার অর্থ চিন্তা করে দেখ। ইহার অর্থ এই যে আমরা যেন আমাদের নিজেদের তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ ত্যাগ করি যাতে আমরা সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হ'তে পারি অপরের সুখে; একজন মানুষের সুখকে তুমি যতই বড় মনে কর, একশ মানুষের সম্মিলিত সুখ নিশ্চয়ই আরো বড় হবে। ত্যাগের দ্বারা তুমি তোমার ভোগকে শতগুণ বৃদ্ধি করতে

পার; যদি তুমি প্রকৃত দেশভক্ত হও তাহ'লে তুমি একজন লোকের সুখ অনুভব করবে না, তুমি অনুভব করবে ত্রিশ কোটি লোকের সুখ; তুমি যদি প্রকৃত মানবপ্রেমী হও তাহ'লে পৃথিবীর অগণিত কোটি লোকের সকল সুখ তোমার অন্তঃপুরুষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে অমৃতসাগরের মত। কিন্তু তুমি বলবে যে তাদের দুঃখও তো প্রবাহিত হবে। ইহাও মাধুর্যের এমন এক ব্যথা যা অন্তঃপুরুষকে উন্নীত করে স্বর্গে, যাতে তুমি পেতে পার সুখ––সেই অতুলনীয় সুখ যাতে পুনর্জীবন লাভ হয় আর যে জাতির জন্য তুমি নিজেকে বলি দাও বা যে মানবজাতির মধ্যে তুমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছ তার দুঃখশোক পরিণত হয় আনন্দে। এমন কি ইহার জন্য ধৈর্যের সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে নিরন্তর চেষ্টা করাও এক অনির্বচনীয় সুখ; এমন কি এরূপ এক ব্রতে পরাজয়ও এক কঠোর সুখ যখন ইহাতে অন্তঃপুরুষ শক্তি পায় নূতন ও অবি-রাম প্রয়াসের জন্য, আর বলির উপযুক্ত মহাত্মারা পরাজয় বা বিজয় থেকে লাভ করে সমানই শক্তি। মনে রেখ যে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির কাছে ব্রহ্ম নিজেকে পুরোপুরি ধরা দেন না; ভগবানকে পায় বলবান শৌর্যশালী পুরুষ। অন্যেরা পারে শুধু তাঁর ছায়া ছুঁতে দূর থেকে। এই ভাবে যে ব্যক্তি পরের মঙ্গলের জন্য নিজের বলার মত যা যৎসামান্য থাকে তা ত্যাগ করে সে তার পরিবর্তে পায় ও পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে এই গতিশীল বিশ্বের মধ্যে যা কিছু জগৎ সে সব।

যদি তুমি অত ঊর্ধ্বে উঠতে না পার, তাহ'লেও উপনিষদের কথাগুলি অন্যভাবে সত্য। ঐ কথার এই অর্থ নয় যে তোমাকে তোমার ভোগ্য বিষয়গুলি স্থূলভাবে ত্যাগ করতে বলা হ'চ্ছে; যদি তুমি সেগুলিকে তোমার হৃদয়ে ত্যাগ কর, যদি তুমি সেসবকে এমন আন্তরভাব নিয়ে ভোগ কর যাতে তুমি লাভে হর্ষোৎফুল্ল হবে না অথবা ক্ষতিতে অবসন্ন হবে না তাহ'লে তা-ই যথেষ্ট। ঐ উপভোগ নির্মল, গভীর ও শান্ত; ভাগ্য ইহাকে ভাঙতে পারে না, তস্কর ইহাকে নিয়ে যেতে পারে না, শত্রু ইহাকে পরাভূত করতে অক্ষম। অন্যথায় তোমার উপভোগ ব্যাহত ও খণ্ডিত হয় ভয়, দুঃখ, অশান্তি ও প্রবল তৃষ্ণার দ্বারা––প্রবল তৃষ্ণা ইহার বৃদ্ধির জন্য, অশান্তি ইহার রক্ষণের জন্য, দুঃখ পাছে তা হ্রাস পায় ও ভয় পাছে সমূহ-নাশ হয়। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা অনেক ভাল। যদি তুমি স্থূলভাবে ত্যাগ করতে চাও তা-ও ভাল যতক্ষণ তুমি সতর্ক থাক যে তুমি তোমার

মনে মনে উপভোগের ভাবনা পোষণ করছ না। বরং ইহা প্রায়ই আরো দ্রুত নিয়ে যাবে ভোগের দিকে। ধন ও যশ ও সাফল্য--এসবের পিছনে যে ছোটে তার কাছ থেকে স্বভাবতঃই সেসব পালিয়ে যায়; এসব না পেলে তার মন হয় ভেঙে পড়ে, নয় সে নিজেই শেষ হয়; আর যদিই বা সে সেসব পায়, তাহ'লে সে তা পায় নারকীয় পরিশ্রমের পর ও পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম ক'রে। কিন্তু যখন সে ধন ও সম্মানকে অগ্রাহ্য করে পিছু ফেরে তখন তারা ভিড় করে তার পায়ে এসে পড়ে অবশ্য যদি না পূর্ব কর্মের জন্য তা ব্যাহত হয়। আর যদি তারা আসে তাহ'লে সে কি সব ভোগ করবে না বর্জন করবে? সে তাদের বর্জন করতে পারে-- ইহা এক মহান্ পথ, অসংখ্য সাধুপ্রকৃতির জ্ঞানী এ পথে গেছেন, কিন্তু সে সব বর্জন করার প্রয়োজন নেই, তুমি সে সব নিয়ে ভোগ করতে পার। তাহ'লে কেমন করে তুমি তা ভোগ করবে? তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, তোমার মিথ্যা আত্মার জন্য নিশ্চয়ই; কারণ তুমি আগেই তোমার হৃদয়ে ঐরূপ উপভোগ ত্যাগ করেছ; কিন্তু তুমি উপভোগ করতে পার তাদের মধ্যে ভগবানকে, এবং তাদের উপভোগ করতে পার ভগবানের জন্য। রাজা যেমন নজরানা শুধু স্পর্শ ক'রে তা পাঠিয়ে দেন সরকারী কোষাগারে, তুমিও তেমন তোমার কাছে আসা ধনকে শুধু স্পর্শ করে তা বাহিরে ঢেলে দিতে পার তোমার চারিদিককার সব লোকের জন্য, দেশের জন্য, মানবজাতির জন্য--এসবে ব্রহ্মকে দেখে। আবার নিজের সম্মানকে সে ঢাকতে পারে বিনয় দিয়ে কিন্তু যে প্রভাব-ইহা তাকে দেয় সে তা ব্যবহার করতে পারে মানুষকে ঊর্ধ্বে ভগবানের দিকে নেবার জন্য। এরূপ লোক শীঘ্রই উঠে যাবে সুখ ও দুঃখের, জয় ও পরাজয়ের ঊর্ধ্বে; কারণ যেমন সুখে, তেমন দুঃখে সে অনুভব করবে যে সে আছে ভগবানের সমীপে, ভগবানের সহিত, সে ভগবদ্-সদৃশ এবং পরিশেষে স্বয়ং ভগবানই। সেজন্য উপনিষদ আরো বলে

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"

এই জগতে তোমার সব কর্ম কর এবং বাঁচতে ইচ্ছা কর শতবর্ষ ধরে।

বেদে বলা হয় যে শতবর্ষ হ'ল মানুষের প্রাকৃত জীবনের পূর্ণ আয়ুষ্কাল। সেজন্য শ্রুতি বলে যে জীবন থেকে পিছু ফেরা আমাদের কর্তব্য নয়, ইহাকে অসময়ে আমাদের কাছ থেকে বিসর্জন দেওয়াও উচিত নয়, অথবা এমন কি শীঘ্র দেহ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করাও উচিত নয়,

বরং কর্তব্য হ'ল স্বেচ্ছায় আমাদের জীবনকাল প্রসারিত করা, এমন কি মানুষের সাধারণ অস্তিত্বের পূর্ণকাল পর্যন্ত ইহাকে দীর্ঘ করার জন্য সাতিশয় উদ্যোগী হওয়া যাতে আমরা আমাদের কর্ম করে যেতে পারে এই জগতে। "কুর্বন্" কথাটিতে "এব" যোগ ক'রে তার উপর যে জোর দেওয়া হ'য়েছে তা তুমি বিশেষ লক্ষ্য কর। বস্তুতঃ, এই জগতে আমাদের সকল কর্ম করা চাই-ই, সেসব এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। আত্মাকে পাবার জন্য পাহাড়ে পর্বতে পালাবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এখানেই আছেন, তোমার মধ্যে এবং তোমার চারিদিককার সকলের মধ্যে। আর যদি তুমি পালিয়ে যাও তাঁকে পাবার জন্য নয়, বরং এই জগতের দুঃখ, ও দুর্গতির সম্মুখীন হতে দুর্বল হওয়ায় সে সব থেকে নিস্তার পাবার জন্য তাহ'লে তুমি এই জীবনের জন্য আত্মা হারাবে আর হয়ত ভবিষ্য অনেক জীবনের জন্যই তা হারাবে। আমি তোমায় আবার বলছি যে বলহীন ও কাপুরুষ ভগবানে আরোহণ করতে সক্ষম হয় না, সক্ষম হয় একমাত্র বলশালী ও সাহসী লোক। "ব্রাহ্মণ" হবার আগে প্রতি ব্যষ্টি জীবাত্মাকে হওয়া চাই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়।

শিষ্য

প্রাজ্ঞতম ব্যক্তিরা যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যাঁদের আমরা সানন্দে শ্রদ্ধা করি তাঁরা এখনও যে শিক্ষা দেন ও আচরণ করেন তার বিরুদ্ধ এই সব কথা।

গুরু

তুমি ঠিক জান যে এইসব তাঁদের শিক্ষার বিরুদ্ধ? তাঁরা কি শিক্ষা দেন?

শিষ্য

এই শিক্ষা যে "বৈরাগ্য"ই, জগতে বিতৃষ্ণাই শ্রেষ্ঠ পথ আর মানুষের অন্তঃপুরুষের মধ্যে ইহার প্রবেশ মুক্তি পথের দিকে তার প্রথম আহ্বান আর মুক্তি কর্মের দ্বারা আসে না, আসে জ্ঞানের দ্বারা।

গুরু

"বৈরাগ্য" একটি বড় কথা, ইহার এখন অনেক অর্থ হ'য়েছে আর তার কারণ হ'ল আর্যাবর্তের লোকেরা বিভ্রান্ত হ'য়ে না বুঝে সেসব মিশিয়ে এক ক'রেছে---আর তমঃ ও অনার্যোচিত কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতায় এই পবিত্র ও প্রাচীন ভূমি ছেয়ে গেছে, ইহা ঢাকা পড়েছে অন্ধকারের এক পুরু আবরণে। একরকম বৈরাগ্য আছে যা সর্বাপেক্ষা সত্য ও মহৎ, তা হ'ল সেই বলশালী লোকের যে এই জগতের সব মধুর বিষয় আস্বাদন ক'রে দেখে যে তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী ও ধ্রুব সত্য নেই, দেখে যে তার সত্যকার অমর আত্মা যে প্রকৃত ও অমর আনন্দ দাবি করে ঐ বিষয়গুলি তা নয় আর যে নিজের মধ্যস্থ এমন কিছুর দিকে ফেরে যা আরো গভীর, পবিত্র ও অক্ষয়। আবার দুর্বলচিত্ত লোকেরও "বৈরাগ্য" আছে যে লোক জগতের মধুর বিষয়গুলির জন্য লালসা করেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তৃষিত হ'য়েছে কিন্তু যাকে ভাগ্য বা তার চেয়ে আরো বলবান লোক তাড়না ক'রে জায়গা থেকে জোর ক'রে সরিয়ে দিয়েছে এবং যে লোক যোগ ও বেদান্তকে ব্যবহার করতে চায় যেমন মদ্যপায়ী ব্যবহার করে তার মদের পাত্রকে বা আফিংখোর তার আফিঙের গুলিকে বা আরককে। এই যে সব মহৎ জিনিষ ঋষিরা জগতের কাছে ব্যক্ত করেছেন সে সব ঐরকম জঘন্য ব্যবহারের জন্য নয়। যদি ঐরূপ কোন লোক আমার কাছে দীক্ষার জন্য আসে তাহ'লে আমি তাকে ফিরিয়ে দেব পার্থের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিময় ভর্ৎসনা বাক্য ব'লে

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

সত্যই, যে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম, জগৎসমূহের স্রষ্টা ও সংহারকর্তা বৈ অন্য কিছু নয় তার অযোগ্য এইরূপ দুর্বলতা। তবু আমার কথার এই অর্থ নয় যে আমি দুঃখ ও নৈরাশ্যজনিত প্রকৃত বৈরাগ্যের নিন্দা করছি; কারণ কখন কখন অনেক লোক অজ্ঞানের মধ্যে হীন বিষয়ের জন্য চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়েছে---তাদের দুর্বলতার জন্য নয়, তবে এই কারণে যে এই সব বিষয় তাদের প্রকৃত মহত্ত্ব ও উচ্চ নিয়তির নিম্নে; তখন তাদের চোখ খোলে এবং তারা ধ্যান, নির্জনতা ও সমাধি খোঁজে

তবে তাদের সব দুঃখকষ্ট ও তখনো অতৃপ্ত কামনাকে চাপা দেবার জন্য সুরাপানের মত নয়, তারা তা খোঁজে তাদের দিব্যক্ষমতা উপলব্ধি ও ইহাকে দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করার জন্য ; কখন কখন মহাত্মারা সন্ন্যাসীর পথ খোঁজেন কারণ নির্জনতার মধ্যে একাকী ভগবান ও গুরুর সহিত অবস্থান করাই তাঁদের পক্ষে ব্রহ্মতেজ বিকশিত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা আর একবার তা পেলে তাঁরা তা জগতের উপর ঢেলে দেন স্রোতধারায়। এমনই ছিলেন শঙ্করাচার্য, আর কখন কখন অপরের দুঃখ কষ্টেই বা জগতের দুর্দশাতেই তাঁরা আরাম ও সুখ পান এবং বুদ্ধের মত তাঁরা বেরিয়ে পড়েন আর্তজনগণের জন্য তাঁদের নিজেদের সত্তার গহনে সাহায্যের সন্ধানে। প্রকৃত সন্ন্যাসীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কারণ তাঁরা কর্মের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ; ভগবানের কাজ করার জন্য তাঁরা ভগবানের শক্তিতে সর্বাপেক্ষা বীর্যবান।

শিষ্য

আমি আবার বলছি যে শ্রীশঙ্কর প্রমুখ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী আচার্য-গণের শিক্ষার বিরুদ্ধ এই শিক্ষা।

গুরু

সকল আচার্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য, সর্বোত্তম জগদ্-গুরু যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধ ইহা নয়। কারণ মহাভারতে তিনি সঞ্জয়কে বলেন যে কর্মের দ্বারা মোক্ষসাধনের মত ও নৈষ্কর্ম্যের দ্বারা মোক্ষসাধনের মত মধ্যে কর্মের দ্বারা মোক্ষসাধনের মতই প্রকৃত মত আর অন্যটিকে তিনি নিন্দা করেন দুর্বলের অলস উক্তি ব'লে; আর ভগবদ্-গীতায় বার বার তিনি কর্মের শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

শিষ্য

সে কথা সত্য, কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ ও ইহার সমান কিছু নেই।

গুরু

সত্যই, জ্ঞানের সমান কিছু নেই; কারণ জ্ঞান অপরিহার্য; প্রথম

ও মহত্তম হ'ল জ্ঞান। জ্ঞানবিহীন কর্মের দ্বারা মানুষের উদ্ধার নেই, সে শুধু বন্ধনের মধ্যে গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবে যায়। উপনিষদ সে সব কর্মের কথা বলে সে-সব করতে হবে তুমি এই সকল বিশ্বকে ভগবান দিয়ে আচ্ছাদিত করার পর; অর্থাৎ এই কথা উপলব্ধি করার পর যে সব কিছুই এক ব্রহ্ম এবং তোমার সব ক্রিয়া পুরুষের আনন্দের জন্য প্রকৃতির দ্বারা উন্মুক্ত নাটকীয় মায়ামাত্র। তখন তুমি তোমার সব কর্ম করবে 'তেন ত্যক্তেন' অথবা যেমন শ্রীকৃষ্ণ করতে বলেন, তোমার কর্মফলস্পৃহা ত্যাগ ক'রে এবং তোমার সকল ক্রিয়া নিবেদন ক'রে তাঁর কাছে--তোমার নিম্ন অনাত্মার কাছে নয় যে সুখ দুঃখ অনুভব করে তবে তোমার মধ্যস্থ ব্রহ্মের নিকট যিনি কাজ করেন শুধু "লোকসংগ্রহার্থম্" যাতে জ্ঞানবিহীন জনগণ তোমার নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা বিমূঢ় ও বিপথে চালিত হওয়ার পরিবর্তে জগৎকে বরং সাহায্য দেওয়া হয়, শক্তিশালী ও পালন করা হয় তোমার দেবতুল্য প্রকৃতির কর্মের দ্বারা। উপনিষদ আরো যা বলে তা এই, "এইভাবে তোমাতে ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই, কর্ম মানুষে লিপ্ত হয় না।" ইহার অর্থ নিষ্কাম কর্ম, যে সব কর্ম ত্যাগের পর করা হয় ও ভগবানে নিবেদিত হয়---এইগুলি আর শুধু এইগুলিই মানুষে লিপ্ত হয় না, তারা তাকে তাদের সব অদৃশ্য শৃঙ্খলে বন্ধন করে না, বরং হাঁসের পাখার উপর জলের মত তারা তার কাছ থেকে ঝরে পড়ে; আর তারা তাকে বাঁধতে পারে না কারণ সে কার্যকারণসম্বন্ধের পাশ থেকে মুক্ত। কার্যকারণসম্বন্ধের উৎপত্তি দ্বৈতভাবের ভাবনা থেকে, অবিদ্যাজাত সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও ঘৃণা, শৈত্য ও উষ্ণতার ভাবনা থেকে, আর সে কামনা ত্যাগ করায় ও ঐক্য উপলব্ধি করায় অবিদ্যার ঊর্ধ্বে ও দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে। তার কাছে বন্ধনের কোন অর্থ নেই। (প্রকৃতপক্ষে সে কাজ করছে না, কাজ করছে প্রকৃতি তার মধ্যস্থ পুরুষের সান্নিধ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে)।

শিষ্য

তাহ'লে শঙ্কর কেন বলেন যে অনপেক্ষ ঐক্য লাভ করার জন্য কর্ম ত্যাগ করা প্রয়োজন? তাঁর মতে যারা কর্ম করে তারা শুধু পায় ব্রহ্মের সহিত সালোক্য, আপেক্ষিক ঐক্য, কিন্তু অনপেক্ষ ঐক্য নয়।

গুরু

শঙ্কর যা বলেছিলেন তার একটা কারণ ছিল আর তাঁর যুগে কর্মকে হীন ক'রে জ্ঞানকে উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল; কারণ যে বিশাল সজীব শক্তির সহিত তাঁকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছিল তা পরবর্তী ক্ষয়প্রাপ্ত ও জরাগ্রস্ত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধ মত নয়, তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল 'কর্মকাণ্ডের' বিজয়ী মতগুলির সহিত যাতে বৈদিক আচার ও ক্রিয়ার বিধিমত অনুষ্ঠানকেই একমাত্র পথ ও স্বর্গকে একমাত্র লক্ষ্য করা হ'য়েছিল। এই সব আচার ও ক্রিয়া সমেত সব কর্ম যে স্বর্গলাভের একমাত্র পথ হ'তে পারে না তা দেখাবার জন্য তিনি নিরন্তর ব্যগ্র ছিলেন এবং সেজন্য তিনি যতদূর সম্ভব বিপরীত দিকে চাপ দিয়েছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে অন্তিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের পক্ষে কর্ম মোটেই কোন পথ নয়। যাহ'ক, এখন বিবেচনা করা যাক শঙ্কর ও অন্যান্য জ্ঞানমার্গীর মুখে কর্মমার্গের এই লঘুকরণের অর্থ কি। এক অর্থ হ'তে পারে যে বৈদিক আচার ও ক্রিয়ার অর্থে কর্ম মুক্তিলাভের পথ নয়, আর ইহাই অর্থ হ'লে বুঝতে হবে যে শঙ্কর তাঁর কাজ ফলপ্রসূভাবেই করেছেন; কারণ আমার মনে হয় যে এখন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিপরীত মতবাদ পোষণ করতে প্রয়াস করবে না। আমরা সকলেই একমত যে কর্মকাণ্ডের একমাত্র অন্তিম ফল যে স্বর্গ তা মুক্তি নয়, ইহা মুক্তির অনেক নিম্নে আর যে মুহূর্তে ইহার কারণ নিঃশেষ হয় সে মুহূর্তে ইহারও অবসান ঘটে। আমরা সকলে এবিষয়েও একমত যে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির একমাত্র আধ্যাত্মিক উপকারিতা হ'ল মনকে শুদ্ধ করা এবং মুক্তির যে সত্যকার পথ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে চলে তাতে যাত্রারম্ভ করার জন্য মনকে যোগ্য করা। কিন্তু যদি তুমি বল যে 'কর্তব্যকর্ম' অর্থে কর্ম মুক্তিলাভের পথ নয়, তাহ'লে আমি আপত্তি করব; কারণ আমি বলি যে কর্ম জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়, বরং ইহা জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের প্রয়োজনীয় সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা; আমি বলি যে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান পৃথক তিন নয়, তারা এক ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলেন সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) ও যোগ (ভক্তি-কর্মযোগ) দুই নয়, ইহারা এক আর শুধু "বালাঃ", যাদের মন বিকশিত হয়নি শুধু তারাই পার্থক্য করে।

শিষ্য

কিন্তু কেমন করে বলা যায় যে শঙ্করাচার্যের মন বিকশিত হয় নি?

গুরু

তাঁর মন যে বিকশিত হয়নি তা নয়, তবে তিনি এমন সব লোক নিয়ে কাজ করছিলেন যাদের মন অবিকশিত ছিল এবং তাদের ভাষাই তাঁকে বলতে হয়েছিল। যদি তিনি কর্ম অনুমোদন করতেন, আর এই অনুমোদন যতই সংকীর্ণ হক না কেন সাধারণ লোকেরা বুঝত না, তারা তাদের ক্রিয়া আচারকেই আঁকড়ে থাকত। বস্তুতঃ ভাষার এই বাধা, ইহার স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও যে সব লোক ভাষা ব্যবহার করে তাদের মনের অপূর্ণতা—এই সবই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সকল বিভ্রান্তি ও পার্থক্য-বোধের জন্য দায়ী, কারণ ধর্ম ও দর্শন এক, পার্থক্যের ঊর্ধ্বে। কোন কোন স্থানে তাঁর তর্কের উগ্রতা থেকে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে শঙ্কর কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি তেমন সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। কারণ যখন তুমি বল যে কর্ম মুক্তিলাভের কোন পথ নয় তখন তুমি কি অর্থে তা বল? তোমার অর্থ কি এই যে কামনা চালিত কর্ম মুক্তির বিরুদ্ধ এই কারণে যে বন্ধন ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আর সেজন্য কর্মত্যাগ অবশ্য কর্তব্য? এই অর্থ হ'লে ইহাতে কোন বিবাদ থাকে না। আমরা সকলেই একমত যে কামনা চালিত কর্মের ফল হ'ল অন্য জীবনে নতুন কর্মের দ্বারা কামনার পরিপূরণ, অন্য কিছু নয়। কথাটির কি এই অর্থ যে নিষ্কাম কর্ম মুক্তিবিরুদ্ধ নতুন বন্ধনের দ্বারা মুক্তি নিবারণ করে এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য? ইহা যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ বন্ধন হ'ল কামনা ও অজ্ঞানতার ফল আর কামনা ও অজ্ঞানতা দূর হ'লে ইহাও দূর হয়। সুতরাং নিষ্কাম কর্মে কোন বন্ধন থাকতে পারে না। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ—"ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃত্তরতি জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি"। বাস্তব-ঘটনারও বিরুদ্ধ ইহা কারণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করেছিলেন, জনক ও অন্যান্যেরা কর্ম করেছিলেন, কিন্তু কেউ বলবে না যে তাঁরা তাদের কর্মের বন্ধনে পড়ে-ছিলেন; কারণ তাঁরা ছিলেন জীবন্মুক্ত। এই কি অর্থ যে নিষ্কাম কর্ম করা যেতে পারে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির দিকে সোপান হিসাবে কিন্তু জ্ঞানলাভ হওয়া মাত্রই তা ত্যাগ করা চাই? এই যুক্তিও টিকবে না কারণ জনক ও অন্যান্যেরা যেমন জ্ঞানলাভের পূর্বে কর্ম করেছিলেন তেমন জ্ঞানলাভের

পরেও কর্ম করেছেন। এই একই কারণে শঙ্করের যে যুক্তিতে বলা হয় যে ব্রহ্ম অকর্তা হওয়ায় ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাত্র স্বতঃই কর্মের অবসান ধ্রুব, সে যুক্তিও গ্রাহ্য নয়; কারণ জনক ব্রহ্মলাভ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ছিলেন অথচ দুজনেই কর্ম করেছিলেন; এমনকি একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলছেন যে তিনি কর্ম করছেন; কারণ বস্তুতঃ ব্রহ্ম উভয়ই, পুরুষ হিসাবে অকর্তা এবং প্রকৃতি হিসাবে কর্তা; আর যদি বলা হয় যে 'তুরীয় আত্মন্' পরব্রহ্ম যাঁর মধ্যে সকল ভেদ লুপ্ত হয় অকর্তা তাহ'লে আমার উত্তর এই যে তিনি কর্তাও নন, অকর্তাও নন, তিনি নেতি, নেতি, অজ্ঞেয়, আর জীবাত্মা দেহের মধ্যে থাকাকালীন তাঁর মধ্যে চূড়ান্তভাবে মগ্ন হয় না, যদিও যে কোন সময় সে তা করতে সক্ষম যোগের দ্বারা। লয় আসে "আদেহনিপাতাৎ" অর্থাৎ দেহত্যাগের পর সেই মুক্তিকামীর দ্বারা যে অন্য দেহে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। জীবন্মুক্ত পুরুষ পরব্রহ্মের জ্যোতির্ময় ছায়ার সহিত এক হয় যাকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ। যদি বলা হয় যে ইহা মুক্তি নয়, আমার উত্তর এই যে সচ্চিদানন্দ হওয়া অপেক্ষা অন্য মহত্তর মুক্তি কিছু হ'তে পারে না আর যে জীবাত্মা আর জীবাত্মা নয়, সচ্চিদানন্দ হ'য়েছে তার পক্ষে পরব্রহ্মের মধ্যে লয় স্বেচ্ছাধীন; কারণ পরব্রহ্ম সর্বদাই ও ইচ্ছামত সচ্চিদানন্দকে নিজের মধ্যে টেনে আনতে পারে আর সচ্চিদানন্দও সর্বদা ও ইচ্ছামত পরব্রহ্মের মধ্যে যেতে পারে; কারণ এই দুই কোন অর্থেই দুই নয়, ইহারা এক, ইহারা কোন অর্থেই অবিদ্যার অধীন নয়, বরং অবিদ্যার অপর দিকে। তারপর যদি বলা হয় যে নিষ্কাম কর্মের ফল শুধু ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু মুক্তি নয়, তাহ'লেও আমার উত্তর এই যে সে ক্ষেত্রে আমাদের মনে করতে হবে যে দেহ-ত্যাগের পর শ্রীকৃষ্ণ পরতম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং সেজন্য তিনি আদৌ ভগবান ছিলেন না, তিনি শুধু ছিলেন একজন মহান্ দার্শনিক ও ভক্ত, মুক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ছিলেন না আর জনক ও অন্যান্য জীবন্মুক্ত পুরুষদের অসঙ্গতভাবে মুক্ত বলা হয় অথবা তা বলা হয় শুধু এই অর্থে যে তাঁদের ছিল আপেক্ষিক মুক্তি। কিন্তু একথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে এবং শ্রুতি ও স্মৃতি বরাবর যে শিক্ষা দিয়েছেন তারও বিরুদ্ধ হবে; সেজন্য কোন হিন্দুই তা গ্রহণ করতে পারে না, আর বেদান্তবাদীর দ্বারা তা গ্রাহ্য হওয়ার আশা আরো কম; কারণ যদি শ্রুতিতে কোন প্রামাণ্য না থাকে, তাহ'লে বেদান্তেও কোন সত্য থাকে না আর যে কোন মতের যা শক্তি

চার্বাকমতেরও সেই শক্তি হবে। উপরন্তু ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ হবে কারণ যে মুক্তি এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন তাকে ঐমত মৃত্যুর মত শুধু এক যান্ত্রিক ও জড়ীয় পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, কিন্তু ইহা অসঙ্গত। সেজন্য শঙ্কর নিজেই স্বীকার করেন যে এইসব ক্ষেত্রে মুক্তির সহিত বা ব্রহ্ম হওয়ার সহিত নিষ্কাম কর্মের কোন অসঙ্গতি নেই; আর তিনি আরো বেশী অকুণ্ঠভাবে ইহা স্বীকার করতেন যদি না তিনি বিব্রত থাকতেন পূর্বমীমাংসার সহিত তাঁর বুদ্ধিগত শত্রুতার সম্পর্কের দ্বারা। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হল যে মুক্তির সহিত কর্মের অসঙ্গতি নেই, বরং বিপরীতভাবে, সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত পুরুষদের ও স্বয়ং ভগবানের শিক্ষা ও আচরণে—উভয়েই জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম যুক্ত হ'য়েছে মুক্তির দিকে একটি মাত্র পথ হিসাবে।

তবে এখনও একটি যুক্তি আছে; বলা হ'তে পারে যে মুক্তির সহিত কর্মের অসঙ্গতি না থাকতে পারে, কর্ম মুক্তির লাভের এক পথ হ'তে পারে, কিন্তু সর্বশেষ পর্যায়ে ইহা মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। আমিও স্বীকার করি যে বিশেষ কিছু কাজ যে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়, মুক্তিলাভের জন্য গৃহস্থ হ'য়ে থাকার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু দেহধারীর পক্ষে কর্ম-মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। একথা স্পষ্ট করে ও অখণ্ডনীয়ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ভগবদগীতায়। আর গীতার এই কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কারণ যে ব্যক্তি জগৎ পিছনে ফেলে পর্বতশিখরে বা আশ্রমের ভিতর বসে থাকে সে যে সেজন্য কর্মত্যাগ করতে পেরেছে স্পষ্টতঃই তা নয়। আর কিছু না হ'ক, তাকে তার শরীর রক্ষা করতে হবে, খেতে হবে, হাঁটতে হবে, অঙ্গসঞ্চালন করতে হবে, অথবা আসনে ব'সে ধ্যান করতে হবে; আর এ সবই কর্ম। যদি সে এখনও মুক্ত হয়নি তাহ'লে এই কর্ম তাকে আরো বাঁধবে এবং ইহার ফলও ফলবে যেমন নিজের সম্বন্ধে তেমন অপরের সম্বন্ধেও; এমন কি যদি সে মুক্তও হয়, তাহ'লেও তার দেহ ও মন কর্মমুক্ত হয় না যতক্ষণ না তার দেহপাত হয়, সে সব চলতে থাকে প্রারব্ধের বেগে যতদিন না প্রারব্ধ ও ইহার সব ফল সমাপ্ত হয়। এমন কি শ্রেষ্ঠ যোগীও এই প্রাতিভাসিক জগতে শুধু উপস্থিত থেকেই চারিদিকে আধ্যাত্মিকশক্তির স্রোত বর্ষণ করেন আর এই কর্ম তাঁকে না বাঁধলেও, অন্যদের উপর ইহার প্রভাব অতীব বিশাল। তিনি ইচ্ছা না করলেও তিনি "সর্বভূতহিতে রতঃ"; তাঁর শরীর বিষয়ে তিনি "অবশঃ" আর প্রকৃতির ত্রিগুণকে কাজ করতে

দিতে তিনি বাধ্য হন। এই যখন অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি তার 'কর্তব্যকর্ম' পিছনে ফেলতে চায় তার দেখা উচিত যে সে তার প্রারব্ধের সমাপ্তিকে ভবিষ্য জীবনের জন্য শুধু স্থগিত রাখছে না আর এইভাবে যে পুনর্জন্ম সে এড়াতে চায় তাতেই সে আবদ্ধ হ'চ্ছে না।

শিষ্য

কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ যে তখনও তার অতীত সব কর্মের দ্বারা বদ্ধ থাকবে তা কেমন করে সম্ভব? মুক্তি কি আগুনের মত লোকের অতীত সব কর্ম পুড়িয়ে নিঃশেষ করে না? কারণ কেমন করে কোন ব্যক্তি একই সময় মুক্ত অথচ বদ্ধ থাকতে পারে?

গুরু

মুক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মের বন্ধনসৃষ্টি নিবারিত হয়; কিন্তু যে অতীত কর্মগুলি আগেই বন্ধনসৃষ্টি করেছে তাদের বেলায় কি? অবশ্য জীবন্মুক্ত পুরুষ বদ্ধ থাকে না, কারণ সে ভগবানের সহিত এক আর ভগবান তাঁর প্রকৃতির কর্তা, তিনি ইহার দাস নন; কিন্তু যতক্ষণ এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বন্ধনমায়ার মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃতি বিভিন্ন কারণ সৃষ্টি করে আর তাকে তার সব ফলের ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে দিতে হবে, তা না হ'লে কার্যকারণসম্বন্ধের শৃঙ্খল ছিন্ন হয় আর প্রকৃতির সমগ্র ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হ'য়ে নৈরাজ্যের মধ্যে পড়ে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ" ইত্যাদি। সুতরাং জগৎরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন্মুক্ত পুরুষ অঙ্গীকারে মুক্ত বন্দীর মত কাজ করতে থাকে; অবশ্য সে অপরের দ্বারা বদ্ধ হয় না, সে নিজেই নিজের দ্বারা বদ্ধ থাকে যতক্ষণ না তার পূর্বনির্ধারিত বন্দী থাকার সময় অতিবাহিত হয়।

শিষ্য

বাস্তবিকই ইহা বিষয়টি সম্বন্ধে এক নতুন আলোকপাত।

গুরু

ইহা নতুন আলো নয়, বরং সূর্যেরই মত পুরাণো ইহা; কারণ গীতায় এ কথা স্পষ্ট করে বলা হ'য়েছে, আর গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ

বলেন যে তিনি পূর্বে তা বলেছিলেন সূর্যমণ্ডলের বিষ্ণু বিবস্বান্‌কে আর বিবস্বান্ বলেছিলেন মানবের আদি মনস্বী মনুকে, আর মনু বলেছিলেন মহান রাজর্ষিদের ও তাঁদের বংশধরদের। তাছাড়া, এরূপ যে হয় তা স্পষ্টতঃই বিষয়সমূহের প্রকৃতি থেকে। এই বিষয়ে সকল বিভ্রান্তির মূলে আছে মুক্তির অর্থসম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞান; এই যে সব লোক মুক্তির সন্ধানে কর্ম থেকে পালিয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম পরিহার করে তার কারণ কি? এই কারণ যে তারা ভয় করে যে আবার তারা বন্ধনের মধ্যে পড়বে, তাদের মুক্তির সম্ভাবনা চলে যাবে। কিন্তু 'মুক্তি' কি? ইহার অর্থ নিষ্কৃতি, কিন্তু কি থেকে? অবিদ্যা থেকে, বিশাল নির্জ্ঞান থেকে, এই যে তোমার ধারণা যে তুমি সীমিত ও বদ্ধ যদিও তুমি অসীম ব্রহ্ম ও বদ্ধ হ'তে পার না সেই ধারণা থেকে। যে মুহূর্তে তুমি উপলব্ধি কর যে অবিদ্যা এক ভ্রান্তি, যে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, ব্রহ্ম ছাড়া কখনও কিছু ছিল না আর হবেও না––আর তা তুমি উপলব্ধি কর, 'অনুভব' কর, শুধু বুদ্ধিগতভাবে এই ভাবনা ধারণ কর না––সেই মুহূর্ত থেকে তুমি মুক্ত এবং সর্বদাই মুক্ত রয়েছ। প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা এই যে জীবাত্মা মনে করে যে নিজ ছাড়া অন্য কিছু আছে, সে নিজে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আর কিছু আছে যা তাকে বাঁধে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ব্রহ্ম হওয়ায় সে বদ্ধ নয়, কখন বদ্ধ ছিল না তার বদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না আর কখনও সে বদ্ধ হবে না। একবার এই বিষয় উপলব্ধি করলে জীবাত্মার আর 'কর্মের' ভয় থাকে না, কারণ সে জানে যে বন্ধন বলে কিছু নেই। সে এই জগতে তার সব কর্ম করতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক হবে; এমন কি সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতেও ইচ্ছুক হবে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করেছেন বার বার জন্ম নেবার জন্য; কারণ পুনর্জন্ম সম্বন্ধেও তার আর কোন ভয় থাকে না; যেহেতু সে জানে যে সে আর অবিদ্যার প্রভাবে পড়তে পারে না, যদি না সে ভেবে চিন্তে নিজেই তা চায়; যে একবার মুক্ত, সে সর্বদাই মুক্ত। এমন কি যদি তার পুনর্জন্ম হয়ও তাহ'লে সে প্রকৃত পক্ষে কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই সে পুনর্বার জন্মাবে আর তার সব অতীত জীবন ও সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তার পূর্ণ জ্ঞান থাকবে আর সে কাজ করবে জীবন্মুক্তের মত।

শিষ্য

কিন্তু এই যে কথা যে একবার মুক্ত সে সর্বদাই মুক্ত তা যদি সত্য

হয় তাহ'লে বহু মহান্ ঋষি ও যোগীদের সম্বন্ধে যেসব বিবরণ আছে যে তাঁরা আবার অবিদ্যার প্রভাবে পড়েছেন সে সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু

জীবন্মুক্ত না হ'য়েও মহান্ ঋষি বা যোগী হওয়া যায়। যোগ এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা মুক্তিলাভের উপায়, ইহারা মুক্তি নয়। কারণ শ্রুতি বলে 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।'

শিষ্য

তাহ'লে শ্রুতি যেমন বলে, জীবন্মুক্ত পুরুষ কি সত্যই একশ বছর বাঁচতে ইচ্ছা করবে? যে মুক্ত তার কি কোন কামনা থাকতে পারে?

গুরু

জীবন্মুক্ত পুরুষ একশ বছর বাঁচতে অথবা দরকার হলে আরো বেশী বাঁচতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে; কিন্তু এই উপদেশ জীবন্মুক্ত পুরুষকে কি কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে দেওয়া হয়নি, ইহা দেওয়া হয়েছে সাধারণ-ভাবে। তোমার জীবনের নির্ধারিত কাল বেঁচে থাকতে তোমার কামনা করা উচিত কারণ এই দেহের মধ্যে তুমি ব্রহ্ম যিনি তাঁর নিজস্ব শক্তির তেজের দ্বারা নিজের জন্য এবং নিজের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের এই লীলা অভিনয় করছেন; এই দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ঈশ, প্রভু, স্রষ্টা ও সংহার কর্তা; আর তুমিও ঈশ, স্রষ্টা ও সংহারকর্তা; একটি উগ্র উপমা ব্যবহার করে বলতে পারা যায় যে, তুমি তোমার নিজের আমোদের জন্য অভিনয়ের উদ্দেশ্যে নিজেকে একটি বিশেষ দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে ভেবেছ, ঠিক যেমন একজন অভিনেতা নিজেকে দুষ্যন্ত বা রাম বা রাবণ বলে মনে করে; আর প্রায়ই অভিনেতা তার চরিত্রের অভিনয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আর যে চরিত্রের অভিনয় সে করছে সে প্রকৃতই নিজেকে তা মনে করে, সে ভুলে যায় যে প্রকৃতপক্ষে সে দুষ্যন্ত বা রাম নয়, সে শুধু দেবদত্ত যে এই চরিত্র ছাড়া আরো অনেক চরিত্রের অভিনয় করে। তবু যখন তার এই ভ্রান্তির নিরসন হয় আর তার মনে পড়ে যে সে দেবদত্ত তখন সেজন্য সে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় না, আর অভিনয় করতে অস্বীকার ক'রে অভিনয় ভেঙ্গে দেয় না, বরং সে যথাসাধ্য অভিনয় ক'রে চলে যতক্ষণ না

যবনিকাপতনের উপযুক্ত সময় আসে। আর আমাদেরও তাই করা কর্তব্য, তা আমরা গৃহী হই, বা সন্ন্যাসী হই, জীবন্মুক্ত হই বা মমুক্ষু হই কারণ আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে এই সংসারের উদ্দেশ্য হ'ল সৃষ্টি আর যতদিন আমাদের দেহ থাকবে ততদিন আমাদের কাজ হ'ল সৃষ্টি করা। শুধু পার্থক্য এই যে যতক্ষণ আমরা আমাদের আত্মাকে ভুলে থাকি ততক্ষণ আমরা সৃষ্টি করি দাসের মত আমাদের প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে আমরা ঠিক যেন ক্রীতদাস ও প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ অথচ আমরা মনে করি যে এই ক্রিয়াগুলি আমাদের; কিন্তু যখন আমরা আত্মাকে জানতে পারি ও আমাদের প্রকৃত আত্মার উপলব্ধি পাই তখন আমরা আমাদের প্রকৃতির প্রভু হই, তার সব সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ হই না; আমাদের অন্তঃপুরুষ হ'য়ে ওঠে আমাদের প্রকৃতির ক্রিয়ার সাক্ষী; নীরব দ্রষ্টা; এইভাবে আমরা দ্রষ্টা ও অভিনেতা, উভয়ই, আর তবু যেহেতু আমরা জানি যে সবকিছুই ক্রিয়ার এক ভ্রান্তিমাত্র, ক্রিয়া নয়, যেহেতু আমরা জানি যে প্রকৃত পক্ষে রাম রাবণকে হত্যা করছে না অথবা রাবণ হত হচ্ছে না কারণ আসলে রাবণ তো এই কল্পিত মৃত্যুর পর আগের মতই বেঁচে থাকে; সেহেতু আমরা অভিনেতাও নই, দ্রষ্টাও নই, আমরা শুধু আত্মা আর আমরা যা সব দেখি সে সব শুধু আত্মার দর্শন––আর বাস্তবিকই শ্রুতিতে ব্রহ্ম যেসব ভাবনার সাহায্যে নিজের বিশ্বকে নিজ দিয়ে অধ্যুষিত করেন তাদের জন্য অন্য পদের পরিবর্তে "ঐক্ষত", "দেখেছিলেন" পদটিই বারবার ব্যবহৃত হয়। সেজন্য মুমুক্ষু নির্ধারিত কালের পূর্বে তার জীবন ত্যাগ করতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করবে না, ঠিক যেমন সে এই জীবনে তার সব কর্ম ত্যাগ করতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করবে না, সে শুধু ত্যাগ করবে কর্মফলের স্পৃহা। কেন না যদি সে জীবনসূত্ররচনার কাজ শেষ হ'বার পূর্বেই অধীর হ'য়ে তা ছিঁড়ে ফেলে, সে জীবন্মুক্ত হবে না, তা হবে শুধু আত্মহত্যা আর তার ফল হবে তার কাম্যের বিপরীত। উপনিষদ বলে,

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

শঙ্কর এই শ্লোকটির এক অদ্ভুত অর্থ করেন। তিনি "আত্মহনো"র অর্থ করেন "আত্মার হন্তা", কিন্তু যেহেতু ইহা অসম্ভব এই কারণে যে আত্মা শাশ্বত ও অবধ্য, তিনি বলেন যে ইহা এক রূপক, ইহার অর্থ

আত্মাকে অবিদ্যার ভ্রান্তিতে ফেলা যার ফল জন্ম। কিন্তু তাহ'লে এ তো এক উদ্ভট বিস্ময়কর রূপক ও সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় কারণ এই ভাবনাকে সহজেই অন্য কোন স্বাভাবিক প্রকারেই প্রকাশ করা যেত। তবু শ্রুতি তো রূপকে ভরা, সুতরাং শুধু এই যুক্তিতেই শঙ্করের ব্যাখ্যা বর্জন করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। আমাদের দেখতে হবে যে এই ব্যাখ্যার সহিত শ্লোকের বাকী অংশের মিল আছে কিনা। এদিকে আমরা দেখি যে শঙ্কর তাঁর মত সমর্থন করতে গিয়ে এই বাক্যের অন্যান্য পদেরও সরল অর্থকে টেনে অদ্ভুতভাবে অন্যরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন; কারণ তিনি বলেন যে পরমাত্মা জন্মের ঊর্ধ্বে ও দেবত্বেরও ঊর্ধ্বে। "অসুর্যার" অর্থ হ'তে পারে শুধু আসুরিক যা "দৈবী"র বিপরীত। পরমাত্মার দৈব জন্মের বিপরীত যা, পরমাত্মার বিপরীত যা সেই আসুরিক জন্ম দেবগণ হ'তে পারে না; কিন্তু ইহা পদের অপপ্রয়োগ কারণ—অর্থ নানাবিধ জন্ম, এমনকি দেবগণ-কেও আসুরিক জন্ম গণ্য করা হয়; তার পর তিনি 'লোকের' অর্থ করেন নানা প্রকারের জন্ম, তাহ'লে "অসুর্যা লোকাঃ"র অর্থ হয় মানুষ, জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ জন্ম যেগুলিকে আসুর বলা হয় এই কারণে যে তাদের মধ্যে রজঃরই প্রাধান্য বেশী আর সে সবের সঙ্গে থাকে আসুরিক প্রবৃত্তি। "আসুরিক লোকের" এই সব অর্থ অদ্ভুত, এরূপ অর্থ কোথাও পাওয়া যায় না। জীবাত্মা যে নানাবিধ রূপ গ্রহণ করে সে সবের জন্য কখনও "লোকাঃ" কথাটি ব্যবহৃত হয় না, ইহার অর্থ বিভিন্ন অবস্থার সেসব নানাবিধ পরিমণ্ডল যাদের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা প্রয়াণ করে এবং যাদের একটি হল জগৎ; আমরা বলি "ইহলোক, বা "মর্ত্যলোক," "পরলোক" বা "স্বর্গলোক", "ব্রহ্মলোক", "গোলক" ইত্যাদি, কিন্তু "পশুলোক", "পক্ষি-লোক", "কীটলোক" এমন কথা আমরা বলি না। যদি আমরা "আসুর লোক" বলি আমরা শুধু মনে করব "ব্রহ্মলোক", "গোলক", "স্বর্গলোক" প্রভৃতি দিব্যলোকের বিপরীত যে আসুরিক তমসার রাজ্য তা-ই, অন্য কিছু নয়। মৃত্যুর পর লোকান্তর গমনের কথা যখন আমরা বলি তখন ইহাই তার সাধারণ অর্থ আর এখানে শুধু আমাদের তর্কের সুবিধার জন্য ইহাকে অন্য অর্থে লওয়া উচিত হবে না। উপরন্তু "যে কে" কথাটিরও বিশিষ্ট জোর নষ্ট হয় যদি আমরা তা প্রয়োগ করি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুক্তিপ্রাপ্ত সামান্য কজন ছাড়া সকল জীবের বেলায়; স্পষ্টতঃই ইহার অর্থ অনেকের মধ্যে কিছু ব্যক্তি। সুতরাং শঙ্করের

ব্যাখ্যায় যখন শ্রুতির ভাষার উপর অতগুলি অত্যাচার করতে হয় আর কথাগুলির স্বীকৃত অর্থের সহিত এসবের এত বিশাল পার্থক্য থাকে তখন সে ব্যাখ্যা শঙ্করের হ'লেও তাকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করাই আমাদের কর্তব্য।

পদগুলির সাধারণ অর্থে এক সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শ্রুতি আমাদের বলছে যে আত্মহত্যা বা আয়ুহ্রাস করায় কোন লাভ নেই কারণ যারা মুক্তি না পেয়ে নিজেদের নিধন করে তারা মৃত্যুর জন্য নিজেদের নিমজ্জন করে অন্ধকারের আরো এক হীন কারাগারে---অন্ধ তমসার দ্বারা আবৃত আসুরিক লোকে।

শিষ্য

তাহ'লে কি সত্যই পৃথিবীর নীচে পাতালের সব জগৎ আছে আর মৃত্যুর পর অন্তঃপুরুষ সেখানে যায়? কিন্তু আমরা এখন জানি যে পৃথিবীর নীচে কিছু নেই, ইহা গোলাকার আর ইহাকে বেষ্টন করে আছে শুধু বাতাস, তার চেয়ে মন্দ কোন কিছু নয়।

গুরু

কথার দ্বারা ভ্রান্ত হও না। আসুরিক "লোক" সত্য বস্তু, এগুলি হ'ল তোমার নিজেরই সত্তার গভীরে নিম্ন প্রদেশে অন্ধকারের লোক। লোকের অর্থ পাহাড়, গাছ পাথর দিয়ে ভরা কোন স্থান নয়। ইহার অর্থ জীবাত্মার এক অবস্থা, বাকীসব শুধু এক স্বপ্নের বিভিন্ন ঘটনা ও খুঁটিনাটি। শ্রুতির ভাষা থেকেই এই অর্থ স্পষ্ট, যেমন ইহা বলে চিৎপুরুষের 'লোকে' অথবা পরবর্তী লোক "অমুষ্মিন্ লোকে" ভাল বা অন্যরূপ। স্পষ্টতঃই 'লোক'-এর অর্থ অবস্থা বা পাদ। 'মর্তলোক'-এর অর্থ মূলতঃ আমরা যে পৃথিবী দেখি তা নয়, কারণ মর্ত্য জীবের জন্য অন্য বাসস্থান থাকতে পারে আর থাকতে বাধ্য, ইহার অর্থ স্থূলদেহে মরণশীলতার অবস্থা, 'স্বর্গলোক' হ'ল সূক্ষ্মদেহে আনন্দের অবস্থা, 'নরক' হ'ল সূক্ষ্মদেহে দুঃখকষ্টের অবস্থা, ব্রহ্মলোক হ'ল কারণ শরীরে হিরণ্যগর্ভের সামীপ্য অবস্থা। যেমন জীবাত্মা মরণশীলতার অবস্থায় পৃথিবী ও ইহার সব অবয়বকে স্বপ্নদ্রষ্টার মত দেখে, আর মনে করে যে সে এক বিশেষ স্থানে অবস্থিত ঠিক তেমনই সূক্ষ্মদেহে সম্পূর্ণ তমোবস্থায় সে বিশ্বাস করে যে সে এমন এক স্থানে

অবস্থিত যার চারিদিকে ঘন অন্ধকার এবং যা অবর্ণনীয় দুঃখে পূর্ণ। অন্ধকারের জগৎকে যে পৃথিবীর নীচে, মরণশীলতার অবস্থার নিম্নে মনে করা হয় তার কারণ পৃথিবীর যে দিকটি সূর্যের বিপরীত দিকে সেইটিকে মনে করা হয় নিম্নদিক আর স্বর্গকে মনে করা হয় পৃথিবীর উপরে কারণ পৃথিবীর যেদিক সূর্যের দিকে ফেরা তাকে মনে করা হয় উচ্চ দিক, আলো ও আমোদের স্থান। এইভাবে চরম আনন্দের জগৎগুলি সূর্য থেকে আরম্ভ করে সূর্যের উপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উঠেছে। কিন্তু এই সবই কথা ও স্বপ্ন কারণ নরক ও পাতাল, এবং পৃথিবী ও নন্দনবন ও স্বর্গ সবই জীবাত্মার মধ্যে, তার বাইরে নয়। তবু যতক্ষণ আমরা স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপ্নের ভাষায়, স্বপ্নের সংজ্ঞাতেই আমাদের কথা বলতে হবে।

শিষ্য

তাহ'লে নিম্নতর অন্ধকারের এই জগৎগুলি কি?

গুরু

যখন অতীব যন্ত্রণার মধ্যে অথবা অতীব শোকের মধ্যে অথবা মনের অতীব অস্থিরতার মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আর তার শেষ চিন্তাগুলি ভীতি, ক্রোধ, যন্ত্রণা বা সন্ত্রাসে পূর্ণ থাকে তখন সূক্ষ্মশরীরে অবস্থিত জীবাত্মা বহু বৎসর ধরে, এমন কি বহু শতাব্দী ধরেও এই সব ছাপ-গুলিকে মন থেকে দূর করতে সমর্থ হয় না। ইহার হেতু মৃত্যুর বিধান; মৃত্যু হ'ল সাতিশয় একাগ্রতার মুহূর্ত যখন প্রয়াণকারী চিৎ-পুরুষ তার মর্ত্য জীবনের ছাপগুলি একত্র করে, যেমন সৈন্যদল তাদের খাদ্যসামগ্রী একত্র করে তাদের যাত্রার জন্য আর যে সব ছাপ সেই মুহূর্তে প্রবল সেইগুলিই পরে তার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এইজন্যই, মুক্তি ছাড়াও নির্মল ও মহৎ জীবনযাপনের এবং শান্ত ও সাহসপূর্ণ মৃত্যু বরণের এত গুরুত্ব। কারণ যদি সে সময়কার প্রবলতম সব ভাবনা ও সংস্কার এমন হয় যা আত্মাকে এই স্থূল দেহ ও প্রাণিক বৃত্তির সহিত অর্থাৎ নিম্ন "উপাধির" সহিত যুক্ত করে তাহ'লে অন্তঃপুরুষ দীর্ঘকাল অবস্থান করে অন্ধকার, ও কষ্টভোগের তামসিক অবস্থায় আর ইহাকেই আমরা বলি পাতাল অথবা আরো অপকৃষ্ট রূপ নরক। যদি প্রবলতম সব ভাবনা ও সংস্কার এমন

হয় যা আত্মাকে মন ও বিভিন্ন উচ্চতর কামনার সহিত যুক্ত করে তাহ'লে অন্তঃপুরুষ দ্রুত এক স্বল্পকালব্যাপী অন্ধতার মধ্য দিয়ে প্রয়াণ করে আলো ও আমোদ ও প্রশস্ততর জ্ঞানের রাজসো-তামসিক অবস্থায় যাকে আমরা বলি নন্দনবন; স্বর্গ বা বেহেস্তা আর তা থেকে ইহা এই জগতের আবার পুনর্জন্ম নেবে; যদি ভাবনা ও সংস্কারগুলি এমন হয় যা আত্মাকে উচ্চতর বুদ্ধি ও আত্মার আনন্দের সহিত যুক্ত করে তাহ'লে অন্তঃপুরুষ দ্রুত প্রয়াণ করে পরতম আনন্দের সাত্ত্বিক অবস্থায় যাকে আমরা বলি 'Heaven' বা ব্রহ্মলোক আর সেখান থেকে ইহা আর ফেরে না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার সহিত চিরদিনের জন্য অভিন্ন করতে শিখে থাকি তাহ'লে মৃত্যুর পূর্বেই আমরা ভগবান হ'য়ে উঠি আর মৃত্যুর পর আমরা অন্য কিছু হব না। কারণ মায়ার তিনটি পাদ আছে—তামসিক ভ্রান্তি, রাজসিক ভ্রান্তি ও সাত্ত্বিক ভ্রান্তি; আর ইহাদের প্রত্যেক-টিকে আমাদের পর পর বর্জন করা চাই তবে যদি আমরা তা-ই পাই যা ভ্রান্তি নয়, যা একমাত্র সত্য।

শ্রুতি বলে যে যারা আত্ম-হত্যা করে তারা অন্ধকারের নিম্ন লোকে অধঃপতিত হয় কারণ তারা আত্মাকে যুক্ত করেছে দেহের সহিত আর ভেবেছে যে এই দেহ থেকে নিস্তার পেয়ে তারা মুক্ত হবে, কিন্তু তাদের মৃত্যুকালে তারা পূর্ণ ছিল শোক, অধৈর্য, বিরক্তি ও যন্ত্রণার ছাপে। ঐ অন্ধকারের অবস্থায় তারা সর্বদাই ভোগ করতে থাকে তাদের জীবনের শেষ অধ্যায়ের অনুভব, ইহার সব ছাপ ও প্রচণ্ড অশান্তি, আর যতক্ষণ না তাদের এইসব ভোগের ক্ষয় হয় তাদের মনের শান্তি আসার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নির্বুদ্ধিতাবশে বা ধৈর্যহারা হ'য়ে কেউ যেন এরূপ দশা না বরণ করে।

শিষ্য

তাহ'লে আমি বুঝচি যে এই তিনটি শ্লোককে একত্র করে এক স্পষ্ট ও সংযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু পরের শ্লোকটিতে উপনিষদ হঠাৎ এমন এক বিষয়ের কথা বলে যার সহিত পূর্বের কোন যোগসূত্র থাকে না।

গুরু

ইহা বলে

"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥"

শ্রুতি বলেছে যে তোমার কর্তব্য সকল বিষয়কে ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদিত করা। কিন্তু স্পষ্টতঃ ইহার আসল অর্থ এই যে তোমার উপলব্ধি করা চাই কেমন করে সকল বিষয় পূর্ব থেকেই তাঁর দ্বারা আচ্ছাদিত। এখন ইহা দেখাতে যাচ্ছে ইহা কেমন, এবং আরো দেখাতে যাচ্ছে যে ঈশ্বরই ব্রহ্ম, তিনিই একম্ যিনি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনশীল সক্রিয়তার বিভাবে ঈশ্বর বলে অভিহিত হন। সুতরাং এখন ইহা সর্ব-নামের ক্লীবলিঙ্গের রূপটি ব্যবহার করছে, তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে তিনি তাহা ও ইহা ; ইহার কারণ ব্রহ্ম লিঙ্গ ও প্রভেদের ঊর্ধ্বে। তিনি এক অথচ তিনি যুগপৎ নিশ্চল ও মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়ই, আবার তবু একই সাথে তিনি কোনটিই নন, তিনি এক ও অবিভাজ্য; পুরুষ ও প্রকৃতি হ'ল তাঁরই মনোস্থিত প্রতীতিমাত্র যেগুলি ইচ্ছা করে উত্থাপিত হ'য়েছে বহুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতি হিসাবে তিনি মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, কারণ প্রকৃতি হ'ল তাঁরই সৃজনীশক্তি যা গতির মাধ্যমে জড় ও ইহার বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে। সকল সৃষ্টিই গতি, সকল সক্রিয়তাই গতি। এই আপাতপ্রতীয়মান স্থির সারা বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে বহুবিধ গতির অবস্থায় স্থিত, সব কিছুই গতির মধ্য দিয়ে অভাবনীয় দ্রুতভাবে ঘুরছে, এমনকি যে চিন্তাকে আমরা সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বলে জানি তা-ও বিশ্বচাঞ্চল্যের বেগের সহিত সমান সমান চলতে পারে না। আর এই সব গতি, এই চিরঘূর্ণায়মান সারা বিশ্ব ও জগৎ---এসব ব্রহ্ম। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলেও দেবতারা, ইন্দ্রিয়াধিপতিরা তাঁকে ধরতে পারে না কারণ তিনি তাদের সম্মুখে দূরে ধাবিত হন। চক্ষু, কর্ণ, মন---জড়ীয় কোন কিছুই ব্রহ্মের অচিন্তনীয় সৃজনশীল সক্রিয়তা পেতে বা ভাবনা করতে সক্ষম হয় না। যদি আমরা সৌরমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আলোকবর্ষী তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করি, তাহ'লে আমরা দেখি যে যখন আমরা প্রয়াস করছি তখন তিনি এমন সব ঘূর্ণায়মান বিশ্ব উৎপাদন করছেন যা চক্ষু বা দূরবীক্ষণের নাগালের অনেক বাহিরে, স্বয়ং চিন্তারই সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী আলোকেরও অনেক দূরে। বিশ্বের অস্তিত্বের অর্থ যে বিস্ময়কর

চাঞ্চল্য ও বিশাল অকল্পনীয় সক্রিয়তা তার ভাবনার সম্মুখে জড়ীয় ইন্দ্রিয়সমূহ কম্পমান। আবার তবু যে সময় তিনি অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি সেই সব সময়ই দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি দৌড়ান না। যে সময় আমরা তাঁকে পাবার জন্য পরিশ্রম করছি, সেসব সময়ই তিনি এখানে থাকেন, আমাদের পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, আমাদের সহিত, আমাদের অভ্যন্তরে। প্রকৃতপক্ষে তিনি আদৌ চলেন না; এই সব গতি আমাদের আপন অবিদ্যারই ফল যার মোহে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ মনে ক'রে আমাদের সব ভাবনাকে কাল ও দেশের অবস্থার অধীন করি। তাঁর সকল সৃজনশীল সক্রিয়তার মধ্যে ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একই স্থানে আছেন; একই সময় তিনি সূর্যে আছেন, আবার এখানেও আছেন, কিন্তু তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁকে আমাদের অনুসরণ করা চাই সূর্য থেকে পৃথিবীতে; আর আমাদের সব ভাবনার এই গতি, যে দেশ আমরা অতিক্রম করি ও যে কাল আমরা অতিবাহিত করি তাদের এই ইন্দ্রিয়গত ছাপ-- এই সব আমরা আমাদের ভাবনাতে আরোপ করি না, আমরা তা আরোপ করি ব্রহ্মে, ঠিক যেমন রেলগাড়ীর ভিতর কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের ছাপ এই হয় যে সবকিছু তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে কিন্তু গাড়ী স্থির রয়েছে। কিন্তু বিদ্যা, জ্ঞান তাকে বলে যে অমন কিছু ঘটে না। সেইরূপ, বিশ্বের চাঞ্চল্য বস্তুতঃ আমাদের আপন মনেরই চাঞ্চল্য--অথচ আবার এমনকি আমাদের মনও প্রকৃতপক্ষে চলে না। যাকে আমরা মন বলি তা শুধু ভাবনার বিলাস যা সেই বহুত্বের ভাবনার সহিত ক্রীড়ারত আর এই বহুত্ব হ'ল রূপে গতির ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিশ্চল; তিনি এমন এক নাটকের অচঞ্চল ও নীরব দ্রষ্টা যার রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয়, দৃশ্যাবলী, অভিনেতাবৃন্দ ও অভিনয়--সবই তিনি স্বয়ং। তিনি কবি সেক্‌স্‌পীয়র যিনি দেখছেন যে ডেসডিমোনা ও অথেলো, হ্যামলেট ও খুনী কাকা, রোসালিণ্ড ও জাক্‌স্‌ ও ভায়োলা এবং তাঁরই নিজের অপর শতশত বহুরূপ অভিনয় করছে, কথা কইছে, আনন্দ করছে, কষ্ট পাচ্ছে--সবই তিনি স্বয়ং, অথচ আবার তিনি নন, তিনি সেখানে বসে আছেন নীরব দ্রষ্টা হ'য়ে, তাদের এমন স্রষ্টা হয়ে যাঁর কোন অংশ নেই তাদের ক্রিয়ায়, অথচ তিনি ব্যতিরেকে তাদের একজনেরও অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। ইহাই জগতের রহস্য আর ইহার হেঁয়ালি, অথচ ইহাই তার একমাত্র স্পষ্ট, সরল ও সহজ সত্য।

শিষ্য

এখন আমি বুঝলাম। কিন্তু 'মাতরিশ্বান্' ও জলরাশি সম্বন্ধে হঠাৎ একি বলা হ'ল? শঙ্কর "অপঃ"র অর্থ করেছেন ক্রিয়া? এই অর্থে কি ইহা শ্লোকের বাকী অংশের সহিত আরো সুসঙ্গত হবে না?

গুরু

হয়ত "অপঃ"র সঠিক অর্থ হ'ল জলরাশি কিন্তু প্রথমে দেখা যাক, ইহাকে তার সঠিক অর্থে নেওয়া হ'লে আমরা কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই কিনা। শ্রুতি বলে যে, অনন্তগুণ অচঞ্চল অথচ অনন্তগুণ চঞ্চল ব্রহ্মই তা যার মধ্যে মাতরিশ্বা জলরাশি স্থাপন করে। কিন্তু শ্রুতিতে এই বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা যে ভাবনা পাই তা আমরা জানি। যা কিছুকে আমরা বলি সৃজন, প্রসরণ, আর বিজ্ঞান বলে বিবর্তন তা প্রকৃতপক্ষে এক সীমা-করণ, আমাদের কথায় এক "সৃষ্টি" অর্থাৎ সমগ্র থেকে এক অংশের মোচন অথবা যেমন বিজ্ঞানীরা বলে, নির্বাচন (তারা ইহাকে বলে স্বাভাবিক নির্বাচন) অথবা যেমন আমাদের বলা উচিত, ইহা হ'ল প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা এক বৃহত্তর ভাণ্ডার থেকে এক ক্ষুদ্র অংশের, সাধারণ থেকে বিশেষের নির্বাচন। এইভাবে আমরা দেখেছি যে সুষুপ্তি পাদ বা প্রাজ্ঞ হ'ল তার চেয়ে আরো ব্যাপক যে বিশ্বচেতনা তা থেকে চেতনার এক অংশের মোচন অথবা বলা যাক নির্বাচন; স্বপ্নচেতনা বা হিরণ্যগর্ভ হ'ল তার চেয়ে আরো ব্যাপক সুষুপ্তি চেতনা থেকে এক নির্বাচন, আর জাগ্রত চেতনা, বিরাট বা বৈশ্বানর হ'ল তার থেকে আরো ব্যাপক স্বপ্ন চেতনা থেকে এক নির্বাচন; প্রতি ধাপেই চেতনা সংকীর্ণ থেকে আরো সংকীর্ণ হ'তে থাকে যতক্ষণ না আমরা সেই একান্ত সংকীর্ণ চেতনার অংশে আসি যা প্রতিভাসের জড়ীয় বহির্জগতের মধ্য থেকে শুধু এক টুকরো সম্বন্ধে সচেতন। জড়ীয় সৃজন ধারাতেও সেই একই কথা। সাংখ্য যাকে প্রধান বলে সেই জড়ের অগঠিত প্রকৃতি থেকে অথবা আদি ভাবনা, ধাতু, থেকে অথবা তোমার ইচ্ছামতো অন্য নামের পদার্থ থেকে একটি আকার বা শক্তি নির্বাচিত হয় যাকে বলা হয় আকাশ আর যার চক্ষুগোচর অভিব্যক্তি হ'ল "ether" (ইথার); এই আকাশ বা 'ইথার' সকল রূপ ও জড়ীয় সত্তার আশ্রয়। ইথার থেকে ইহা অপেক্ষা আরো সংকীর্ণ এক শক্তি নির্বাচিত হয় অথবা মুক্ত করা হয়, ইহাকে বলা হয় বায়ু বা মাতরিশ্বা, মাতার মধ্যে সুপ্তজন,

কারণ সে মাতৃ-তত্ত্বের, ইথারের মধ্যে সরাসরি নিদ্রা যায় বা বিশ্রাম করে। ইহাই সেই মহান্ দেব যিনি ব্রহ্মের মধ্যে জলরাশি স্থাপন করেন তাদের যথাযথ স্থানে।

শিষ্য

আমার মনে হয় আপনি যে ইহাকে দেবতা বলছেন তা রূপক হিসাবে। বিজ্ঞান তো প্রাচীন অসংস্কৃত দেব-উপাখ্যানের দেবতাদের বাতিল করেছে।

গুরু

দেবতারা ঠিকই আছেন—তাঁরা অমর, বিজ্ঞান তাদের বাতিল করতে পারে না তা যতই প্রচণ্ডভাবে ইহা তাঁদের অস্বীকার করুক না কেন; তাদের বাতিল করতে পারে শুধু একম্ ব্রহ্মের জ্ঞান। কারণ প্রতি বৃহৎ ও মৌলিক প্রাকৃতিক বিষয়ের পিছনে এক বিশাল জীবন্ত শক্তি আছে, ইহা ব্রহ্মের এক অভিব্যক্তি, এক বিভাব, আর সেজন্য ইহাকে দেবতা থেকে ক্ষুদ্র কিছু বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে মাতরিশ্বা হ'ল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেবতা।

শিষ্য

তাহ'লে কি বাতাস দেবতা অথবা পবন দেবতা? কিন্তু ইহা তো কতকগুলি গ্যাসের সমষ্টি।

গুরু

জড়ীয় বিশ্লেষণের কথায় ইহা তা-ই, বেশী কিছু নয়, কিন্তু ইহারও উজানে সংশ্লেষণের দিকে তাকাও; জড় সব কিছু নয় আর বিশ্লেষণও সব কিছু নয়। জড়ীয় বিশ্লেষণের দ্বারা তুমি প্রমাণ করতে পার যে মানুষ কতকগুলি কীটাণুর সমষ্টি বৈ আর কিছু নয়, আর জড়বাদ তা-ই নিশ্চিতভাবে বলে চলে একগুঁয়ে পণ্ডিতমূর্খের মত; কিন্তু মানুষ কখনো নিজেকে কীটাণুর সমষ্টি বলে মনে করতে স্বীকার করবে না, কারণ সে জানে যে সে আরো কিছু। সে তাকায় বিশ্লেষণ ছাড়িয়ে সংশ্লেষণের দিকে, গৃহ ছাড়িয়ে গৃহের অধিবাসীর দিকে, অংশ ছাড়িয়ে সেই শক্তির দিকে যা অংশগুলিকে একত্র ধরে রাখে। বায়ু সম্বন্ধে এই একই কথা,

ইহা পৃথিবীর উপযোগী মাতরিশ্বার এক অভিব্যক্তিমাত্র, সে যে সব গৃহে বাস করে তার একটি মাত্র; কিন্তু মাতরিশ্বাসকল জগতের মধ্যেই অবস্থিত এবং ইহাই সকল জগৎ নির্মাণ করেছে; তার বাসের জন্য তার অসংখ্য গৃহ আছে। তার সত্তার তত্ত্ব হ'ল জড়ীয়ভাবে অভিব্যক্ত গতি, আর আমরা জানি যে গতির দ্বারাই সৃজন সম্ভব হয়। সুতরাং মাতরিশ্বা হ'ল প্রাণের তত্ত্ব প্রাণের বিশ্বব্যাপী ও সর্বব্যাপী সমুদ্র আর মানুষের মধ্যে ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হ'ল সেই শক্তি যা দেহের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসের বিতরণ পরিচালনা করে; এই বিতরণকেই আমরা নাম দিই শ্বাসবায়ু।

শিষ্য

তবু, বেশীর ভাগ লোকই বলতে চাইবে যে ইহা এক প্রাকৃতিকশক্তি, কোন দেবতা নয়।

গুরু

ইহাকে তোমার যা খুশি তাই নাম দিতে পার শুধু উপলব্ধি করো যে মাতরিশ্বা ব্রহ্মের এক শক্তি, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্ম যিনি নিজের মধ্যে জলরাশি স্থাপন করেন তাদের যথাযথ স্থানে। এখন, ঠিক যেমন মাতরিশ্বা আকাশ বা ইহার থেকে এক নির্বাচন, তেমন অগ্নি মাতরিশ্বা থেকে এক নির্বাচন এবং জলরাশি অগ্নি থেকে এক নির্বাচন। আবার লক্ষ্য করো যে "অপঃ"র বহুবচন ব্যবহার করা হ'য়েছে; তুমি প্রায়ই দেখবে যে শ্রুতিতে অগ্নির বিভিন্ন অভিব্যক্তির অধিষ্ঠাতৃতত্ত্ব অগ্নি নামের পরিবর্তে বহুবচনের "জ্যোতীংষি" আলোকসমূহ, দীপ্তিসমূহ, ভাস্বর বিষয়সমূহ ব্যবহৃত হ'য়েছে, ঠিক তেমনই যে "আপঃ", অর্থাৎ বিভিন্ন জলীয় পদার্থ তাদের পিছনকার অধিষ্ঠাতা শক্তি বরুণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। সেই "আপঃ" পদ ব্যবহৃত হ'য়েছে। তুমি কখনো ভেবো না যে সমুদ্রের জল অথবা বৃষ্টির জলই শুধু এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি, যেমন তোমার মনে করা উচিত নয় যে ঐ অঙ্গারপাত্রের মধ্যের অগ্নি বা আকাশের সূর্যই অগ্নিতত্ত্বের একমাত্র অভিব্যক্তি। আলোর সব বিষয়েরই এবং যা কিছু থেকে তাপ আসে সে সবেরই অব্যবহিত ভিত্তি বা আশ্রয় অগ্নিতে। তাপ প্রভৃতির ক্রিয়ায় অগ্নি থেকে যে সব জলধারা নির্বাচিত হয় তাদের বেলাতেও এই একই কথা। সেইরকম আবার সকল মাটির, ঘন অবস্থার সকল

রূপের ভিত্তি বা আশ্রয় পৃথ্বীতে, ক্ষিতি-শক্তিতে যা আবার তরল তত্ত্ব জল বা বরুণ থেকে এক নির্বাচন। এখন প্রাণের উদ্ভব হয় এই প্রকারে; তরল অবস্থা থেকে ইহার দেহস্বরূপ ঘন অবস্থায়, তাপের মাধ্যমে অগ্নির বা আলোর ক্রিয়ার দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয় ইথারের আশ্রয়ের উপর এবং ইহার তত্ত্ব ও মৌলিক অবস্থা হিসাবে মাতরিশ্বা বা বায়ু-শক্তির সাহায্যে। সেজন্য শ্রুতিতে প্রায়ই বলা হয় যে জড় জগৎ জলরাশি থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে, কারণ যতক্ষণ ইহা তরল অবস্থা থেকে আবির্ভূত না হয় ততক্ষণ কোন বিশ্ব থাকে না। যখন বিজ্ঞান বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকৃতির গতিকে উজানধারায় না অনুসরণ ক'রে, ঘনকে তরলে, তরলকে আগ্নেয়তে, আগ্নেয়কে বায়বীয়তে পরিণত না ক'রে প্রকৃতির সব ক্রিয়াধারাকে অনুকরণ ক'রে ইহাকে নিম্নাভিমুখী ভাবে অনুসরণ করে আর বিশেষ করে সংক্র-মণের সংকটপূর্ণ পর্যায়গুলি অনুধাবন ক'রে কাজে লাগায় তখনই জড়ীয় সৃজনের রহস্যের সমাধান হবে আর বিজ্ঞান সক্ষম হবে জড়ীয় প্রাণ সৃজন করতে, এখনকার মত শুধু ইহাকে ধ্বংস করতে নয়। শ্রুতি যে বলে যে ব্রহ্মর মধ্যে মাতরিশ্বা জলধারাসমূহকে তাদের যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করে তার অর্থ কি তা এখন আমরা বুঝতে পারি। সকল জড়ীয় জীবনের পিছনে ব্রহ্মই সদ্‌বস্তু আর সৃজনের ক্রিয়াগুলি শুধু তাঁর বিশ্বব্যাপী চেতনার এক সীমিত অংশ, আর ভিত্তিস্বরূপ ঐ চেতনা ব্যতিরেকে ক্রিয়া-গুলি চলতে পারে না। যখন শঙ্কর "অপঃ"র অর্থ করেন বিভিন্ন কর্ম, তখন বোধ হয় তিনি ভুল করেন নি; মানবজাতির বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য মাতরিশ্বার দ্বারা পরিচালিত নানাবিধ প্রাণিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে কর্মই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তুমি মনে রেখো যে যা সব তুমি সম্পাদন কর, সৃষ্টি কর, ধ্বংস কর, তুমি সেসব করছ ব্রহ্মের মধ্যে, তিনিই তোমার সকল কর্মের সর্ত; ব্রহ্মকে আধ্যাত্মিক শক্তির সাগর হিসাবে যতই তুমি উপলব্ধি কর ও নিজের মধ্যে তা প্রবল কর ততই তোমার সৃষ্টি ও তোমার ধ্বংস শক্তিশালী হবে, তুমি ততই পরমদেবতার দিকে অগ্রসর হবে। কারণ পরম চিৎ-পুরুষই সব, দেহ নয়; দেহ সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া উচিত শুধু এই কারণে যে ইহা পরম চিৎ-পুরুষের এক বাহন কারণ যে পরম চিৎ-পুরুষ প্রকৃতিকে কাজ করার শক্তি দেয় তার সান্নিধ্য বিনা প্রকৃতি নিশ্চেষ্ট হবে এমন কি ইহার অস্তিত্বই অসম্ভব হত। কারণ প্রকৃতি নিজেই কি? যে পরাক্রান্তা শক্তি অনাদি ও অনন্ত

ও সনাতনের শক্তি শুধু তাঁরই সৃজন ইহা। তোমার মধ্যে পরম চিৎ-পুরুষের কিছু জ্ঞান ও অনুভব ছাড়া তোমার কর্ম মহৎ হ'তে পারে না; আর তোমার জ্ঞান যতই গভীর হবে, তোমার কর্মও তত মহৎ হবে। সকল মহান্ স্রষ্টারাই এমন সব ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা নিজেদের মধ্যে ভগবানকে তীব্রভাবে অনুভব করেছেন তা তাঁরা শঙ্করের মত স্বর্গীয় জাতিরূপের দৈবী প্রকৃতির হন অথবা নেপোলিয়নের মত আসুরিক জাতি-রূপের আসুরিক প্রকৃতির হন; শুধু অসুরের জ্ঞান সীমিত ও কলুষিত হওয়ায় অসুর সর্বদাই কাম ও দুরাকাঙ্ক্ষারূপ তার নিজেরই সব প্রাণিক উচ্চণ্ড ভাবাবেগের ন্যায় প্রকৃতির সব স্থূলতর ও সাময়িক অভিব্যক্তিকে ব্রহ্ম বলে ভুল করে; দেব সাত্ত্বিক ও আলোর সন্তান হওয়ায় তার দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ। যখন নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "ফরাসী বিপ্লব আবার কি? আমিই ফরাসী বিপ্লব" তখন তিনি এই ভাবকেই প্রকাশ করেছিলেন যে শুধু মানুষের চেয়ে আরো বেশী কিছু তিনি, তিনি কর্মরত ভগবানেরই শক্তি ও সামর্থ্য, আর তা থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বিস্ময়জনক ক্রিয়া-শক্তি ও ব্যক্তিত্ব; কিন্তু তার মন রজঃ, উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও কামনার দ্বারা পঙ্কিল হওয়ায় তিনি বুঝতে পারেন নি যে তিনি ফরাসী বিপ্লব হ'লে তিনি এমন সব আদর্শ দেখতে পারতেন যা সাম্রাজ্য ও জাঁকজমকে তার প্রাণিক অংশের নিছক তৃপ্তি অপেক্ষা আরো উচ্চ ও মহৎ তাঁর নিজের চেয়ে সনাতন শক্তির আরো মহত্তর ও বীর্যবন্ত অভিব্যক্তি যে জাতীয়তা তার মৃত্যুঞ্জয়ী আন্তর ভাবকে পদদলিত করা অপেক্ষা তাঁর উৎসাহ থাকা উচিত ছিল বিদ্রোহী মানবজাতির নেতা হওয়ায়। সেজন্য তাঁর পতন হ'য়েছিল; সেজন্যই আদ্যা শক্তি, পরাক্রান্তা দেবী চণ্ডী রণরঙ্গিনী নৃমুণ্ডমালিনী তাঁর কাছ থেকে তাঁর 'বরাভয়' প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি তাকে চূর্ণ ও বিদীর্ণ করে-ছিলেন তাঁর সিংহের নখর দিয়ে। মানবজাতির নেতারূপে যদি তাঁর পতন হ'ত——তখন অবশ্য তাঁর পতন সম্ভব হ'ত না, তবু যদি তাঁর পতন হ'ত——তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আন্তরভাব বিজয়ী হ'য়ে বহু শতাব্দী ধ'রে রাষ্ট্রজাতিসমূহকে শাসন ও পরিচালনা করত। সুতরাং তোমার মধ্যে জ্ঞান, ব্রহ্মের শুদ্ধ জ্ঞান লাভ কর আর ইহাকে প্রকট কর নিষ্কাম কর্মে, স্বার্থশূন্য কর্মে, তোমার জনগণের জন্য, তোমার দেশের জন্য, মানবজাতির জন্য, জগতের জন্য; তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই এমন কি এই মরদেহেই ব্রহ্ম

হবে আর মৃত্যুর দ্বারা তুমি পরিগ্রহ করবে নিত্যতা।

তারপর শ্রুতি ঈশ্বরের স্বভাবের কথা ব'লে ও তাঁকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ক'রে অজ্ঞেয় পরব্রহ্ম ও বিশ্বের ঈশ্বর হিসাবে, বিশ্বগত আত্মা ও তোমার দেহস্থ আত্মা হিসাবে তাঁর দ্বিবিধ বিভাবজনিত আপতিক বিরোধ-গুলি সংক্ষেপে একসাথে বলতে শুরু করে। তাহা চলে এবং তাহা চলে না—যে বিষয়টি পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে; তাহা দূরে এবং সেই 'তাহাই' অতি নিকটবর্তী, তাহা সকল কিছুর অভ্যন্তরে আবার সেই তাহাই সকল কিছুর বাহিরে অবস্থিত।

শিষ্য

এই কথাটি বুঝতে কোন কষ্ট নেই।

গুরু

না, কোন কষ্ট হয় না, যদি তুমি সন্ধানসূত্র পেয়ে থাক। কিন্তু ইহার কি অর্থ তা বুঝতে চেষ্টা করো। ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে তোমার চক্ষু ফেরাও। সে সেখানে অবস্থিত জীবন ও আলো ও জ্যোতির ঐ বিস্ময়কর হৃদয়ে। রাত্রে অগণিত তারকামণ্ডলীগুলি লক্ষ্য করো, সনা-তনের গম্ভীর প্রহরী-অগ্নির মতো তারা জ্বলছে অসীম নৈঃশব্দ্যের মাঝে, কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য শূন্য নয়, একটিমাত্র স্থির ও বিশাল অস্তিত্বের সান্নিধ্যে ইহা স্পন্দিত; ঐ দেখ কালপুরুষ তার অসি ও কটিবন্ধসমেত দীপ্তিমান্, দশসহস্র বৎসর পূর্বে আর্যযুগের আদিতে আর্য পিতারা ইহাকে যেমন দীপ্তিমান দেখেছিলেন, এখনও ইহা তেমনই দীপ্তিমান; ঐ দেখ লুব্ধক (sirius) শোভা পাচ্ছে, ঐ দেখ বীণামণ্ডল (Lyra) কোটি কোটি ক্রোশ দূরে মহাকাশ সমুদ্রের মাঝে ভেসে যাচ্ছে। স্মরণ রেখ, এই যে সব অগণিত জগৎ তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের জগৎ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী আর তারা অবর্ণনীয় বেগে ঘুরছে সেই পুরাণের আজ্ঞায়, আর কোন দিকে যে যাচ্ছে তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না অথচ তারা তোমাদের হিমালয় অপেক্ষা লক্ষগুণ বেশী প্রাচীন, তোমাদের পর্বতমূলের অপেক্ষা বেশী দৃঢ় আর এই রকমই তারা থাকবে যতদিন না তিনি তাদের নিক্ষেপ করেন জীর্ণ পত্রের মতো বিশ্বের সনাতন বৃক্ষ হ'তে। কালের অন্তহীনতার কথা ভাব, দেশের সীমাহীনতা উপলব্ধি কর; আর তারপর

স্মরণ কর যে যখন এই সব জগৎ ছিল না তখন তিনি ছিলেন, এখনকার মতো সেই একই, আর যখন এসব জগৎ থাকবে না তখনো তিনি থাকবেন আর সেই একই থাকবেন; বুঝে দেখ যে বীণামণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে আরো বহুদূরে তিনি আছেন, যেখানে ত্রিশঙ্কুমণ্ডলের (Southern Cross) একটি তারকাও দেখা যায় না সেখানেও তিনি আছেন। আবার পৃথিবীতে ফিরে এস, উপলব্ধি কর এই তিনি কে? তিনি তোমার অতি নিকটেই আছেন। দেখ ঐ বৃদ্ধ তোমার পাশ দিয়ে লাঠি নিয়ে নীচু হ'য়ে গুঁড়ি মেরে যাচ্ছে। তুমি কি উপলব্ধি কর যে এই যে লোকটি যাচ্ছে তা স্বয়ং ভগবান? ঐখানে একটি শিশু সূর্যালোকে হাসতে হাসতে ছুটছে। তুমি কি ঐ হাসিতে তাঁর স্বর শুনতে পাও? না, তিনি তোমার আরো কাছেই আছেন, তিনি তোমার মধ্যেই অবস্থিত, তিনিই তুমি। মহাকাশের অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে যা জ্বলছে, আকাশীয় সমুদ্রের ঘূর্ণায়মান তরঙ্গমালার উপর স্থির পদক্ষেপে যে হাঁটছে—সে তুমিই নিজে; তুমিই তারকারাজিকে তাদের যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করেছ আর সূর্যসমূহের মালা গেঁথেছ, তবে হাত দিয়ে নয়, তুমি তা করেছ যোগের দ্বারা, সেই নীরব নিষ্ক্রিয় নৈর্ব্যক্তিক পরম সংকল্পের দ্বারা যা তোমাকে আজ এখানে নিযুক্ত করেছে আমার মাঝে তোমার নিজের কথাই শোনবার জন্য। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, মাথা তুলে দাঁড়াও, আর ভয়ে বা সংশয়ে আকুল হয়ো না; ভয় করো না, সংশয় করো না, শোক করো না; কারণ তোমার আপতিক দেহে সেই একম্ অবস্থিত যিনি জগৎসমূহকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে পারেন এক নিঃশ্বাসে।

হ্যাঁ, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন আধ্যাত্মিক শক্তির অসীম সমুদ্রের মতো; কেননা তিনি যদি না থাকতেন তাহ'লে এই বাহিরের তুমি বা বাহিরের আমি, এই সূর্য বা এই সব জগৎ—কিছুই থাকতে পারত না, এমন কি নিমেষপাতের লক্ষাংশের জন্যও নয়, কিন্তু তিনি আবার বাহিরেও আছেন। এমন কি তাঁর অভিব্যক্তিতে তিনি ইহার বাহিরে আছেন এই অর্থে যে তিনি ইহাকে শুধু ব্যেপে নয়, ছাড়িয়েও আছেন, "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'; তাঁর অব্যক্ত অবস্থায় তিনি ইহা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই সত্যটিকে অবধারণ করা অন্যটি অপেক্ষা আরো বেশী কঠিন কিন্তু ইহার অবধারণের প্রয়োজন আছে। একরকম বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (Pantheism) আছে যা বিশ্বকে দেখে ঈশ্বর বলে, তবে ঈশ্বরকে বিশ্ব বলে দেখে না;

কিন্তু যদি বিশ্ব ঈশ্বর হন তাহ'লে ঈশ্বর কি জড়ীয়, বিভাজ্য; পরিবর্তনীয়, শুধু বিষয়সমূহের প্রবাহ ও পশ্চাৎ প্রবাহ? কিন্তু এই সব স্বরূপে ভগবান নয়, এইসব ভগবান তাঁর ছায়ায় ও অবভাসে; আমাদের রূপকের ভাষায় বলা যায়, ইহারা সেক্‌স্‌পীয়ারের মনের ছায়া ও কল্পনা; তাঁর সকল নাট্যজগৎকে একসাথ করলেও সেক্‌স্‌পীয়ার তার চেয়ে শুধু যে আরো বিশাল তা নয়, তিনি যে শুধু ইহার ভিতরে ও বাইরেও আছেন তা নয়, তিনি ইহা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু।

শিষ্য

আপনি কি বলতে চান যে এইগুলি তাঁর মনের নিঃসরণ (emanation)?

গুরু

না তা নয়। 'Emanation' (নিঃসরণ) কথাটি অর্থহীন, ইহা এক নির্বোধ ভাবনা। ভগবান তো বাষ্পস্রাবী কোন দেহ নয় যদি তুমি তাঁর কাছ থেকে নিঃসৃত হয়েছ, তাহ'লে দয়া করে বল, নিঃসৃত হ'য়ে কোথায় রয়েছ? কোনটি তাদের দেশ, কোথায় তাদের গৃহ? তুমি এমন কোথাও যেতে পার না যেখানে তুমি ভগবানের বাহিরে থাকবে; তুমি তোমার নিজের আত্মা থেকে বাহিরে যেতে পার না। কারণ যদিও তুমি মহাকাশের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী অংশেও পলায়ন কর, তিনি সেখানে আছেন। হ্যামলেট ও বাকী সকলে কি সেক্‌স্‌পীয়ারের মন থেকে নিঃসরণ? তুমি কি আমায় বলবে তারা নিঃসৃত হ'য়ে কোথায় রয়েছে? সেগুলি কি ঐ সব পৃষ্ঠায় রয়েছে যেসব পৃষ্ঠা হ'ল বৃক্ষের কোমল অংশের বিকার আর আজ তৈরী হয় ও কাল ধ্বংস হয়? এগুলি কি পৃষ্ঠাভর্তি ইংরাজী বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের ঐসব সমবায়ের মধ্যে আছে? যদি তুমি এগুলিকে অন্য কোন বর্ণমালার সমবায়ে স্থাপন কর অথবা অক্ষরজ্ঞানহীন লোকের কাছে তাদের কথা বর্ণনা কর, তাহ'লেও হ্যামলেট তার কাছে জীবন্ত থাকবে। অক্ষরগুলি যেসব শব্দের প্রতিরূপ ইহারা কি তাদের মধ্যে আছে, কিন্তু শব্দ তো এই মুহূর্তে শোনা হয় ও পরের মুহূর্তে বিস্মৃত হয়? কিন্তু হ্যামলেট বিস্মৃত হয় না—সে তোমার মনে বাস করে চিরকাল ধরে। তাহ'লে কি এগুলি বিস্মৃত শব্দগুলির দ্বারা জড়ীয় মস্তিষ্কের উপর ছাপের

মধ্যে আছে? না, যদি তুমি কখনও হ্যামলেট নাটক না পড়ে থাক বা ইহার অভিনয় না শুনে থাক, তবু যদি যোগের পর্যাপ্ত ক্রিয়ার দ্বারা অথবা শক্তিশালী সম্মোহনের দ্বারা তুমি তোমার সুষুপ্তি আত্মাকে মুক্ত কর তাহ'লে ইহা তোমাকে হ্যামলেট সম্বন্ধে বলবে। সেক্স্পীয়ারের নাট্য-জগৎ কখনও সেক্স্পীয়ারের মন থেকে নিঃসৃত হয় নি, কারণ ইহা তাঁর মনের ভিতর ছিল এবং মনেই আছে; আর তুমি যে হ্যামলেটের কথা জানতে পার তার কারণ তোমার মন হ'ল সেই বিশ্বমনের এক অংশ যার অন্য এক অংশ আবার সেক্স্পীয়ারেরও মন—আমি যে 'অংশ' বলছি তা শুধু অবভাসে, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ মন এক ও অবিভাজ্য। ইহার স্বভাব বশেই সকল জ্ঞান ইহার অন্তর্গত চিরকাল ধ'রে ও চিরকাল থেকে, আর জাগ্রত অবস্থায় আমরা কথা ও লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করি তা শুধু ইহা থেকে সৃষ্ট (মুক্ত) কতকগুলি টুকরো, অথচ আবার ইহারা তার মধ্যে অবস্থিত ঠিক যেমন বিভিন্ন জগৎ ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট (মুক্ত) শুধু কতকগুলি টুকরো এই অর্থে যে ইহারা বিশ্বচেতনা থেকে নির্বাচিত হ'য়ে পৃথক ভাবে স্থাপিত হ'য়েছে, কিন্তু সর্বদাই ইহারা ব্রহ্মের মধ্যেই অবস্থিত। শ্রুতিতে ঊর্ণনাভ ও তার তন্তু সম্বন্ধে যেমন রূপক ব্যবহার করা হয়েছে, 'Emanation' (নিঃসরণ) কথাটিও সেই রকম একটি রূপক; কোন কোন উদ্দেশ্যের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক, কিন্তু ইহা সত্য নয়, সুতরাং দর্শন গঠনের ভিত্তি হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইহা।

বিশ্বের মধ্যে ও তোমার নিজের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করাই প্রকৃত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ আর অজ্ঞেয়ের দিকে অগ্রসর হ'বার প্রয়োজনীয় সোপান ইহা, কিন্তু বিশ্বকে ভগবান ব'লে ভুল করা এক ভ্রান্ত ও বিপরীত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ। এই বিপরীত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ হ'ল ঋগ্বেদের বাহিরের দিক এবং সেজন্য ঋগ্বেদ নিয়ে যেতে পারে হয় বন্ধনেরই পুনরাবৃত্তিতে, নয় ব্রহ্মলোকে, কিন্তু উপনিষদ তা করে না, উপনিষদ নিয়ে যেতে পারে শুধু ব্রহ্মলোকে বা স্বয়ং ব্রহ্মে।

শিষ্য

কিন্তু নব্য পণ্ডিতরা আমাদের বলেন যে ঋগ্বেদ—হয় একস্থ-বহু-ঈশ্বরবাদী, (henotheistic) নয় বহু-ঈশ্বরবাদী, (polytheistic)

প্রকৃত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (Pantheism) নয়।

গুরু

কিন্তু যদি খৃষ্টান, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীদের কাছ থেকে তুমি তোমার ধর্মের ব্যাখ্যা শোন তাহ'লে তুমি ইহার চেয়ে আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার শুনবে। বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে চার্বাকের যে ব্যাখ্যা যে ইহা বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদীও নয়, বহু-ঈশ্বরবাদীও নয়, ইহা শুধু ব্রাহ্মণদের কল্পিত ধন-ঈশ্বরবাদী (plutotheistic) তার সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? বাতাস যেমন বদ্ধ ঘরের ভিতর মুক্তভাবে বইতে পারে না, সেইরকম কোন ইওরোপীয় বা তার শিক্ষার্থী ছাত্র বেদের আন্তরভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম। আর বিশেষতঃ পাণ্ডিত্যাভিমানীরা কখনও কথার মার-প্যাঁচ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। ম্যাক্স্‌মুলারের মত ব্যক্তিরা আমাদের কাছে বেদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে স্পর্দ্ধা করেন এই জন্য যে তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু জানেন। কিন্তু যখন আমরা আলোর জন্য তাঁদের কাছে যাই, তখন দেখি যে তাঁরা মন্দিরের বহিরঙ্গনের দ্বার-প্রান্তে ছেলেখেলায় রত। প্রবেশ করার "অধিকার" তাঁদের ছিল না কেন না তাঁরা পূর্বকল্পিত ভাবনা নিয়ে ঔদ্ধত্যভরে শেখাতে এসেছিলেন, শিখতে আসেন নি; আর সেজন্য তাঁদের বিদ্যা সত্যলাভের পক্ষে সহায়কর হয়নি, ইহা সহায়কর হ'য়েছিল ব্যাকরণের পক্ষে। অন্য অনেকে সংস্কৃতের প্রাথমিক বিষয়গুলিও না জেনে তাঁদের চেয়ে আরো গভীরভাবে দেখেছেন—যদিও কেউ কেউ যা দেখবার নেই তার চেয়ে বেশী দেখেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "henotheism"কথাটি নেওয়া যাক্; এই যে নতুন পদ, পাণ্ডিত্যাভিমানের একটি ভ্রমপূর্ণ অপসৃষ্টি—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ যদি এই হয় যে আর্যদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন একটিকে গণ্য করত সকলের ঊর্ধ্বে একমাত্র দেবতা বলে, আর অন্য দেবতাদের মনে করত মিথ্যা বা অপেক্ষাকৃত মিথ্যা দেবতা, তাহ'লে ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও নিরন্তর ধর্মযুদ্ধ, কিন্তু তা তো হয়নি। অপরপক্ষে যদি এই অর্থ হয় যে বিভিন্ন পূজারীরা বিশ্বের ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ রূপে পূজা করতে বেশী পছন্দ করে, তাহ'লে আমরা এখনো একস্থ-বহু-ঈশ্বরবাদী (henotheist); কারণ আমাদের মধ্যে এমন কেউ একজনও নেই যার নিজস্ব "ইষ্টদেবতা" নেই, যেমন বিষ্ণু,

শিব, গণপতি, মারুতি, রাম, কৃষ্ণ বা শক্তি; কিন্তু তবু আমরা সকলেই স্বীকার করি যে আমরা যেরূপ পূজা করি তার পিছনে আছেন বিশ্বের ঈশ্বর। অপরপক্ষে যদি একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতিশক্তিকে পূজা করত কিন্তু প্রত্যেককেই তার বেলাতে পূজা করত বিশ্বের ঈশ্বর ব'লে তাহ'লে ইহা নিছক বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ। আর বস্তুতঃ ইহাই বৈদিক ধর্মের বহিরঙ্গ; কিন্তু যখন বেদের ঋষিরা বেদী ছেড়ে ধ্যানে বসতেন তাঁরা উপলব্ধি করতেন যে ব্রহ্ম বিশ্বদেববৃন্দও নন্, অথবা তাদের সমন্বয়ও নন্, বরং তাদের থেকে অন্য কিছু; তখন এই দিব্য প্রকাশ হ'ত যার কথা উপ-নিষদে বলা হ'য়েছে "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নি-গূঢ়াম্" ইহার যা অর্থ তা এইভাবে বলা যায়—ব্রহ্ম এই সকল কিছুর বাহিরে আছেন, তিনি প্রকৃতির সংশ্লেষণ নন অথবা বিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে তা-ও তিনি নন, তবে তিনি নিজেই নিজের মনের মধ্যে বিশ্বকে ধারণ করেন যে বিশ্ব তাঁর নিজের মনের এক ছায়ামাত্র।

শিষ্য

আমি বুঝলাম।

গুরু

যদি তুমি সত্যই বুঝে থাক তাহ'লে ইহার পরেই শ্রুতি যে কথাটি বলে তা বোঝবার জন্য তুমি উপযুক্ত হ'য়েছ—ব্রহ্মের ঐক্য থেকে ইহা সেই নৈতিক তত্ত্বের কথা আনে যা যে কোন ধর্মের নৈতিক তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তম।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

মানব নিজেকে দেখে তার নিজের আত্মার দ্বিবিধ প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ যে শক্তি জানে ও যে শক্তি জানে ব'লে অভিনয় করে তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন বিরোধের মাঝে;—এই মানবকে শ্রুতি দেয় এক অভ্রান্ত দেশনা, এক নিশ্চিত দণ্ড এবং এক সম্পূর্ণ আদর্শ।

সকল ভূতকে দেখ নিজের আত্মার মধ্যে। যদি তোমার মন তোমাকে বিভ্রান্ত করে, যদি তোমার আবরণের যন্ত্রণা তখনো অন্তঃস্থ অমর চিৎ-পুরুষকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তবু তোমার অশ্রু মুছে ফেল, যদি রক্তমাখা অশ্রুও

হয়, তাহ'লেও তা চোখ থেকে মুছে ফেল আর তাকাও বিশ্বের দিকে। ওখানে তোমার আত্মাই রয়েছে যা ব্রহ্ম, আর এই সব বিষয়-- তুমি, তোমার সুখ, তোমার দুঃখ, তোমার সব বন্ধু ও শত্রু তাঁর মধ্যে অবস্থিত।-- "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"। হ্যা সকল কিছু--স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, শত্রু, আনন্দ, শোক, জয়, পরাজয়, সৌন্দর্য ও কদাকার, সজীবতা ও নির্জীবতা--এ সবই সেই এক চেতনার বিভিন্ন দশামাত্র আর ঐ চেতনা আমাদের নিজেদের। যদি তুমি এই কথাটি চিন্তা কর, তাহ'লে তোমার নিজের তৈরী ছাড়া অন্য কোন বন্ধু বা শত্রু আনন্দ বা শোক থাকবে না। বিজ্ঞানীরা তোমায় বলে যে পরিবেশের সহিত একটি বিশেষ প্রকারে নিজেকে অভিযোজন করার সংকল্প দ্বারাই একটি প্রজাতি নিজেকে ভিন্ন করে অন্য থেকে। এক বিশ্বজনীন তত্ত্বের শুধু এক বিশেষ প্রয়োগ ইহা। পরম সংকল্পই সকল বিষয়ের মূল; তুমি স্ত্রী, অপত্য, বন্ধু ও শত্রু পেতে সংকল্প কর আর তাদের উৎপত্তি হয়। তুমি পীড়িত ও শোকগ্রস্ত হ'তে সংকল্প কর আর পীড়া ও শোক তোমাকে আক্রমণ করে; তুমি বলবান ও সুন্দর ও সুখী হ'তে সংকল্প কর আর সারা জগৎ আরো উজ্জ্বল হয় তোমার প্রভায়। এই সমগ্র সেই এক বিশ্বাত্মক সংকল্পের ফলমাত্র যা নিজের মধ্যে বহু সৃষ্টি করার সংকল্প করে নিজেকে পরিণত করেছিল ইহার মধ্যে যাসব বিভিন্ন রূপ দেখ সে সব রূপে।

শিষ্য

এই ভাবনা এত বিশাল অথচ আবার এত সূক্ষ্ম যে ইহাকে অবধারণ করা দুরূহ।

গুরু

ইহার কারণ এই যে অবিদ্যা, ভেদবোধ দেহের মধ্যে তোমার স্বাভাবিক অবস্থা। একটু চিন্তা করো। জৈবনিক (protoplasm) নিজেকে বহু-গুণিত ক'রে এই দেহ নির্মাণ করে; ইহা নিজেকে ভাগ করে না, কারণ ভাগের দ্বারা ইহার বৃদ্ধি হ'ত না। ইহা নিজের মধ্য থেকে আর একটি নিজ উৎপন্ন করে--যা দেখতে, আয়তনে, প্রকৃতিতে একই এবং এইভাবে ইহা দেহ নির্মাণ করে যা শুধু নিজেই, তবে তা নিজেকে বহুগুণিত করেছে নিজের মধ্যে। ইহাকে একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করো, যা তবু

তোমার বোঝবার সহায় হ'তে পারে।

শিষ্য

কিন্তু ইহা নিজের মধ্যে বহুগুণিত করে না, ইহা বহুগুণিত করে নিজের বাহিরে যেমন নর ও নারী নিজেদের বাহিরে সন্তান সৃষ্টি করে।

গুরু

এইরূপই তোমার কাছে প্রতীয়মান হয় কারণ ইহার কাজ হয় কাল ও দেশের মধ্যে—এই একই কারণে তোমার মনে হয় যে জীবাত্মা বহু, প্রতিটি অন্যের বাহিরে, কিন্তু আরো গভীর জ্ঞানে জানা যায় যে ইহা এক; অথবা তুমি মনে কর যে একই লোকের মাঝে দুই পৃথক চেতনা আছে অথচ আরো কুশল সম্মোহন দ্বারা তুমি জানবে যে ইহারা একই চেতনা যা নিজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করছে। এক অর্থে আমাদের কাছে মনে হয় যে 'এক' নিজেকে বহুগুণিত করে জৈবনিকের মতো, কারণ সকলের মধ্যে সেই একই এক জীবাত্মা, আর এইজন্যই সকল জীবের মধ্যে চেতনার মূলগত সাদৃশ্য; এক অর্থে মনে হয় তিনি নিজেকে বিভক্ত করছেন মানুষী চেতনার মতো কারণ তিনি একক আর সব কিছুই মনে হয় এই ব্যাপক এককের আংশিক প্রকাশ; আবার মনে হয় যে তিনি নিজেরই বিভিন্ন টুকরো একত্র যোগ করছেন কারণ তুমি যে চেতনা তিনি তাকে তুমি যোগ করছ তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে চেতনাও আবার তিনি, আর এইভাবে এক হও, আর এইরূপই ধারা চলতে থাকে যতক্ষণ না ব্যষ্টি থেকে, খণ্ডে খণ্ডে বিশ্লেষণ থেকে, তুমি পাও সমষ্টি, সকল খণ্ডের সংশ্লেষণ; পরিশেষে মনে হয় যে তিনি নিজেকে বিযুক্ত করছেন, নিজ থেকে, কারণ, আমি যেমন তোমায় বলেছি, সৃষ্টির প্রতি পর্যায়ই হ'ল এক বৃহত্তর সত্তা থেকে অংশসমূহের মোচন অথবা পৃথকীকরণ। এসবই কিন্তু আকার ও অবভাস আর যা কিছু তিনি করেন তা তাঁর নিজের মধ্যেই হ'তে হবে কারণ অন্যকিছুতে করার মত কিছু তো নেই যেহেতু তিনিই সকল দেশ ও সকল কাল। সুতরাং উপলব্ধি করো যে এই যে সব তোমার চারিদিকে—স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু, শত্রু, মানুষ, প্রাণী, সজীব ও অচেতন—সেসব তোমার মধ্যেই বিশ্বমনের ভিতর অবস্থিত মঞ্চে অভি-নেতাদের মতো আর সেসব যে তোমার বাহিরে মনে হয় তা শুধু অবভাসের

জন্য, অভিনয়ের সুবিধার জন্য। যদি তুমি তা উপলব্ধি কর, তাহ'লে তুমি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হবে না, সেজন্য তুমি কাকে ঘৃণাও করবে না, আবার সেই কারণে তুমি কারুর ক্ষতিও করতে চেষ্টা করবে না। কারণ কিরূপে তুমি কারুর উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পার? যদি তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষতি করে, সে ক্ষতি তুমি নিজেই নিজের করছ; তারা যা কিছু, তা তুমিই তাদের তা করেছ; যা কিছু তা করে, তাদের ক্রিয়ার মূল তুমি। তাছাড়া তুমিও কারুর ক্ষতি করবে না কারণ তাহ'লে তুমি নিজ ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষতি করবে। Iago (আয়াগো) Othello -র (অথেলোর) ক্ষতি করেছিল ব'লে কি সেক্স্‌পীয়র আয়াগোকে ঘৃণা করেছিলেন? তুমিও তাহ'লে কেমন করে তাদের ঘৃণা করে তাদের ক্ষতি করতে চাইবে? তুমি কি মনে কর যে যখন সেক্স্‌পীয়র সকল দুর্বৃত্তকে মৃত্যু ও পীড়নের দণ্ড দিয়েছিলেন তখন কি তার (আয়াগোর) মনের ভাবের মতোই তাঁর মনের ভাব হ'য়েছিল? যদি সেক্স্‌পীয়র আয়াগোকে সত্যই ঘৃণা করতেন তাহ'লে তুমি তখনই বলতে যে ইহা সেক্স্‌পীয়ারের ভ্রান্তি অবিদ্যা—কারণ সেক্স্‌পীয়র নিজেই আয়াগোকে সৃষ্টি করেছিলেন অথেলোকে ক্ষতি করার জন্য, আর বাস্তবিকই আয়াগোও নেই, অথেলোও নেই, আছেন শুধু সেক্স্‌পীয়ার যিনি নিজের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করছেন। তাহ'লে সেক্স্‌পীয়ারের নিজের সৃষ্টিকে ঘৃণা করা অপেক্ষা তুমি যে নিজেকে শত্রু ক'রে নিজেকে ঘৃণা কর তা বেশী যুক্তিসঙ্গত তা কেন মনে করবে? না, সকল বিষয়ই যখন তোমারই মধ্যে, তখন তারা তোমার নিজেরই সৃষ্টি, তারা তুমি নিজেই আর তুমি তোমার নিজের সৃষ্টিকে ঘৃণা করতে পার না, তুমি নিজেকে অবজ্ঞা করতে পার না। অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভ্রান্তির, অবিদ্যার সন্তান। ইহা নৈতিকতার নেতিবাচক দিক; কিন্তু একটি ইতিবাচক দিক আছে যার জন্য ভিত্তি স্থাপন করতে শ্রুতি ইহার পর অগ্রসর হয়। সকল অসৎ থেকে তোমার নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য তোমার কর্তব্য হ'ল সব ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখা; কিন্তু তুমি যদি শুধু তা-ই কর তুমি শীঘ্রই সকল ক্রিয়ার নির্বাণে উপনীত হবে আর যবনিকাপাত করবে এক অসমাপ্ত অভিনয়ের উপর। তোমার সর্বশেষ নিষ্ক্রামণের উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে যাবার জন্য তোমার আরো কর্তব্য হ'ল সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখা। বিদ্যার অবস্থায় আত্মার স্বভাব হ'ল আনন্দ; এখন বিদ্যার অবস্থা হ'ল আত্ম-

উপলব্ধির অবস্থা, একত্ব ও বিশ্বজনীনতা উপলব্ধির অবস্থা। অবিদ্যার অর্থাৎ বৈচিত্র্য ও খণ্ডতার মিথ্যা বোধের অবস্থায় আত্মার স্বভাব শুদ্ধ আনন্দের নয়, ইহা সুখ ও দুঃখের অবস্থা কারণ সুখ আনন্দ থেকে ভিন্ন, ইহা সীমিত ও দুঃখের সহিত যুক্ত অথচ আনন্দের স্বরূপ হ'ল অসীম, ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। এই আনন্দের উৎপত্তি হয় যখন দুঃখ নিজেই সুখ হ'য়ে ওঠে, সুখের মধ্যে লীন হ'য়ে যায়। সুতরাং যা কিছু ভেদবোধকে এমনকি আংশিকভাবেও দূর ক'রে চূড়ান্ত ঐক্য আনার সহায়কর হয় তা-ই দুঃখকে আংশিকভাবে ভুলিয়ে দিয়ে তার সহিত নিয়ে আসে আনন্দের স্পর্শ। কিন্তু যা থেকে তুমি আনন্দ পাও তাতে তুমি উল্লসিত না হ'য়ে পার না, তুমি তাকে ভাল না বেসে পার না। সুতরাং যদি তুমি অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখ, তুমি স্বতঃই এই অন্যকে ভালবাসবে কারণ নিজেতে তুমি আনন্দ পাবেই; যদি তুমি সর্বভূতে নিজেকে দেখ তাহ'লে তুমি সর্বভূতকে না ভালবেসে পার না। বহুর মধ্যে একের উপলব্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল বিশ্বজনীন প্রেম আর বিশ্বজনীন প্রেম থাকলে তার সহিত ঘৃণা, বিরক্তি, অপ্রীতি, অবজ্ঞার লেশমাত্র কি করে থাকবে? রাত্রির কুহেলিকা যেমন লীন হ'য়ে যায় উদীয়মান সূর্যের দীপ্তির মাঝে, ইহারাও তেমন লীন হয়ে যায় বিশ্বজনীন প্রেমের মাঝে। ইহাকে অন্য ভাবে নিলে আমরা এক সত্যের অন্য এক নতুন দিক পাই। সকল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উৎপত্তি একটি মাত্র কারণ,—অবিদ্যা যা থেকে জন্মাল কামনা নামক সংকল্প; তা থেকে এল অহঙ্কার আবার তা থেকে জন্মাল ক্ষুধা নামক কামনা। কামনা ক্ষুধা থেকেই জন্মায় প্রীতি ও অপ্রীতি,—যা কিছু আমাদের কামনা পূর্ণ করে অথবা তার সহায়কর হয় তার জন্য প্রীতি আর যা কিছু কামনাপূরণকে বাধা দেয় বা ক্ষুণ্ণ করে তার জন্য অপ্রীতি। এইভাবে যে প্রীতির উৎপত্তি হয় তা হ'ল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক সব কিছুর জন্য জৈবনিক কোষের প্রীতি, ভাবাবেগের তৃপ্তিদায়ক সব কিছুর জন্য প্রাণিক কোষের প্রীতি, সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিদায়ক সব কিছুর জন্য মনকোষের প্রীতি, বুদ্ধির তৃপ্তিদায়ক সব কিছুর জন্য জ্ঞানকোষের প্রীতি। কিন্তু এই সবের উজানে অন্য এমন কিছু আছে যা তত বোধগম্য নয়, নারীর সুন্দর দেহের জন্য, অথবা কোন সুন্দর আলেখ্যের জন্য বা মনোরম সঙ্গীর জন্য, কোন উত্তেজনাদায়ক খেলার জন্য অথবা কুশল বক্তার বা ভাল কবিতার বা অর্থপ্রকাশক সুযুক্তিসমন্বিত বিতর্কের জন্য আমার

প্রীতির অতীত এমন কাহারও জন্য আমার প্রীতি থাকে যার সমর্থনে কোন কারণ বা আপতিক যুক্তি নেই। যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই সব কিছু হ'ত তাহ'লে স্পষ্টতঃই একটি নারীর পরিবর্তে অন্য নারীকে পছন্দ করার কোন যুক্তি থাকে না আর পাশবিক তৃপ্তির পর প্রীতিরও অবসান হবে ; আমি দেখেছি যে এই পাশবিক সংবেগকে নাম দেওয়া হয় প্রেম ; হয়ত আমি নিজেই এই বলতাম যখন আমার মধ্যে জৈবনিক পশু প্রবল ছিল। যদি ভাবাবেগের তৃপ্তিই সব কিছু হ'ত তাহ'লে অবশ্য আমি কিছু সময়ের জন্য সেই নারীতে আসক্ত থাকতে পারতাম যে আমার দেহের সন্তুষ্টি দিয়েছে,--কিন্তু শুধু ততক্ষণই যতক্ষণ সে আমাকে ভাববগত তৃপ্তি দিয়েছে তার বাধ্যতার জন্য আমার প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর বিষয়গুলির প্রতি তার সমবেদনার জন্য, তার মনোহর বাক্য, তার প্রশংসা বা আমার ভালবাসার উত্তরে তার ভালবাসার জন্য। কিন্তু যে মুহূর্তে এগুলির অবসান হয় সেই মুহূর্তে আমার প্রীতিও লোপ পেতে শুরু করে। এই প্রকার প্রীতিকেও অনবরত ঐ মহৎ নাম দেওয়া হয় এবং প্রশংসা করা হয় কবিতায় ও উপন্যাসে। তারপর যদি সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিই সব কিছু হ'ত তাহ'লে অতি সুন্দরী বা অতীব লাবণ্যময়ী নারীর জন্য আমার প্রীতি ভাবাবেগের তৃপ্তিনাশের পরও অনেক দিন থাকতে পারে, কিন্তু যখন বলিরেখা এসে তার মুখের উপর বয়সের ছাপ দিতে শুরু করে বা কোন দুর্ঘটনায় তার সৌন্দর্য নষ্ট হয় আমার প্রীতি ক্ষীণ বা বিলুপ্ত হবে যেহেতু বর্তমান অবস্থায় তার খাদ্যের অভাব হবে। নারীর প্রতি নরের ভালবাসার মধ্যে বুদ্ধিগত তৃপ্তির স্থান একরকম নেই ; আর যদিই বা থাকত, তাহ'লেও দিনরাত্রি একসঙ্গে থাকার দরুণ একটি মাত্র মন থেকে যে বুদ্ধিগত তৃপ্তি পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শীঘ্র নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তাহ'লে যে প্রেম জীবন অপেক্ষা মহত্তর ও মৃত্যু অপেক্ষা বলিষ্ঠ, সৌন্দর্যহানি ও লাবণ্যহানিসত্ত্বেও যা টিকে থাকে, প্রেমাস্পদের কাছ থেকে চরম দুঃখ ও ঘৃণা পেয়েও যা তা তুচ্ছ করে, যা প্রায়ই বর্ষিত হয় এক বিশাল ও উচ্চ ধীশক্তি থেকে তার অনন্তগুণ হীন পাত্রের উপর তা আসে কোথা থেকে ? আবার নারীর সেই প্রেমের কথাই বা কি, যাকে কিছুই অতিক্রম করতে পারে না, অবহেলা সত্ত্বেও যা টিকে থাকে, ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা পেয়েও যা বৃদ্ধি পায়, চিতাগ্নির লোহিত জিহ্বা অপেক্ষাও যার শিখা আরো ঊর্ধ্বে ওঠে, যা তোমাকে স্বর্গ পর্যন্ত অনুসরণ করে অথবা নরক

থেকে উদ্ধার করে? একথা বোলো না যে এরূপ প্রেমের-অস্তিত্ব নেই, আর এখানকার সব প্রেমেরই ভিত্তি হ'ল ক্ষুধা, মিথ্যাগর্ব, স্বার্থ বা নিজের সুখ, বোলো না যে রাম, সীতা, রুরু ও সাবিত্রী শুধু স্বপ্ন ও কল্পনা। নিজের দিব্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন মানবপ্রকৃতি এই অপবাদ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে--আর ইহার রায়কে কবিতা আশীর্বাদ করে ও ইতিহাস সমর্থন করে। ঐ প্রেম অন্য কিছু নয়, ইহা শুধু অস্পষ্ট বা স্পষ্টভাবে আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা এবং সেজন্য একত্ব ও একত্বের আনন্দ উপলব্ধির প্রয়াস। আবার বন্ধু কি? একথা ঠিক যে আমি তার কাছ থেকে দেহের সুখ চাই না বা তাকে যে পছন্দ করি তা তার সুন্দর আকৃতির জন্য নয় অথবা যে রুচি ও বৃত্তির সাদৃশ্য আমি একজন শুধু সঙ্গীর কাছে চাইব তা-র জন্যও নয়; অথবা হয়ত শিষ্যকে ভালবাসার মত সে আমায় ভালবাসে বা আমার প্রশংসা করে বলে যে আমি তাকে ভালবাসি তা-ও নয়; অথবা আমি ইহাও দাবি করি না যে সে অতীব বুদ্ধিমান হ'ক যেন সে-ই একমাত্র বুদ্ধিবিষয়ক সাহায্যদাতা বা শিক্ষাদাতা। এই সব ভাব থাকতে পারে কিন্তু ইহারাই বন্ধুত্বের সারপদার্থ নয়। না, আমি বন্ধুকে ভালবাসি সেই একই কারণে যে কারণে আমি নারীকে ভালবাসি, আমি ভালবাসি এই কারণে যে আমি তাকে ভালবাসি, প্রাচীন অক্ষয় ভাষায় এই কারণে যে সে আমার অন্য আত্মা। এইখানেই প্রাচীন রোমান বোধিবলে প্রেমের চরম রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। যখন আত্মা মন বা দেহের মধ্যে তার মিথ্যা আত্মা থেকে অন্যের মধ্যে তার প্রকৃত আত্মার দিকে ফেরে তখনই তা প্রেম; আমি তাকে ভালবাসি এই কারণে যে আমি তার মধ্যে আমারই প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করেছি, ইহা আমার দেহ বা মন বা রুচি বা হৃদয়বৃত্তি নয়, পরন্তু ইহা আমারই প্রেম ও আনন্দময় আত্মা যার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে শ্রুতি সুন্দর-ভাবে বলেছে, "প্রেম তার দক্ষিণ পক্ষ ইত্যাদি"। দেশপ্রেমীর বেলাতেও সেই কথা; সে নিজেকে, আত্মাকে দেখেছে জাতির মধ্যে এবং সে চায় ঐ উচ্চতর জাতীয় আত্মার মধ্যে তার নিম্ন আত্মাকে বিসর্জন দিতে; আর সে তা পারে ব'লেই আমরা পাই ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, জোন-অফ-আর্ক, ওয়াশিংটন, প্রতাপসিং, বা শিবাজীর মত বীর; নিম্ন জড়গত আত্মা তোমায় এসব দিতে পারত না; এরূপ লোক তুমি কার্য-কারিতার কারখানায়, চার্বাকের কামারশালায় তৈরী করতে পারবে না,

অথবা পারবে না তাদের এপিকিউরাসের উদ্যানে জন্মাতে। সেই একই কথা মানবপ্রেমিকের বেলায় যে মানবজাতির মধ্যে তার নিম্ন আত্মাকে বিসর্জন দেয় বা দিতে চায়; ফাদার ডামিয়েন বা যীশু বা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল--কোন প্রবুদ্ধ স্বার্থপরতার দান হ'তে পারে না। সর্বশেষে সেই একই কথা জগদ্-প্রেমীর বেলায়, যার মহান্ জাতিরূপ হ'ল বুদ্ধ, মানবের মাঝে দিব্য প্রেমের এক অগম্য আদর্শ যিনি সম্পূর্ণ মানুষী আনন্দ থেকে ফিরে আসার মতোই ফিরে এসেছিলেন সম্পূর্ণ দিব্য আনন্দ থেকে এই কারণে যে শুধু তিনি একলা নন, সকল প্রকার প্রাণীই যেন পরিত্রাণ পায়।

সর্বভূতের মধ্যে তোমার আত্মাকে এবং তোমার আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা--ইহাই সকল ধর্ম, ভালবাসা, দেশপ্রেম, জনপ্রীতি, মানবপ্রীতির অর্থাৎ স্বার্থপরতা ও স্থূল সুবিধার ঊর্ধ্বস্থিত সকল কিছুর অটল ভিত্তি। কারণ স্বার্থপরতা কি? তোমার যে প্রকৃত আত্মা সমগ্র বিশ্ব এবং বিশ্বেরও অতিরিক্ত তার নিষ্কলুষ আনন্দের পরিবর্তে দেহ ও বিভিন্ন প্রাণিক সংবেগকে তোমার প্রকৃত আত্মা ব'লে ভুল ক'রে তাদের তৃপ্তি অর্থাৎ এক স্থূল সংকীর্ণ ও অনিত্য সুখ অন্বেষণ করাই স্বার্থপরতা। ইহার উৎপত্তি অবিদ্যা থেকে, সেই বৃহৎ মৌলিক অজ্ঞানতা থেকে আর এই অবিদ্যার সৃষ্টি হ'ল অহঙ্কার, তোমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বোধ, তোমার নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্বেই তোমার নিবিষ্টতা আর এই অহঙ্কার থেকে তখনই আসে কাম আর আসে ক্ষুধা যা মৃত্যু, তোমার নিজের মৃত্যু ও অপরের মৃত্যু। এই যে বোধ যে ইহা আমি ও উহা তুমি, এই জিনিস বা ঐ জিনিস আমার চাই-ই আর অন্যথায় তুমি তা নেবে--ইহাই সকল স্বার্থপরতার ভিত্তি; এই যে বোধ যে এই আমি ঐ তোমাকে খাবই, তবে যদি আমি বাঁচি ও আমাকে অন্য কেউ খেতে না পারে--ইহাই সকল জড়ীয় অস্তিত্বের তত্ত্ব যা থেকে উৎপত্তি হয় কলহ ও ঘৃণা। আর যতক্ষণ 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে বিভেদ থাকে তখন ঘৃণার অবসান হ'তে পারে না, লোভের অবসান হ'তে পারে না, হ'তে পারে না যুদ্ধের অবসান, অশুভ ও পাপের অবসান আর যেহেতু পাপের অবসান হ'তে পারে না সেহেতু দুঃখ ও শোকেরও অবসান অসম্ভব। ইহাই সেই সনাতনী মায়া যা পৃথিবীতে জড়ভিত্তিক স্বর্গের জন্য সকল জড়ভিত্তিক প্রকল্পকে উপহাস করে। খাদ্য ও পানীয়ের ভিত্তির উপর, দ্রব্যসামগ্রীর সমবন্টনের উপর, এমন কি দ্রব্যসামগ্রীর

সাধারণ অধিকারেরও উপর স্বর্গরচনা সম্ভব হয় না কারণ সর্বদাই 'আমার' ও 'তোমার', লোভ, ঘৃণা আবার ফিরে আসবে—ইহা এই ব্যক্তি ও ঐ ব্যক্তির মধ্যে না হ'লেও তবু এই সম্প্রদায় ও ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হবে। খৃষ্টীয় ধর্ম আশা করে যে ইহা সব মানুষকে ভাইয়ের মত একত্র বাস করাবে—একটি সুখী পরিবার হবে, তারা পরস্পরকে ভালবাসবে ও সাহায্য করবে; হয়ত ইহা এখনও তা আশা করে যদিও আধুনিক জগতে তার সব স্বপ্নকে তুষ্ট করার মত কিছু নেই। বিলাপ ও দন্তঘর্ষণে পূর্ণ বাহিরের অন্ধকারে অধিকাংশ মানুষকে নির্বাসন দিয়ে, পবিত্র ও বিশ্বস্ত অবশিষ্ট সামান্য কিছু মানুষ নিয়ে মানবজাতির এই সংযুক্ত পরিবার স্থাপন ক'রে যদি খৃষ্ট নিজে তার সকল দেবদূতকে নিয়ে অবতরণ করেন ও গ্রন্থি ছেদন করেন তাহ'লেও তাঁর সেই সহস্রবর্ষের রাজ্য আসবে না। ব্যাধিদুষ্ট কল্পনার এ এক উন্মাদের স্বপ্ন যে মানুষ সত্যই চিরস্থায়ী-ভাবে সুখী হ'তে পারে যখন মানবজাতি চিরস্থায়ীভাবে দুঃখ ভোগ করতে থাকে! আর কি অদ্ভুতভাবেই না বৌদ্ধধর্মের স্বল্প কিন্তু মধুর ও প্রসন্ন ছায়া বিকৃত হ'ল সেই সব ক্রূর ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোকেদের মলিন ও নিষ্ঠুর মনে যখন তারা চিত্রিত করত যে সাধুরা আরো অধিক আনন্দ ভোগ করছেন এই ভাবনা থেকে যে যেসব ব্যক্তিদের সহিত তাঁরা বাস করেছিলেন এবং যাদের হয়ত ভালবেসেছিলেন তারা অনন্তকাল ধরে যন্ত্রণা ভোগ করছে। দিব্য প্রেম, দিব্য অনুকম্পা, বুদ্ধের স্বভাব—এই বাণীই ভারতবর্ষ ইওরোপে পাঠিয়েছিল যীশুর মুখ দিয়ে আর এই ভাবেই ইওরোপীয় মন দিব্য প্রেম, দিব্য অনুকম্পা ব্যাখ্যা করেছিল! নরকের যেসব আগুনকে পূর্বেই পৃথিবীতে স্মিথফিল্ডের আগুনরূপে উপযুক্তভাবে ও ধর্মভাবের সহিত আনা হ'য়েছিল, সেসব, বিরুদ্ধবাদীদের দগ্ধ করার অগ্নির দেদীপ্যমান জ্যোতি; বিরুদ্ধবাদীদের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের সব কারাগার থেকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার যে বাস্প ইতিহাসের মধ্য দিয়ে উপরে ওঠে তা এমন জ্ঞানীলোকও আছেন যাঁরা এইসব ধর্মভাবাপন্ন উৎপীড়নের সমর্থনে যুক্তি বাহির করেন—এসব কিন্তু মোটের উপর নশ্বর দেহের পরিবর্তে আত্মাকে পরিত্রাণ করার প্রয়াস! কিন্তু প্রাচ্যের আর্য মনোভাব, বুদ্ধের মনোভাব চিরকাল ইওরোপীয় বর্বরতার সহিত সংগ্রাম করে আর পরিশেষে ইহার বিজয় ধ্রুব ও নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই ইওরোপ মুখে ও তার মনের বহিঃপ্রান্ত থেকে মানবপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা

অর্পণ করে; হয়ত একদিন সে তার হৃদয় দিয়েও তা করবে। কিন্তু যাই হ'ক তারতুলিয়ানের (Tertullian) সহস্রবর্ষের যীশুরাজ্য এখন সেকেলে হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু এখনো খৃষ্টীয় আদর্শই,---যা সত্যের সিরীয় ব্যাখ্যা, সঠিক সত্য নয়---উৎকৃষ্ট ইওরোপীয় ভাবনাকে অধিকার করে আছে এবং খৃষ্টীয় আদর্শ হ'ল সংযুক্ত পরিবারের আদর্শ।

শিষ্য

ইহা নিশ্চয়ই এক মহান্ আদর্শ।

গুরু

অতীব মহান্ আর আমাদের মধ্যে আমরা তা পাই এই মহান্ শ্লোকে---"বসুধৈব কুটুম্বকম্"; কিন্তু যা কিছুতে ভেদের অর্থ আসে তার ভিত্তি অবিদ্যা ও অবিদ্যার সব অবশ্যম্ভাবী ফল। তুমি কখনো বাংলাদেশে কোন বড় সংযুক্ত পরিবার, যৌথ পরিবার লক্ষ্য করেছ---বিশেষতঃ এমন দিনে যখন আর্যশিক্ষা ও বশ্যতা আর নেই। বল ও ঐক্যের বাহ্য মুখোসের পিছনে কি বিবাদ, কি মতভেদ, কি তুচ্ছ দ্বেষ ও ঘৃণা, কি হিংসা ও লোভ! আর তারপর সর্বশেষে একদিন সংঘর্ষ, যুদ্ধ, আদালতে মকোদ্দমা চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ। সংকীর্ণ পরিসরে যৌথ পরিবার যা, বিস্তৃত পরিসরে সংযুক্ত রাষ্ট্রজাতি তা---রাশিয়া বা অষ্ট্রিয়া বা জার্মানি বা যুক্ত-রাজ্য। সংযুক্ত পরিবাররূপে মানবজাতির অর্থ কার্যতঃ সংযুক্তরাষ্ট্র-জাতিরূপে মানবজাতি। এতে তোমার কতখানি লাভ হ'বে? কিছুদিনের জন্য তুমি যুদ্ধ থেকে মানুষের দ্বারা মানুষের দেহ ছেদন থেকে নিস্তার পেতে পার কিন্তু দেহই সব চেয়ে বড় জিনিস নয়, যদিও তাকে ব্রহ্মের নির্বাচিত বাহন বা প্রিয় পরিচ্ছদরূপে সম্ভ্রম করা চাই। ঘৃণা, লোভ ও কলহের দ্বারা মানুষী আত্মার আরো যে নিষ্ঠুর ছেদন তা থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। ইওরোপীয়রা দেহের প্রতি বড় বেশী গুরুত্ব দেয়, শারীরিক পাপ থেকেই তারা বেশী সঙ্কুচিত আর মানসিক পাপের বেলায় তারা বরং স্বস্তিতেই থাকে। তাদের কাছে ইহাই যথেষ্ট যদি কোন নারী তার কামনাকে কর্মে পরিণত করা থেকে নিবৃত্ত থাকে, যদি কোন পুরুষ শারীরিক হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকে, তাহ'লে একজন সাধ্বী এবং অন্যজন আত্ম-সংযত। ইহা সম্পূর্ণ অনার্যভাব ম্লেচ্ছপনা না হ'লেও

ইহা তোমার কাছে বড়জোর অর্ধ-আর্যভাবাপন্ন ব্যক্তির অর্ধ-পক্ব গুণ, কারণ তুমি জন্মেছ আর্যশিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, তা সে শিক্ষা দীর্ঘ বন্ধনদশার জন্য যতই হীনভাবাপন্ন হ'ক না কেন, তুমি আর্যই বটে, মনে ও আন্তর-ভাবে পবিত্র, আর শুধু বাক্যে ও দেহে সাবধানী নও, তুমি হৃদয়ে ও ভাবনায় কোমল আর শুধু কথায় ও কাজে ভদ্র নও। উহাই প্রকৃত আত্ম-সংযম ও সত্যকার সুনীতি। সুতরাং কোন স্বর্গই থাকতে পারে না, আর থাকলেও কোন স্বর্গ টিকতে পারে না যতক্ষণ না সেই বিষয়কে জয় করা হয় যা থেকে পাপ ও নরকের উৎপত্তি। পৃথিবীতে স্বর্গ পাওয়া সম্ভব না হ'তে পারে কিন্তু যদি কখন তা সম্ভব হয়ও. তাহ'লেও যখন মানবজাতি ভাইয়ের মত অবস্থান করে তখন তা আসবে না কারণ ভাইরা বন্ধুর বা অপরিচিতের মতোই সমান এবং প্রায়ই তাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে কলহ ও হিংসায় রত; ইহা আসবে যখন মানবজাতি উপলব্ধি করে যে ইহা এক আত্মা। আর তা হবেও না যতদিন না মানবজাতি উপলব্ধি করে যে সকল অস্তিত্বই এক-আত্মা, কারণ যদি সংযুক্ত মানবজাতি পশু, পক্ষী ও কীটপতঙ্গের উপর উৎপীড়ন করে তাহ'লে এই নিম্নসৃষ্টি থেকে যন্ত্রণা, ঘৃণা ও ভীতির আবহাওয়া উঠে উর্ধ্বের সৃষ্টির বিশুদ্ধতাকে আক্রমণ ক'রে কলুষিত করবে। কর্মের বিধান অমোঘ; আর অপরের প্রতি তুমি যা-ই কর তার ফল তুমি পাবেই তা এই জন্মেই হ'ক বা অন্য জন্মে হ'ক। তুমি কি মনে কর যে এই অভিনব বিষয় কখন ঘটবে, যে মানবজাতি কখনো উপলব্ধি করবে যে কুকুর ও শকুনি, এমন কি যে সাপ তাকে কামড়ায় বা যে কাঁকড়াবিছা তাকে হুল ফোটায় তা-ও তাদের আপন আত্মা, তারা কি কখন বলবে যে মৃত্যু তাদের ভাই এবং ধ্বংস তাদের বোন, তারা কি কখনো এই সব বিষয়কে নিজ বলে জানবে? "সর্বভূতেষু চাত্মানম্"––শ্রুতি তোমার কাছ থেকে কিছুই বাদ দেবে না––বুকে হাঁটে এমন যে ক্ষুদ্রতম কীট বা ছটফট করে এমন যে ঘৃণ্য পোকা তাও নয়।

শিষ্য

সম্ভব বলে মনে হয় না।

গুরু

সম্ভব মনে হয় না বটে; কিন্তু তবু অসম্ভব বিষয়ও বারবার ঘটে। যাই হ'ক, যদি তোমাকে কোন আদর্শ পেতে হয়, সেই দূরবর্তী ঘটনা যার দিকে মানবজাতি অগ্রসর হ'চ্ছে, তা পোষণ কর। যে সকল রাম-রাজ্যের কল্পনায় পাপের মূল, অবিদ্যা জাত অহঙ্কার ও কামনা অক্ষুন্ন রেখেও পাপের ধ্বংস চাওয়া হয় অথবা যে মাটিতে তা জন্মায় তার কিছু অংশ কেটে বাদ দিতে চাওয়া হয় সেই সব কল্পনা বিশ্বাস ক'রো না। কারণ একবার অহঙ্কার থাকলে, তা থেকে প্রীতি ও অপ্রীতি "রাগদ্বেষৌ" জন্মাবেই, ইহারাই দ্বন্দ্বসমূহের আদি মিথুন, যা কামনা তৃপ্তির সহায়ক তার প্রতি প্রীতি এবং যা ইহার প্রতিবন্ধক তার প্রতি অপ্রীতি; আর জন্মাবে প্রাপ্তির বোধ ও ক্ষয়ের বোধ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, মোহ ও বিতৃষ্ণা, ভালবাসা ও ঘৃণা, অনুকম্পা ও নিষ্ঠুরতা, দয়া ও ক্রোধ,---দ্বন্দ্বসমূহের অনন্ত ও চিরন্তন শোভাযাত্রা। মাত্র একটি দ্বন্দ্বকে আসতে দাও, অন্য-গুলিও তার পিছনে গড়াতে গড়াতে আসবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে নিজেকে দেখে, সে ঘৃণা করতে পারে না; সে কারুর কাছ থেকে সঙ্কুচিত হয় না, তার বিতৃষ্ণাও নেই, ভয়ও নেই 'ততো ন বিজুগুপ্সতে"। ঐ যে কুষ্ঠরোগী যাকে সকলে বর্জন করে---কিন্তু আমি কি তাকে বর্জন করব, আমি যে জানে যে এই অদ্ভূত ছদ্মবেশ থেকে ব্রহ্মই তাকিয়ে আছেন হাসিভরা চোখে? এই যে শত্রু আসছে অসি হাতে আমার হৃদয় বিদ্ধ করার জন্য---আমি এই তীক্ষ্ণ ভয়াল অসির ওধারে, ভ্রূকুঞ্চিত কপাল ও ঘৃণাভরা চোখের ওধারে তাকিয়ে দেখে চিনতে পারি আমারই আত্মার মুখোসকে; আর তারপর আমি অসিকে ভয় করব না বা অসিধারককেও ঘৃণা করব না। আমি মূর্খের মত তোমাকে বলি আমার শত্রু, আমি না চাইলে তুমি কেমন করে আমার শত্রু হবে? বন্ধু ও শত্রু তো শুধু সেই মনের সৃষ্টি যে মন অগণিত বৈচিত্র্যকারী যাদুকর, বিরাট স্বপ্নদ্রষ্টা ও শিল্পী; আর যদি আমি তোমাকে শত্রু বলে না মনে করি তুমি স্বপ্ন বা ছায়ার অতিরিক্ত কিছু হ'তে পার না, যেমন বাস্তবিকই তোমার ঝলসে ওঠা অসি শুধু এক স্বপ্ন, তোমার ভ্রূকুঞ্চিত কপাল শুধু এক ছায়া। তবে, তুমি আমায় তোমার অসি দিয়ে কেটে ফেলবে, তুমি আমাকে হত্যা করবে, বন্দুকের গুলি দিয়ে বিদ্ধ করবে, আগুন দিয়ে উৎপীড়ন করবে, তোমার কামানের মুখ থেকে আমাকে উড়িয়ে দেবে? আমাকে তুমি বিদ্ধ করতে পারনা,

কারণ আমি অবধ্য, অবেধ্য, অবিভাজ্য, অদাহ্য, অচঞ্চল, তুমি শুধু পার আমার এই পোষাককে, এই যে অন্নকোষ অথবা বহুগুণিত জৈবনিক আমি পরিধান করি তাকে ছিন্ন করতে। তবুও আমি তোমার উপর রাগ করব না, কারণ যদি কোন শিশু খেলাচ্ছলে বা শিশুসুলভ রাগে তার পোষাক ছেঁড়ে কে তার উপর রাগ করে? হয়ত আমি পোষাকের কদর করতাম, অতশীঘ্র ইহাকে বিদায় দিতে চাইতাম না; পারলে আমি ইহাকে রাখবার চেষ্টা করব অথবা রাগ না করেও তোমাকে শাস্তি দেব যাতে তুমি আর অন্য পোষাক না ছিঁড়তে পার; কিন্তু যদি আমি তা না পারি—— তাও ভাল, ইহা তো শুধু এক খণ্ড বস্ত্র, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শীঘ্রই অন্য একটি পাওয়া যায়; আমি কি আগেই কেনবার টাকা দিই নাই? হে আমার বিচারক, তুমি যে রায় দিয়েছ যে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা হবে এই কারণে যে আমি তোমার আইন ভেঙেছি; হয়ত নিরন্ন সহস্র সহস্র লোককে খাদ্য দেবার জন্য, হয়ত আমার যে দেশবাসীদের তুমি তোমার সুখের জন্য ক্রীতদাসরূপে রাখতে চাও তাদের সাহায্য করার জন্য——আমাকে তুমি ফাঁসি দেবে? যখন তোমার সাধ্য হবে সূর্যকে আকাশ থেকে নড়িয়ে দিতে বা আকাশকে পোষাকের মতো মুড়ে ফেলতে, তখনই তোমায় শক্তি দেওয়া হবে আমায় ফাঁসি দেবার জন্য। ফাঁসিতে কার বা কোন বিষয়ের মৃত্যু হ'বে, এ সম্বন্ধে কি তোমার ধারণা? কতক-গুলি কীটাণুর সমষ্টির মৃত্যু হ'বে তার বেশী কিছুর নয়। এই বাহ্য তুমি ও আমি শুধু রঙ্গমঞ্চের বেশ, তাদের পিছনে একজন আছেন যিনি নিধন করেন না, নিহতও হন না। বিচারক নামে একটি মুখোস তুমি, তোমার অভিনয়ের অংশ তুমি অভিনয় কর; আমার অংশ আমি অভিনয় করেছি। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, সকল বিষয়ের মধ্যে তোমার আত্মাকে তুমি উপলব্ধি কর; কোন কিছুকে ভয় করো না, কোন কিছুকে অবজ্ঞা করো না; কাহারও ভয়ে ভীত হ'ও না, কাহাকেও ঘৃণা করো না। কিন্তু তোমার নির্ধারিত কাজ তুমি করে যাও শক্তি ও সাহসের সহিত। এইভাবেই তুমি তা-ই হবে যা তুমি সত্যই——তোমার বিজয়ে তুমি ভগবান, তোমার পরাজয়ে তুমি ভগবান, তোমার মৃত্যু ও যন্ত্রণাতেও তুমি ভগবান,——যে ভগবান পরাজিত হন না আর যিনি মরতে পারেন না। ভগবান কি কাউকে ভয় করবেন? তিনি কি নিরুৎসাহ হবেন? তিনি কি কম্পমান ও চঞ্চল হবেন? না, যে কীটগুলি তোমার দেহ ও মস্তিষ্ক

গঠন করে সেইগুলিই কাঁপবে ও চঞ্চল হবে; তাদের অভ্যন্তরে তুমি তাদের যন্ত্রণা ও ত্রাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছ; কারণ তারা শুধু তাদের যা সদ্‌বস্তু তার ছায়া ও স্বপ্ন। সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি কর, উপলব্ধি কর সকল প্রাণীকে আত্মার মধ্যে; ইহার পর ভয় তোমার কাছ থেকে ভয়ে পালিয়ে যাবে, যন্ত্রণা তোমায় স্পর্শ করবে না পাছে তা নিজেই তোমার স্পর্শের দ্বারা যন্ত্রণা পায়; মৃত্যু তোমার কাছে আসতে সাহস করবে না পাছে সে নিহত হয়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যিনি বিজ্ঞানবান্, যাঁর মধ্যে সকল প্রাণী তিনিই স্বয়ং, তিনি কি ক'রে, মোহগ্রস্ত হ'বেন, কোথা থেকে তিনি শোক পাবেন--সেই তিনি যাঁর দৃষ্টিতে সকল কিছুই 'একম্'? আমাদের মধ্যে সকল বিষয়ই হবে আমরা স্বয়ং--ইহাই শ্রেষ্ঠ বেদান্তর মহান্ আদর্শ, তার নৈতিক ও কার্যকরী ফল। শ্রুতি বলে, যে ব্যক্তির আত্মা সর্বভূত হ'য়েছে তার মধ্যে থাকতে পারে এমন কি মোহ বা কি শোক আছে, কারণ যেখানেই সে তাকায় "অনুপশ্যতঃ" সেখানেই সে মহৎ একত্ব ছাড়া, ভগবান ছাড়া কিছু দেখে না, নিজের প্রেম ও আনন্দের আত্মা ছাড়া কিছু দেখে না, । 'মোহ'-র অর্থ প্রতিভাসকে সদ্‌বস্তু ব'লে ভুল করা, মায়ার শক্তির দ্বারা বিমূঢ়তা । "এই যে বাড়ী আমার বাবার ছিল তা আমার ছিল আর হায়, তা আমি হারালাম" "ইনিই আমার স্ত্রী যাঁকে আমি ভালবাসতাম আর চিরদিনের মত তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন", "হায়, আমার যে ছেলের কাছে আমি অত আশা করেছিলাম সে কেমন করে আমায় নিরাশ করেছে", "এই যে পদটির জন্য আমি আশা ক'রেছিলাম ও পাবার ফন্দী করেছিলাম তা পেল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যাকে আমি ঘৃণা করতাম।" এ সবই মোহের উক্তি আর মোহের ফল "শোক"। কিন্তু যার আত্মা সর্বভূত হয়েছে তার মোহ থাকতে পারে না এবং সেজন্য শোকও থাকতে পারে না। সে বলে না "আমি দেবদত্ত এই বাড়ী হারালাম। কি দুর্ভোগ", সে বলে "আমি দেবদত্ত এই বাড়ী হারিয়েছি কিন্তু আমি হরিশ্চন্দ্র তা পেয়েছি। কি সৌভাগ্য!" আমার কাছ ছাড়া 'আমি' কিছু হারাতে পারি না। আমার স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছে বলেও আমি কাঁদব না কারণ আমি তাঁকে কিছুমাত্র হারাইনি, তিনি আমার কাছেই আছেন আগের মতো, মৃত্যুর আগে যখন

তাঁর শরীর আমার করায়ত্ত ছিল তিনি যেমন ছিলেন, মৃত্যুর পরেও তিনি তেমনই এখনও আমার আত্মা, আমার আত্মার মধ্যেই আমার আত্মার সহিত তিনি বর্তমান। "আমি" আমার আত্মাকে হারাতে পারি না। আমার ছেলে আমায় নিরাশ করেছে? সে তার নিজের পথে গেছে, তা আমার পথ নয়, কিন্তু সে তার যে নিজ-আত্মা যা আমার-আত্মা তাকে নিরাশ করে নি, সে শুধু নিরাশ করেছে সেই কোষকে, সেই আধারকে, সেই মানসিক কারাকক্ষকে যার মধ্যে আমি আবদ্ধ ছিলাম। এক ও অদ্বয় আত্মার দর্শন সকল বিভেদ দূর করে; যে বলবান পুরুষ ভগবান দেখেছে তার স্বভাবই হ'ল অনন্ত অচঞ্চলতা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পরহিতৈষিণা, অনন্ত তিতিক্ষা। জগতের পাপ, কলুষ, ব্যাধি, কদর্যতা তার মনকে মলিন করতে পারে না, পারে না তার সমবেদনাকে দূর করতে; যখন সে পাপীকে তার আবাস বিষ্ঠাস্তূপ থেকে তোলবার জন্য নীচু হয় তখন যে বিষ্ঠা তার হাত কলুষিত করে তা থেকে সে সঙ্কুচিত হয় না; যখন সে আর্তনাদকারী দুঃখীকে তার যন্ত্রণার গর্ত থেকে তোলে তখন অশ্রুতে তার চক্ষু ঝাপসা হয় না; সে তাকে তোলে যেমন বাপ তোলে তার ছেলেকে যে কাদার মধ্যে পড়ে কাঁদছে; শিশু স্বেচ্ছায় মনে করে যে সে আঘাত পেয়েছে এবং কাঁদতে থাকে; বাবা জানে যে সত্যই সে আঘাত পায়নি, সেজন্য সে দুঃখ করে না কিন্তু সে তাকে ভর্ৎসনাও করে না বরং সে তাকে তুলে সেই ইচ্ছাকৃত কল্পিত যন্ত্রণার উপশম করে। এইরূপ পুরুষই ভগবান হ'য়েছেন যিনি সাহায্য ও পরিত্রাণ করার জন্য শক্তিশালী ও স্নেহপরায়ণ, তিনি দুর্বল নন যে তিনি কেঁদে নিজের অশ্রু দিয়ে মানুষী অশ্রুর সাগরকে আরো স্ফীত করবেন। যখন বুদ্ধ জগতের দুঃখভোগ দেখেছিলেন তখন তিনি কাঁদেন নি; তিনি বেরিয়ে পড়লেন উদ্ধার করতে। আর ইহাও নিশ্চিত যে এইরূপ পুরুষের বাহ্য আত্মাকে বাহ্য জগৎ যে সব আঘাত দেয় বলে মনে হয় তাতে সে দুঃখ করে না; কারণ, যে নিজে এই সারা বিশ্ব সে দুঃখ করবে কি করে? বিভিন্ন রাষ্ট্রজাতির ভাগ্য স্কন্ধে বহন করে রাজা চিন্তান্বিত হ'য়ে তার বাগানে ভ্রমণ করার সময় যেমন একটি পদদলিত পিঁপড়ার দুঃখ তাঁর চেতনায় আসে না, তেমন ঐ পুরুষের তুচ্ছ ব্যক্তিগত আত্মার কষ্ট তাঁর চেতনায় আসে না। ইচ্ছা করলেও তিনি নিজের জন্য দুঃখ বোধ করতে অক্ষম কারণ সারা জগতের দুঃখ দূর করাতেই তিনি ব্যস্ত; তাঁর কাছে তাঁর নিজের আনন্দ কিছুই নয়,

কারণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে আছে সমগ্র বিশ্বের আনন্দ।

জ্ঞানলাভের জন্য, দর্শনলাভের জন্য দুটি পথ আছে। একটি হ'ল অন্তর্দৃষ্টির পথ, অন্যটি জগৎ-সৃষ্টির পথ। ভক্তির দুটি পথ---একটি হ'ল, যে আত্মা সকলের ঈশ্বররূপে তোমার মধ্যে অভিনিবিষ্ট তাঁর প্রতি ভক্তির দ্বারা, অন্যটি হ'ল যে আত্মা সকলের ঈশ্বররূপে বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর প্রতি ভক্তির দ্বারা। কর্মের দুটি পথ---একটি হ'ল অন্তঃস্থ আত্মার অনির্বচনীয়, নিষ্ক্রিয় অথচ সর্ববেষ্টনকারী সর্বশক্তিমত্তার জন্য যোগের দ্বারা, কোষসমূহের উপশমের দ্বারা; অন্যটি হ'ল বিশ্বের মধ্যস্থিত বৃহত্তর আত্মার জন্য কামনা ও কোষসমূহের স্বার্থশূন্য সক্রিয়তার উপশমের দ্বারা। প্রথমটির জন্য তোমার কর্তব্য হ'ল বহির্মুখী না হ'য়ে অন্তর্মুখী হওয়া, সংস্পর্শ ও ইন্দ্রিয়ের সুখ পরিহার করা, মন ও ইহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করা এবং দ্বন্দ্বসমূহের উর্ধ্বে উঠে নিজের মধ্যে "একম্‌" হওয়া। "আত্মতুষ্টিরাত্মারামঃ"। ইহা কি তোমার পক্ষে এত দুরূহ যে তুমি তা করতে পারবে না? তোমার মন কি তোমাকে নিরাশ করে, তোমার আচ্ছাদনের যাতনা কি এখনো অন্তঃস্থ অমর চিৎ-পুরুষকে প্রচ্ছন্ন রাখে? তোমার চোখ থেকে অশ্রু মুছে ফেল; তা রক্তের অশ্রু হতে পারে, তবু যেমন তা নিঃসৃত হয় তুমিও মুছে চল আর বিশ্বের দিকে বাহিরে তাকাও। ঐ তোমার আত্মা, ঐ ব্রহ্ম। এই যে বিশ্বচাঞ্চল্য, সূর্যসমূহের পরিভ্রমণ, এই আলো, এই প্রাণ, এই বিরামহীন কার্যধারা---উপলব্ধি কর যে এই সব তুমি; তুমিই এই সারা বিশ্বের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছ, তুমিই এই সূর্য আর এই চন্দ্র আর এই সব তারকামণ্ডলী। মহাসমুদ্র আবর্তন করে তোমার মধ্যে, ঝড় বয়ে যায় তোমার মধ্যে, তোমার মধ্যেই পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ় হ'য়ে। তুমি না থাকলে, এসবও থাকত না। ব্রহ্মের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বিন্দুর দুঃখের জন্য অর্থাৎ এই সামান্য কীট-কোষের দুঃখের জন্য যে দুঃখের স্রষ্টা তুমি ও যার অবসানও তুমি ঘটাতে পার---তার জন্য তুমি কি শোক করতে পার? এই দর্শন কি এত মহৎ যে তা তোমার আয়াসসাধ্য নয়? তাহ'লে তোমার চারিদিকে তাকাও আর সেই-খানে তোমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ কর। এই যে তোমার চারিদিকে নর ও নারী ও প্রাণী, তাদের অগণিত সুখ ও দুঃখ, সে সবের মধ্যে তোমার কি? সে সব তোমারই আত্মা, সেসব তোমার আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। তুমি তাদের স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহারকর্তা। ইচ্ছা করলে তুমি তাদের ভাঙতে

পার, আর ইচ্ছা করলে তুমি তাদের উদ্ধার করতে পার শোক ও কষ্ট থেকে ; কারণ তোমার মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি। তুমি তো আর তাদের মধ্যে নিজের ক্ষতি করার জন্য অসুর হবে না! সুতরাং অপরের মধ্যে তোমার আত্মাকে সাহায্য করার জন্য তুমি দেবতা হও। তোমার প্রতিবেশীদের দুঃখের কথা জেনে তা দূর কর ; তুমি শীঘ্রই অনুভব করবে এতদিন তুমি কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েছ---এমন আনন্দ যার মধ্যে তোমার নিজের দুঃখ হবে এক অসার কুয়াসার মত। প্রবল অন্যায়কারী-দের সহিত সংগ্রাম কর, উৎপীড়িতদের সাহায্য কর, পরাধীন ও বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত কর আর তুমি শীঘ্রই সেই আনন্দের কিছু জানবে যা যে কোন সুখের চেয়ে বেশী, তুমি শীঘ্রই প্রবিষ্ট হবে সর্বভূতস্থিত 'একম্'এর আনন্দের মধ্যে। মৃত্যুতেও তুমি সেই উল্লাস জানবে আর হৃষ্ট হবে রক্তক্ষরণের মধ্যেও।

শিষ্য

এই সব আদর্শ অতীব উচ্চ। এসব অনুসরণ করার শক্তি কোথায় আর কোথায়ই বা ঐ শক্তি লাভের পথ?

গুরু

শক্তি তোমার মধ্যেই আছে আর এই শক্তি লাভের পথের নির্দেশ প্রাচীন কাল থেকেই দেওয়া আছে। কিন্তু প্রথমে আদর্শকে গ্রহণ কর, তা না হ'লে পথের সব বাধা অতিক্রম করার জন্য কোন সহায়ক প্রেরণা থাকবে না।

শিষ্য

কিন্তু যেখানে শক্তি ও সান্ত্বনা পাবার কত আরো সহজ আদর্শ আছে, সেখানে কয়জন এই আদর্শ গ্রহণ করবে?

গুরু

কিন্তু ঐসব আদর্শ কি সত্য? যা সত্য নয় তা কিছু কালের জন্য শক্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিফল হয় এবং তুমি গিয়ে পড় বিশৃঙ্খলার মধ্যে। একমাত্র সত্যই নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী পর্বত-

তুল্য আশ্রয়স্থল, শক্তির অমোঘ অস্ত্র। সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপর, অস্তির উপর, নাস্তির উপর নয়। অসত্য বিষয়ে সান্ত্বনা পাওয়া হ'ল স্থূল জড়-উপাদানের তামসিক আবরণে স্থিত ব্যক্তির স্বভাব; দর্শন ও ধর্মের কাজ হ'ল তার ভ্রম দূর ক'রে তাকে জোর করে সত্যের সম্মুখীন করা।

শিষ্য

কিন্তু অনেক জ্ঞানীলোকের মত এই যে এই নিম্নতর আদর্শগুলিই সত্য; ধর্ম ও দর্শন সত্য নয়, তারা ভুল।

গুরু

এই যে সব নবজাত সত্য অনাদি ও অনন্তজ্ঞান দূর করে বলে দাবী করে তাদের একটির কথা আমায় বল, কারণ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে বেশী জান।

শিষ্য

একটি মত হ'ল সর্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণের মঙ্গল, ইহা এমন কিছু যা সীমিত, নিশ্চিত ও লভ্য---ইহাতে দার্শনিক কিছু নেই, ভাবাত্মকও কিছু নেই।

গুরু

ইহার সম্বন্ধে এদেশে আমরা কিছু শুনেছি। ইহাকে বলা হয় উপযোগবাদ---গাণিতিক নীতিশাস্ত্র যা চায় যে মানুষ ভাল ও মন্দ ওজন করার জন্য এক জোড়া নিক্তি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। ইহার সময় ইহা মঙ্গল করেছিল, কিন্তু ইহা সত্য না হওয়ায় স্থায়ী হ'তে পারল না।

শিষ্য

কি বিষয়ে ইহা সত্য নয়?

গুরুত্ব

ইহা সত্য নয় কেন না মানুষের প্রকৃতিতে তা নেই; কাজ করার পূর্বে কাজ থেকে কি সুখ দুঃখ আসবে এবং কত লোক তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাবে—ইহার গাণিতিক হিসাব কোন মানুষই এ পর্যন্ত করেনি আর কখন করবেও না। সুনীতির ঐরূপ গণিতের, নীতির এইরূপ হিসাবশাস্ত্রের বিকাশের জন্য অন্য এক গ্রহ দরকার; মানুষী স্তরে এরূপ সুযোগ্য হিসাব রক্ষকেরও জন্মগ্রহণ দরকার। সের ছটাকের মাপে তুমি সুখ ও দুঃখের, ভাল ও মন্দর পরিমাণ স্থির করতে পার না; মানুষের অনুভব, ও অমূর্ত ভাবাবেগকে ধরা যায় না, তারা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। উপযোগবাদ দেখতে অত্যন্ত কার্যকরী ও সুনিশ্চিত কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার মধ্যে কোন নিশ্চিত সত্য নেই, কোন সারগর্ভ সহায়কর নির্দেশ দেবারও ক্ষমতা ইহার নেই; নিজে ইহা যেমন আলোকশূন্য, তেমন প্রেরণাশক্তিহীন, এমন এক মত যা নীরস, শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ, আর তার চেয়ে আরো যা মন্দ তা এই যে ইহা মিথ্যা। ইহার ভিতর যা কিছু মূল্যবান তা পরসেবার এক নকল অথবা বরং এক ব্যঙ্গচিত্র। ইহা ওজন ও মাপের এমন সব মান আমাদের দেয় যা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব আর আত্ম-ত্যাগের সমর্থনে কোন দার্শনিক যুক্তি বা ইহার দিকে সাগ্রহ প্রেরণা দিতে ইহা অক্ষম। ইহার আর এক যে নাম উপযোগাত্মক সুখবাদ তা, আমার মনে হয়, বলতে চায় যে অপরের মঙ্গল ক'রে আমরা বস্তুতঃ আমাদের নিজেদের এমন এক সুখ দিই যা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই সীমিত পরিতৃপ্তির সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী দুষ্প্রাপ্য ও গভীর। ইহা অতীব সত্য বটে,—কিন্তু সুখবাদী বা উপযোগবাদীর কাছ থেকে এই সত্য জানা আমাদের প্রয়োজন নেই। দু হাজার বৎসর আগে বৌদ্ধরা তা জানত আর তার পূর্বে ভারতের আর্যরা তার অনুশীলন করত; শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবন ধ'রেই ব্যাপৃত ছিলেন পরের মঙ্গলসাধনে, তাঁর বন্ধু দেশ ও জগতের মঙ্গলসাধনে আর তিনি নিজে কখনো কোন শোক বা যন্ত্রণা বোধ করেননি। কিন্তু দাক্ষিণ্য ও পরোপকার থেকে তিন রকমের সুখ পাওয়া যায়; আত্মগরিমার তৃপ্তি আছে—নিজের প্রশংসা শোনার আত্মগরিমা, "আমি কত ভাল" এই অনুভবের আত্মগরিমা আমার মনে হয় ভারতে অনেক দয়াদাক্ষিণ্যের মূলে ইহাই বর্তমান, আর ইওরোপে তা আরো বেশী; আর এখানেই সুখবাদের কাজ শুরু হয়, কিন্তু ইহার প্রেরণাশক্তি স্বল্প আর যে কোন সংকটে তা

নিষ্ফল হয়; তা থেকে দাক্ষিণ্য আসতে পারে, কিন্তু আত্মত্যাগ কখনো আসে না। তারপর আছে সৎকর্ম করার ও নিজেকে স্বর্গের আরো নিকটে আনার আনন্দ আর আর্যভূমিতে ইহাই পরোপকার সাধনের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত প্রেরণা ছিল এবং হয়ত এখনো তা-ই রয়েছে। এই প্রেরণা আরো শক্তিশালী বটে, কিন্তু সংকীর্ণ এবং ইহাতে প্রকৃত আত্মায় উপনীত হওয়া যায় না; ইহার শ্রেষ্ঠ মূল্য এই যে ইহা শুদ্ধিকরণের সহায়কর। তারপর এমন প্রকৃতির লোক আছে যাদের জন্ম প্রেম ও স্বার্থশূন্যতার জন্যই, এবং যারা শুধু অপরকে সাহায্য করার আনন্দে, অপরের জন্য কষ্টভোগ করার আনন্দে, অশ্রুক্লিষ্ট মুখে ও যন্ত্রণা-মলিন চক্ষে আনন্দ ফিরে আসতে দেখার আনন্দে সেই পরমানন্দ অনুভব করে যা আসে অন্তঃস্থ ভগবানের উৎসবন থেকে। ইহাদের কাছে সুখবাদ অসার ও শিশুর কাকলী। উপযোগবাদের মধ্যে সুখবাদের যে উপাদান আছে তা এমন এক মহৎ সত্যের জন্য অজ্ঞানময় অন্বেষণের অসম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ প্রয়াস যা ইহা নিজেই আয়ত্ত করতে পারেনি অথবা বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের সহিত প্রকাশ করতে পারেনি। সে সত্য পাওয়া যায় শুধু বেদান্তর সুস্পষ্ট ও সুদীপ্ত শিক্ষায়; ইহা এই যে, যে যৌগিক ফলকে আমরা মানুষ বলি তা সত্যই এক যৌগিক ফল, আমাদের ইন্দ্রিয় যে বিশ্বাস করে যে ইহা একটি মাত্র সরল সমজাতীয় সত্তা তা ইহা নয়। অনেকগুলি উপাদানে ইহা গঠিত-- শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক, বুদ্ধিবিষয়ক ও স্বরূপগত; আর যে উপাদানের মধ্যে (পরম) আত্মার বাস তার এই সব বিভিন্ন-জাতীয় অংশের কোনটিই তার প্রকৃত আত্মা নয়, পরন্তু ইহা এমন কিছু যা এসবের অতীত ও অতিস্থিত। সুতরাং সুখ ও দুঃখ, শুভ ও অশুভ কোন স্থায়ী ও নির্দিষ্ট সত্তা নয়; প্রথম দুটি হ'ল এমন এক বিভিন্ন-জাতীয় সমষ্টি, কখনো কখনো এক বিবদমান স্তূপ, যার উপাদান হ'ল সেইসব অনুভব ও সংবেগ যেগুলি প্রকৃত আত্মার আবরণস্বরূপ বিবিধ কোষের অন্তর্গত। শুভ ও অশুভ আপেক্ষিক, মানবের এই ক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যে আত্মার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিই তার উপর তারা নির্ভরশীল; যদি আমরা ঐ আত্মাকে অতি নিম্নে স্থাপন করি তাহ'লে আমাদের 'শুভ' হবে পৃথিবীর এক হীন বিষয়, মলিন এবং অশুভের সহিত ইহার পার্থক্য হবে খুবই অল্প; যদি আমরা ইহাকে তার সত্যকার স্থানে স্থাপন করি তাহ'লে ইহা হবে অন্তরীক্ষের মত উচ্চ, বিশাল ও বিশুদ্ধ। সকল সুখ ও দুঃখের,

সকল শুভ ও অশুভের উৎপত্তি, স্থিতি ও অন্ত হ'ল আত্মাতে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এমন কি শ্রেষ্ঠ প্রেম ও পরোপকারও আত্মার দ্বারা সীমিত। পরোপকারের অর্থ অপরের কাছে আমাদের আত্মাকে বলিদান নয়, ইহার অর্থ আমাদের প্রকৃত আত্মার কাছে আমাদের মিথ্যা আত্মার বলিদান আর যোগী না হ'লে আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে সর্বাপেক্ষা ভাল দেখি অপরের মধ্যে। প্রকৃত প্রেম অপরের প্রেম নয়, ইহা আমাদের আত্মার প্রেম; কারণ যা আমরা নই তাকে,অনাত্মকে ভালবাসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি আমরা কোন অনাত্মকে ভালবাসি, তা নিশ্চয়ই স্পর্শের ফল; কিন্তু শুধু স্পর্শের দ্বারা আমরা ভালবাসতে পারি না; ইহার কারণ এই যে প্রকৃতিতে ও ফলে স্পর্শ অস্থায়ী, ইহা প্রেমের মতো কোন স্থায়ী অনুভব উৎপন্ন করতে অক্ষম। যাজ্ঞবল্ক্য ভালই বলেছেন, "আমরা যে স্ত্রীকে চাই তা স্ত্রীর জন্য নয়, তা আত্মার জন্য।" শুধু যদি আমরা যেসব বিষয় প্রকৃত আত্মা নয় তাদের আত্মা বলে ভুল করি তাহ'লে আমরা যেসব বিষয় প্রেম নয় তাদের ভুল করব প্রেম ব'লে। আমরা যদি অন্নকোষকে আত্মা বলে ভুল করি তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে কামনা করব দৈহিক তৃপ্তির জন্য; যদি আমরা প্রাণিক আবেগাত্মক কোষকে আত্মা ব'লে ভুল করি তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে চাইব সৌন্দর্যগত তৃপ্তির জন্য এবং গৃহের মধ্যে তার উপস্থিতি, তার স্বর, তার আকৃতি প্রভৃতির সুখদায়ক বোধের জন্য; যদি আমরা বুদ্ধিবিষয়ক কোষকে ভুল করি আত্মা বলে তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে চাইব তার বিভিন্ন গুণ ও সৎকর্মের জন্য, তার সামর্থ্য ও মানসিক ক্ষমতার জন্য, বুদ্ধির তৃপ্তির জন্য। যদি আমরা আত্মাকে দেখি আনন্দকোষের মধ্যে যেখানে প্রমাদের উপাদান প্রায় শূন্য অঙ্কে এসেছে, তাহ'লে আমরা তখন স্ত্রীকে চাইব প্রকৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য, মিলনবোধের 'একম্' হবার আনন্দের জন্য। আর যদি আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মাকে কোষ বা আবরণহীন অবস্থায় দেখে উপলব্ধি করি তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে আদৌ চাইব না, কারণ আমরা তাকে পাব, আমরা জানব যে স্ত্রী পূর্ব-থেকেই আমাদের আত্মা এবং সেজন্য তার কোষের মধ্যে তাকে চাইবার কিছু নেই, কারণ সে পূর্বথেকেই আমাদের অধিগত। দেখা যাচ্ছে যে, আমরা যে কোষের সহিত আত্মাকে ভুল করি তা যতই আভ্যন্তরীণ হয়, সুখও ততই শুদ্ধ হয়, শুভের ভাবনাও তত উন্নত হয় যতদিন না প্রকৃত নিরাবরণ আত্মার মধ্যে আমরা উত্তরণ করি শুভ ও অশুভের অতীত হ'য়ে

কারণ তখন আর আমাদের কোন শুভের অথবা অশুভের প্রতি আকর্ষণের প্রয়োজন থাকে না। শারীরিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হল ভাবগত সুখ, ভাবগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হ'ল সৌন্দর্যগত সুখ, সৌন্দর্যগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হ'ল বুদ্ধিগত সুখ, বুদ্ধিগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হ'ল নৈতিক সুখ, নৈতিক সুখ অপেক্ষা মহত্তর হ'ল আধ্যাত্মিক সুখ। নীতিবাদের সমগ্র সত্য ও সমগ্র তত্ত্ব ইহাই; বাকী সব হ'ল কার্যোপযোগী ব্যবস্থা সামাজিক স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অস্থায়ী লক্ষ্যের জন্য বিভিন্ন শক্তির সমীকরণ ও সক্রিয় শক্তিগুলির পরিমিত ব্যয়।

উপযোগবাদ সত্য সম্বন্ধে এক আংশিক ও বিভ্রান্ত দৃষ্টি পায় এবং ইহাকে সঠিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত করতে অক্ষম হওয়ায় কোন বিধানের জন্য শৃঙ্খলার কোন মান ও তত্ত্বের জন্য অন্ধের মত অন্বেষণ ক'রে মনে করে যে ইহা তা পেয়েছে উপযোগের মধ্যে। কিন্তু কি উপযোগ? আমি, বিভিন্ন কামনা, মনন, ইন্দ্রিয়সংবিৎ সমেত ও ইহাদের তৃপ্তির জন্য সাগ্রহ প্রয়োজন সহ এই উৎকৃষ্ট পশু বেশ বুঝতে পারি ব্যক্তিগত উপযোগ কি; এই উপযোগ হ'ল এই প্রাণিক, ইন্দ্রিয়গত ভাবনাত্মক আমার জন্য। আমার উপযোগ হ'ল––আমার নিজের আরাম ও নিরাপত্তার সহিত সঙ্গতি রেখে এই জীবন থেকে যত বেশী ইন্দ্রিয়গত, ভাবগত ও বুদ্ধিগত সুখ পাওয়া সম্ভব ততবেশী পাওয়া। যদি নীতিবাদ সম্বন্ধে আমার মান উপযোগ হয়, তাহ'লে তা-ই আমার নীতিবাদ। কিন্তু যখন তুমি উপযোগ ও যুক্তিবাদের নামে আমাকে অন্য কোন আরো উচ্চ বা বিশাল উপ্পযোগের জন্য, অপরের জন্য, আরো অধিক সংখ্যক লোকের জন্য, সমাজের জন্য এইসব বিষয় বিসর্জন দিতে বল তখন আর আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না। প্রশাসন, আইন ও শৃঙ্খলা ও দক্ষ রক্ষীব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু বিসর্জন যে প্রয়োজনীয় তা আমি বুঝি কারণ এই সব বিষয় আমার নিরাপত্তা ও আরামের জন্য প্রয়োজনীয়; সমাজ আমাকে এই সব দিয়েছে আর আমার কর্তব্য হ'ল তাদের রক্ষাব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং আমার দ্বারা ও অন্যের দ্বারা তাদের জন্য অর্থ দেওয়া। ইহা কার্যোপযোগী, ইহা উপযোগমূলক ও যুক্তিসম্মত উভয়ই। কিন্তু ইহার বাহিরে আমার উপর সমাজের কোন দাবী নেই; সমাজ আছে আমার জন্য, আমি সমাজের জন্য নয়। তাহ'লে যেসব বিষয় হয়ত আমি গভীরভাবে ভালবাসি, যেমন আমার প্রাণ, আমার বিষয়সামগ্রী, আমার গার্হস্থ্য সুখ তা যদি

আমায় বিসর্জন দিতে হয় সমাজের জন্য তাহ'লে সমাজে আর আমার প্রয়োজন থাকে না; তখন আমি সমাজকে এমন এক অসৎ অমানতকারী বলে মনে করি যে আমার নৈতিক ব্যাঙ্ক থেকে তার গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত নিতে চায়। একজন সাধারণ লোক যে নীতিবিহীনও নয়, আবার গভীর-ভাবে নীতিনিষ্ঠও নয়, তবে শুধু সম্ভ্রান্ত——এইভাবে তর্ক করতে পারে; উপযোগবাদ তাকে কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম।

উপরন্তু, যদি সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবৃত্তি ছাড়া আমার অন্য সব প্রবৃত্তি থাকে আর যদি আমার শক্তি থাকে সেসবের চরিতার্থ করা তাহ'লে কেন আমি নিবৃত্ত হব? আমাকে কে আটকাবে? যদি আমি নিরাপদ কোন প্রতারণার দ্বারা, জুয়া খেলে, পূর্বঅর্থবিনিয়োগের দ্বারা অথবা আমেরি-কার ধনিকের নির্দয় সব উপায়ের দ্বারা তাড়াতাড়ি প্রভূত ধন উপার্জন করতে সক্ষম হই তাহ'লে কেন আমি নিবৃত্ত হব? এই তো অভিযোগ হ'বে যে ইহা সমাজবিরুদ্ধ আচরণ; কিন্তু বলিষ্ঠমনা আত্ম-শ্লাঘী ব্যক্তি তাতে ভয় পায় না; সে ভালই জানে যে স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করে সে সমাজের নিন্দা স্তব্ধ করতে সক্ষম। উপযোগভাবপ্রবণ যুগে প্রাণিক ইন্দ্রিয়পর লোকের কাছে সুনীতির অর্থ হ'য়ে ওঠে শুধু সামাজিক বা আইনসম্মত শাস্তির ভয় আর বলিষ্ঠমনার তো ভয় নেই; তাছাড়া তাদের কার্যকলাপের দ্বারা যদি সামাজিক গঠনব্যবস্থায় কোন নাড়াচাড়া না আসে উপযোগ-ভিত্তিক সমাজ তাদের নিন্দা করার প্রয়োজন বোধ করবে না, কারণ তারা তো কোন প্রবল নিষেধ-আজ্ঞা ভঙ্গ করছে না, কোন বদ্ধমূল কোমল ভাবের ক্ষতিসাধনও করছে না——উপযোগবাদ ইচ্ছা ক'রেই কোমল ভাবকে বিদায় দেয় আর শক্তি ও ভয় ছাড়া ইহার এমন কোন নিষেধ-আজ্ঞা নেই যা দিয়ে ইহা ধর্মের ও প্রাচীন সংস্কারের যেসব নিষেধ-আজ্ঞা ধ্বংস করেছে তাদের স্থান পূরণ করতে পারে। যদি এই সব ব্যক্তিকে বলা হয় যে তাদের বর্তমান স্বার্থপর ও সমাজ-বিরুদ্ধ কার্যকলাপের তারা যে আনন্দ পায় তার চেয়ে আরো গভীর ও সত্যকার আনন্দ পাবে সৎ নৈতিক আচরণে ও পরোপকারে তা হ'লে তা নিরর্থক হবে। এই সব দার্শনিকরা যে কথা বলে তার প্রমাণ কোথায় অথবা এমন কি তার সমর্থনে দার্শনিক যুক্তিই বা কি? তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা? সাধারণ ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির কাছে তা গ্রহণীয় নয়; তার গভীরতম সুখ প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত হ'তে বাধ্য; যারা ঐ কথা বলে তাদের বেলাতেই তা খাটে, কেননা তারা বুদ্ধি-

বিষয়ক আত্মা আর মৃত খৃষ্টীয় ধর্মের এখনো বর্তমান নৈতিক শিক্ষা সমন্বিত। কোন ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি'র বেলায় তা সত্য হ'তে হ'লে, তাকে আর ইন্দ্রিয়পর থাকলে চলবে না, তার কর্তব্য হ'বে আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের জন্য--রীতিমত সাধনা করা কিন্তু উপযোগবাদী দর্শন ইহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান দিতে অথবা এমনকি প্রেরণার সংবেগ দিতেও অক্ষম। কারণ উপযোগবাদীর মুখে আরো গভীর ও প্রকৃত আনন্দের কথা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান; ইহা তার নিজের অর্জন নয়, বরং সেই নৈতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের অংশ যা যুক্তিবাদ হরণ করেছে খৃষ্টীয় ধর্মের সিন্দুক থেকে আর বর্তমানে ইহারই উপর নির্ভর ক'রে ইওরোপীয় সভ্যতা অনিশ্চিতভাবে জীবিত রয়েছে। যেদিন এই মুদ্রা নিঃশেষ হবে সেদিনের কথা ভাবলে শরীর কাঁপে--আর ইতিমধ্যেই আমরা ইওরোপীয় মানসে বর্ধিষ্ণু নৈতিক কদর্যতা, কর্কশতা এবং ক্রুরতার কিছু কিছু নিদর্শন দেখি আর যদি ইহা বৃদ্ধি পায়, যদি রাজনীতিতে ও বাণিজ্যে পাশব শক্তি ও সংকোচহীন ক্ষমতার প্রকাশ্য পূজা সমাজের গভীরতর হৃদয় কলুষিত করে--আর পরিশেষে তা করবেই--তাহ'লে তার ফলে সব প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত সংবেগের এমন এক উন্মত্ত উৎসব শুরু হবে যা রোমক সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দুর্দিনের পর আর ঘটে নি।

শিষ্য

কিন্তু লেকী (Lecky) প্রমাণ করেছেন যে ইওরোপের নৈতিক উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হ'ল যুক্তিবাদের উত্থান।

গুরু

বৎস, ইওরোপ ও এসিয়া--উভয়দেশেই বিদ্যা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মনে এমন এক মহৎ সামর্থ্য আছে যা প্রশংসার যোগ্য কিন্তু অনুকরণের যোগ্য নয়; ইহা হ'ল কথা নিয়ে নিপুণ যাদু দেখানর সামর্থ্য। যদি তুমি কোন একটি বিশেষ পদের এমন এক প্রসারিত অর্থ করতে চাও, যে অর্থ সে পদের হ'তে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয় তাহ'লে তুমি সহজেই তার উপর এক নয়নমুগ্ধকর মতের চাকচিক্যময় সৌধ গঠন করতে পার যতদিন না অন্য কেহ এক আরো কার্যকরী পদ নিয়ে আসে তার অর্থ আরো সকলভাবে প্রসারিত ক'রে এবং আরো নতুন ও

চাকচিক্যময় প্রাসাদ তৈরী করার জন্য পুরণো বাড়ীটি ভেঙে ফেলে। এইভাবে প্রাচীন শাশ্বত সত্যগুলি অসার উপরকার গঠনের দ্বারা আবৃত থাকে যতদিন না কোনদিন কোন মঙ্গলজনক ভূমিকম্প অট্টালিকা ও অট্টালিকানির্মাতাদের গ্রাস করে আর তখন প্রকাশিত হয় সেই প্রাচীন সত্য কোন পরিবর্তন বা দুর্ঘটনা যার কোন ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম। ইওরোপ আমাদের কাছে যেসব সদাপরিবর্তনশীল মত এনে বিভ্রান্ত করে তাদের মধ্যে দুটি মূল সত্য আছে––অবশ্য প্রায়শঃই তাদের প্রয়োগ সঠিক হয় না, তবু প্রতিভাসের ক্ষেত্রে ইহারা সত্য––বিবর্তন যা আমাদের সাংখ্য ও বেদান্তে ভিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নিয়ত কার্যকারণ-সম্বন্ধের বিধান যা আমাদের কাল ও কর্মের মতে সূচিত হয়। ইহাদের গ্রহণ ক'রে ধরে রেখ––কারণ ইহাদেরই বিস্তৃত প্রয়োগের দ্বারা, যদিও তা সর্বদাই ভালভাবে করা হয় নি, তবু সর্বদাই ইহারই নির্দেশানুযায়ী ইওরোপ জ্ঞানের শাশ্বত ভাণ্ডারে তার প্রকৃত অবদান করেছে। কিন্তু তাদের বিভিন্ন মতে ও মতভেদে বিশ্বাস করো না––রাশি রাশি প্রমাদের মধ্যে তাদের মধ্যে আছে শুধু সত্যের ছিটেফোঁটা।

শিষ্য

তবু, আমার তো মনে হয় লেকী সম্পূর্ণ ভুল কথা বলেন নি।

গুরু

বরং তিনি সম্পূর্ণ যথার্থ কথাই বলেছেন, অবশ্য যদি আমরা সকল জ্ঞানবিস্তারকেই তাদের প্রকৃতি ও উৎসের বিচার না ক'রেই একসাথে যুক্তিবাদ বলতে সম্মত হই; ইওরোপের নৈতিক উন্নতির জন্য যে বর্ধিষ্ণু জ্ঞানবিস্তারই দায়ী তা সম্পূর্ণ সত্য কারণ জ্ঞান––অবশ্য জ্ঞান বলতে আমি স্কুলশিক্ষকের থলিভর্তি তথ্য অথবা এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাও বুঝি না, আমি বুঝি প্রকৃত জ্ঞান যার অর্থ সত্যের প্রত্যক্ষীকরণ ও উপলব্ধি ইহাই পাপের চিরন্তন শত্রু ও হন্তা; কারণ পাপ অজ্ঞানতা থেকেই আসে তার সন্তান অহংবোধের মধ্য দিয়ে। একথা সত্য যে ইওরোপে তথাকথিত খৃষ্টীয় যুগ পাপ ও অন্ধকারের কাল ছিল; ইওরোপ খৃষ্টকে গ্রহণ করে-ছিল শুধু তাঁকে নতুন ক'রে ক্রুশবিদ্ধ করতে; সে তাঁকে সমাধিস্থ করেছে তাঁর শুদ্ধ ও উদার শিক্ষাসহ আর ঐ জীবন্ত সমাধির উপর নির্মাণ করেছে

চার্চ (যাজকসম্প্রদায়) নামক এক বিষয়। খৃষ্টীয়সমাজ বলে আমরা যা জানি তা ছিল রোমক অপকৃষ্টতা, জার্মান অসভ্যতা ও প্রাচীন সংস্কৃতির অংশের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ যাসব সিক্ত ছিল সমাধিস্থ ও ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের জ্যোতিঃ বেষ্টিত ললাট থেকে উর্ধ্বে নিঃসৃত ক্ষীণ আলোর দ্বারা। তিনি প্রতীচীর কাছে যে বৃহৎ আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন তা কয়জন ছাড়া সকলের কাছেই তালাবদ্ধ ও অপ্রাপ্য হয়েছিল——এই কয়জন ছিল সেইসব ব্যক্তি যাদের অন্তঃপুরুষ এত বেশী প্রোজ্জ্বল ছিল যে ইহা সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও নিমজ্জিত হয় নি। সকল জ্ঞানই নিষিদ্ধ করা হ'য়েছিল কিন্তু তা যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন স্বাভাবিক সংঘর্ষের কারণে তা নয়, ইহার কারণ এই যে রাজনৈতিক পুরোহিতদের অজ্ঞানতা ও পুনরুত্থানশীল জ্ঞানের মধ্যে এমন এক স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল যে কোন সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা ছিল না। আবার এসিয়া এল ইওরোপের উদ্ধারে এবং আরবদের উদার সভ্যতা থেকে বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম হ'ল তার মধ্যযুগের রাত্রির মধ্যে এবং নিগৃহীত ও উৎপীড়িত হ'য়েও বিজ্ঞানের আলো যুদ্ধ করে বৃদ্ধি পেল যতদিন না অন্ধকার বিনষ্ট হ'ল অভিভূত ও আহত হ'য়ে। ইওরোপের বুদ্ধিবিষয়ক ইতিহাস বাহ্যতঃ ছিল বিজ্ঞান ও যাজকসম্প্রদায়ের (Church) মধ্যে সংঘর্ষ, তবে ভুল করে চার্চকে মনে করা হয়েছে খৃষ্টধর্ম ব'লে কারণ চার্চ মুখে খৃষ্টধর্ম স্বীকার করলেও তার চেষ্টা ছিল স্বহস্তে তার শ্বাসরোধ করা; আন্তরভাবে ইহা ছিল দেব ও অসুরের মধ্যে সত্ত্ব ও তমসের-মধ্যে প্রাচীন সংঘর্ষ। এখন ধর্ম হ'ল সাত্ত্বিক, ইহার স্বাভাবিক প্রবেগ হ'ল আলোর দিকে, ইহা তামসিক হ'তে পারে না, দেবগণের শত্রুদের সহিত ইহার কোন কারবার থাকতে পারে না; আর যদি কোন বিষয় নিজেকে ধর্ম ব'লে আলোক দমনের চেষ্টা করে, তুমি ঠিক জেন যে তা ধর্ম নয়, ধর্মের নামে ইহা এক ছদ্মবেশী প্রতারক। সেই সব ভাবনা বিবেচনা কর যাদের আশ্রয়ে, যেন এক পতাকার আশ্রয়ে আধুনিক ভাব উৎখাত করেছিল মধ্যযুগের অসুরকে; ঐসব ভাবনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখি ফরাসী বিপ্লবে। বিপ্লবের মন্ত্র আমরা জানি——স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী; মানবতার আন্তরভাব ইহা স্বীকার করেছিল কিন্তু আমরা জানি ইহা তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। স্বাধীনতার মধ্যে ছিল খৃষ্টীয় ধর্মের ব্যষ্টির নৈতিক স্বাধীনতার সহিত গ্রীসের নাগরিক স্বাধীনতার মিলন; সাম্যের মধ্যে ছিল

সমাজে প্রযুক্ত খৃষ্টীয় ধর্মের গণতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সাম্য; মৈত্রীর অর্থ হ'ল খৃষ্টীয় ধর্মের যে অসামান্য বিশিষ্ট ভাবনা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব তার দিকে আস্পৃহা; মানবতা ও করুণা, দয়া, প্রেমের বৌদ্ধভাব যার কথা ইওরোপ কিছু জানত না যতদিন না খৃষ্টীয় ধর্ম তা প্রচার করেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং অধিকতর বিশুদ্ধতার সহিত আয়ার্লাণ্ডে এবং যার সহিত মিশ্রিত হ'য়েছিল প্রাচীন 'নস্টিক' (Gnostic) ও 'প্লেটোনিস্ট' (Platonist) সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আনীত মানবের মাঝে দেবত্ব বোধ---এইগুলিই সেই সব ভাবনা যাদের দ্বারা ইওরোপ এখনো গভীরভাবে প্রভাবান্বিত; ইহাদের অনেকগুলিকেই বৈজ্ঞানিক জড়-বাদ নিতে বা সহ্য করতে বাধ্য হ'য়েছে, কিন্তু কোনটিকেই এখনো সম্পূর্ণ-ভাবে নির্মূল করতে পারে নি। যুক্তিবাদ এই সব ভাবনা সৃষ্টি করে নি, তবে সেগুলিকে পেয়ে গ্রহণ করেছিল। যুক্তিবাদ হ'ল সেই আন্তরভাব যা সকল বিশ্বাস ও মতকে দৃষ্টতথ্য থেকে ন্যায়ের পরীক্ষাধীন করে, বস্তুতঃ ইহা হ'ল বুদ্ধিবিষয়ক কোষ, অধিকাংশই বুদ্ধিবিষয়ক কোষের নিম্নার্ধ বা শুধু ন্যায়মত অর্ধ যার চেষ্টা হ'ল নিজেকে আত্মা ব'লে প্রতিষ্ঠা করা। যাকে আমরা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ভাব বলি তা ইহাই। যেখানেই ইহা স্বার্থ, আত্মগরিমা উচ্চণ্ড ভাবাবেগ, সংস্কার প্রভৃতির আকারে নিম্ন আত্মাগুলির আক্রমণে বিকৃত না হ'য়ে শুদ্ধ শুষ্ক বুদ্ধির আলোকে কাজ করতে সমর্থ হ'য়েছে সেখানেই ইহা থেকে পাওয়া গেছে অমূল্য সব ফল; সুতরাং তথ্যসমূহের আবেগহীন পর্যবেক্ষণ, শ্রেণী-ভাগ ও তাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা অবিশ্বাস বা স্খলনের ভয় না করে বিজ্ঞানকে অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু যেখানেই ইহা মানবপ্রকৃতি, মানবের কার্য-কলাপ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহার দেখা তথ্য থেকে মত গঠন করতে চেষ্টা করে সেখানেই বিজ্ঞান সর্বদাই পতিত হয় নিম্নআত্মাসমূহের গর্তে; জড়স্তরের ঊর্ধ্বের সব বিষয়কে জড়ীয় আত্মার বিধানের অধীনে আনার প্রয়াস করার অর্থ জলের উপর হাঁটার, বাতাসের উপর ভাসার প্রয়াস; ইহা এমন কিছু করছে যা মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক। এই কথা আরো বেশী সত্য যখন ইহা চিৎ-পুরুষের সত্যগুলি সেইভাবে ব্যবহার করে; তখন ইহার সব মত অদ্ভুত ও অযৌক্তিক হয় আর দেখলে আশ্চর্য লাগে যে সংস্কার ও পূর্বধারণাবশে ঘটনাসমূহের শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক কেমন তথ্যসমূহের প্রতি স্বেচ্ছায় অন্ধ হ'য়ে পড়ে। সেখানে তাদের কথা

শুন না, অন্ধ পাখী যেমন রাত্রিতে তার পলায়নের জন্য যে জানালা খোলা আছে তা না দেখে একই চিরন্তন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়, তেমন এই অন্ধ ব্যক্তিরাও অন্য অন্ধদের পথ দেখাতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সেই একই চিরন্তন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিজেদের আহত করে।

শিষ্য

কিন্তু আপনি বলেছেন যে বিবর্তন এক চিরন্তন সত্য। বৈজ্ঞানিকরা বিবর্তনের ভিত্তির উপর এমন এক নৈতিক অনুশাসন আবিষ্কার করেছে যা প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনের স্থান নেয় আর তা হ'ল ব্যষ্টির উপর প্রজাতির সর্বপ্রধান দাবী।

গুরু

কোন প্রজাতি? ইংরেজ, না জার্মান, না রুশীয়, না সেই মহান্ এংলো-সাক্সন প্রজাতি যা মনে হয় জগৎকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অর্থাৎ ভগবানের ইংরেজরা, আর এখন যোগ করতে হবে ভগবানের আমেরিকানরা, না সমগ্র শ্বেতকায় প্রজাতি? বিবর্তনের শির ও অগ্রভাগ ব'লে কার কাছে ব্যষ্টি তার মাথা নত করবে?

শিষ্য

আমি বলতে চাই সমগ্র মানবজাতি। ব্যষ্টি নশ্বর, জাতি (species) দীর্ঘস্থায়ী আর গণ (genus) প্রায় চিরদিন স্থায়ী। এই ভিত্তির উপর তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য; সমাজের প্রতি তোমার কর্তব্য, তোমার দেশের প্রতি তোমার কর্তব্য, মানবজাতির উপর তোমার কর্তব্য-- এই সবই একটি সুন্দরভাবে শ্রেণী-বিন্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুষম ব্যবস্থার মধ্যে আসে। সকল নীতিকেই দেখান হয় এক ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবী বিবর্তন হিসাবে আর তোমার কাজ হ'ল শুধু ইহাকে স্বীকার করা এবং তার পথের গতিতে চলে ঐ বিবর্তনকে এগিয়ে দেওয়া, পথের বিপরীত দিকে যাওয়া নয়।

গুরু

এবং প্রাচীনপন্থী ও অধঃপতিত ও অন্যান্য ভীষণ নামে অভিহিত

না হওয়া? তবু আমি এই সুষম ও অবশ্যম্ভাবী ব্যবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে আরো বেশী সন্তোষজনক কারণ জানতে চাই; কারণ যদি আমি নিশ্চিত হ'তাম যে আমি এক নশ্বর প্রাণী তাহ'লে আমি অন্য নশ্বর প্রাণীদের মতোই যতদিন জীবন আছে ততদিন উপভোগ করতে চাইতাম, আর আমি শাশ্বত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার কোন কারণ দেখি না; আর এমন কি বিজ্ঞান আমার বিরুদ্ধে তার শব্দকোষের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বহু পদাংশের কথা নিক্ষেপ করলেও আমি যে তা বেশী গ্রাহ্য করব তা মনে হয় না; আর আমি ভাবি যে রক্‌ফেলার মহাশয় ও জে গুল্‌ড মহাশয় ও অন্যান্য অনেকে আমার সহিত এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতেন বা হন। তুমি বলছ যে গণ (genus) চিরস্থায়ী? কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের শিক্ষা তা নয়। আমি ইহার সম্বন্ধে যা বুঝেছি তাতে, মানুষ শুধু এক প্রাণী, এক বিশেষ প্রকারের বানর যা হঠাৎ কোন অবোধ্য কারণে বিকশিত হ'য়ে পৃথিবীতে যত প্রাণী তখন জন্মেছিল তাদের সকলকে পিছনে ফেলে ১০ হাজার মাইল অগ্রবর্তী হ'য়ে পড়ল। তাই যদি হয় তাহ'লে অন্য কোন প্রাণী যেমন কোন বিশেষ প্রকারের পিপীলিকা যে হঠাৎ কোন অবোধ্য কারণে বিকশিত হ'য়ে লক্ষমাইল অগ্রবর্তী হবে না এবং মানুষ যেমন ম্যামথকে (লুপ্ত অতিকায় হস্তীবিশেষকে) তুচ্ছ করেছিল তেমন ইহা মানুষকে তুচ্ছ করবে না––তার কোন কারণ নেই। অথবা নিশ্চয়ই অন্য কোন প্রকারে সমগ্র মানবজাতিকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোন প্রজাতি আসবে। যে ম্যামথের অস্থি বিজ্ঞান সম্প্রতি ভূগর্ভ থেকে বার করেছে তার কি মঙ্গল হচ্ছে এখন যে এমন এক প্রজাতি উদ্ভূত হ'য়েছে যা তাকে ভূগর্ভ থেকে বার করতে পারে এবং তার দেহাবশেষের উপর বহুসংখ্যক বড় বড় কথা দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে পারে? আর যদি কোন বৈজ্ঞানিক ম্যামথ সে সময় তার কাছে এই ভবিষ্য ফল রেখে তাকে ম্যামথ প্রজাতির মঙ্গলের জন্য তার অসামাজিক ও স্বার্থপর পন্থা ত্যাগ করতে বলত তাহ'লে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান হস্তীর কাছেও কি ইহা তার আত্ম-ত্যাগের জন্য যথেষ্ট প্রেরণা বলে মনে হ'ত? এবিষয়ে তার মঙ্গল কোথায় আসত?

শিষ্য

ইহা ঠিক কোন ব্যক্তিগত মঙ্গলের প্রশ্ন নয়; ইহা এক অবশ্যম্ভাবী বিধানের প্রশ্ন। অবশ্যম্ভাবী বিধানের বিরুদ্ধে আপনি নিজেকে দাঁড়

করাবেন?

গুরু

তাই নাকি? আর যদি অবশ্যম্ভাবী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ আমার কোন ক্ষতি না করে বরং তাতে আমার জীবনে সন্তোষ ও শ্রীবৃদ্ধি আসে, তাহ'লে ক্ষতি কি? যদি আমি মাটি ছাড়া কিছু না হই, তাহ'লে মৃত্যুর পর কিছুতেই আমার কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য

ব্যষ্টি দুর্নীতিপরায়ণ হ'তে পারে কিন্তু নীতির উন্নতি হ'তে থাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে।

গুরু

সত্যই? আমি তো মনে করি না যে ইওরোপের বর্তমান অবস্থা ঐ ধারণার অনুকূল। কেন? আমরা ভেবেছিলাম যে বিজ্ঞানের প্রভাবে কৃষ্টি-সম্পন্ন রাষ্ট্রজাতিরাই প্রবল হ'য়ে পৃথিবীপূর্ণ করবে। আর আমরা দেখি যে তারাই জনসংখ্যায় স্থিতিশীল অথবা একান্তভাবে পশ্চাদ্‌বর্তী, বীর্য ও সাহসিকতায় হীন হ'চ্ছে এবং প্রকৃত মহৎ সব গুণ হ্রাস পাচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম যে সভ্যতার যুদ্ধের পদ্ধতি থেকে নগর লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, উৎপীড়ন, ঘৃণ্য নারীধর্ষণ মুছে যাবে। ইওরোপের-আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চীনের মধ্যে যুদ্ধযাত্রা করে আর সেখানে সংঘটিত হয় নোংরামি, ও রক্ত ও যন্ত্রণায় নির্দয় আনন্দের উন্মত্ততা যাথেকে অতীব ঘৃণ্য বর্বর ছাড়া সকলেই বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে। ইহাই কি অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অগ্রগতি, না রেড্ ইণ্ডিয়ান্ বর্বরতার উন্নত সংস্করণ? আমরা ভেবেছিলাম যে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুশীলনের বৃদ্ধির সাথে নৈতিক বিশুদ্ধতা বা অন্ততঃ শিষ্টতা বৃদ্ধি পাবে। কোন এক আমেরিকার বৃহৎ নগরে পুলিশদল গণিকালয়-গুলিতে অভিযান করে শত শত শিক্ষিতা, সংস্কৃতিসম্পন্না, লাবণ্যযুক্তা ও শ্রীময়ী নারী ধৃত করে যারা তাদের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গেছল সেইখানে। ইহাই কি অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অগ্রগতি, না বরং মেসা-লিনা যুগের পুনরাগমন? এই সব কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অজস্র এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইওরোপ অনুসরণ করছে প্রাচীন রোমের

পদাঙ্ক।

শিষ্য

এইরূপ পশ্চাদ্গমনের কালও থাকে; বিবর্তনের অগ্রগতি হয় বক্র রেখায়, সরলরেখায় নয়।

গুরু

আর লক্ষ্য করো যে এই সব পশ্চাদ্গমন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে যখন জগৎ ধর্ম পরিত্যাগ করে নিমগ্ন হয় দার্শনিক জড়বাদের মধ্যে। এরূপ যে তৎক্ষণাৎ ঘটে তা নয়; প্রাচীন ধর্মের দেহের নাশের পরও যতক্ষণ তার আন্তরশক্তি বর্তমান থাকে, ততক্ষণ মনে হয় রাষ্ট্রজাতিগুলির শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু অতি শীঘ্রই এই মৃত্যুর পরের শক্তি নিঃশেষ হয়। প্রাচীন রাষ্ট্রজাতিগুলি যে ধ্বংস হ'য়েছিল তার কারণ তারা সকলেই বুদ্ধির অহঙ্কারে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। ভারত, চীন এখনো বেঁচে আছে। কি সে শক্তি যার বলে ভারত বর্মাবৃত মুষ্টি ও লৌহময় খুরের দ্বারা পর্যুদস্ত ও পদদলিত হ'য়েও সর্বদাই অমর হ'য়ে বেঁচে রয়েছে, সর্বদাই প্রতিরোধ করেছে, সর্বদাই শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বিজেতাকে চূর্ণ করেছে তার বিশাল পায়ের তলায় সর্বদাই আবার তার গৌরবময় মস্তক তুলেছে নক্ষত্ররাজির দিকে। ইহার কারণ সে কখনো তার ধর্ম ত্যাগ করে নি, আন্তরশক্তিতে তার বিশ্বাস কখনো হারায় নি। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি সর্বদাই সত্য হয়; সেজন্যই আদ্যাশক্তি, ওজস্বিনী চণ্ডী তাঁর কাছে জনগণের প্রার্থনায় সর্বদাই নেমে এসে অসুরকে পদদলিত ও চূর্ণ করেন। সময়ের পরিবর্তন হ'য়েছে আর প্রাচীর অসুরের পরিবর্তে ভারতের উপর আধিপত্য করছে এক নূতন প্রকার বহিঃশক্তি। কিন্তু ভারতের দুর্গতি হ'বে যদি সে তার সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে। রাষ্ট্রজাতিসমূহের তালিকা থেকে তার নাম বিলুপ্ত হ'বে আর তার জনগণের কথা পৃথিবীতে হয়ে উঠবে স্মৃতি ও উপকথার বিষয়। আর সে যদি তার আত্মাতে শ্রদ্ধাবান হয়, তাহ'লে আত্মশক্তি, আত্মার শাশ্বত শক্তি তাকে আবার শক্তিসম্পন্ন করে ঊর্ধ্বে তুলবে। আধুনিক বিজ্ঞান নিজেকে দুই প্রধান প্রমাদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে; কার্যকারণসম্বন্ধের বিধান থেকে ইহা এমন এক নূতন ও আরো বেশী অলঙ্ঘনীয় নিয়তি নির্মাণ করেছে যা গ্রীক, হিন্দু বা আরব

কখনো কল্পনাও করে নি; ঐ পূর্বনির্ধারণবাদে নিবিষ্ট হ'য়ে বিজ্ঞান বিশ্বাস করছে যে মানুষের সংকল্প শুধু এক দাস, এমন কি চিরন্তন জড়শক্তিসমূহের এক সৃষ্টিমাত্র। এবিষয়ে বিজ্ঞান ভ্রান্ত এবং যদি না ইহা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে ইহা শীঘ্রই অতি কদর্যভাবে তার ভ্রম সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে। যে কোন বিধান, নিয়তি বা শক্তি অপেক্ষা সংকল্প আরো বেশী শক্তিশালী। সংকল্প সনাতন ও সর্বশক্তিমান্, ইহাই কার্যকারণসম্বন্ধের বিধান সৃষ্টি করেছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে; জড়ের বিভিন্ন বিধান ইহারই সৃষ্টি, আর ইহা সেসবকে বাতিলও করতে সক্ষম; যে সব শক্তি মনে হয় ইহাকে নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ করে সে সব শক্তি ইহা নিজেই। অগ্রসরতার দিকে বিকশিত হবার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের সংকল্পের উপর নেই; যদি ইহার ইচ্ছা হয় যে ইহা পশ্চাদগমন করবে, ইহা তা-ই যাবে, আর তার সঙ্গে সকল জগৎও ঘুরতে ঘুরতে আর্তনাদ করে যাবে বর্বরতা ও চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে; যদি ইহা ইচ্ছা করে এগিয়ে যাব, কোন শক্তিই তাকে থামাতে পারবে না। অন্য যে ভুল বিজ্ঞান করেছে তা ইহা নিয়েছে খৃষ্টধর্ম থেকে; তা এই যে ক্রিয়া ও ভাবাবেগকে নিজ থেকে পৃথক অন্যসত্তাদের দিকেও চালিত করা যায়; সকল ক্রিয়া ও ভাবাবেগ আত্মার জন্য, আত্মার মধ্যে, কিন্তু যদি বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দেয় নিজেদের এমন পৃথক পৃথক ও শুধু শারীরিক সত্তা ব'লে মনে করতে যে তাদের সহিত শারীরিক সংস্পর্শের ও ইন্দ্রিয়সমূহের যোগাযোগের দ্বারা সৃষ্ট সংযোগ ব্যতীত অন্য কোন সংযোগই নেই, তাহ'লে ইহা স্পষ্ট যে এই বিশ্বাসে অভিভূত হ'য়ে মানুষী সংকল্প অনিবার্যভাবেই তদনুসারে তার ক্রিয়া ও ভাবনা গঠন করবে, তখন ইহা আর বিবর্তন-মতবাদীদের আরো বেশী অস্পষ্ট নৈতিক সব সাধারণ শিক্ষা গ্রাহ্য করবে না; আর তার শেষ পরিণতি হবে এক বিরাট স্বার্থপরতা, বর্ধিষ্ণু ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, ক্ষমতা, ধনসম্পদ, আরাম ও আধিপত্যের লালসা ও এমন এক দানবীয় ও অহমাত্মক পাশবতা যা সেই শতহস্ত অসুরের পাশবতার তুল্য যে তার ঐ শতহস্তে ব্যবহার করে দেবতাদের সকল শস্ত্র। যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে সে পশু তাহ'লে তার কাজও হবে পশুর মত আর সে তার পশু-প্রবৃত্তিকেই উন্নত করবে তার দিশারী হিসাবে। ইওরোপ যে আরো দ্রুত এই অবস্থায় আসছে না তার কারণ এই যে জ্ঞান, ধর্ম, প্রকৃত আলোকবিস্তার বিকৃতাঙ্গ ও আহত হ'লেও ধ্বংস পেয়ে সব কিছু শেষ

করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছে; ইহা মানুষী সংকল্পকে বিশ্বাস করতে দেবে না যে ইহা স্নায়ু ও মাংস ও দেহ, পশু ও স্বল্পস্থায়ী বৈ আর কিছু বেশী নয়। ইহা টিকে থাকে এবং জড়বিজ্ঞানের অন্বেষণ এড়াবার জন্য শত শত রূপ গ্রহণ করে আর সনাতন জননীকে ডাকে নেমে এসে উদ্ধার করার জন্য; আর নিশ্চয়ই তিনি নেমে আসবেন অচিরে। নীতিবাদের যে সব ভিত্তি মানবের আদি দিব্য ও শাশ্বত প্রকৃতিতে ফিরে যায় না তারা প্রমাদপূর্ণ ও নশ্বর হ'তে বাধ্য। ধর্ম ও পুণ্যের মহিমারাজি বানর ও বর্বরের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও প্রথা থেকে উদ্ভূত হয় নি; ইহারা প্রচ্ছন্ন দেবতার চিরন্তন আলো আর নিজেদের সর্বদাই প্রকাশিত করছে আরো সুস্পষ্ট রেখায়, আরো সুন্দর রামধনুপ্রভার বন্যায় আর তাদের শেষ পরিণতি হ'ল পরম উপলব্ধির শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতি; যখন সর্বভূত আমাদের আত্মা হ'য়েছে আর আমাদের আত্মা উপলব্ধি করে তার নিজের ঐক্য।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুশ্যতঃ।।

এই যে ঐক্য সকল ধর্ম ও সুনীতির অস্তিত্বের মূল কারণ এবং যার মধ্যে ইহারা লুপ্ত হ'য়ে এমন কিছুতে পরিণত হয় যা উভয় অপেক্ষাই উচ্চতর তা প্রতিষ্ঠিত ক'রে উপনিষদ অগ্রসর হয় আবার সংক্ষেপে সব কথা বলে এই নতুন আলোর ব্রহ্মের বর্ণনা দিতে। চতুর্থ শ্লোকে শুধু বলা হয়েছে যে তিনি এক প্রচণ্ড শক্তি যা এই সকল বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে বেষ্টন ক'রে আছে; এখন বলা হবে যে তিনি এক বিরাট ঐক্য যা তার অব্যক্ত অবস্থায় সর্ব অস্তিত্বের উৎস এবং ব্যক্ত অবস্থায় এই সব অগণিত জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাঃ।।

ইহাই তিনি যিনি সর্বত্র গমন করেছিলেন ঔজ্জ্বল্য, কায়াহীন, অক্ষত, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, এবং যাঁকে পাপ কখনো স্পর্শ করে নি; তিনি দ্রষ্টা, মনস্বী, সর্বব্যাপী স্বয়ম্ভূ; চিরন্তন থেকে তিনি সকল বিষয় বিন্যস্ত করেছেন সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে।

এই শ্লোকের গোড়াতেই আবার সেই পূর্বেকার কথাটি বলা হ'ল যে ঈশ্বর সকল বিষয়কে ঘিরে আছেন যেমন পরিচ্ছদ ঘিরে থাকে পরিচ্ছদ-ধারীকে এবং যিনি সকল বিষয় সৃষ্টি করছেন গতির প্রতিভাস দ্বারা

যে গতি কিন্তু এক প্রতিভাস, এক অস্থায়ী বিষয়, এবং যা সনাতনের সদ্‌বস্তু নয়। "ইহাই তিনি যিনি সর্বত্র গমন করেছিলেন।" গতির যে ঘূর্ণনকে ব্যক্ত সনাতন কর্মে প্রবৃত্ত করেছিলেন তা-ই বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করেছে; তিনি নিজ থেকে সনাতনী প্রজ্ঞারূপে নিঃসৃত হ'য়ে প্রতি বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে ইহাকে বেষ্টন করলেন তার সৃষ্টিকালে। কিন্তু এই তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শ্রুতি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে ক্লীব-লিঙ্গে। কারণ ইহাকে ফিরে যেতে হবে সেই জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মে যিনি লিঙ্গ বা লক্ষণের সকল ভাবনার অতীত। জগৎসমূহের স্রষ্টা তিনি বস্তুতঃ ঐ ঔজ্জ্বল্য, অজ্ঞেয়ের সেই জ্যোতির্ময় ছায়া যার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি শুধু নেতিবাচক পদে। তার কোন দেহ বা রূপ নেই, রূপ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হ'য়েছে এবং সেজন্য ইহা তাঁর এই দিকে অবস্থিত; তাঁর কোন ক্ষত বা অসম্পূর্ণতা নেই, কিন্তু তিনি এমন এক যা নির্দোষ ও সুষ্ঠু আলোক; তাঁর কোন স্নায়ু বা পেশী নেই; তিনি জড়ের ঐ দিকে এবং সৃষ্টি যে তাঁর কাছ থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে তা কোন শারীরিক উপায়ে বা শারীরিক ক্ষমতা ও কুশলতার দ্বারা নয়, তা হ'য়েছে শুধু তাঁর শক্তি বা সংকল্পের প্রবাহ থেকে। তিনি যে শুধু জড়ের ঐ দিকে তা নয়, তিনি আবার মনেরও ঐদিকে কারণ তিনি শুদ্ধ ও পাপের স্পর্শমুক্ত। মনই অশুদ্ধতা ও পাপ সৃষ্টি করে দ্বৈতভাবের উৎপাদক কামনার দ্বারা; কিন্তু সনাতন কামনার অধীন নন। পাপ কি? ইহা শুধু আরো সূক্ষ্ম অপেক্ষা আরো স্থূলের প্রতি প্রীতি, রজঃ অপেক্ষা তমসের প্রতি, সত্ত্ব অপেক্ষা রজসের প্রতি প্রীতি; সুতরাং ইহার কাজ শুধু গুণের ক্ষেত্রের মধ্যে, আর সনাতন গুণাতীত হওয়ায় পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ও শাসন করেন তিনিই যে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম যিনি ঈশ্বরও নন বা তাঁর অধীনস্থও নন--এই তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে শ্রুতি ঈশ্বরের বর্ণনা দেয় সর্বজ্ঞ নিয়ন্তারূপে; তিনি দ্রষ্টা ও কবি যিনি তাঁর প্রোজ্জ্বল চিদাবেশের দ্বারা তাঁর নিজেরই অনন্ত মনে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন হিরণ্যগর্ভরূপে, তিনি মনস্বী, প্রাজ্ঞ, যাঁর স্বরূপগত সাম্যভাবাপন্ন চৈতন্যরাশি থেকে সকল অস্তিত্ব ও ইহার বিভিন্ন বিধান তাদের চিরস্থায়ী শক্তি ও সত্তা নিয়ে তাদের কর্মের দিকে প্রবাহিত হয় আর তিনি তা-ও যা বাহিরে প্রবাহিত হয়, তিনি বিরাট, সেই সর্বব্যাপী চিৎ-পুরুষ যা সকল বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের ঘিরে রাখে। এই সকল অবস্থাতেই তিনি

স্বয়ম্ভূ; কারণ তিনি প্রাজ্ঞ যিনি নিজের শক্তি বলে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম থেকে নিঃসৃত হ'য়েছেন এবং পরব্রহ্মও, তিনি হিরণ্যগর্ভ যিনি নিজের শক্তি-বলে প্রাজ্ঞ থেকে নিঃসৃত হ'য়েছেন এবং প্রাজ্ঞ; তিনি বিরাট যিনি নিজের শক্তিবলে হিরণ্যগর্ভ থেকে নিঃসৃত হ'য়েছেন এবং হিরণ্যগর্ভ। তিনি আত্মা যিনি আত্মার দ্বারা আত্মা থেকে জাত। অর্থাৎ এ সবই সেই এক পরম চিৎ-পুরুষের শুধু বিভিন্ন নাম তাঁর বিশ্বব্যাপী ও অনন্ত চেতনার বিভিন্ন বিভবে বা পাদে। তাহ'লে যখন পরব্রহ্ম সম্বন্ধে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়নি তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তা করা হ'ল কেন? ইহার কারণ এই যে এখন তাঁকে ভাবা হ'চ্ছে তাঁর মহান্ শাসক ও বিধাতার অবস্থায়, যে উৎস থেকে সকল বিষয় নিঃসৃত হয় তাঁর সেই উৎসের অবস্থায় নয়। বিষয়সমূহের উৎস, আশ্রয় ও আধার হিসাবে তিনি ত্রিত্ব, প্রাজ্ঞ-হিরণ্যগর্ভ-বিরাট যাঁর মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী, চিৎ-পুরুষ ও জড়, অন্তঃপুরুষ ও তার শক্তি এখনো এক ও অবিভক্ত। সেজন্য তাঁকে সুষ্ঠুভাবেই বলা হ'ল ক্লীবলিঙ্গে। কিন্তু যখন আমরা তাঁকে দেখি শাসক ও বিধাতারূপে, সেই ব্যক্ত ব্রহ্ম হিসাবে যিনি তাঁর সৃষ্ট প্রতিভাসের জগতের কাজে রত তখন বিভাগ শুরু হ'য়ে গিয়েছে, শক্তি তার সব কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং মহান পুরুষ ত্রিত্ব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ঐ শক্তির বলে পূর্ণ হয়ে সৃষ্টি করছেন, রক্ষা করছেন ও ধ্বংস করছেন অগণিত জগৎসমূহ এবং তাদের মধ্যে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ অসংখ্য রূপ। এই দুই ত্রিত্ব বস্তুতঃ একই ত্রিত্ব, যা পার্থক্য হয় তা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রুতি এখন ঈশ্বরের বর্ণনা দিতে শুরু করে। তিনি 'কবি', মহান্ দ্রষ্টা ও কবির প্রকৃত অর্থে তিনি কবি; সে-ই কবি যে নিছক বোধি বলে বিষয়সমূহকে দিব্যভাবে জানে ভাস্বর ও সুস্পষ্টভাবে এবং যার দিব্য-জানা বিষয়গুলি সৃষ্টি হ'য়ে উঠে তাদের নিজেদেরই উপচেপড়া প্লাবনে। সৎ-ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভরূপে পরমাত্মার এই কবিত্বের দিব্যগুণ আছে, ইহাকেই বলা হয় সৃষ্টির শক্তি এবং এই জন্যই তাঁর মহাশক্তিকে বলা হয় সরস্বতী। তারপর ঈশ্বরকে বলা হ'ল মনীষী, অর্থাৎ মনস্বী। ঈশ্বরের ভাবনাই এই সকল সৃষ্টির ভিত্তি বা আশ্রয়; এই জন্যই অচেতন বিষয়গুলির গঠন হয় নির্দোষ, বৃক্ষ বৃদ্ধি পায় নির্ভুলভাবে, পশু কাজ করে তার প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি অভ্রান্ত সহজপ্রবৃত্তি বলে, তারকা চলে তার গতি-পথে আর পর্বত দৃঢ়বদ্ধ থাকে তার ভিত্তিতে। এই যে অলঙ্ঘ্য প্রজ্ঞা যার

লক্ষণ হ'ল স্থিরতা ও সমতা সকল বিষয়ে অন্তর্নিহিত হ'য়ে তাদের স্থানে, ক্রিয়ায় ও স্বভাবে বদ্ধ রাখে যদি তা না থাকত, তা হ'লে মহাকবির সকল সৃষ্টিই তাদের বিভিন্ন সম্পর্কে অস্থির হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে ও আঘাতে লিপ্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত নিজেদের ধ্বংস করত। লক্ষ্য করো যে এই প্রজ্ঞা সকল বিষয়ের মূল; ইহা কোন সুচিন্তিত আবিষ্কার নয়, অথবা পরবর্তী চিন্তার, যথাযথ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয় নয়, বরং ইহা অপরিবর্তনীয় এবং আদি থেকেই অস্তিত্বের মূলভিত্তি। যা রূপই ইহা নিক না কেন--মাধ্যাকর্ষণের, অথবা আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অথবা বিবর্তনের-- ইহা এক চিরন্তন উপস্থিতি জগতের প্রকৃত স্বভাব, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" দিব্য সহজপ্রবৃত্তিমূলক ভাবনার এই শক্তি হ'ল চিৎ-মহাদেব-প্রজ্ঞারূপে (তমঃ, স্থাণু) পরমাত্মার এক সামর্থ্য। তাঁর অন্য সামর্থ্য হ'ল সংহারের, কারণ তিনি হ'লেন নিশ্চলতার চিৎ-পুরুষ যাঁর কাছে পূর্ণ অনপেক্ষ ভাবনার গভীর নিদ্রা হ'ল শেষ পরিণতি (চিৎ) আর যদি ব্রহ্মের মধ্যে কবির সক্রিয়তা না থাকত, যদি তাঁর মধ্যকার মনীষী কবিকে মুছে দিত তাহ'লে বাহ্য ঘটনাসমূহের এই সব স্পন্দনশীল জগৎ নিঃস্তব্ধ হ'ত এবং নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা পরিণত হ'ত নির্বিশেষ ঘন অস্তিত্বের গর্ভে। তারপর তিনি আবার "পরিভূ"--যিনি সর্বত্র বিরাজমান, অস্তিত্বের মহান্ সর্বব্যাপী আনন্দ। কারণ কবির সব কর্ম মনীষীর দ্বারা বিধৃত হ'লেও স্থায়ী হ'ত না যদি না অস্তিত্বের আনন্দ স্বর্গীয় সুধাধারার মত প্রবাহিত হ'ত সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে এবং প্রাণকে, সত্তাকে করত তাদের প্রথম অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। ইহাই জার্মান দার্শনিকের জিজীবিষা (Will to Live) কিন্তু সকল ইওরোপবাসীদের মত তিনি সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন মাত্র একটি অঙ্গে, তিনি সত্যকে দিব্যসমগ্রভাবে দেখেন নি এবং সেজন্য ঐ জিজীবিষা তার ভাবনায় অত বিষাদময় সুর এনেছিল। এই আনন্দই সকল বিষয়কে আশ্রয় দেয় ও নিত্যভাবাপন্ন করে, কারণ ইহাই অপরিবর্তনীয় ও সনাতন পরমাত্মা। ইহা ব্যক্ত হ'য়েছে সান্তভাবে বাঁচবার ইচ্ছায় কিন্তু যাতে ইহা নিজেকে সার্থক ক'রে তার নিজস্ব গভীরতম ও মূল প্রকৃতি ফিরে পায় সেজন্য ইহাকে প্রসারিত করতে হবে অনন্তভাবে বাঁচবার ইচ্ছায়। প্রথম আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করি ব্যষ্টিভাবে, পরে পরিবারের মধ্যে, তারপরে কুল বা গণের মধ্যে, তারপরে প্রজাতি বা রাষ্ট্রজাতির মধ্যে, তারপর মানবজাতির মধ্যে, তারপর বিশ্বের মধ্যে,

তার মধ্যে একম্ ব্রহ্মের, ভগবানের মধ্যে; ইহাই মানবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বিবর্তন আর ইহার গতিধারা নির্ধারিত হয় আত্মারই প্রকৃতির দ্বারা। বিজ্ঞান, অপরাবিদ্যা আমাদের জন্য বিবর্তনের গতিধারা ও বিভিন্ন উপ-বিধির ইতিহাস বার করে কিন্তু একমাত্র পরাবিদ্যাই আমাদের জন্য ইহার ভিত্তি নির্ধারণ করে এবং আমাদের দেয় ইহার হেতু, উৎস, বিধান ও পরিণতি। এই আনন্দ হ'ল আনন্দময় বিষ্ণু-বিরাটের সামর্থ্য। সকল সত্তার মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের দ্বারাই ঈশ্বর সংরক্ষণ ও উদ্ধার করেন। মনে রেখ যে যদিও তোমার দুঃখে তুমি স্বর্গস্থ দেবতার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা কর, তাহ'লেও নীল আকাশ তোমার কথা শোনে না, তোমার বাহিরের কিছু তোমায় উদ্ধার করতে আসে না, তোমাকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র তিনিই যিনি তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত। তুমি কি রাক্ষস ও দৈত্য দ্বারা শত্রু ও প্রতিপক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত। প্রার্থনা কর তোমার মধ্যে তাঁর বিশাল শক্তি, ভবানী মহিষমর্দিনীকে, এবং অসি ও ত্রিশূলে সজ্জিত হ'য়ে তিনি নিজেকে বহির্ভাবাপন্ন করবেন বিজয়ী অসুরকে চূর্ণ করার জন্য। ইহাই বিধান ও ধর্মের বাণী। কবি, মনীষী, পরিভূ,—এই তিন স্বয়ম্ভূ, সনাতন আত্ম-জাত যিনি নিজ দ্বারা নিজের মধ্য থেকে নিজের মধ্যে জন্ম নেন। এই দেবতারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্ন নন, কারণ তাঁরা সকলেই এক ভগবান, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই সকল বিষয়কে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করেছেন শাশ্বতী বৎসর থেকে, "যাথাতথ্যতঃ", প্রতি বিষয়কে সঠিক বিন্যস্ত করেছেন যেমন ইহার নিজস্ব স্বভাবের জন্য ইহা হওয়া উচিত ও হ'তে বাধ্য সেই ভাবে, কারণ বিষয়ের স্বভাবই ইহার আদি, ইহার বিধান, ইহার নিয়তি, ইহার অন্ত; আর ইহার স্বভাবের সহিত সুসঙ্গতিই ইহার পূর্ণতা। এই যে সারা বিশাল বিশ্ব যেখানে নানাবিধ বিষয় তাদের বিবিধ স্বভাব অনুযায়ী কাজ ক'রে সুসঙ্গত হ'য়ে একটি সুষ্ঠু ঐক্যধারায় পর্যবসিত হয়, একটিমাত্র বিধানের এই যে বহুবিধ বৈচিত্র্যের বিস্ময়কর রাজ্য—এইসব তিনিই বিন্যস্ত করেছেন, "ব্যদধাৎ", তিনিই ভিন্ন ভিন্নভাবে সজ্জিত করেছেন; প্রতি বিষয়কে তিনি স্থাপন করেছেন তার নিজস্ব স্থানে, যেখানে তা কাজ করে নিজেরই কক্ষপথে, এবং নিজেরই সর্বজয়ী ও অপরিবর্তনীয় স্বভাব অনুযায়ী। এই সব তিনি করেছেন চিরন্তন বৎসর থেকে, কালে নয়, কোন বিশেষ দিন বা ঋতুতে নয়, তিনি তা করেছেন শাশ্বতভাবে, কাল হবার পূর্বে। দিব্যবিধান উদ্ভূত

হয় নি, ইহা ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবেও। একথা সত্য যে বিষয়-সমূহের রূপের পরিবর্তন হয় কালের মধ্যে কিন্তু তাদের স্বভাবের যে বিধান তার আদি চিরন্তন। আজ তুমি যে কাজ করছ তাতে তুমি একটি বিধান পালন করছ যা বিরাজিত সমগ্র নিত্যতাব্যাপী। এই বিষয়টি তুমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর আর তুমি দেখবে যে কাল ও দেশ আনন্ত্যের মধ্যে বিলীন হ'চ্ছে, তুমি শুনতে পাবে চিরন্তন জলরাশির গর্জন আর সেই মহান্ স্বর যা চিরকাল ধরে জলরাশির উপর বলছে, "তপঃ, তপঃ", আর অনুভব করবে যে তুমি রয়েছ সেই এক অক্ষর ও সনাতন ভগবানের সান্নিধ্যে। মায়া ও তার সব কাজের কোন অন্ত নেই কারণ তাদের আদি ছিল না কিন্তু মানবের অন্তঃপুরুষ মায়া ও তার সব কাজের ঊর্ধ্বে উঠে মায়া থেকে মুক্ত হ'য়ে তার উপরে অধিষ্ঠিত হ'তে সক্ষম, তখন সে দেখবে যে সে মায়ার প্রভু আর তার আনন্দের জন্যই তার সব কাজ নিত্যকাল ধরে। কারণ বস্তুতঃ মানব ভগবান আর সে নিজের সংকল্পের দ্বারাই নিজেকে যাদুকরীর বন্ধনে নিক্ষেপ করেছে, সেজন্য সে নিজের সংকল্পের দ্বারাই সক্ষম হয় বন্ধন পরিহার ক'রে তার উপর প্রভুত্ব করতে। মায়ার সহিত অন্তঃপুরুষের ক্রীড়া হ'ল প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের ক্রীড়া, একজন অপরের দাস বলে ভান করছে, তার অনুগ্রহে আনন্দিত হ'চ্ছে, তার ক্রোধে তার পদতলে কাঁদছে, আর এখন আবার প্রভু ও স্বামীর যে ন্যায্য স্থান তার তা নিচ্ছে, হ্যাঁ স্বেচ্ছায় তার দিক থেকে ফিরছে অন্য এক আরো সুন্দর ও বিস্ময়কর মুখের দিকে; আর এখন কৃষ্ণের পরিধানে আছে সুনীল বসন ও সুদীপ্ত রত্নরাজি আর রাধার পরিধানে পীতবসন ও সবুজ বনের সুগন্ধ মালা ও উজ্জ্বল শিখিপুচ্ছ; কারণ কৃষ্ণই রাধা এবং রাধাই কৃষ্ণ; তাঁরা শুধু ভেদের খেলা খেলছেন, কারণ প্রকৃতসত্য এই যে তাঁরা সমগ্র নিত্যকাল ধরে একই রয়েছেন ও এখনও এক।

শিষ্য

তাহ'লে এখানে মনে হয় উপনিষদের প্রথম ভাগ শেষ হ'ল আর এর পর আছে কতিপয় অতি দুর্বোধ্য ও বিচ্ছিন্ন উক্তি।

গুরু

উপনিষদের সব উক্তি কখনই বিচ্ছিন্ন নয়, তবে যোগসূত্রটি সাধারণতঃ

অন্তরালে থাকে, স্পষ্ট কথায় বা ব্যাকরণের গঠনের দ্বারা তা খোলাখুলি বলা হয় না। উপনিষদ বলেছে যে সনাতন বিশ্বের সকল বিষয়কে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করেছেন শাশ্বত বৎসর থেকে। তাহ'লে মায়া নিত্য, অবিদ্যা নিত্য, তখনই প্রশ্ন হ'বে, তা হ'লে এসব কি বিদ্যা ও অবিদ্যা? নিত্য ও অনিত্য? সৎ ও প্রতিভাস? যদি অবিদ্যা শাশ্বত হয় তাহ'লে তার বিস্ময়কর কাজে ও মহিমায় আমাদের আনন্দিত হ'তে হয়, তার সব বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করা কখন উচিত হবে না। কিন্তু যদি শুধু বিদ্যাই শাশ্বত হয়, তাহ'লে অবিদ্যা কি এক অভিশাপ ও বন্ধন, যতশীঘ্র সম্ভব বিরক্ত হ'য়ে ইহাকে পরিহার করা ছাড়া ইহার সম্বন্ধে আমাদের আর কি করার আছে? এইসব কথা হ'ল জড়বাদী চার্বাক ও শূন্যবাদীদের কথা। কিন্তু বেদান্ত ইহাদের কোনটিকেই সমর্থন করে না। অনপেক্ষ ব্রহ্ম সৎ কিন্তু সাপেক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি না যে তিনি অসৎ আর যাকে আমরা মায়া বলি তা এই সাপেক্ষ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য, সেজন্য মায়া নিত্য; কিন্তু স্পষ্টতঃ সাপেক্ষ ব্রহ্ম অনপেক্ষ ব্রহ্মেরই উপর প্রতিষ্ঠিত, অনপেক্ষ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোথাও তার থাকা সম্ভব নয়। মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগ ও সম্মুখভাগ যেমন, তেমন হ'ল সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ আর বিদ্যাভীপ্সুর কর্তব্য উভয়কেই জানা, শুধু একটিমাত্র নয়, তা না হ'লে সে ব্রহ্মের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে বস্তুতঃ একরকম কিছুই জানবে না।

শিষ্য

অদ্বৈতপন্থীরা বলবে ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত। মায়া হ'ল ভ্রান্তি, অসদ্-বস্তু, আর ইহার নাশ হয় জ্ঞানের দ্বারা, সুতরাং ইহা নিত্য হ'তে পারে না।

গুরু

তুমি মায়াকে নাশ করতে পার না; তুমি পার শুধু মোহকে, মায়ার ভ্রান্তিকে নাশ করতে; তুমি শুধু পার তাকে জয় করে তোমার পদতলে রাখতে। তুমি মনে রেখো যে শঙ্কর উভয়ভারতীকে জয় করে তার জীবন্ত দেহকে করেছিলেন তাঁর ধ্যানের আসন; উহা যোগের প্রতীক এবং ব্রহ্মের বিস্ময়কর দ্বিবিধ মায়া। তিনি তাকে পরাভূত করে তাকে তাঁর নীচে রাখলেন, কিন্তু তবু তার উপরই তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত---এমন কি তখনো যখন তিনি তার সম্বন্ধে অচেতন হ'য়ে ব্রহ্মের সহিত মিলিত থাকেন।

তা যদি না হ'ত তাহ'লে যে মুহূর্তে কেহ বুদ্ধ হ'য়ে নির্বাণপ্রাপ্ত হবে সেই মুহূর্তে সমগ্র প্রতিভাসের অবসান হবে; কারণ সে ও ব্রহ্ম একই। যদি পরব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে একটিতে সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহ'লে স্পষ্টতঃই বিদ্যা আরম্ভ হ'লে অবিদ্যার অবসান হবে এবং একটি জীবাত্মার মোক্ষের ফলে আসবে সকলের জন্য জগতের নাশ; ঠিক যেমন খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীরা বলে যে খৃষ্টের ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যু জগৎকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু ইহা তা নয়। ব্রহ্মের শক্তির ক্ষমতা দ্বিবিধ ও যুগপৎ; তিনি একই মুহূর্তে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই প্রয়োগ করতে সক্ষম। তিনি চিরন্তন তাঁর নিজের বিশ্বাতীত প্রকৃতি উপলব্ধি করেন আর ঠিক সেই সময় তিনি তাঁর কল্পনার এই বিস্ময়জনক বিশ্বও উপলব্ধি করেন। তিনি সেই মহাকবির সদৃশ যিনি তাঁর নিজের মধ্যেই ও তাঁর নিজের থেকেই নিজের আপন সৃষ্টির এক ছায়াময় জগৎ বাহির করেন আর তবু জানেন যে তিনি তা থেকে ভিন্ন এবং ইহার অনধীন। শুধু এই কারণেই একটি বিশেষ জীবাত্মার মোক্ষে জগতের নাশ হয় না। আর বাস্তবিক শঙ্করও অন্যরূপ বলেন না; কারণ তিনি বলেন না যে মায়া অসৎ; তিনি বলেন ইহা এমন এক রহস্যময় বিষয় যার সম্বন্ধে তুমি বলতে পার না যে ইহা সৎ, অথচ আবার তুমি বলতে পার না যে ইহা অসৎ। বস্তুতঃ অসীম, অনপেক্ষ, অজ্ঞেয় ব্রহ্মের এই রহস্যময়ী শক্তি সম্বন্ধে সান্ত মন শুধু এই বর্ণনাই দিতে সক্ষম। মায়া তার বিভিন্ন রূপে অসৎ ও নশ্বর হ'তে পারে, কিন্তু মায়া তার স্বরূপে সনাতনের শক্তি -হিসাবে নিজে প্রাচীন কাল হ'তে ও চিরদিন ধরে নিত্য হ'বেই হবে।

সূত্রে উপনিষদ্

ঈশ উপনিষদ্

ঈশ্বরের জন্য বাসস্থান এই সকলই--যাকিছু জগৎ (গতিমান্) জগতীর (গতিমতীর) মধ্যে।

জগৎ যে আছে তা তুমি কেন বলছ? কোন জগৎ নেই, আছেন শুধু পরম এক যিনি গতিমান্।

তুমি যাকে জগৎ বল তা কালীর গতিবিধি; এই ভাবে তোমার জগৎ-অস্তিত্বকে আলিঙ্গন কর। তোমার দর্শনের সর্বালিঙ্গনকারী নিশ্চলতার মধ্যে তুমি পুরুষ ও বাস কর; তোমার বহির্মুখী গতিতে ও ক্রিয়ায় তুমি প্রকৃতি এবং বাসস্থানের নির্মাতা। এইভাবেই তোমার সত্তাকে চিন্তা কর।

এই গতির অনেক গ্রন্থি এবং প্রতি গ্রন্থিকে তোমার চক্ষু দেখে এক বিষয়রূপে; অনেকগুলি গতিধারা এবং প্রতি গতিধারাকে তোমার মন দেখে শক্তি ও প্রবণতা রূপে; বিভিন্ন শক্তি ও বিষয় কালীর বিভিন্ন রূপ।

তাঁর প্রতি রূপকে আমরা এক নাম দিই। এই নাম কি? ইহা পদ, ইহা শব্দ, ইহা সত্তার স্পন্দন, আনন্দের সন্তান ও মানসিক ভাবনার জনক। রূপ হবার পূর্বে, নাম ও ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল।

অর্ধ-শিক্ষিত বলে, "যা কিছু রূপ নির্মিত হয়, তার মধ্যে ঈশ্বর প্রবেশ করেন বাস করার জন্য", কিন্তু ঋষি জানেন যে যা কিছু ঈশ্বর তাঁর নিজের সত্তায় দেখেন তা-ই ভাবনা হ'য়ে ওঠে এবং রূপ ও বাসস্থান চায়।

বিশ্ব হ'ল অনন্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক ছন্দোময় স্পন্দন যা নিজেকে বহুগুণিত করে বহু একতানে এবং সেগুলিকে সুবিন্যস্তভাবে ধরে রাখে গতির আদি প্রকৃতিতে ।

তুমি একটি পাথর দেখে বল, "ইহা নিশ্চল।" ইহা তা-ই, তবে শুধু ইন্দ্রিয়-অনুভবের কাছে । যে চক্ষু দেখে তার কাছে ইহা গতি থেকেই নির্মিত ও গতি দিয়েই গঠিত। যে আণবিক গতিবিধি ইহাকে গঠন করে তার সুবিন্যস্ত পুনরাবৃত্তিতেই নিশ্চলতার প্রতিভাস।

সকল স্থিরতা হ'ল ছন্দের এক নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থা। ছন্দ ভঙ্গ কর, স্থিরতা ভেঙ্গে গিয়ে হ'য়ে উঠবে চঞ্চল।

কোন একটি ছন্দ চিরদিন স্থির থাকতে পারে না; সুতরাং বিশ্ব এমন এক সমুদ্র যা সর্বদাই প্রবহমাণ আর ইহার মধ্যে সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। প্রকৃতির মধ্যে প্রতি বিষয়টি টিকে থাকে যতদিন না তার মধ্যে কালীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়; তার পর ইহা ভেঙে গিয়ে পরিবর্তিত হয় অন্য কোন একতানের অঙ্গরূপে।

প্রকৃতি সনাতনী, কিন্তু প্রতি বিশ্ব চঞ্চল। বিশ্বে নাম তথ্য চিরদিন টিকে থাকে কিন্তু বিষয়সমূহের কোন বিশেষ জগৎ স্থায়ী হয় না; কারণ প্রতি বিশ্ব হ'ল এক অনন্ত সংখ্যক সম্ভবপর গতিবিধির মধ্যে একটি ছন্দমাত্র। প্রকৃতির বা প্রকৃতির মধ্যস্থ সুসংবদ্ধ যা কিছু সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় তাকেই চলে গিয়ে স্থান দিতে হবে এক নতুন একতানকে।

তা সত্ত্বেও, সকল জগৎ এবং জগতের মধ্যে সব কিছু তার স্বরূপ সত্তায় শাশ্বত; কারণ সকল মৌলিক অস্তিত্বই ব্রহ্ম যার আদি বা অন্ত নেই।

রূপ ও নাম,—ইহারাও ব্রহ্ম ও সনাতন, কিন্তু জগতের মধ্যে তাদের আছে শুধু পুনরাবৃত্তির নিত্যতা, অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্বের নিত্যতা তাদের নেই। প্রতি রূপ ও প্রতি ভাবনা যা একবার হ'য়েছে তা এখনও বিদ্যমান এবং আবার ঘটতে পারে; প্রতি রূপ ও ভাবনা যা হবে তা পূর্বথেকেই আছে এবং গোড়া থেকেই ছিল। কাল হ'ল গতিবিধির এক সংকেত, ইহা অস্তিত্বের কোন অবস্থা নয়।

কালীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে যা বাস করে তা আত্মা ও গতিবিধির ঈশ্বর। পুরুষ প্রকৃতির প্রভু, সে তার অধীন নয়; অন্তঃপুরুষই রূপ ও ক্রিয়া নির্ধারণ করে, ইহারা তাকে নির্ধারণ করে না। চিৎ-পুরুষ প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে তার জ্ঞানে, কিন্তু শুধু সেইসব ক্রিয়াকলাপ যা সব আরম্ভ করতে সে নিজেই প্রকৃতিকে বাধ্য করেছে।

শরীরের অন্তঃস্থ অন্তঃপুরুষ দেহের প্রভু, ইহা দেহের সব বিধানের অধীন নয়, অথবা তার অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমিত নয়।

অন্তঃপুরুষ যে মন ও ইহার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা গঠিত তা-ও নয় কারণ ইহারাও প্রকৃতির অংশ এবং গতিবিধিমাত্র।

মন ও দেহ হ'ল আমাদের অন্তঃস্থ গূঢ়, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ আত্মার বিভিন্ন করণ।

দেহমধ্যস্থ অন্তঃপুরুষ দেহের দ্বারা দেশের মধ্যে অথবা অভিজ্ঞতায়

মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়: সমগ্র বিশ্বই তার বাসস্থান।

বিষয়সমূহের শুধু এক আত্মা, বহুবিধ রূপের মধ্যে একমাত্র অন্তঃ-পুরুষ। দেহ ও মনের দ্বারা আমি এমন কি আমার ভাই বা আমার প্রেমিকের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন কিন্তু দেহ ও মন অতিক্রম করে আমি সত্তায় ও অভিজ্ঞতায় সকল বিষয়ের সহিত, এমন কি পাথর ও গাছেরও সহিত এক হ'য়ে উঠতে পারি।

যেমন আমার ব্যষ্টিচেতনা আমার দেহস্থ একটি মাত্র কোষের অনু-ভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়, তেমন আমার বিশ্বজনীন অন্তঃপুরুষকেও আমার ব্যষ্টি মন ও দেহের দ্বারা আর সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। যে প্রাচীরগুলি আমাদের আবদ্ধ রাখে সেগুলি নির্মিত হয়েছে প্রকৃতির দ্বারা তার গতি-বিধিতে আর তারা থাকে শুধু তার সব অধস্তন রাজ্যে। আরো উচ্চে উঠলে তারা হ'য়ে ওঠে ব্যবহারিক সীমানা আর এগুলিকে আমরা সর্বদাই অতিক্রম করতে পারি, আর শিখরের উপর তারা শুধু আমাদের বিশ্বব্যাপী চেতনার মধ্যে বিভিন্ন কক্ষ চিহ্নিত করে।

অন্তঃপুরুষ নিশ্চল, কিন্তু তারই পূর্ণ নিশ্চলতার মধ্যে ঘটে প্রকৃতির চাঞ্চল্য।

প্রকৃতির চাঞ্চল্য প্রকৃত বা জাগতিক চাঞ্চল্য নয়, ইহা অন্তঃপুরুষের আত্ম-চেতনার স্পন্দন।

প্রকৃতি হ'ল চিৎ-শক্তি, ঈশ্বরের আত্ম-সংবিতের প্রকাশশীল সামর্থ্য যার দ্বারা তিনি নিজের মধ্যে যা কিছু দেখেন তা হ'য়ে ওঠে চেতনার রূপে।

প্রকৃতির মধ্যস্থ সব কিছুই সেই এক পরম চিৎ-পুরুষের সম্ভূতি যিনিই শুধু সত্তা। আমরা ও প্রকৃতির মধ্যে সকল বিষয় ভগবানের বিভিন্ন সম্ভূতি, "সর্বভূতানি।"

যদিও জগৎ-অভিজ্ঞতায় বিশ্বের মধ্যে অসংখ্য অন্তঃপুরুষ (পুরুষ) দেখা যায়, তবু এই সবই শুধু এক পুরুষ যিনি তাঁর চেতনার বহুরূপের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করেছেন।

প্রতি অন্তঃপুরুষ নিজে সম্পূর্ণভাবে ভগবান, অন্তঃপুরুষের প্রতি সমবায় সমষ্টিগতভাবে ভগবান; প্রকৃতির গতির বিভিন্ন প্রকারের দ্বারাই সৃষ্ট হয় তাদের বিচ্ছিন্নতা ও বাহ্য বিভেদসমূহ।

ভগবান জগতের অতি-স্থিত, তিনি প্রকৃতির কোন বিধানের দ্বারা বদ্ধ

নয়। তিনি বিধান ব্যবহার করেন, বিধান তাঁকে ব্যবহার করে না।

ভগবান জগতের অতি-স্থিত এবং জগতের মধ্যে চেতনার কোন বিশেষ অবস্থায় বদ্ধ নন, তিনি ঐক্য-চেতনা নন, কি বহুল চেতনা নন, ব্যক্তিভাব নন কি নৈর্ব্যক্তিক নন, নিশ্চলতা নন, চাঞ্চল্যও নন কিন্তু তাঁর অনপেক্ষ সত্তার এই যে সব আত্ম-প্রকাশ তা যুগপৎ তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান।

ভগবান যুগপৎ জগতের অতীত, ইহার আধার ও ইহার মধ্যে অনুস্যূত; দেহস্থ অন্তঃপুরুষ ভগবদ্-চেতনায় উপনীত হ'তে সক্ষম হয় আর তখন সক্ষম হয় তার বিশ্বকে যুগপৎ অতিক্রম করতে, নিজের মধ্যে ধারণ করতে এবং ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'তে।

ভগবদ্-চেতনা জগৎ-চেতনাকে বাদ দেয় না। প্রকৃতি চিৎ-পুরুষ থেকে বাহিরের ঘৃণ্য কিছু নয়, বরং ইহা তার প্রতিমূর্তি, জগৎ এমন কোন মিথ্যা নয় যা ব্রহ্মকে খণ্ডন করে, বরং ইহা দিব্য অস্তিত্বের এক প্রতীক।

ভগবান প্রকৃতির বিপরীত দিক, আর প্রকৃতি ভগবানের সম্মুখ দিক।

যেহেতু দেহস্থ অন্তঃপুরুষ চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্যভাবে মুক্ত, সেহেতু অহংভাবে, দৈহিক প্রকৃতির বিধানে, মানসিক প্রকৃতির বিধানে, সুখদুঃখের বিধানে, জীবন ও মৃত্যুর বিধানে তার যে বন্ধন দশা তা হ'তে পারে শুধু আপতিক, ইহা কোন আসল বন্ধন নয়। আমাদের সব শৃঙ্খল হয় খেলা বা ভ্রান্তি, অথবা খেলা ও ভ্রান্তি, উভয়ই।

আমাদের আপতিক বন্ধনদশার রহস্য হ'ল চিৎ-পুরুষের খেলা যার দ্বারা সে প্রকৃতির গতিবৃত্তিতে মগ্ন হ'য়ে ভগবদ্-চেতনা ভুলে যেতে সম্মত হয়।

প্রকৃতির গতিবৃত্তি হ'ল এক সপ্তবিধ প্রবাহ যার প্রতি ধারা তার আপন গতির বিধানের অধীন কিন্তু ইহার মধ্যে গূঢ়ভাবে, প্রকাশিত হ'য়ে বা অর্ধ-প্রকাশিত হ'য়ে আছে তার ছয় ভগিনী বা সহচরী।

সত্তা, সংকল্প বা শক্তি, সৃজনশীল আনন্দ, শুদ্ধ ভাবনা, মন, প্রাণ ও জড়---সৎ, চিৎ বা তপঃ, আনন্দ, বিজ্ঞানম্, মনঃ, প্রাণ ও অন্নম্, ইহাদের দ্বারা প্রকৃতি গঠিত।

এই সব তত্ত্বের যে কোনটিতে পুরুষ থাকতে পারেন, আর তার অবস্থান অনুসারে, তার দৃষ্টিরও পরিবর্তন হয় আর সে ভিন্ন জগৎ দেখে; সকল জগৎ শুধু চিৎ-পুরুষের বিন্যস্ত ও সুসঙ্গত দৃষ্টি।

যা ভগবান দেখেন, তা-ই আছে; যা তিনি দেখেন শৃঙ্খলা ও সুসঙ্গতির

সহিত তা-ই হ'য়ে ওঠে জগৎ।

সাতটি জগৎ আছে, শুদ্ধ সত্তার সত্য, শুদ্ধ সংকল্প বা শক্তি'র তপঃ, শুদ্ধ আনন্দের জন, শুদ্ধ ভাবনার মহঃ, শুদ্ধ মানসিকতার স্বর, শুদ্ধ প্রাণের ভুবঃ, শুদ্ধ জড়ের ভূঃ।

সৎ-এর মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল সত্তার শুদ্ধ সত্য এবং নিজেকে দেখে জগতের বহুত্বের মধ্যে এক ব'লে।

তপঃর মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল দিব্য সংকল্প ও জ্ঞানের শুদ্ধ শক্তি এবং বিশ্বকে তার প্রসারিত আত্মা হিসাবে অধিগত করে সর্বজ্ঞভাবে ও সর্ব-শক্তি'মানভাবে।

আনন্দের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ আনন্দ, এবং নিজেকে বহুগুণিত করে বিশ্বব্যাপী আত্ম-সৃষ্টিতে এবং সত্তার অবিমিশ্র আনন্দে।

মহঃর মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ ভাবনা, সে নিজেকে দেখে বহুত্বের মধ্যে সর্বগ্রাহী ঐক্যের শৃঙ্খলায় ও বিন্যাসে, সকল বিষয়কে দেখে তাদের ঐক্যে, এবং প্রতি বিষয়কে দেখে তার যথার্থ স্থানে, কালে, ও অবস্থায়। বিষয়সমূহের ছাপের অধীন সে নয়, বরং যে বিষয়গুলি সে জানে তাদের সে নিজের মধ্যে ধারণ করে ও আয়ত্ত করে।

মনসের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ মানসিকতা, সে পৃথক বিষয়সমূহের শুদ্ধ ছাপ গ্রহণ করে এবং তাদের যোগফল থেকে গ্রহণ করে সমগ্রের ছাপ। মনসই মাপে, সীমা টানে ও ভাগ করে।

প্রাণের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ প্রাণবত্তা এবং নিজেকে বাহিরে প্রবাহিত করে দেয় বিবিধ প্রাণ-শক্তিতে।

অন্নের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ জড় এবং চেতনার রূপের মধ্যস্থ চেতনার শক্তিকে ভুলে যায়।

জড় হ'ল সোপানশ্রেণীর নিম্নতম ধাপ আর যে পুরুষ জড়ের ভিতর অবতরণ করেছে সে তার গূঢ় প্রকৃতি ও অনিবার্য আত্ম-প্রবেগের দ্বারা উন্মুখ হয় রূপের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে শুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সত্তার স্বাধীনতার দিকে। এই দুটি গতিবৃত্তি প্রপঞ্চকে নিয়ন্ত্রণ করে—'অধো-গতি', জড় বা শুধু রূপের দিকে অবতরণ এবং 'ঊর্ধ্বগতি' চিৎ-পুরুষ ও ভগবানের দিকে উত্তরণ।

মানব মানসিক সত্তা, মনু বা মনোময় পুরুষ যে প্রবেশ ক'রেছে এক প্রাণভাবাপন্ন জড়ীয় দেহের মধ্যে আর তার প্রয়াস হ'ল ইহাকে অনন্ত

মানসিকতায়, অনন্ত ভাবনাপরায়ণতায় সমর্থ করা যাতে সে হ'তে পারে ব্যক্ত সচ্চিদানন্দের সুষ্ঠু যন্ত্র, আসন ও মন্দির।

জড়জগতের মধ্যস্থিত মন দুই প্রকার জ্ঞানের দিকে মনোযোগী-- বাহির থেকে দৈহিক বা মানসিক সব সংস্পর্শ। যেগুলিকে ব্যষ্টি মানসিকতার মধ্যে গ্রহণ করার পর রূপান্তরিত করা হয় মানসিক মূল্যে; অন্যটি হ'ল ভিতর থেকে জ্ঞান যা আধ্যাত্মিক ভাবনাপর ও মানসিক এবং অনুরূপভাবে রূপান্তরিত।

নিশ্চেষ্ট ভৌতিক দেহগুলি মনের লওয়া সব সংস্পর্শই গ্রহণ করে কিন্তু সুসংহত মানসিকতার অভাবে সে সবকে তারা রাখে জড়ে অবস্থিত সংবৃত্ত মনের মধ্যে, আর সে সবকে মানসিক প্রতীকে রূপান্তরিত করতে অক্ষম।

আমাদের দেহ স্বভাবতঃই নিশ্চেষ্ট ভৌতিক বস্তু যা প্রাণ ও মনের দ্বারা চালিত হয়। ইহারাও সকল সংস্পর্শ গ্রহণ করে কিন্তু তাদের সকলগুলি মানসিক মূল্যে রূপান্তরিত হয় না। যা সব রূপান্তরিত হয় তাদের কতকগুলি রূপান্তরিত হয় অসম্পূর্ণভাবে, কতকগুলি সম্পূর্ণভাবে, কতকগুলি তৎক্ষণাৎ আর কতকগুলি রূপান্তরিত হয় শুধু জড়স্থিত সংবৃত্ত মনের মধ্যে দীর্ঘ বা স্বল্পকালীন অবস্থানের পর। আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের বেলাতেও সেই একই রকম তারতম্য। যে সকল জ্ঞান এখানে বিভিন্ন মানসিক মূল্যে রূপান্তরিত হয় তারাই আমাদের জাগ্রত চেতনার উপাদান হয়। এই যে জাগ্রত চেতনা যাকে মনোময় পুরুষ নিজ বলে গ্রহণ করে এবং যা এক কেন্দ্রীয় আমি-বোধের চারিদিকে সংহত হয় তা-ই জাগ্রত অহং।

জীব অর্থাৎ দেহধারী মনোময় পুরুষ তার চেতনায় জাগ্রত অহং অপেক্ষা অনেক বেশী বিশাল; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, নিকট ও দূর, এই জীবন ও অন্যসব জীবন, এই জগৎ ও অন্য সব জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্র এত বিশাল যে তা জাগ্রত অহং পায় না। জাগ্রত অহং অনেক বিষয় লক্ষ্য করতে অসমর্থ হয় এবং যা লক্ষ্য করে তা-ও ভুলে যায়; জীব সকল অনুভূতিই লক্ষ্য করে ও স্মরণে রাখে।

জাগ্রত মনের স্তরের নীচে আমাদের প্রাণ-শক্তির ও দেহের মধ্যে যা চলতে থাকে তা এই জগতে আমাদের অবচেতন আত্মা; আমাদের জাগ্রত মনের স্তরের ঊর্ধ্বে আমাদের মন ও উচ্চতর তত্ত্বগুলির মধ্যে যা চলতে থাকে তা আমাদের অতিচেতন আত্মা। এই দুই উৎসের যে কোনটি থেকে জাগ্রত অহং প্রায়ই কম বেশী দুর্বোধ্য কিছু বার্তা পায় কিন্তু তাদের

উৎস কোথায় তা সে জানতে পারে না।

মানুষের অগ্রগতি সেই অনুপাতে হয় যে অনুপাতে সে তার চেতনাকে বিস্তৃত করে এবং জাগ্রত চেতনার বোধ ও আনন্দের জন্য ক্রমশঃ বেশী বিশাল ও সূক্ষ্ম অনুভূতি উপস্থিত করে এবং যে অনুপাতে সে আরোহণ করে মনের উচ্চতর স্তরসমূহে এবং মনের অতীত শুদ্ধ ভাবনায় ও চিৎ-পুরুষে।

তার অগ্রগতি ও আত্ম-চরিতার্থতার সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও কার্যকরী উপায় হ'ল তার জাগ্রত অহংকে বিলীন করা এক অনন্ত চেতনার উপ-ভোগের মধ্যে, প্রথমে বিশ্বজনীন মনোময় পুরুষের মানসিক চেতনার উপভোগের মধ্যে কিন্তু পরে পরতর বিজ্ঞানের এবং পরতম সচ্চিদানন্দের ভাবময় ও আধ্যাত্মিক চেতনার উপভোগের মধ্যে।

সুতরাং দেহস্থ জাগ্রত মানসিক অহং-এর উত্তরায়ণ ও বিলয়নই সকল ব্যবহারিক বেদান্তর প্রথম উদ্দেশ্য।

এই উত্তরায়ণ ও বিলয়নের ফল হ'তে পারে জাগ্রত আত্মার নাশ এবং কোন নিদ্রাবদ্ধ তত্ত্বের মধ্যে, যেমন নির্বিশেষ প্রকৃতি, সুষুপ্ত পুরুষ, শূন্য ব্রহ্ম ইত্যাদির মধ্যে পুনঃপতন অথবা জগদ্-আত্মার নাশ পরব্রহ্মের মধ্যে অথবা জাগ্রত আত্মার বিশ্বভাবাপন্নতা এবং জগতের মধ্যে ও তা ছাড়িয়ে ভগবানের দিব্য সত্তার আনন্দের মধ্যে, অমৃতম্-এর মধ্যে। ঈশ উপনিষদ মানবের জন্য এই সর্বশেষ লক্ষ্যের কথাই বলে।

জাগ্রত অহং জীবকে তার দেহ, প্রাণিক ও মানসিক অভিজ্ঞতার সহিত এক করে অথচ এগুলি প্রকৃতির গতিধারার অংশ এবং প্রকৃতির ও গতি-ধারার অধীন এবং সেজন্য তার মিথ্যা বিশ্বাস হয় যে অন্তঃপুরুষ প্রকৃতির অধীন, ইহা তার প্রভু নয়, ইহা 'অনীশ', ইহা 'ঈশ' নয়। ইহাই সেই বন্ধনদশার ভ্রান্তি যাকে মনোময় পুরুষ হয় স্বীকার করে, নয় ধ্বংস করতে চায়। যারা ইহা স্বীকার করে তাদের বলা হয় 'বদ্ধজীব', বন্ধনদশায় পুরুষ; যারা ইহা ধ্বংস করতে চায় তাদের বলা হয় 'মমুক্ষু জীব', আত্মমুক্তিকারী পুরুষ; যারা ইহা ধ্বংস করেছে তারা 'মুক্ত জীব', ভ্রান্তি ও খণ্ডতা থেকে মুক্ত পুরুষ।

প্রকৃতপক্ষে, কোন পুরুষই বদ্ধ নয় এবং সেজন্য মমুক্ষু বা বন্ধনমুক্ত কেউ নেই; এই সব হ'ল জাগ্রত মনের বিভিন্ন অবস্থা, যে আত্মা বা চিৎ-পুরুষ ঈশ্বর, চিরন্তনভাবে প্রভু ও মুক্ত তার অবস্থা ইহারা নয়।

বন্ধনদশার সার হ'ল সীমাবদ্ধতা আর সীমাবদ্ধতার প্রধান অবস্থাগুলি হ'ল মৃত্যু, কষ্ট ভোগ ও অজ্ঞানতা।

মৃত্যু, কষ্টভোগ ও অজ্ঞানতা হ'ল প্রাণিকভাবাপন্ন দেহস্থ মনের অবস্থা, ইহারা বিজ্ঞান, আনন্দ, চিৎ ও সৎ-এর মধ্যকার পুরুষের চেতনাকে স্পর্শ করে না। তিনটি যে নিম্ন অঙ্গ--মন, প্রাণ ও দেহ তাদের সমবায়কে সেজন্য বলা হয় 'অপরার্ধ', নিম্নরাজ্য অথবা খৃষ্টধর্মালম্বী-দের ভাষায় মৃত্যু ও পাপের রাজ্য; চারটি উচ্চতর অঙ্গকে বলা হয় 'পরার্ধ', পরতর রাজ্য অথবা খৃষ্টধর্মালম্বীদের ভাষায় স্বর্গের রাজ্য। মানবকে মৃত্যু, কষ্টভোগ ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করা এবং নিম্নরাজ্যের উপর পরতর রাজ্যের সর্ব-আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় প্রকৃতি আরোপ করা-- ইহাই ঈশ উপনিষদের ঋষির উদ্দেশ্য।

এই মুক্তি সাধনের উপায় হ'ল জাগ্রত অহংকে বিলীন করা ঈশ্বরের দিব্যসত্তার মধ্যে এবং অন্য সকল ভূতের সহিত এবং যিনি ভগবান, আত্মা ও ব্রহ্ম তাঁর সহিত আমাদের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা।

সকল ব্যষ্টি ভূত হ'ল 'জগতীর' মধ্যে জগৎ, গতিধারার মধ্যে গতির বিষয় এবং তারা পালন করে ঐ গতির বিভিন্ন বিধান ও প্রণালী।

দেহ হ'ল সেই জড়ীয় চেতনাধারার মধ্যে গতির এক বিষয় যার প্রধান বিধান হ'ল জন্ম ও মৃত্যু। সুতরাং সকল দেহই রূপায়ণ ও নাশের অধীন।

প্রাণ হ'ল শাশ্বত প্রাণ-শক্তি দিয়ে গঠিত প্রাণিক চেতনাধারার মধ্যে গতির এক স্রোত। প্রাণ নিজে মৃত্যুর অধীন নয় কারণ মৃত্যু প্রাণ-শক্তির বিধান নয়, যে রূপের মধ্যে প্রাণ আবিষ্ট হয় তা থেকে শুধু ইহাকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হয় এবং সেজন্য ইহা তার দেহের মৃত্যুর ভৌতিক অনুভূতির অধীন।

এখানে সকল জড় ক্রিয়া বেশী বা কম তীব্রতার প্রাণ-শক্তির দ্বারা পূর্ণ কিন্তু ব্যষ্টি সজীবতার মধ্যে যে প্রাণের সংগঠন তা জড় জগতের প্রণালীর মধ্যে পরে শুরু হয় প্রথমে উদ্ভিদের এবং পরে জীবজন্তুর আবি-র্ভাবের দ্বারা। ভুবঃ-র দেবতাদের অথবা ভূঃ-র উপর প্রাণলোকের চাপের ফলেই প্রাণের এই বিকাশ হয় আর উহার উপরই এই বিকাশ নির্ভরশীল।

দেহের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণ দেহের বিভিন্ন বিধানের দ্বারা কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়; সেজন্য ইহা অসমর্থ হয় তার রূপকে তার পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন

শক্তি দিতে। এইজন্যই কোন ভৌতিক অমরতা নেই।

ব্যষ্টি জীবগত প্রাণের সংগঠনের প্রবণতা হ'ল জড়ের বিজাতীয় শক্তির তীব্রতার আঘাত এনে নাশের কাল ত্বরান্বিত করা কারণ ঐ বিজাতীয় শক্তি তার সক্রিয়তার দ্বারা জড়ীয় রূপের ক্ষয়সাধন করে। সেজন্য উদ্ভিদের নাশ হয় কিন্তু পাথর ও ধাতু তাদের নিজস্ব সাম্যাবস্থায় স্থায়ী হয়।

প্রাণিকভাবাপন্ন দেহের মধ্যে মন প্রবেশ ক'রে দেহের উপর তার সব স্পন্দনের উচ্চতর দাবির দ্বারা নাশের কালকে আরো ত্বরান্বিত করায় সহায় হয়।

মন হ'ল মানসিক চেতনাধারার মধ্যে গতির এক গ্রন্থি। প্রাণের মত, ইহাও নিজে মৃত্যুর অধীন নয়, যে প্রাণিকভাবাপন্ন দেহের মধ্যে ইহা আবিষ্ট হ'য়েছে তা থেকে ইহাকে শুধু নিষ্ক্রান্ত হ'তে হয়। কিন্তু যেহেতু মানসিক অহং নিজেকে দেহের সহিত অভিন্ন করে এবং তার জীবন বলতে বোঝে শুধু তার বর্তমান নশ্বর স্থূল ভৌতিক দেহের মধ্যে এই স্থিতি সেহেতু ইহা দৈহিক মৃত্যুর মানসিক অনুভূতি লাভ করে।

অতএব মৃত্যুর অনুভূতির মধ্যে যুক্ত রয়েছে তার সত্যকার অমর প্রকৃতি সম্বন্ধে আপতিক নশ্বর মনের অজ্ঞানতা এবং দেহের মধ্যে শক্তির সংকীর্ণতা যার দ্বারা যে রূপের মধ্যে আমরা বাস করি তা ক্ষয়ে যায় স্পন্দনশীল প্রাণ-শক্তির ও স্পন্দনশীল মানসিকতার আঘাতের প্রভাবে। মৃত্যু বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রাণ বা মনের নাশ নয়, তা হ'ল রূপের বা দেহের নাশ।

যাকে মানুষ বলা হয় সেই মনোময় সত্তার পক্ষে দেহের নাশ প্রকৃত মৃত্যু নয়; ইহা শুধু মাধ্যমের ও চেতনার চতুঃপার্শ্বস্থ বিষয়ের পরিবর্তন। দেহের জড় তার বিভিন্ন উপাদান ও সমাবেশ পরিবর্তন করে, মনোময় সত্তা টিকে থাকে তার স্বরূপে ও ব্যক্তিসত্ত্বে, উভয়েতেই এবং প্রস্থান করে অন্য রূপ ও পরিবেশের মধ্যে।

'ঈশ'র রহস্য

এখন থেকে বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই বেদ ও উপনিষদের জন্য বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। যেদিন থেকে ভারতবর্ষে মানবমন ক্রমশঃ বেশী বুদ্ধিভাবাপন্ন হ'য়ে, তর্কশাস্ত্র ও বুদ্ধিগত যুক্তিবাদের সাহায্যে জ্ঞানের গৌণ প্রণালীতে সর্বদাই উত্তরোত্তর আসক্ত হ'য়ে, অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা জ্ঞানের প্রকৃত ও আদি সব প্রণালী থেকে উত্তরোত্তর সরে এসে প্রাচীন বৈদিক সত্যের বহুমুখী সুষমাকে স্থানচ্যুত ও খণ্ডিত ক'রতে শুরু করল ও ইহাকে বিভিন্ন মতবাদের ও দর্শনের কঠিন কাঠা-মোর মধ্যে আবদ্ধ করল তখন থেকেই ইহা শ্রুতির প্রথম যুগের সত্য অপেক্ষা পরবর্তী কালের সূত্র ও ভাষ্যের বিভিন্ন মত নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। বেদ ও বেদান্ত আর জ্ঞানের পথ প্রদর্শক রইল না, তারা হ'য়ে উঠল শুধু কতকগুলি খনি ও আকর যেখান থেকে সুবিধাজনক কিছু মূল উক্তি নেওয়া যেতে পারে দার্শনিকদের তর্কযুদ্ধে বাদানুবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য অথচ কি প্রসঙ্গে ঐসব উক্তি করা হ'য়েছে তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'ত না। অসুবিধাজনক মূল উক্তিগুলিকে হয় উপেক্ষা করা হ'ত, নয় তাদের অর্থ বিকৃত ক'রে অথবা তাদের মূল্য হ্রাস করে তাদের ব্যাখ্যা করা হ'ত অন্যভাবে। আর যেগুলি ব্যাখ্যাকারদের বাদানুবাদের উদ্দেশ্যের সহায়ও হ'ত না অথবা বাধাও হ'ত না সেগুলি শুধু প্রতিশব্দের দ্বারা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হ'ত, অথবা প্রায়ই ফেলে রাখা হ'ত অর্ধ-আলোকিত অবোধ্য অবস্থায়। বেদান্ত রচয়িতাদের ভাষা আর বোধগম্য ছিল না, তাদের মননের রূপক ও প্রতীক, প্রকাশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য অপ্রচলিত ও অবোধ্য হ'য়ে উঠল। সেজন্য এক সময়ে যে সব অংশের ভিতর গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে জ্ঞানের এক গভীরতা ও সূক্ষ্মভাবনার এমন মাধুর্য প্রকাশ পেত যা তার সম্পদে ও গুণে প্রায় অলৌকিক ছিল সেগুলিকে আজকালকার অমনোযোগী পাঠকের কাছে মনে হয় অগঠিত অপক্ব চিন্তাপ্রণালীর পরিচায়ক স্তূপীকৃত শিশুসুলভ অবোধ্য ও অর্থহীন কল্পনা। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাদের অভিহিত করেছেন অসার ও মানবজাতির নাবালকত্বের প্রলাপ ব'লে,

তিনি বোঝেন নি যে মূল বচন তা নয়, ইহার সম্বন্ধে তার যে বোধ হ'য়েছে সেই বোধই অসার ও অজ্ঞানতার প্রলাপ। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে যখন ভারতবর্ষের উপর কলিকালের তমসাবরণ ঘন হ'ল, তখন বৈদান্তিক সাধকদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির অধিকাংশই ভারতবর্ষে লুপ্ত হ'ল, যেমন তার জ্ঞান সংকুচিত হ'ল তেমন তার সদ্‌গুণও হ্রাস পেল, আর তার প্রাচীন আধ্যাত্মিক সাহসিকতার নির্ভীকভাব ও শক্তিও বিনষ্ট হ'ল। অবশ্য তা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়নি কারণ ইহার জ্ঞান ও সাধনার অংশগুলি তখনো গুহায় ও আশ্রমে জীবিত ছিল এবং ইহার অনুভব ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের অংশগুলি আরো আত্যন্তিক ও আত্মত্যক্ত উৎসাহের দ্বারা সংকীর্ণ হ'য়ে অবশিষ্ট রইল ভক্তিমার্গের কম্পনশীল তীব্রতার মধ্যে ও অগণিত ভক্তের প্রচণ্ড আন্তর আনন্দের মধ্যে, এমন কি সেখানে তারা আরো সঞ্জীবিত হ'ল। কিন্তু এমন কি এখানেও ইহা পূর্ণতা রহিত হ'য়ে নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট রইল, এবং তার প্রাচীন ও উজ্জ্বল শুদ্ধতাও মলিন হ'ল। তবু আমরা ভাবি যে যাই হ'ক আমরা বেদের অর্ধেক পেয়েছি ও তা বুঝেছি। আর উপনিষদ! আমরা কিছু সংখ্যক প্রধান অংশ বুঝেছি এবং সেগুলিও অসম্পূর্ণভাবে; কিন্তু উপনিষদগুলির অধিকাংশ সম্বন্ধেই আমরা যা বুঝি তা মিশরীয় রহস্যপূর্ণ লেখা সম্বন্ধে আমাদের বোঝা অপেক্ষা কম আর এই সব মহান গ্রন্থে যে জ্ঞান নিহিত রয়েছে তাতে আমাদের যে অধিকার আছে তা প্রাচীন মিশরীয়দের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অধিকার অপেক্ষাও কম। "দভ্রম্ এবাপি ত্বম্ বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্" (ব্রহ্মের রূপ তুমি সামান্যই জান)!

আমি বলেছি যে এই দারুণ জাতীয় ক্ষতির জন্য দায়ী হ'ল ভারতীয় মনের বর্ধিষ্ণু বুদ্ধিভাবাপন্নতা। আমাদের যে পূর্বপুরুষরা বৈদিক সত্য আবিষ্কার বা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বুদ্ধিগত কল্পনা বা ন্যায়ানুগ যুক্তিধারার সাহায্যে তা পান নি। তা তাঁরা পেয়েছিলেন চিৎ-পুরুষে বাস্তব ও স্পষ্ট অনুভূতির দ্বারা---আমাদের কথায় আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং যা তাঁরা অনুভূতিতে পেয়েছিলেন তা তাঁরা বুঝেছিলেন বোধিময় যুক্তিশক্তির সাহায্যে। কিন্তু একটা সময় এল যখন লোকেরা অনুভব করল যে নিজেদের অপরদের কাছে এই পরম ও অতিপ্রাচীন বৈদিক সত্যের বিবরণ বুদ্ধিগত যুক্তিধারার ভাষায় ন্যায়ের সংজ্ঞায় দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ বোধিময় যুক্তিশক্তিকে জ্ঞানের

সাধারণ করণ হিসাবে রাখতে হ'লে ইহার ভিত্তিস্বরূপ দরকার লৌহকঠিন নৈতিক ও বুদ্ধিগত সংযম, চিন্তার সাতিশয় স্বার্থশূন্যতা,---নচেৎ কল্পনা ও বিভিন্ন ইচ্ছা ইহার ক্রিয়াকে কলুষিত করে, ইহাকে তার রাজাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে তারই নাম ও ছদ্মবেশ নিয়ে শোভা পায়; বৈদিক জ্ঞান নষ্ট হ'তে শুরু করে আর শীঘ্রই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা ও প্রতীক বিলুপ্ত হয় আর তাদের স্থলে আসে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও নির্বোধ আচার ও উৎসব। তপস্যা বিনা কোন বেদ সম্ভব নয়। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের অর্থ অনুসারে ইহাই ছিল আমাদের মধ্যে মননধারার গতি। তপস্যার সামর্থ্য হ'ল মানবের প্রথম বীর্যের স্বর্ণযুগ; মানবজাতির বয়োবৃদ্ধির সাথে ইহাও ক্ষীণ হ'তে থাকে আর গতির চক্র চলে লৌহযুগের দিকে, আর যেমন ভিত্তিস্বরূপ তপস্যা ক্ষীণ বা ধ্বংস হয়, তেমন তার সাথে উপরের গঠন দিব্যজ্ঞানও ক্ষীণ বা ধ্বংস হয়। সত্যের সাথে আসে কুসংস্কার, আসে অযৌক্তিক প্রমাদ যা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সত্যের সমাধির উপর এবং নির্মাণ করে তার প্রমোদের জমকালো ও উদ্ভট প্রাসাদ বিনষ্ট, প্রচ্ছন্ন ও উৎসর্গীকৃত ভিত্তির উপর, আর এমন কি পুরাতন সত্যের ধ্বংসাবশেষও ব্যবহৃত হয় তার অনিয়মিত গঠনের প্রস্তর হিসাবে। কিন্তু এরূপ এক অবৈধ অধিকার কখনই স্থায়ী হয় না। কারণ যেহেতু মানুষের সত্তার প্রয়োজন হল সত্য ও আলোক সেহেতু যে দিব্য বিধানের প্রধান দিক এই যে অন্তঃপুরুষের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি চিরদিন অপূর্ণ থাকবে না তা যুক্তিশক্তিকে উত্তোলন করে কুসংস্কারকে সরিয়ে দেবার জন্য। যুক্তিশক্তি আসে ঈশ্বরের দূতরূপে, তার দ্বিবিধ অস্বীকারের অসিতে সজ্জিত হ'য়ে (কারণ বুদ্ধিগত যুক্তিশক্তির প্রকৃতিই এই যে পরাক্-বৃত্ত প্রতিভাসের সত্যের অতীত কোন কিছুরই কথা সে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জোরালোভাবে বলবে না, বরং মৌলিক সত্য সম্বন্ধে তাকে সর্বদাই অজ্ঞেয়বাদী ও সংশয়পূর্ণ থাকতে হবে, তার শ্রেষ্ঠ উক্তি হ'ল, 'সম্ভবতঃ' আর নিম্নতম উক্তি হ'ল 'হতে পারে')---সে এসে যা পারে তা-ই ছিন্ন করে; নেতিবাদের উন্মত্ততায় সে প্রায়ই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অবশ্য সে কুসংস্কারকে অস্বীকার করে কিন্তু সেই সঙ্গে সে আবার সত্যকেও সন্দেহ ক'রে অস্বীকার করে কারণ ইহা কুসংস্কারের ভিত্তি হ'য়েছিল অথবা তার কিছু প্রস্তর ব্যবহার করেছিল গঠনের অংশ রূপে। কিন্তু যাই হ'ক সে আরো দৃঢ় কর্মের জন্য ক্ষেত্র আবর্জনামুক্ত করে; আরো শুদ্ধ লেখার

জন্য সে তৈরী করে এক অ-লেখা শ্লেট। প্রাচীন ভারতীয় মন সহজ-সংস্কার বশে অনুভব করেছিল--আমি একথা বলি না যে ইহা উপলব্ধি করেছিল অথবা সচেতনভাবে বিচার করেছিল--যে নেতিবাদের এরূপ এক রাজত্ব এড়াবার একমাত্র উপায় হ'ল বৈদিক সত্যের যে অংশ তখনো আয়ত্ত করা সম্ভব তাকে বুদ্ধিগত যুক্তিশক্তির কাছে বলার ও ইহাকে ন্যায়ানুগভাবে সমর্থন করার প্রয়োজন। ষড়দর্শন এই বিশাল পরিশ্রমের ফল। অবশ্য নেতিবাদের প্রবল স্রোত বৌদ্ধমত এসেছিল কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় নেতিবাদ যেমন কিছু সময়ের জন্য আধ্যাত্মিকতা ধ্বংস করেছিল এখানে বৌদ্ধমতকে তেমন আধ্যাত্মিকতা ধ্বংস করতে দেওয়া হয়নি আর তা যে সম্ভব হ'য়েছিল তার কারণ ভারতীয় মানসিকতার উপর দার্শনিকদের এই অবদানের বিশাল ও অটল প্রভাব; আর এই প্রভাব এত দৃঢ় ছিল যে নেতিবাদের মহান্ আচার্যেরাও---কারণ বৌদ্ধদের তুলনায় জড়বাদী বৃহস্পতি অস্বীকারে শিশু ও দুর্বল ছিলেন--এই বিশিষ্ট ভারতীয় উপলব্ধি থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি যে প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভূতিই অস্তিত্বের ভিত্তি, পরাক্-বৃত্ত অনুভূতি ঐ অস্তিত্বের শুধু এক বাহ্য সংজ্ঞা।

কিন্তু বুদ্ধিসম্বন্ধীয় সুব্যবস্থার এই যে বিশাল কর্ম অতুলনীয় ভাবে সূক্ষ্ম, আত্ম-আয়ত্ত ও সফল হ'য়েছিল, ও এখন ভারতীয় মানসিকতার পরম গৌরব ও চরম উৎকর্ষ ব'লে বিবেচিত হয় তা বিস্ময়কর ও প্রয়োজনীয় হ'লেও বৈদান্তিক সত্যের দিক থেকে ইহার তিনটি প্রধান অসুবিধা ছিল।

(অসম্পূর্ণ)

ঈশাবাস্যম্

ঈশোপনিষদ্ তার প্রারম্ভেই সোজা সেই সমস্যার মূলে চলে যায় যার সমাধানে ঋষি প্রবৃত্ত হ'য়েছেন; আমাদের অস্তিত্ব যে দুটি মহত্তম সংজ্ঞা দিয়ে গঠিত বলে মনে হয় তা নিয়েই তিনি তৎক্ষণাৎ শুরু করেন এবং আটটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পর্যাপ্ত ও সমুজ্জ্বল পদের দ্বারা গঠিত এক স্মরণীয় বাক্যে তাদের সম্মুখীন হন এবং তাদের স্থাপিত করেন তাদের যথার্থ ও শাশ্বত সম্বন্ধে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। ঈশ ও জগৎ, ভগবান ও প্রকৃতি, চিৎ-পুরুষ ও জগৎ--ইহারাই সত্তার দুটি মেরু যাদের মধ্যে আমাদের চেতনা ঘোরে। এই দ্বিবিধ বা দ্বয়াত্মক সদ্-বস্তুই অস্তিত্ব, জীবন, মানুষ। সনাতন তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে একক আসীন হ'য়ে সদা-চঞ্চল বিশ্বকে ও ইহার গতির সেই সব অগণনীয় আবর্ত ও গ্রন্থি ব্যেপে থাকেন যার প্রতিটিকে আমরা এক বিষয় বলি আর যাদের সকলের মধ্যেই একমাত্র ঈশ্বরই বহুলভাবে অধিবাসী। দীপ্তিমান্ সব সূর্য থেকে গোলাপফুল ও ধূলিকণা পর্যন্ত, জ্যোতির্ময় বা অন্ধকারময় জগতের মধ্যে ভগবান ও অসুর থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষ ও মানুষ যাকে চিন্তা না ক'রেই পদদলিত করে সেই কীট পর্যন্ত--সবকিছুই তাঁর মন্দির ও প্রাসাদ। মন্দিরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতা তাঁরই, প্রাসাদের ভিতর উন্মুক্ত গৃহস্বামী তাঁর। তাঁরই জন্য এবং তাঁর সত্তার বহুত্ব ও ঐক্য উপভোগের জন্য সকল কিছুর সৃষ্টি, তাদের অস্তিত্বের অন্য কোন হেতু তাদের নেই। ঈশ্বরের দ্বারা নিবাসের জন্যই এই সব কিছু--'জগতীর' মধ্যে (গতিমতীর মধ্যে) যা কিছু 'জগৎ' গতিমান্ সেসব কিছু।

মানবজাতি মনে হয় যে সব দুর্গতির এক চিরন্তন বন্দী ও বলি এবং যেসব থেকে মনে হয়, তার উদ্ধার সম্ভব নয় তা থেকে মুক্ত এক-জীবনের, অর্থাৎ পৃথিবীর উপর এক সম্পূর্ণ সুষ্ঠু জীবনের সমস্যার সমাধান, বেদান্তবাদীদের বিশ্বাসে, সম্ভব হবে কেবল তখনই যখন আমরা ফিরে যাই অস্তিত্বের মূল প্রকৃতিতে; কারণ একমাত্র সেখানেই আমরা পেতে পারি অশুভের মূল এবং প্রতিকারের সত্য। এখানে তাদের বলা হ'য়েছে

দুটি কথায়--ঈশ ও জগৎ। অধিবাসী হ'লেন ঈশ্বর; এই সত্যের মধ্যেই, আমাদের মনের দ্বারা এই জ্ঞানের মধ্যেই, আমাদের সমগ্র প্রকৃতি ও সত্তার দ্বারা ইহার উপলব্ধির মধ্যেই আছে অশুভের যে বলি তার সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর যে বন্দী তার মুক্তির উপায়। অপর পক্ষে প্রকৃতি হ'ল এক চঞ্চল ও অস্থির গতি কিন্তু তাকে ধরে থাকে তার বিশেষ সব গতির নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন বিধানের স্থিরতা। প্রকৃতির এই অধীনতা ও অস্থিরতাই আমাদের বন্ধনদশা, মৃত্যু, সংকীর্ণতা ও কষ্টভোগের রহস্য। আমরা যারা প্রকৃতির গুণক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখি যদি তার বিভ্রান্তকারী মায়া থেকে মুক্তি পেতে চাই তাহ'লে আমাদের কর্তব্য হবে আমাদের অস্তিত্বের অন্য মেরু যে বিশেষণহীন চিৎ-পুরুষ বা ভগবান তাঁকে উপলব্ধি করা। আমাদের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে উঠে আমরা মুক্ত হই এবং উদ্ধার পাই জগতের বন্ধন ও মৃত্যুর পাশ থেকে। কারণ ভগবানই মুক্তি, ভগবানই অমৃতত্ব।" মৃত্যুং তীর্ত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে"। মৃত্যু পার হ'য়ে আমরা উপভোগ করি অমৃতত্ব।

প্রকৃতি ও চিৎ-পুরুষের, জগৎ ও ভগবানের এই যে সম্বন্ধের উপর ঋষি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলছেন যে প্রকৃতি হ'ল প্রাসাদ আর ভগবান হ'লেন অধিবাসী তা তাদের ব্যবহারিক সম্বন্ধ, তাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ নয়। চিন্ময় অস্তিত্ব হ'ল ব্রহ্ম, এক ও অবিভাজ্য, চিৎ-পুরুষ ও প্রকৃতি, জগৎ ও ভগবান এক; "অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ"--তারা এক অচঞ্চল অথচ মনের চেয়ে দ্রুতগামী। কিন্তু জীবনের জন্য তা ইহা বদ্ধই হ'ক আর মুক্ত হ'ক আর বন্ধনদশা থেকে মুক্তির জন্য অগ্রসর হ'তে হ'লে এই একককে সর্বদাই ধারণা করতে হবে এক দ্বিবিধ বা দ্বয়াত্মক সংজ্ঞা হিসাবে যাতে ভগবান হ'লেন প্রকৃতির বিপরীত দিক আর প্রকৃতি হল ভগবানের সম্মুখ দিক, আমাদের সচেতন অস্তিত্ব। এই যে পার্থক্য তা চিৎ-পুরুষ নিজেই করেছেন তাঁর আপন সত্তায় আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হ'য়েছে তাকে ঋষি এক কথায় বলছেন, "বাস্যম্"; ভগবান তাঁর নিজের সত্তা নিক্ষেপ করেছেন বিশ্বের দেশগত ও কালগত গতির মধ্যে তাঁর চঞ্চল, প্রসারিত আত্ম-চেতনার এমন সব বিভিন্ন রূপ নির্মাণ ক'রে যে সবকে তিনি মনে করেন তাঁর নিশ্চল ও সনাতন, অধিকার-কারী ও উপভোগকারী আত্ম-চেতনা থেকে পৃথক ব'লে যাতে তিনি অন্তঃপুরুষরূপে, ভোক্তারূপে এমন এক পরাক্‌বৃত্ত অস্তিত্ব পেতে পারেন যা তিনি দেখতে,

অধিকার করতে ও উপভোগ করতে পারেন, তিনি তাঁর আত্ম-প্রাসাদের গৃহস্বামী তার আত্ম-মন্দিরের দেবতা তাঁর আত্ম-সাম্রাজ্যের সম্রাট। জগৎ এমন এক জড়ীয় খোল নয় যার মধ্যে চিৎ-পুরুষ বদ্ধ আছেন অথবা চিৎ-পুরুষ বিষয়সমূহের মধ্যে জালবদ্ধ এমন কোন ভ্রাম্যমাণ শ্বাসবায়ু নন যাঁর কাছে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত বিষয়টি এক বন্দীশালা। অন্তর্বাসী ভগবান তাঁর সব সৃষ্টির ঈশ্বর, তিনি তাদের দাস বা বন্দী নন। যেমন গৃহস্বামী তার সব বাসগৃহের প্রভু এবং ইচ্ছামত সে সবের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং সে সব থেকে বাহির হতে পারেন, যা তিনি নির্মাণ করেছেন তা যখনই তাঁর কাছে আর সুখকর হবে না অথবা তাঁর প্রয়োজনের উপযোগী থাকবে না তখনই তিনি তা ভেঙে ফেলতে পারেন, তেমন চিৎ-পুরুষও ইচ্ছামত তাঁর সব দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে ও সে সব থেকে বাহির হতে পারেন এবং এই বিশ্বের মধ্যে যা খুসী তা নির্মাণ করার, ধ্বংস করার ও পুনর্গঠন করার ক্ষমতা তাঁর আছে। এই সমগ্র বিশ্বকেই তিনি যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস করতে এবং আবার সৃষ্টি করতে পারেন। ভগবান বদ্ধ নন; তাঁর সব সৃষ্টির তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অপ্রতিহত প্রভু।

'ঈশ', এই কথাটি ইচ্ছা ক'রেই বৈদান্তিক ভাবনার এই মহান্ বিষয়ের প্রারম্ভেই দেওয়া হ'য়েছে যেন ইহাই আধিপত্য করবে তার সকল ছন্দের প্রধান সুর হিসাবে। উপনিষদের আঠারটি শ্লোকে যা সব পরে বলা হ'য়েছে সেসব কিছুর চাবিকাঠি ইহা। ইহা যে শুধু বিশ্ব সম্বন্ধে সকল যান্ত্রিক মত খণ্ডন ক'রে বিষয়সমূহের অন্তঃস্থ বিশ্বাতীত পুরুষের পূর্ব-অস্তিত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, মহিমা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে তা নয়, ইহা সকল দেহের মধ্যস্থ চিৎ-পুরুষের সহিত বিশ্বের ঈশ্বরকে অভিন্ন ক'রে মানবের অন্তঃ-পুরুষেরও মহত্ত্ব, স্বাধীনতা ও গূঢ় সর্বশক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠা করে যদিও মনে হয় এই অন্তঃপুরুষ এখানে ঘুরে বেড়ায় এইরূপ কষ্টের সহিত জড়িত ও বিভ্রান্ত হ'য়ে। তার প্রকৃতির সকল আবরণের পশ্চাতে মানবের মধ্যস্থ অন্তঃপুরুষও প্রভু, সে দাস নয়, সে বদ্ধ নয়, সে মুক্ত। শোক, মৃত্যু ও সংকীর্ণতা, এই সব এমন কোন ক্রিয়াব্যাপারের যন্ত্র যা সে তার নিজের আনন্দের জন্য সার্থক করার উদ্দেশ্যেই এখানে রয়েছে; সে তাদের হ্রাস করতে পারে, বর্জন করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে। তাহ'লে যদি মনে হয় যে আমরা যেন আবদ্ধ আমাদের মন ও দেহের দৃঢ় প্রকৃতির দ্বারা,

দৃশ্যমান জগতের প্রকৃতির দ্বারা, হর্ষ ও শোকের, সুখ ও দুঃখের, বিভিন্ন দ্বন্দ্বের দ্বারা, কার্যকারণের শৃঙ্খলের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন শৃঙ্খল বা নিগড় বা বন্ধনের দ্বারা, তাহ'লে সে বন্ধনদশা শুধু এক প্রতিভাস, ইহার বেশী কিছু হ'তে পারে না। ইহা মায়া, বন্ধনদশার এক ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি, অথবা ইহা লীলা, স্বেচ্ছায় বরণ করা বন্ধনদশার খেলা। যেমন শিশু ভান করে যে সে এই বা ঐ আর তার কার্যকলাপের সহিত নিজেকে এক করে তেমন পুরুষ, এই অন্তঃস্থ দিব্য অধিবাসীও মনে হয় তার স্বাধীনতা ভুলে যান, কিন্তু তিনি ভুলে গেলেও স্বাধীনতা তবু রয়েই যায়, ইহা স্বাধিষ্ঠিত এবং সেজন্য অবিচ্ছেদ্য। প্রতিভাস ছাড়া ইহা কখনই নষ্ট হয় না, আর এমন কি প্রতিভাসের মধ্যেও ইহাকে ফিরে পাওয়া যায়। জগদ্-অস্তিত্বের লীলা শুধু দাসত্বের লীলা নয়, ইহা সমানভাবেই স্বাধীনতা এবং দাসত্ব থেকে মুক্তিরও লীলা।

(অসম্পূর্ণ)

কেন উপনিষদ্

প্রাক্-কথন

যেমন ঈশ উপনিষদ ভগবান ও জগতের সমস্যা নিয়ে এবং সেজন্য আধ্যাত্মিকতা ও সাধারণ মানুষী ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে ব্যাপৃত, তেমন কেন উপনিষদ ব্যাপৃত ভগবান ও অন্তঃপুরুষের সমস্যা নিয়ে এবং অনন্ত শক্তির গতিবিধি ও বিশ্বজনীন সংকল্পের আধিপত্যের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের সামঞ্জস্য স্থাপনে। আমরা এখানে এই বিশ্বে বিভিন্ন অনধীন বিষয় হিসাবে নেই। স্পষ্টতঃই আমরা এমন সীমিত জীব যাদের সংঘর্ষ হ'চ্ছে অন্য সব সীমিত জীবের সহিত, জড় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সহিত, এবং সেই জড়াতীত প্রকৃতিরও বিভিন্ন শক্তির সহিত যাদের কথা আমরা জানতে পারি, অবশ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, তবে মনের দ্বারা। উপনিষদ ধরে নেয় যে আমরা অন্তঃপুরুষ প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত শুধু কতকগুলি দেহ নই——এই প্রশ্নের ভিতর ইহা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যস্থ এই অন্তঃপুরুষের সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক থাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, প্রাণবত্তার মাধ্যমে, মনের মাধ্যমে। ইহা তার বিভিন্ন করণের জালে জড়িত, ভাবে তারাই শুধু আছে অথবা তাদের ক্রিয়ার সহিত নিজেকে অভিন্ন করে সেই ক্রিয়াতে মগ্ন থাকে——নিজের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিজেকে ভুলে যায়। ইহাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনা, ইন্দ্রিয়গত এই জীবনের উর্ধ্বে ইহাকে উত্তোলন করা যাতে এই জগতের মধ্যে বাস করার সময়েও ইহা নিজেকে ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াকে সর্বদাই স্থাপন করবে সেই পরতর বিশ্বাত্মক আত্মা ও দেবতার কাছে যা আমরা সকলেই হই আমাদের সত্তার চরম সত্যে——এই উদ্দেশ্যে যে আমরা মুক্ত হ'তে পারি, নমনীয় ও হৃষ্ট হ'তে পারি, অমর হ'তে পারি—— ইহাই কেন উপনিষদের ঋষির লক্ষ্য। কি প্রণালীতে তিনি তাঁর বক্তব্য-বিষয় এবং তাঁর বিশাল যুক্তিধারার মধ্যে প্রধান দার্শনিক দিকগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট ক'রে তা প্রতিপন্ন করেন তা-ই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করাই, এই টীকার উদ্দেশ্য। অনন্তের নিকট প্রপত্তি ও আত্ম-সমর্পণের এই প্রাচীন বাণীর পূর্ণ উপলব্ধির জন্য অনেক কিছু বলা যায় এবং বলা উচিতও,

কিন্তু তা রাখা হ'ল আরো বিস্তৃত ও বলিষ্ঠ গ্রন্থে বলবার জন্য। মূল-গ্রন্থের সঠিক তাৎপর্য ও অর্থের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যের সহিত ব্যাখ্যা করা--ইহাই বরাবরের মতো এখানেও আমার রীতি হবে।

প্রথম ভাগ

আত্মা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়

"কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, কার দ্বারা নিযুক্ত ও প্রেরিত হ'য়ে মন তার লক্ষ্যে পড়ে, আর বিভিন্ন প্রাণিক শক্তির প্রধানই বা কার দ্বারা তার সক্রিয়তায় যুক্ত হ'য়ে এগিয়ে চলে? এই যে কথা মানুষ বলে তা কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর কোন দেবতা কর্ণ ও চক্ষুকে নিযুক্ত করেন তাদের বিভিন্ন কাজে? শ্রোত্রের মধ্যে যা শ্রোত্র, মনের মন, পদের পশ্চাতে যা বাক্ সে-ও প্রাণশক্তির প্রাণ, দর্শনের অন্তঃস্থ দৃষ্টি; ধীরমতি পুরুষরা এইসব করণ থেকে মুক্ত হন এবং এই জগৎ অতিক্রম ক'রে তাঁরা অমর হন।... সেখানে চক্ষু যায় না, যায় না বাক্য ও মনও; আমরা ইহাকে জানি না, আর যুক্তির দ্বারা আমরা স্থির করতে পারি না যে কেমন ক'রে ইহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায়; কারণ বাস্তবিকই ইহা বিদিত থেকে অন্য এবং অবিদিতের উজানে; তা-ই আমরা শুনেছি আমাদের পূর্বগামী পুরুষদের কাছ থেকে যাঁরা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন এই ব্রহ্মকে। বাক্যের দ্বারা যা প্রকাশিত হয় না কিন্তু যার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয় তা-কেই তুমি জেন বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ ব'লে, আর এই তাকে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা মনের দ্বারা চিন্তা করে না, বরং যার দ্বারা মন নিজেই উপলব্ধ হয়, তাকেই তুমি জেন বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ ব'লে, আর এই তা-কে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা চক্ষুর দ্বারা দেখে না বরং যার দ্বারা লোকে দৃশ্য বিষয়সমূহ দেখে তা-কেই তুমি জেন বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ ব'লে, আর এই তা-কে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে না, বরং যার দ্বারা শ্রোত্র কর্ণের মাধ্যমে জ্ঞানের অধীন হয় তা-কেই তুমি জেন বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ ব'লে, আর এই তা-কে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা জীবিত থাকে না বরং যার দ্বারা শ্বাসবায়ু হ'য়ে ওঠে পুঞ্জীভূত প্রাণশক্তি, তাকেই তুমি জেন বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ ব'লে আর এই তাকে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে।"

১

যে প্রশ্নটি নিয়ে উপনিষদের চিন্তাধারা শুরু হয় তা বুঝতে হ'লে, দেহের মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াবৃত্তির উপাদানস্বরূপ যে ইন্দ্রিয়সংবিৎ, প্রাণ, মন ও ভাবনারাজি সেই সব বিষয় সম্বন্ধে বৈদান্তিক মনস্বীদের ভাবনা আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজনীয়। ইহা লক্ষণীয় যে এই উপনিষদে দেহের কথা এবং দেহ যার অভিব্যক্তি সেই জড়তত্ত্বের কথা উল্লেখও করা হয় নি। ঋষি মনে করেন যে জিজ্ঞাসুর জন্য এপর্যন্ত জড়ের সমস্যার সমাধান এই হয়েছে যে সে আর চেতনার শারীরিক অবস্থাকে মৌলিক কিছু বলে মনে করে না এবং ইহাকে আর চেতনা থেকে পৃথক কিছু ব'লে গণ্য করে না। এই সমগ্র জগৎ শুধু চিন্ময় পুরুষ। বেদান্তবাদীর কাছে জড় হ'ল এই চিন্ময় পুরুষের বহু অবস্থার---বস্তুতঃ বহু গতিবিধির মধ্যে একটি---এমন একটি অবস্থা যাতে এই বিশ্বজনীন চেতনা নিজের মধ্যেই, ভিতরে ও ধাতু হিসাবে উহা থেকেই বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি ক'রে রূপের ধাতু হওয়ার ভাবনায় একাগ্রতায় মগ্ন হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ইহা তখনো সচেতন কিন্তু রূপ হিসাবে ইহা আর আত্ম-সচেতন থাকে না। জড়ের মধ্যস্থ পুরুষ, মাটির ঢেলা, পাথর প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞাতা রূপের মধ্যে সংবৃত্ত থাকেন, তাঁর প্রকৃতির বা ক্রিয়ার প্রকারের এই গতিবিধির মধ্যে নিজেকে ভুলে যান এবং পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানেই হারিয়ে ফেলেন তাঁর চিন্ময় সত্তা ও আনন্দের আত্মাকে। তিনি নিজের অধিকারে থাকেন না; তিনি আত্মবান্ নন। আত্মবান্ হ'তে হ'লে তিনি যা হারিয়েছেন তা-ই তাঁকে ফিরে পেতে হবে আর তার অর্থ এই যে তিনি জড়ের ভিতর নিজের কাছ থেকে যা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা-কেই জড়ের ভিতর তার ক্রমশঃ জানা দরকার। তিনি যা সংবৃত্ত করেছেন তা-ই তাকে বিকশিত করতে হবে। জ্ঞানের মধ্যে আমাদের পূর্ণ ও প্রকৃত আত্মার এই পুনর্প্রাপ্তিই বিবর্তনের একমাত্র অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইহা কোন বিবর্তন নয়, ইহা এক অভিব্যক্তি। যা আমরা হ'য়ে উঠি তা-ই আমরা আছি ইতিপূর্বেই। জড়ের মধ্যে যা এখন ভবিষ্যৎ তা ইতিপূর্বেই চিৎ-পুরুষের মধ্যে বর্তমান।

কারণ যদি বৈদান্তিক মত ঠিক হয় তাহ'লে যাকে আমরা জড় বলে মনে করি তা শুধু জড় নয়, শুধু নিশ্চেষ্ট অস্তিত্ব নয়, নিজের নিশ্চেষ্টতার দ্বারা চিরন্তনভাবে বদ্ধ নয়। এমন কি জগতের সম্বন্ধে জড়বাদীর মতেও

জড়কে যা মনে হয় তা ইহা হ'তে পারে না, ভারতীয়রা যাকে প্রকৃতি বলে সেই শক্তির এক রূপ বা গতিবৃত্তি ইহা। উপনিষদ্ বলে যে এই শক্তি তার ক্রিয়ায় অনেকগুলি তত্ত্ব দিয়ে গঠিত আর ইহার যোগ্যতাতেও সেই সব তত্ত্বে সমর্থ আর এই তত্ত্বগুলির মধ্যে জড়, মন ও প্রাণ ইতিপূর্বেই এই জগতে ব্যক্ত ও সক্রিয় হয়েছে, আর যেখানে এই সব তত্ত্বের একটি সক্রিয়, সেখানে অন্যেরাও ইহার মধ্যে সংবৃত্ত হ'য়ে থাকবেই; অর্থাৎ, অন্যভাবে বলা যায় যে, শক্তি তার আপন সব তত্ত্বের একটি হিসাবে, তার গতিবিধির একটি হিসাবে সক্রিয় হ'য়ে স্বগতভাবে ঐ গতিবিধির মধ্যে অন্যদের বিষয়েও সমর্থ। যদি পাতায়, মাটির ঢেলায়, পাথরে ও ধাতুতে প্রাণ ও মন সক্রিয় নয় তাহ'লে তার কারণ এই নয় যে তারা উপস্থিত নয়, তার কারণ এই যে তাদের এখনও সম্মুখে আনা হয়নি ('প্রকৃত') এবং ক্রিয়ার জন্য সংহত করা হয় নি। তাদের প্রচ্ছন্ন রাখা হ'য়েছে সেই চিৎ-সত্তার পশ্চাদ্-পটে যা পাতা, পাথর বা মাটির ঢেলা; যেমন ঋগ্বেদ বলবে, তারা এখনো "বীলু" নয়, তারা 'গূহ', তারা ব্যক্ত নয়, তারা অব্যক্ত! যা ঠিক এখনই বা এই স্থানে বা ঐ স্থানে ব্যক্ত নয় বা সক্রিয় নয় তা যে সে সময় ও সে স্থানে নেই তা মনে করা বড় ভুল হবে। প্রচ্ছন্নতা ধ্বংস নয়; ক্রিয়াহীনতা সত্তাহীনতা নয় অথবা গূঢ়তা ও নিষ্ক্রিয়তা মিলেও অনস্তিত্বও নয়।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেমন করে আমরা জানি যে পাতায়, ঢেলায় বা পাথরে পুরুষ বা জ্ঞাতা আছেন তাহ'লে বৈদান্তিকের উত্তর এই যে ঋষির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া এবং সেই সব প্রত্যক্-বৃত্ত ও পরাক্-বৃত্ত অনুভূতি ছাড়াও যাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাথার্থ্য যুক্তিবৃত্তির মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, জ্ঞাতা যে জড়ের মধ্যে আবির্ভূত হন তা থেকেই প্রমাণ হয় যে তিনি নিশ্চয়ই সকল সময়ই সেখানে ছিলেন। আর যদি তিনি জড়ের কোন রূপের মধ্যে থাকেন তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই সাধারণভাবে বা সকলকিছুর মধ্যেও থাকবেন; কারণ প্রকৃতি একই, ইহা কোন স্বরূপ-গত বিভাগ জানে না, ইহা জানে শুধু রূপ, অবস্থা ও অভিব্যক্তির প্রভেদ। এই জগতের মধ্যে বহু ধাতু নেই, আছে একটিমাত্র ধাতু যা বহুরূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একাগ্র, বহু প্রাণ নেই, আছে শুধু একটিমাত্র প্রাণ যা বহু দেহের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সক্রিয়, বহু মন নেই, আছে শুধু একটিমাত্র মন যা বহু দেহধারী প্রাণবত্তার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বুদ্ধিমান।

একটি মত আছে—আর ইহা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় গ্রহণযোগ্য যে প্রাণ ও মন হ'ল কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে জড়েরই বিশেষ গতিবিধি মাত্র, এবং সেজন্য, তারা যে জড়ের মধ্যে সংবৃত্ত চেতনার অনধীন জড়াতীত গতিবিধি তা মনে করার প্রয়োজন নেই, জড় যে সব জড়ীয় ক্রিয়াকলাপে সমর্থ শুধু সেই সব সুপ্ত ক্রিয়া হিসাবেই তাদের মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই মত শুধু ততদিনই সমর্থনযোগ্য যতদিন ইহা দেখা যায় যে মন ও প্রাণ শুধু এই দেহেই থাকতে পারে এবং যেমন দেহের নাশ হয় তেমন তাদেরও অবসান হয়, তারা শুধু দৈহিক বিভিন্ন করণের মাধ্যমেই জানতে পারে এবং তাদের কাজ সম্ভব কেবল কতকগুলি জড়ীয় গতিবিধির নিয়মানুসারে ও তাদের ফলে। উপনিষদের প্রাজ্ঞ ঋষিরা যোগী হিসাবে তাদের আপন অনুভূতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে এই সব সীমার কোনটিই প্রাণ ও মনের প্রকৃতিতে স্বগত নয়। যে মন ও প্রাণ এই দেহের মধ্যে থাকে তারা ইহা থেকে চলে যেতে পারে পূর্ণ অবস্থায় আর তখনো সংহত থাকে এবং ইহার বাহিরে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম; এমন কি জড়ীয় জিনিসও মন জানতে পারে ভৌতিক চক্ষু, স্পর্শ বা কর্ণের সাহায্য বিনাই; দেহের বিভিন্ন অবস্থার বা গতি-বিধির দ্বারা প্রাণ নিজেই যে সীমিত হ'তে বাধ্য তা নয় আর মন সাধারণতঃ সীমিতও নয়, যদিও সাধারণতঃ ইহা তাদের প্রভাবাধীন। আমাদের অনুভূতিতে ইহা সর্বদাই তাদের ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম এবং প্রায়ই যায়ও। দেহের বিভিন্ন অবস্থাকে ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। সুতরাং যে জড়ের মধ্যে মন বাস করে সেখান থেকে সে স্বাধীনতা পেতে সক্ষম—সত্তায় স্বাধীনতা, জ্ঞানে স্বাধীনতা, শক্তিতে স্বাধীনতা।

এ কথা সত্য যে দেহের মধ্যে কাজ করার সময়, মনের প্রতি গতিধি দেহের মধ্যে কোন ফল উৎপাদন করে এবং সেজন্য কোন অবস্থা বা গতিবিধিও উৎপাদন করে, কিন্তু ইহা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় না যে মন জড়ের কোন জড়ীয় ফল, যেমন ইহা ঠিক নয় যে বাষ্প যন্ত্রের যান্ত্রিকফল। এই যে জগতের মধ্যে মন বর্তমানে বিচরণ করছে, যে ঘটনাপুঞ্জের সহিত আমরা প্রকাশ্যভাবে সম্পর্কিত তা এক জড়ের জগৎ আর প্রথমে একথা বলা ঠিক হবে যে এখানে 'অন্নম্ বৈ সর্বম্'; সব কিছুই জড়। ইহার মধ্যে মন ও প্রাণ জেগে ওঠে এবং নিজেদের প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। সুতরাং যখন তারা ইহার মধ্যে কাজ করে তখন ইহার

উপর তাদের কোন ফল হবেই এবং ইহার মধ্যে তাদের দ্বারা কোন গতি-ধিও উৎপন্ন হবে, ঠিক যেমন বাষ্পের কাজে ইহার শক্তি যে যন্ত্রের মধ্যে সক্রিয় হয় সেই যন্ত্রের মধ্যে কিছু ফল হ'তে বাধ্য। মন ও প্রাণও তাদের বিশেষ কাজের জন্য দৈহিক যন্ত্রের কোন কোন বিশেষ অংশ ব্যবহার করে আর যখন এই অংশগুলির কিছু ক্ষতি হয় তখন প্রাণ ও মনের কাজও অনুরূপভাবে ব্যাহত হয়, কষ্টকর হ'য়ে ওঠে, অথবা কিছু সময়ের জন্য অসম্ভব হ'য়ে পড়ে—আর এমন কি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে যদি না প্রাণ ও মনকে সময়, সংবেগ ও সুবিধা দেওয়া হয় নতুন অবস্থার সহিত নিজেদের পুনরায় খাপ খাইয়ে হয় পুরানো অংশটিকে নতুনভাবে তৈরী করতে, নয় তাকে সারিয়ে নিতে, নয় কাজের নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে। ইহা স্পষ্ট যে সময়, সংবেগ ও সুবিধার এইরূপ যোগাযোগ সাধারণতঃ ঘটে না আর এমন কি প্রায়ই ঘটে না—আর এরূপ ঘটা সম্ভবও নয় যদি না লোকের বিশ্বাস থাকে, নিষ্ঠা থাকে—যদি না লোকে পূর্ব থেকে জানে যে এরূপ কাজ করা সম্ভব অথবা উপায় অনুসন্ধানে নিজেদের অভ্যস্ত করেছে। এখন যেসব দেহ ডুবে গিয়ে "প্রাণহীন" হয়—বস্তুতঃ জগতে কিছুই প্রাণহীন নয়—সে সবকে এখন পুনর্জীবিত করা যায় কারণ লোকে বিশ্বাস করে ও জানে যে ইহা করা সম্ভব এবং বর্তমানে সকল জড়ের মধ্যে যে অসংহত প্রাণ বর্তমান তা থেকে সংহত মন ও প্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সময় পাবার আগেই তা করার উপায়ও বাহির করেছে। সকল শক্তি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই তা-ই হয়। এই সব ততদিন অসম্ভব যতদিন আমরা বিশ্বাস করি না যে তারা সম্ভব এবং তাদের যথার্থ প্রণালী বাহির করার জন্য কোন কষ্ট করি না অথবা মনের স্বচ্ছতা পাই না।

কখন কখন ইহা বিশ্বাস করা হয়—আর তা মত হিসাবেও উপস্থাপিত হয় যে প্রাণ ও মন এই জগতে নেমে আসে—অন্য এক জগত থেকে যেখানে তারা আরো স্বচ্ছন্দ। যদি জগৎ বলতে এই জড় বিশ্বের মধ্যে অন্য কোন তারকা বা ভুবন না বোঝায় বরং বিশ্বব্যাপী চেতনার মধ্যে অন্য কোন ভুবন বোঝায় তাহ'লে বেদ ও উপনিষদের অনুসরণকারী বৈদান্তিক দ্বিমত হবে না। ইহা মনে করা যেতে পারে যে এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে অন্য কোন তারকা বা রাজ্যের মধ্যে প্রাণ ও মন আরো স্বাধীন এবং সেজন্য স্বচ্ছন্দ হবে; কিন্তু তখনো তারা এমন এক জগতে

সক্রিয় হবে যার ভিত্তি ও প্রকৃত ধাতু হ'ল জড়। সুতরাং তার ক্রিয়ার অবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন হবে না অথবা এখানে তাদের উৎপত্তির সমস্যার আরো ভাল কোন সমাধান হবে না। কিন্তু ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে ঠিক যেমন এখানে শক্তি নিজেকে জড়ের মধ্যে সংহত করে তার মৌলিক আধেয় ও গতিবিধি হিসাবে, সেইরকম চেতনার অন্য কোন রাজ্য থাকাই সঙ্গত––আমাদের প্রাচীন মনস্বীদের জ্ঞানে ও অনুভূতিতে প্রমাণ হয় যে এরূপ রাজ্য আছে––যেখানে শক্তি নিজেকে প্রাণের মধ্যে ও মনের মধ্যে সংহত করে তার মৌলিক আধেয় ও গতিবিধি হিসাবে। আমাদের জগতের সহিত এরূপ সব জগতের কাল ও দেশের মধ্যে কি সম্বন্ধ হবে তা এখানে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। ইহা সম্ভব যে এরূপ সব জগৎ থেকে প্রাণ ও মন প্রস্তুত ও সংহত হ'য়ে নেমে এসে এখানে জড়ের বিভিন্ন রূপের সহিত সংযুক্ত হয়; তবে এই অর্থে নয় যে ইহারা এইসব জড়ীয় রূপের মধ্যে স্থূলভাবে বাস করে এবং তখনই তাদের ব্যবহার করে, কিন্তু এই অর্থে যে ইহারা তাদের সংস্পর্শের আঘাতের দ্বারা জড়ের মধ্যে সুপ্ত প্রাণ ও মনকে জাগিয়ে তুলে সক্রিয়তায় প্রণোদিত করে। ইহা সম্ভব যে তখন জড়ের মধ্যস্থ প্রাণ ও মন মহত্তর সাহায্য ও সংবেগের প্রভাবে প্রাণের ব্যবহারের জন্য এমন এক স্নায়ুমণ্ডলী গঠন করবে এবং মনের ব্যবহারের জন্য স্নায়ুর মধ্যে প্রাণ-গতিবৃত্তির এমন শৃঙ্খলা গঠন করবে যা জড়ের মধ্যে প্রকাশ করবে সেই সব মহত্তর সংগঠনকে যেগুলি এখানে নেমে এসেছিল। বস্তুতঃ প্রাচীনরা বিশ্বাস করতেন যে––প্রতি সজীব রূপটি একটি একক সংহত ব্যক্তিত্ব হওয়ার ঘটনা ছাড়া––এখানে নিম্নে প্রাণ ও মনের সকল ব্যাপ্রিয়া ধারণ ও পোষণ করার জন্য প্রাণ ও মনের জগৎ থেকে এরূপ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এই কারণে যে অন্যথায় যে জগৎ ঠিকমত তাদের অন্তর্গত নয় বরং সম্পূর্ণ অন্য সব গতিবৃত্তির অন্তর্গত সেখানে তাদের প্রকাশ করা ও সুষ্ঠু করা দুরূহ হ'ত। দেব, দৈত্য, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, প্রভৃতির যে ভাবনার সহিত বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাস আমাদের মনকে পরিচিত করেছে ইহাই তার ভিত্তি ছিল। একথা মনে করার যুক্তি নেই যে এই জড়ীয় ভুবনের সকল জগতই সজীব বিষয়ের আবাস, বরং ইহাই সম্ভব যে ইহার ঠিক বিপরীত সত্য। জড়ের মধ্যে যে প্রাণ ও মন বিকশিত হয় তা হয় সম্ভবতঃ কষ্ট ক'রে এবং কোন বিশেষ নির্বাচিত স্থানে।

যদি অন্যরূপ হ'ত, যদি প্রাণ ও মন জড়ীয়রূপের মধ্যে প্রবেশ করত সংহত হ'য়ে অথবা পূর্ণশক্তিতে যেমন তারা হ'তে বাধ্য তাদের স্বকীয় জগত্যে, তাহ'লে এই সব রূপ তৎক্ষণাৎ সুষ্ঠুভাবে ও অন্য কোন বাধা না পেয়েই কাজ করতে শুরু করত। আমরা ক্রম-অভিব্যক্তির এই দীর্ঘ, ও শ্রমসঙ্কুল কর্মপ্রণালী দেখতাম না যা এত কষ্টকৃত, এত দুরূহ, এত ভীষণ সংঘর্ষের ও জড়ের মধ্যে গূঢ় সংকল্পের এরূপ এক বিরাট পরিশ্রমের ফল। সর্বত্রই আমরা রূপের এক ক্রম-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখি। এই যা সংহত হ'চ্ছে তা কি? প্রাণের বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য এক উপযুক্ত আধার, মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য এক উপযুক্ত আধার। যেমন বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে যে নির্জীব বিষয়সমূহে ও ধাতুতে এমন সব চাঞ্চল্য আছে যা প্রাণের চাঞ্চল্যের অনুরূপ, যেমন প্রাণিক সাড়া দেওয়া এবং সাড়া না দেওয়া, কিন্তু প্রাণবত্তার নিয়মিত গতিবৃত্তির জন্য কোন সুব্যবস্থা সংগঠিত হয় নি; সেজন্য ধাতু জীবন ধারণ করে না। উদ্ভিদের মধ্যে একটি প্রাণিক সুব্যবস্থা আছে, এমন কি বলা যায় যে স্নায়ুমণ্ডলীও আছে, কিন্তু যদিও উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে বলা যায় অচেতন মন, যদিও কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে এমন কি বুদ্ধিরও অস্পষ্ট গতিবৃত্তি আছে, তবু যে প্রাণব্যবস্থা সংহত হ'য়েছে তা শুধু রসপ্রবাহের উপযোগী, শুধু প্রাণের জন্য পর্যাপ্ত কিন্তু জড়ের মধ্যে মনের ক্রিয়াবলীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণের জন্য অর্থাৎ স্নায়ুশক্তির জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রাণের জন্য "আপঃ" পর্যাপ্ত, কিন্তু যে প্রাণ মন হ'তে সমর্থ তার জন্য প্রয়োজন "বায়ু"। কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রাণ অন্য এক ভিন্ন স্তরে আরো সুষ্ঠুভাবে সংহত আর যতই প্রাণীজগতের পর্যায়ে উর্ধ্বে আরোহণ করা যায় ততই প্রাণিশক্তির স্রোত বহনে সমর্থ স্নায়ুমণ্ডলী বিকশিত হয় যতদিন না তা মানবের মধ্যে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হয়। সুতরাং যে প্রাণ ও মন জড়ের মধ্যে জাগ্রত হয় এবং কষ্ট করে অভিব্যক্ত হয় তা-ই জড়ীয় জগতের সত্য, এমন কোন পূর্ব-প্রস্তুত প্রাণ নয় যা এই জড়ীয় জগতের নিজের যোগ্যতায় সম্পূর্ণ বিজাতীয়।

যদি বলা হয় যে প্রাণ বা মন জড়ে সংযুক্ত হ'য়ে আধার যোগ্যতর হবার সাথে অল্পে অল্পে তার মধ্যে প্রবেশ করে ও যে দেহ তার জন্য প্রস্তুত করা হ'চ্ছে তার মধ্যে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তার নিজস্ব বিষয় প্রদান করে তাহ'লে তা-ও সম্ভব ও বোধগম্য। যতই আমরা আত্ম-

জ্ঞানে উন্নতি করি, ততই বস্তুতঃ আমরা দেখতে পাই যে এমন এক বিশাল মানসিক ক্রিয়া আমাদের অধিকারভুক্ত যার এক অংশ মাত্র আমাদের জাগ্রত চিন্তায় ও বোধে অপূর্ণভাবে প্রকাশিত---যে অবচেতন বা অতিচেতন আত্মা প্রতিটি বিষয় সঞ্চয় করে, প্রতিটি বিষয় মনে রাখে, প্রতিটি বিষয় পূর্ব থেকেই দেখে, যা কিছু জ্ঞাতব্য সেসব একপ্রকারে জানে তার অধিকারে যাসব মিথ্যা ও যাসব সত্য সেসবই থাকে কিন্তু ইহা জাগ্রত মনকে জানতে দেয় তার পুঁজির সামান্য কিছু। সেইমত দেহের মধ্যে আমাদের প্রাণ হ'ল যে অমর প্রাণের আমরা নিশ্চিত অধিকারী তার এক আংশিক প্রকাশমাত্র। কিন্তু ইহাতে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে আমরা নিজেরা আমাদের সমগ্রতায় বা মূল অংশে দেহমধ্যস্থ প্রাণ বা মন নই, শুধু আমরা ঐ তত্ত্ব ব্যবহার করছি আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য অথবা জড়ের মধ্যে আমাদের খেলার জন্য। ইহাতে একথা প্রমাণিত হয় না জড়ের মধ্যে প্রাণ ও মনের কোন তত্ত্ব নেই। অপরপক্ষে একথা বিশ্বাস করার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে যে অনুরূপভাবে মন ও প্রাণের মধ্যে জড় সংবৃত্ত হ'য়ে আছে আর যেখানেই প্রাণ ও মনের গতিবিধি আছে সেখানেই ইহা নিজের জন্য দেহের এমন কোন রূপ বিকশিত করতে প্রবণ হয় যার মধ্যে ইহা নিজেকে দৃঢ়ভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে পারে। সুতরাং আমাদের মনে করা কর্তব্য যে প্রাণ ও মন অনুরূপভাবে জড়ের মধ্যে সংবৃত্ত ও সুপ্ত (স্বগত) এবং সেজন্য ইহাতে বিকশিত হবার যোগ্য অভিব্যক্তিতে সমর্থ।

তাহ'লে আমরা প্রাণ, মন ও জড়ের বিবিধ সম্বন্ধের বিষয়ে প্রাচীন বেদান্তবাদীদের মত জানলাম, আর আমরা এখন দেখতে পারি উপনিষদ সঠিক কি বলেছে প্রাণ ও মনের ক্রিয়াবলী সম্বন্ধে এবং বিষয়সমূহের অন্তঃপুরুষ যে ব্রহ্ম তাঁর সহিত তাদের সম্পর্ক বিষয়ে।

২

মন

যদি উপনিষদগুলি দার্শনিক কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু না হ'ত তাহ'লে তাদের সম্বন্ধে টীকা রচনায় কোন অংশের সাধারণ ভাবনা ব'লে ও আধুনিক ভাষায় ইহার আনুষঙ্গিক অর্থ প্রসারিত করে আমরা এখন যে

সব ভাবনা ধারণ করি তাদের উপর ইহার প্রভাবের কথা বললেই যথেষ্ট হ'ত, কারণ যদি তারা তাদের প্রাচীন ভাষায় মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির শুধু এমন সব সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করত যা সব এখনো পাওয়া যায় ও পরিচিত, তাহ'লে মূল বেদান্তগ্রন্থগুলির পদগুলির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জোর দিয়ে কোন লাভ হ'ত না। কিন্তু এই মহান গ্রন্থগুলি ভাবনার লিপিবদ্ধ বস্তু নয়; তারা বিভিন্ন অনুভূতির লিপিবদ্ধ বস্তু; আর ঐসব মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সাধারণ লোকের বাহ্য মনস্তত্ত্ব থেকে তত দূরে যত দূরে বিজ্ঞানের সব পরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সেই চাষীর সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে যে তার লাঙ্গল চালায় শুধু বাহ্যভাবে জানা মাটির মধ্য দিয়ে অথবা সেই প্রাচীন নাবিকের পর্যবেক্ষণ থেকে যে তার পোত চালায় প্রাথমিক নৌবিদ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় কতিপয় তারকার দ্বারা। উপনিষদগুলির প্রতি কথাটির উৎপত্তি এমন মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের গভীরতা থেকে যা আর আমাদের অধিকারে নেই এবং যা এমন সব আধ্যাত্মিক সত্যের চাবিকাঠি যা আমরা কষ্টকর কৃচ্ছ্রসাধনা ব্যতিরেকে আর পেতে সক্ষম নই। সুতরাং যেমন আমরা অগ্রসর হব তেমন প্রতি কথাটির যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের বিবেচনা করতে হবে ভাবনার মধ্যে ইহার কি স্থান, এবং সেই সব ভাবনা আবিষ্কার করতে হবে ইহা যার বাচনিক প্রতীক ছিল।

ইহা যে সততই প্রয়োজনীয় তা দেখা যায় কেন উপনিষদের প্রথম কথাটি থেকেই––"কেনেষিতং পততি প্রেষিতম্ মনঃ"। ঋষি মনের যে বর্ণনা দিচ্ছেন তা তার সম্পূর্ণতায় নয়, তিনি শুধু তার সেই ক্রিয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তিনি সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দেখেছেন এবং তাছাড়া যা সরাসরি নিয়ে যায় সকল মানসিক ক্রিয়ার গূঢ় উৎসের প্রশ্নে, তাদের অধ্যক্ষের ও সংবেগদায়ী বলের প্রশ্নে। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় ভাবনা ও সাধারণ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হচ্ছে "পততি, "পতিত হয়" এই কথাটির দ্বারা। যখন মন কাজ করে তখন তার স্বভাবই হ'ল সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া ও বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হওয়া।

মন সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক ধারণা অন্যরূপ; ইহার গতির ও সম্মুখদিকে মনোযোগের ক্রিয়া স্বীকার করলেও আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অপেক্ষা বরং ইহাদের গ্রহণ করাই তার স্বরূপগত ও সাধারণ ক্রিয়া। মানসিক কার্য সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা তাতে এই ধারণাকে দৃঢ় করারই সুবিধা হয়। যে স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক মননের ভৌতিক প্রণালী তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শারীর বিদ্যা জোর দিয়ে বলে যে মননের ক্রিয়ার গঠনে আছে অন্তঃসঞ্চালক ও বহিঃসঞ্চালক সব স্নায়ুর দুইটি ক্রিয়া। মন বিষয়ের উপর পতিত হওয়ার পরিবর্তে বিষয় পতিত হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় স্থানের উপর, অন্তঃ-সঞ্চালক স্নায়ুগুলি সেই সংঘাতকে বয়ে নিয়ে যায় সব মস্তিষ্ক কোশে আর তাদের জড়পদার্থে পরিবর্তন আসে, সূক্ষ্ম কেশরগুলি অভিঘাতে সাড়া দেয়, একটি বার্তা—–কোশ—–প্রজাতন্ত্রের সংকল্প—–ফিরে যায় বহিঃসঞ্চালক স্নায়ুগুলির দ্বারা, আর বোধের ঐ ক্রিয়া—–তা কোন বিষয়ের হ'ক অথবা কোন বিষয়ের ভাবনা হ'ক অথবা কোন ভাবনার ভাবনা, যা মনন ক্রিয়ার সার—–নিষ্পন্ন হয়। বাকী অন্য যাকিছু মন সম্পন্ন করে তা শুধু মস্তিষ্কের ঘিলুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও ইহার কেশরগুলির বিরামহীন ক্রিয়া যার সহিত থাকে সংহত জড়ের এই সব অত্যাশ্চর্য খণ্ড দ্বারা সঞ্চিত বিভিন্ন বোধের ও ভাবনার ভাণ্ডার। দৈহিক যন্ত্রের এই সব গতিবৃত্তিই সব—–ইহাই শারীরবিদ্যার কথা। কিন্তু ইহা প্রয়োজন হ'য়েছে... । ঐসব কীটাণুসম্বন্ধীয়···দ্বারা সৃষ্ট মনন-তরঙ্গের অথবা স্পন্দনের মত···যাতে মননের ফলগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যায়।

এক সম্মোহিত জগতের দ্বারা এই মত যতই ব্যাপকভাবে ও বিনীত-ভাবে গৃহীত হ'ক না কেন বৈদান্তিক ইহাতে আপত্তি করতে বাধ্য। তার অনুসন্ধান শুধু যে শারীরিক ক্রিয়ার, দৈহিক যন্ত্রের গতিবৃত্তির উপর নিবদ্ধ করেছে তা নয়, ইহা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ারও উপর, যে শক্তি যন্ত্রকে ধারণ করে তার গতিবিধিরও উপর নিবদ্ধ করেছে—–মন যা করে শুধু তার উপর নয়, যা করতে ইহার বিচ্যুতি হয় তারও উপর। পৃথক মানসিক গঠন-উপাদানের পরীক্ষণে ঐ সতর্ক বিশ্লেষণ ও বিচ্ছিন্নতার সাহায্যে তার পর্যবেক্ষণের দ্বারা সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে এসেছে। "পততি মনঃ" এই কথাটির মধ্যে ঋষির গভীর জ্ঞান সে সমর্থন করে। একটি প্রতিবিম্ব চোখের উপর পড়ে—–ইহা অবশ্যই স্বীকৃত, কিন্তু চোখের উপর প্রতিবিম্বের শুধু পতনেই মানসিক বোধ গঠিত হ'বে না, মনকে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে; কারণ যা দেখে তা চোখ নয়, মনই দেখে যন্ত্রস্বরূপ চোখের মাধ্যমে, ঠিক যেমন, যে সূর্য অন্যপ্রকারে অদৃশ্য তাকে দূরবীক্ষণ দেখে না, কিন্তু তাকে দেখে দূরবীক্ষণের পশ্চাতে জ্যোতির্বেত্তা। সুতরাং

প্রতিবিম্বের ভৌতিক গ্রহণই দৃষ্টি নয়, শব্দের ভৌতিক গ্রহণই শ্রবণ নয়। কারণ কতই না দ্রষ্টব্য বিষয় ও শব্দ আমাদের আক্রমণ করে, আমাদের অক্ষিপটে পড়ে, কর্ণের পর্দা স্পর্শ করে অথচ আমাদের জাগ্রত মননে তারা অসৎ! যদি বাস্তবিকই দেহ এক স্বয়ং-পর্যাপ্ত যন্ত্র হ'ত তাহ'লে তা হ'তে পারত না। সংঘাতকে প্রবেশ করতে দিতেই হ'ত, বার্তাকে অন্তঃসঞ্চালক স্নায়ুর দ্বারা ছুটতেই হ'ত, কোশগুলিকে অভিঘাত গ্রহণ করতে হ'ত, পরিবর্তন, সাড়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হ'ত। করা হবে, কি করা হবে না—এ সম্বন্ধে কোন স্বয়ং-পর্যাপ্ত যন্ত্রের কোন অভিরুচি নেই; বিকল না হ'লে ইহাকে তার কাজ করতেই হবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে অভিরুচি আছে, নির্বাচন আছে, অস্বীকার করার প্রভৃত ক্ষমতা আছে। যোগীদের ব্যবহারিক অনুসন্ধানের দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে অস্বীকার করার ক্ষমতা একান্ত হ'তে পারে (হয়) আর আমাদের মধ্যস্থ কিছুর এমন এক অপ্রতিহত ও বহুমুখী শক্তি আছে যার দ্বারা ইহা বোধ বা মননকে নির্বাচন করতে অথবা সম্পূর্ণ নিষেধ করতে সক্ষম, এমন কি ইহা নির্ধারণ করতেও সক্ষম যে যদি ইহা আদৌ সাড়া দেয় তাহ'লে কিভাবে ইহা সাড়া দেবে, আর এমন কি ইহা বিনা চক্ষুতেই দেখতে পায়, বিনা কর্ণেই শুনতে পায়। এমন কি ইওরোপীয় সম্মোহন বিদ্যাও অনুরূপ ঘটনা নির্দেশ করে। শারীরবিদ্যা অধীর হ'য়ে সত্যে পৌছতে চায় হ্রস্ব পথে আর তার প্রাথমিক সব আবিষ্কারে বিস্মিত হয়ে ব্যস্ত হয় তাদেরই আলোতে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে; সুতরাং তার সব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব নয়।

যেখানে প্রতিবিম্ব দেখা হয় না, শব্দ শোনা হয় না, সেখানে বুঝতে হবে যে তার কারণ হ'ল মন বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হয় না,—'ন পততি'। কিন্তু আমাদের আরো এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে কি সে বিষয় যা অন্তঃসঞ্চালক ও বহিঃসঞ্চালক স্নায়ুগুলির মধ্যে কি কাজ করে ও স্নায়ুগুলির মনোযোগ নিশ্চিত করে। আমরা দেখেছি যে ইহা শুধু ভৌতিক অভিঘাত নয়, স্নায়ুর মধ্যে দৈহিক জড়পদার্থের স্পন্দনমাত্র নয়। কারণ তা যদি হ'ত তাহ'লে প্রতিটি সংঘাতের বেলাতেই মনোযোগ আপনা-আপনি অনিবার্যভাবে নিশ্চয়ই আসত। বেদান্তবাদী বলে যে স্নায়ুমণ্ডলী হ'ল দেহের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়ার জন্য এক অতীব জটিল সংহত উপস্কর; তাদের মধ্যে যা বিচরণ করে তা প্রাণ, প্রাণতত্ত্ব, জড়ভাবাপন্ন, প্রকৃতিতে

বায়বীয় ('বায়ব্য') এবং সেজন্য চোখের কাছে অদৃশ্য কিন্তু জড়ের প্রাণ ও মনের প্রাণ, এই উভয়েরই সহিত ইহা আত্ম-অভিযোজনে এমন যথেষ্ট সমর্থ যে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে ইহা হ'য়ে ওঠে এক মিলন-স্থান বা সেতু। কিন্তু এই প্রাণতত্ত্বের ক্রিয়া মনন সৃষ্টি করতে নিজে পর্যাপ্ত নয়, কারণ তা যদি হ'ত তাহ'লে জন্তুর প্রাণের ভিতর মন যেমন সংহত, উদ্ভিদের মধ্যেও ইহা তেমন শীঘ্রই সংহত হ'ত। মনন সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন 'প্রাণ' গতিবৃত্তির এমন তীব্রতা পেয়েছে যাতে ইহা মনের দ্রুত কার্যাবলীর বাহন হ'তে সক্ষম এবং মনও অবশেষে একটি ভৌতিক যন্ত্রের অধিকার পেয়ে প্রাণ-গতিবৃত্তির মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে তাকে অধিগত করেছে। স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যা বিচরণ করে তা এমন এক প্রাণ-ধারা যা মনের অভ্যস্ত গতিবৃত্তির দ্বারা অনুস্যূত এবং পুষ্ট। যখন প্রাণ-গতিবৃত্তির মধ্যে মনের গতিবৃত্তি সংবৃত্ত থাকে—যেমন সাধারণতঃ সকল রূপের মধ্যেই হয়—তখন কোন সংস্পর্শেই বা ছাপেই মানসিক জ্ঞানের কোন সাড়া আসে না। কারণ যেমন ধাতুর মধ্যে প্রাণ আছে, তেমন ধাতুর মধ্যে মনও আছে; কিন্তু ইহা সুপ্ত, সংবৃত্ত, ইহার ক্রিয়া গূঢ়—আমরা যেমন বলি অচেতন, এবং এই সব সংঘাতের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন মনো-রূপের জড়ের মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্রহণের কাজেই ইহা সীমিত থাকে। ইহা আরো স্পষ্ট হবে যখন আমরা আরো গভীরভাবে প্রবেশ করি মনের সব রহস্যের মাঝে; আমরা দেখব যে যদিও মাটির ঢেলা, পাথর ও গাছ চিন্তা করে না, তবু তাদের মধ্যে মনের গূঢ় গর্ভাশয় আছে আর ঐ গর্ভাশয়ের ভিতর এমন সব রূপ সঞ্চিত হয় যেগুলিকে রূপান্তরিত করা যায় মানসিক প্রতীকে, বোধ, ভাবনা ও কথায়। কিন্তু মানসিক ক্রিয়া উত্তরোত্তর বেশী সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন প্রাণ-ধারাগুলি তীব্রতায় ও ক্ষিপ্রতায় ও সূক্ষ্মতায় সমৃদ্ধ হয় যাতে বিষয়সমূহের ক্রিয়া আরো কম দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু কর্মে আরো বেশী সমর্থ হয়; আর মানসিক ক্রিয়া একবার ব্যক্ত হ'লে ইহা ক্রমশঃই বেশী ক'রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও জটিলভাবে কার্যক্ষম হয়। কারণ এখন দেহ ও প্রাণ হ'ল মনের "প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ ভিত্তি। যাই হ'ক এমন একটা স্থান আসে যেখানে মন তার উচ্চতর বিকাশের জন্য তার যা সব প্রয়োজন সে সব ইহা প্রাণের মধ্যে পায় এবং সে সময় থেকে ইহা নিজেকে ও ইহার কার্যাবলীকে এত প্রসারিত করে চলে যে তার বিভিন্ন দৈহিক ও প্রাণিক যন্ত্রের আরো উন্নত সংগঠনের সহিত কোন

সমতা থাকে না, অথবা এমন কি অধস্তন মানুষের মাঝে কোন আরো উন্নত সংগঠনও থাকে না।

কিন্তু এখানে এই জড়ীয় জগতে এমন কি শ্রেষ্ঠ রূপগুলিরও মধ্যে জড় ভিত্তি, প্রাণ মধ্যবর্তী ও মন শেষ ফল হওয়ায়, সাধারণ নিয়ম এই যে "দেহের মধ্যে" জড় ও প্রাণ (যেখানে প্রাণ প্রকাশিত হয়) সর্বদাই সক্রিয় হবে আর মন সক্রিয় হবে শুধু ব্যতিক্রম হিসাবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, মনের সাধারণ ক্রিয়া অবচেতন ও গ্রহণশীল, যেমন পাথরে, ঢেলায় ও গাছে। যে প্রতিবিম্ব চক্ষু স্পর্শ করে, যে শব্দ কর্ণ স্পর্শ করে তাকে তৎক্ষণাৎ ভিতরে নেওয়া হয় মন-অনুস্যূত প্রাণের দ্বারা এবং মন-অনুস্যূত ও প্রাণ-অনুস্যূত জড়ের দ্বারা এবং ইহা হ'য়ে ওঠে ঐ আধারের মধ্যে ব্রহ্মের অনুভূতির এক অংশ। শুধু যে ইহা দেহের মধ্যে স্পন্দন ও প্রাণের মধ্যে গতিবৃত্তির স্রোত সৃষ্টি করে তা নয়, ইহা মনের মধ্যে এক ছাপও সৃষ্টি করে। ইহা অবশ্যম্ভাবী কারণ মন, প্রাণ ও জড় একই। যেখানে একটি আছে, সেখানে অন্যেরাও থাকে---ব্যক্ত ভাবে অথবা সুপ্তভাবে, সংবৃত্তভাবে বা বিকশিত ভাবে, অতিচেতন ভাবে সক্রিয় হ'য়ে অথবা অধিচেতনভাবে সক্রিয় হ'য়ে। যে অসি যুদ্ধে আঘাত করেছে, তা নিজের মধ্যে আঘাতের, আঘাতকারীর ও আহত ব্যক্তির মানসিক ছাপ রেখে দেয় আর যে যোগী ইহার সব মনোরূপকে মনের সক্রিয় ভাষায় রূপান্তরিত করার শিক্ষার দ্বারা নিজেকে পারদর্শী করেছে সে বহু শতাব্দী পরেও ঐ পুরাতন ঘটনার অর্থগ্রহণে সক্ষম হয়। এইরূপ, আমাদের চারিদিকে যা কিছু ঘটে তা-ই আমাদের উপর তার গূঢ় চিহ্ন ও ছাপ রেখে যায়। এরূপ যে ঘটে তা ইওরোপীয় মনোবিদ্যার আধুনিক আবিষ্কারসমূহ প্রমাণিত করতে শুরু করেছে এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা অস্তিত্বের অন্যতম সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর তথ্য; কিন্তু বেদান্তবাদীর দৃষ্টিতে ইহা অতীব সরল, স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব ছাপ মস্তিষ্কে নিয়ে যাওয়া হয় শুধু সেগুলিরই সকল অভিজ্ঞতা যে এইভাবে এক মহৎ ও অক্ষয় লিপিতে টিকে থাকে তা নয়, যেভাবেই হ'ক মনে যা কিছু আসে সে সবও---দূরবর্তী ঘটনাসমূহ, অস্তিত্বের এমন সব বিভিন্ন অবস্থা ও পুরাতন ঘটনা যাতে আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলির কোন অংশ নেই, স্বপ্নের মধ্যে ও স্বপ্নহীন নিদ্রার মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়, এমন সব বৃত্তি যা আপতিক

অচেতনার মধ্যে ঘটে অথবা তন্দ্রা, মস্তিষ্কবিকৃতি, সংজ্ঞালোপ ও সমাধির নিমগ্নত চেতনার মধ্যে ঘটে এ সবই টিকে থাকে। অচেতনতা এক প্রমাদ ; সংবিতের নিবৃত্তি এক ভ্রম।

এই কারণেই যে বৃত্তিটির উপর ঋষি এখানে মানসিক ক্রিয়ায় ও জাগ্রত অবস্থাতে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী জিনিস বলে জোর দিচ্ছেন তা ইহার গ্রহণশীলতা নয়, ইহা তার বহির্গামী শক্তি—'পততি'। ইন্দ্রিয়ের কাজে আমরা তিন প্রকারের পৃথক ক্রিয়া পাই—প্রথম, যখন সংঘাত অবচেতনভাবে পাওয়া যায় আর প্রাণস্রোতের মধ্যে মনের দ্বারা মস্তিষ্কে পাঠাবার কোন বার্তা থাকে না—এমন কি যদি প্রাণস্রোত নিজেই বার্তা বহন করে—দ্বিতীয়তঃ যখন মন সংঘাতের কথা জেনে, বিষয়ের উপর পতিত হয়, কিন্তু তা শুধু তার ইন্দ্রিয়অংশের সহিত, কিন্তু তার বুদ্ধি-অংশের সহিত নয় ; তৃতীয়তঃ যখন নিজের ইন্দ্রিয়অংশ ও বুদ্ধি-অংশ, উভয়েরই সহিত মন বিষয়ের উপর পতিত হয়। প্রথমটির বেলায়, কোন মানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না, চক্ষু বা মনের কোন মনোযোগ নেই, যেমন হয় যখন আমরা চিন্তামগ্ন হ'য়ে প্রকৃতির কোন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চলে যাই, অথচ আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই জানি না। দ্বিতীয়-টিতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এক ক্রিয়া হয়। চক্ষুর অন্তর্গত মন মন দেয় ও পর্যবেক্ষণ করে, তা যত অল্পমাত্রাতেই হ'ক ; বিষয়কে বোধ করা হয় কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন ভাবনা হয় না, অথবা মাত্র আংশিক ভাবনা হয়, যেমন পরিচারিকা তার কাজ করতে করতে তার গৃহস্বামীর হিব্রুপাঠ শোনে ; সে সব শোনে, কিন্তু সে কিছুই বোঝে না, তার কিছুই ধারণা হয় না, বাস্তবিকই কান দিয়ে সে শুধু শোনে মাত্র, কিন্তু তাতে মন দেয় না। তৃতীয়টিতে প্রকৃত মানসিক বোধ ও ভাবনা থাকে অথবা বোধ ও ভাবনার প্রয়াস থাকে, আর এই শেষ ক্রিয়াটিই ঋষির দেওয়া বর্ণনার মধ্যে পড়ে—"ঈষিতং প্রেষিতং পততি মনঃ"। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করা চাই যে এই সব ক্ষেত্রেই কেউ একজন মনোযোগ দিচ্ছে, কোন কিছু জানে ও বোঝে, দুইই করে। শস্ত্রোপচারের সময় সংজ্ঞালোপকারী ঔষধের প্রভাবে যে ব্যক্তি অচেতন ছিল, তার গভীরতর শক্তিগুলিকে যখন সম্মোহনের অবস্থায় মুক্ত করা হয় তখন সে সক্ষম হয় যেসব ঘটনা তার কল্পিত অচেতনার মধ্যে ঘটেছিল তাদের প্রতিটি বিষয় ঠিকমত স্মরণ করতে ও তাদের বর্ণনা দিতে। পরিচারিকাকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আনা

হ'লে সে তার গৃহস্বামীর হিব্রু ভাষণের প্রতিটি কথা স্মরণ করতে পারে এবং যে ভাষা সে বোঝে নি সেই ভাষায় সে সব বাক্য আবার বলতে পারে তাদের যথাযথ ক্রমে ও একটিও ভুল না ক'রে। আর এ কথা নিশ্চিত করে পূর্বেই বলা যায় যে আমাদের মন যে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়ে তার তাৎপর্য প্রণিধান করতে এত চেষ্টা করেছিল, অর্থাৎ এক নতুন ভাষায় উপনিষদের এই অংশটি, ঐ নতুন ও সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়,—আমাদের মধ্যস্থ কিছু এক সম্পূর্ণভাবে তা বোধ করেছিল, সম্পূর্ণভাবে বুঝেছিল আপনাআপনিই, অভ্রান্তভাবে কিন্তু তা মনের কাছে এই জ্ঞান নিয়ে যেতে পারে নি অথবা নিয়ে যায় নি। আমরা শুধু চেষ্টা করছিলাম যে জ্ঞান ইতিপূর্বেই আমাদের সত্তার কোন এক নিভৃত কোণে সম্পূর্ণ অধিগত ছিল তাকে কার্যকরী করতে মনের স্তরে।

এই তথ্যেই প্রকাশ পায় মনের সম্বন্ধে ঋষির বাক্যের সকল তাৎপর্য।

(অসম্পূর্ণ)

গ্রন্থবিবরণ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীঅরবিন্দ কিছুসংখ্যক উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু টীকা ও প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংশোধন করা হ'য়েছিল, সামান্য কিছুসংখ্যকের একাধিকবার সংশোধন হয়েছিল। এইসব যেভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিল তা নিম্নে বলা হ'য়েছে। শতবার্ষিকী গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্যে যা সর্বশেষ সংশোধিত লেখা পাওয়া গিয়েছে তা-ই নেওয়া হ'য়েছে। অন্যসব ক্ষেত্রে, পাণ্ডুলিপি যেমন পাওয়া গিয়েছে সেইমতই প্রকাশ করা হ'চ্ছে।

"উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব" সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধ এবং "উপনিষদ অনুবাদ করা সম্বন্ধে" একটি তাঁর প্রথমদিককার লেখা, যে সময়ে তিনি বরোদায় ছিলেন, সে সময়কার লেখা। প্রথম ছয়টি ১৯৫৩ সালে ' Advent '-এ প্রকাশিত হয়। "উপনিষদ অনুবাদ করা সম্বন্ধে" লেখাটি সেই বৎসরই " Eight Upanishads " গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়েছিল।

ঈশঃ অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছিল "কর্মযোগীতে", ১৯০৯ সালে। ইহাকে সংশোধন ক'রে আবার ' Arya ' 'আর্য'তে প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯১৪-১৫ সালে ভাষ্য ও টীকা সহ। সামান্য কিছু সংশোধনের পর ইহাকে আবার পুস্তকাকারে বার করা হ'য়েছিল ১৯২১ সালে। তারপর থেকে এপর্যন্ত ইহার বহু সংস্করণ বার হ'য়েছে।

কেনঃ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় 'কর্মযোগীতে', ১৯০৯ সালে। টীকা সহ একটি সংশোধিত সংস্করণ বাহির হয় ' Arya 'তে ১৯১৫-১৬ সালে। ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৭০-এর সংস্করণের সময় ইহা আবার সংশোধিত হয়।

কঠঃ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় 'কর্মযোগী'তে ১৯০৯-১০ সালে। ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয় ১৯১৯ সালে, আর ১৯৫২ সালে ইহার এক সংশোধিত সংস্করণ বাহির হয়।

মুণ্ডকঃ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় 'কর্মযোগী'তে ১৯০৯ সালে। একটি সংশোধিত সংস্করণ 'আর্য'তে বাহির হয় ১৯২০ সালে। ইহাকে আবার সংশোধন করা হয় আর এখানে এই অনুবাদটিই দেওয়া হয়েছে।

মাণ্ডূক্য ও প্রশ্ন--ইহাদের যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনভাবেই ছাপা হ'য়েছে।

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বেতর, ছান্দোগ্য, কৈবল্য, ও নীলরুদ্র নামক উপনিষদগুলি অনুবাদ করা হয়েছিল বরোদায়; ইহাদের মধ্যে তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ। শ্বেতাশ্বেতরের শুধু ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় পাওয়া গিয়েছে। অন্যগুলির অনুবাদের অংশমাত্র আছে। ইহাকে সংশোধন করা হ'য়েছে কিন্তু কোনটি যে শেষ সংশোধন তা বোঝা যায় না। তৈত্তিরীয় সম্বন্ধে প্রবন্ধটি 'আর্য'তে বাহির হয় ১৯১৮ সালে।

বৃহদারণ্যক--বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের উপর টীকা " Sri Aurobindo Mandir Annual , 1953"তে (শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্ষিকী, ১৯৫৩)

বাহির হয়।

গৌড়পাদের কারিকাচয় ও সদানন্দের বেদান্তসার ঃ——এগুলি কতিপয় বেদান্তগ্রন্থের অসম্পূর্ণ অসংশোধিত অনুবাদ; পাণ্ডুলিপিতে যেমন পাওয়া গিয়েছে তেমনভাবেই ইহাদের এখানে ছাপা হ'য়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ 'ঈশ' সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি টীকা লিখেছিলেন। এখানে পরিশিষ্ট অংশে ইহাদের কতকগুলি প্রথম প্রকাশিত হ'ল পাণ্ডু-লিপিতে তাদের যে আকারে পাওয়া গিয়েছে সেই আকারে। তাছাড়া 'কেন' সম্বন্ধে এক অসম্পূর্ণ টীকা শেষে দেওয়া হ'ল।